তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

৯ম কল্প
২য় ভাগ } 2

১৭৯৮ শক

২৫০/৭৫

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
৬২/৩৪১২

Registered No 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
বৈশাখ ১৭৯৮ শক

৩৯৩ সংখ্যা

ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৭

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

উপদেশ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৩ চৈত্র বুধবার ১৭৯৭ শক।

সৃষ্টি-বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে যেমন মনুষ্যকে সকল জীব হইতে উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়, মনুষ্য-বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সেইরূপ আত্মাকে সকল হইতে উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। আত্মা যে কত উৎকৃষ্ট তাহা বুঝিতে হইলে এইটি কেবল জানা আবশ্যক যে, পরমাত্মার সহিত যোগ-সাধনে আত্মারই কেবল অধিকার আছে। ব্রাহ্মধর্ম্মে কথিত আছে "প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥ প্রণব অর্থাৎ ওঁকার ধনুঃস্বরূপ আত্মা শরস্বরূপ এবং পরব্রহ্ম লক্ষ্যস্বরূপ; প্রমাদ-শূন্য হইয়া সেই প্রণব-ধনুর অবলম্বনেতে জীবাত্মারূপ শর দ্বারা ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবেক। আর যেমন শর লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত হয় তদ্রূপ জীবাত্মা ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইবে। ওঁকারকে কেন ধনুঃস্বরূপ বলা হইল ইহার প্রতি একবার প্রণিধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। একটি কোন শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহার প্রতি মন আকৃষ্ট হয়, এবং তাহার অর্থ-ভাবনাতে বুদ্ধি নিয়োজিত হয়। মন এবং বুদ্ধিকে যদি কোন বিষয়-বিশেষে প্রশান্তভাবে ব্যাপৃত করা যায়, তাহা হইলে বুদ্ধির মূলবর্ত্তী যে আত্মা তাহা পরব্রহ্মের সহিত যোগের অবসর পায়। মন বিষয়েতে আকৃষ্ট হয় মনের এই স্বভাব; মনকে বিষয়-হইতে ক্রমে উচ্চ উচ্চ প্রদেশে উঠাইয়া লওয়া যাহার কার্য্য, সে বুদ্ধি; অসীম উচ্চ প্রদেশ যে বিষয়াতীত ব্রহ্মনিকেতন, অবসর পাইলেই আত্মা সেখানে গিয়া পরব্রহ্মের অমৃত রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইতে পারে। তুলাদণ্ডের ভারদ্বয় প্রশান্ত ভাব এবং সাম্য ভাব প্রাপ্ত হইলে তাহার কাঁটা যেমন ঠিক ঊর্দ্ধদিকে স্থির-লক্ষ্য হয়; তেমনি মন প্রশান্ত ভাব এবং সাম্যভাব প্রাপ্ত হইলে আত্মা পরমাত্মাতে স্থির-লক্ষ্য হইতে পারে। ওঙ্কার এমনি একটি শব্দ যাহা অবলম্বন করিলে মন সহজে প্রশান্ত ভাব এবং সাম্যভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। স্বর বর্ণের মধ্যে "ও" এই বর্ণটি যেমন

সহজে উচ্চারণ করা যায়, অন্য কোন বর্ণই তেমন সহজে উচ্চারণ করা যায় না। আ উচ্চারণ করিতে হইলে উচ্চ-নীচে অধিক মুখব্যাদান করা আবশ্যক হয়, ই উচ্চারণ করিতে হইলে পার্শ্বাপার্শ্বি অধিক মুখব্যাদান করা আবশ্যক হয়, উ উচ্চারণ করিতে হইলে মুখ অধিক পরিমাণে সঙ্কুচিত করিতে হয়, ও উচ্চারণ করিতে হইলে মুখ তত ব্যাদান করিতে হয় না, তত সঙ্কুচিত করিতেও হয় না, অতি সহজ ভাবে প্রশান্ত ভাবে এবং সাম্যভাবে, "ও" উচ্চারিত হইতে পারে। হল বর্ণের মধ্যে ম যেমন সহজে উচ্চারণ করা যায় এমন আর কোন বর্ণই নহে। শিশুর মুখ হইতে সর্ব্বপ্রথমেই ম এই বর্ণ বাহির হইয়া থাকে। ওষ্ঠ এবং নাশিকা মুখের এই যে দুইটি দ্বার ইহার যোগেই ম উচ্চারিত হইয়া থাকে, এ জন্য ম উচ্চারণ অন্যান্য হল বর্ণ উচ্চারণের দ্বার-স্বরূপ বলিলেও অযথা হয় না। অতএব যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে কোন্ শব্দ সর্ব্বাপেক্ষা সহজে প্রশান্ত-ভাবে এবং সাম্যভাবে দীর্ঘকাল উচ্চারণ করিতে পারা যায়, তবে তাহার উত্তর এই যে ওঁ শব্দ। আরেক কথা এই যে, বিষয়ের রূপরসাদি যত প্রকার গুণ আছে তন্মধ্যে শব্দগুণ সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম, এই জন্য মনের নিকটবর্ত্তী; শব্দ দ্বারা মন যেমন সহজে ভাব প্রকাশ করিতে পারে এমত অন্য কোন কিছু দ্বারা নহে। চিত্রাদি দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিতে গেলে পট তূলি প্রভৃতি নানা বাহ্য উপকরণ আবশ্যক হয়, শব্দ দ্বারা ভাব প্রকাশ করিবার সময় বাগিন্দ্রিয় ভিন্ন আর কোন উপকরণই আবশ্যক হয় না। অতএব রূপ-রসাদি মনের যত প্রকার অবলম্বন আছে, তাহার মধ্যে শব্দই সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম এবং সহজতম অবলম্বন। রূপ-রসাদির মধ্যে শব্দ সহজতম অবলম্বন এবং শব্দের মধ্যে ওঙ্কার সহজতম শব্দ। এই কারণ বশতঃ ওঁঙ্কারকে মনের সহজতম অবলম্বন বলা যাইতে পারে। মন যখন সহজ এবং প্রশান্ত ভাবে কার্য্যবিশেষে ব্যপৃত থাকে বুদ্ধি তখন কারণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইবার অবসর পায়, মন চঞ্চল থাকিলে বুদ্ধি তাহা পায় না। মন প্রশান্ত হইলেই এইরূপ বুদ্ধি জন্মে যে, "যদ্বাচা ন ভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে" বাক্য দ্বারা যিনি প্রকাশিত হন না; বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয়, তিনিই ব্রহ্ম, এই তুমি জান; লোকে যে কোন পরিমিত বস্তুর উপাসনা করে তাহা ব্রহ্ম নহে। বুদ্ধি কার্য্য অবলম্বন করিয়া কারণের প্রতি লক্ষ্য নিয়োগ করে। সৃষ্টিকর্ত্তা কে? বুদ্ধি এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয়। সসীম কার্য্য দেখিলে তাহার একটা সসীম কারণ নিরূপণ করিতে পারে, বুদ্ধির এরূপ একটি ক্ষমতা আছে; কিন্তু সেরূপ সসীম কারণ সহস্র সহস্র জানিলেও আমরা যাহা জানিতে চাই তাহা জানা হয় না—আদি কারণ এবং অনাদি কারণ যে পরমাত্মা তাঁহাকে জানা হয় না। যে কারণ সসীম তাহারো কারণ আছে সুতরাং তাহা আদি কারণ নহে—তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। বাক্য মন এবং বুদ্ধি ইহার কেহই অসীম পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে পারে না, কেবল আত্মাই তাহাতে সমর্থ। পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া "ইনিই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা" এ কথা কেবল আত্মাই বলিতে পারে, ইহাতে আর কাহারো অধিকার নাই। কেন না, আমারদের আত্মাতে যে এক আধ্যাত্মিক ভাব রহিয়াছে তাহাই অনাদ্যনন্ত অসীমের দিকে আমারদিগকে লইয়া যাইতে পারে, আর কেহই তাহা পারে না। মন বিষয় গ্রহণ করে, বুদ্ধি তদুপলক্ষে এইরূপ প্রশ্ন করে যে ইহার

সৃষ্টিকর্ত্তা কে? আত্মা পরমাত্মার সহিত যোগ-যুক্ত হইয়া আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উত্তর দেয় "এই যে অসীম পরমাত্মা ইনিই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্ত্তা।" প্রণব ধনু-স্বরূপ জীবাত্মা শর-স্বরূপ ব্রহ্ম লক্ষ্য-স্বরূপ ইহার অর্থ এতক্ষণে স্পষ্টরূপে বোধগম্য হইল। অধ্যাত্ম-যোগে প্রবৃত্ত হইবার সময় মনের অবলম্বন চাই, বুদ্ধির অনুসন্ধান চাই; এ-দুইটি যদিও কেবল উপলক্ষ মাত্র তথাপি এ দুইটিই প্রয়োজনীয়। ওঁকার মনের সহজতম এবং নিকটতম অবলম্বন, ওঁকারের অর্থও বুদ্ধির সর্ব্বপ্রথম ভাবনার বিষয়; কার্য্য দেখিবামাত্রই "কর্ত্তা কে?" ইহা সর্ব্ব-প্রথমেই আমাদের মনে উদিত হয়। অগ্রে এইরূপ হইলে তাহার পর তবে আত্মা পরমাত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়া উক্ত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর আনয়ন করিতে সমর্থ হয়। এই জন্যই প্রণবরূপ ধনুর অবলম্বন আবশ্যক। ব্রাহ্মধর্ম্মে আরো কথিত আছে যে, "অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং" "প্রমাদশূন্য হইয়া বিদ্ধ করিবেক।" পরমাত্মা আত্মার নিকটতম বস্তু তথাপি মন প্রশান্ত না হইলে আত্মা পরব্রহ্মেতে স্থির-লক্ষ্য হইতে পারে না। ওঁকার অবলম্বন দ্বারা মনকে প্রশান্ত সমাহিত এবং একাগ্র করিলে অধ্যাত্মযোগে আশু কৃতকার্য্য হওয়া যায় বলিয়া ওঁকার ধনুঃ-স্বরূপ কথিত হইয়াছে; এবং মন কিংবা বুদ্ধি নহে—কেবল আত্মাই অধ্যাত্ম-যোগে অধিকারী এই জন্য আত্মা শর-স্বরূপ উক্ত হইযাছে। অনাদ্যনন্ত অসীম পরমাত্মার সহিত অধ্যাত্ম যোগের আমরা অধিকারী ইহা জানিতে পারিলেও যখন আমাদের শরীর উৎসাহে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তখন সেই যোগের আস্বাদ পাইলে আমরা যে কি ধন লাভ করিব তাহা কে বলিতে পারে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বসন্ত কালের ব্রহ্মোপাসনা।

প্রকৃতি চির কাল রমণীয়; মনুষ্যের আত্মা চির কাল যৌবনান্বিত। মনুষ্যের মন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, বন্ধুতা তিরোহিত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির মনোহারিতার কখন পরিবর্ত্তন হয় না। মনুষ্যের সঙ্গে বন্ধুতা করিলে সে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতে পারে কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধুতা করিলে সে কখন বিশ্বাস-ঘাতকতা করে না। মনুষ্যের সঙ্গে বন্ধুতা করিলে সে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতে পারে কিন্তু বন, উপবন, গিরি ও স্রোতস্বতীর সঙ্গে বন্ধুতা করিলে তাহারা কখন বিশ্বাস-ঘাতকতা করে না। যে সকল বন, উপবন, গিরি ও স্রোতস্বতীর প্রতি অনুরাগ আছে, বহুকাল অনুপস্থিতি পরে তাহাদিগকে পুনরায় দর্শন করিলে পুরাতন বন্ধুর সহিত পুনর্ম্মিলনের ভাবের ন্যায় ভাব মনে উদিত হয়। মনুষ্যের আত্মা চির-যৌবনান্বিত, যৌবন কালে তরুণ অরুণের গলিত কনকসদৃশ কিরণ মনে যেরূপ আহ্লাদের সঞ্চার করে বার্দ্ধক্যেও সেইরূপ সঞ্চার করে; যৌবন কালে সুধাকর যেরূপ সুধা ক্ষরণ করে বার্দ্ধক্যেও সেইরূপ সুধা ক্ষরণ করে; যৌবন কালে পুষ্পের রমণীয় কান্তি ও সৌরভ যেরূপ মনোহরণ করে, বার্দ্ধক্যেও সেইরূপ মনোহরণ করে। বহুদিবস অনুপস্থিতি পরে বার্দ্ধক্যে জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করিলে দেখা যায় সমবয়স্ক তরুগণ বাল্য কালে মনে যেরূপ আহ্লাদের সঞ্চার করিত বার্দ্ধক্যেও সেইরূপ সঞ্চার করে, বাল্যকালে জন্মভূমির সমীরণ যেরূপ আনন্দ বহন করিত বার্দ্ধক্যেও সেইরূপ করে, বাল্য কালে বালসখাদিগের মুখশ্রী যেরূপ হর্ষ উৎপাদন করিত বৃদ্ধ কালেও জীবিত বালসখাদিগের মুখশ্রী সেই রূপ করিয়া থাকে। মনুষ্যের আত্মা চির যৌ-

বনান্বিত কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির আত্মা সম্বন্ধে এই বাক্য যেমন প্রয়োগ করা যাইতে পারে এমন অন্য কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। তাঁহার আত্মা চিরকাল সমানরূপে তেজস্বী; তাঁহার উদ্যম ও উৎসাহের কখন শেষ হয় না, ইহার প্রতি কারণ কি? ইহার প্রতি কারণ এই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন সত্য তেমনি কবিত্বে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্য এই জন্য উহাকে অবলম্বন করিলে মনের যেরূপ বল হয় এমন অন্য কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে হয় না। ব্রাহ্মধর্ম্ম কবিত্বে পরিপূর্ণ! নিরতিশয় মহান সুন্দর পুরুষের ভাব কি কবিত্ব পূর্ণ! আমরা মৃত্যুর পর এক লোক হইতে উচ্চতর লোকে যাইব, স্বর্গ হইতে উচ্চতর স্বর্গে উৎসব হইতে গাঢ়তর উৎসবে প্রবেশ করিব, এই ভাব কেমন কবিত্ব মাখা! সকল মনুষ্য এক পিতার সন্তান, সকল মনুষ্যকে প্রীতি করা কর্ত্তব্য এই তত্ত্ব যেমন কবিত্বে পরিপূর্ণ এমন অন্য কোন্ তত্ত্ব আছে? ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্য ও কবিত্বে পরিপূর্ণ, এ জন্য উহা পৃথিবীর দুঃখ ক্লেশ মধ্যে মনকে সতেজ রাখে ও জগৎকে মধুর করে।

পরমাত্মা আমাদের আত্মাতে সর্ব্বদা আবির্ভূত থাকিয়া তাহাকে সতেজ ও মধুর করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

অধ্যাত্ম-বিদ্যা।

ঘটিকা-যন্ত্রের বিকলাবস্থায় একটা বাজিবার সময় হয়ত বারোটা বাজে, বারোটা বাজিবার সময় হয়ত একটাও বাজে না। অনেক বিষয়ে জনসমাজের ঐরূপ বিকলাবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি সম্পদের শিখরে আরূঢ় হইয়াছেন, তাঁহার সম্পদ বর্দ্ধনে অনেককেই উৎসাহী দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধি যতদূর হইবার তাহা তাঁহার হইয়াছে, আর বুদ্ধি তাঁহার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন, তথাপি তাঁহার বুদ্ধি যাহাতে আরো বাড়ে, তাহাতে অনেককেই তৎপর দেখিতে পাওয়া যায়। আবার যাঁহারা বিপদ-সাগরে জলমগ্ন হইতেছেন, বিশেষরূপ আনুকূল্য না পাইলে যাঁহারা একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িবেন, তাঁহারদের এক বিন্দু আনুকূল্য করে এমন ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্লভ! ইহার কারণ কি? কারণ ত স্পষ্টই পড়িয়া রহিয়াছে—স্বার্থপরতা! সম্পন্ন ব্যক্তির, যদিও, আর বৃদ্ধিতে বিশেষ কোন লাভের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু যাঁহারা তাহাতে আনুকূল্য করেন তাঁহারদের বিশেষ লাভের সম্ভাবনা আছে। বিপন্ন ব্যক্তির যদিও আনুকূল্য প্রাপ্তিতে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা, কিন্তু যাঁহারা তাহা প্রদান করেন তাঁহারদের তাহাতে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা! যেখানে এইরূপ ক্ষতিবৃদ্ধি গণনা অনিবার্য্য সেখানে সত্যাসত্য বা ন্যায়ান্যায় বিচার কেবল একটা কথার কথা মাত্র হইবে, ইহা ভিন্ন আর কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? আমারদের দেশের যেরূপ বিপন্ন অবস্থা তাহা সকলেই জানিতেছেন, কিন্তু তাহা জানিয়াও কৃত্যবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে কয়জন স্বদেশের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন? স্বদেশকে অসভ্য বর্ব্বর প্রভৃতি বলিয়া তিরস্কার করিবার লোক যদি একশত জন পাওয়া যায়, তবে তাহাকে সভ্যতার জন্মভূমি, সরস্বতীর প্রিয়-নিকেতন বলিয়া উৎসাহ দেয়—এমন লোক হয়ত একজন মাত্র পাওয়া যাইবে। স্বদেশের দোষ বাহির করিবার সময়ে সকলেই শত সহস্র চক্ষু উন্মীলন করিয়া উঠেন, তাহার গুণ অন্বেষণ করিবার সময় সকলেই অন্ধের ভান করিয়া থাকেন। "গুণ আছে কি? কই! আমরা ত কিছু দেখিতে পাই না!"

এইরূপে তাঁহারা আপনারদের অজ্ঞতাভিমান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ "গুণ থাকুক্ বা না থাকুক্, আমারদের তাহা জানিবার কোন প্রয়োজন নাই বরং দোষ, অবগত হইতে পারিলে তাহাতে ফল আছে।" স্বদেশ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, অধ্যাত্ম-বিদ্যা সম্বন্ধে তাহাই বলা যাইতে পারে। "অধ্যাত্ম-বিদ্যা আছে কি? কই! আমরা ত কিছু দেখিতে পাই না।" পুনশ্চ "অধ্যাত্ম-বিদ্যা থাকুক্ বা না থাকুক্, আমারদের তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই, বরং তাহা না থাকিলেই ভাল!" কেবল আধ্যাত্ম-বিদ্যাই তাঁহাদের জানিতে বারণ। আর যত প্রকার বিদ্যা আছে, তাহা তাঁহাদের জানিতে বারণ নাই। অধ্যাত্ম-বিদ্যার প্রতি এত যে বিদ্বেষ তাহার কারণ কি সত্যপ্রিয়তা? তাহা হইতে পারে না! সত্যের কোথাও বারণ নাই, আত্মাতেও সত্য আছে, বহির্ব্বিষয়েও সত্য আছে, সত্য সর্ব্বত্রই অবারিত-দ্বার। সত্যকে যিনি বলেন "তুমি আত্মাতে থাকিও না, কেবল বহির্জগতেই বিচরণ কর," সত্য তাঁহাকে বলেন "অতি যে ক্ষুদ্র বালুকা তাহাও যখন আমার কাছে ত্যজ্য নহে, তখন ভৌতিক জগতের সারাংশ লইয়া যাহার সিংহাসন বিরচিত হইয়াছে এমন বস্তুকে আমি কি-দোষে পরিত্যাগ করিব? আমাকে তুমি তোমার আত্মা হইতে বাহির করিয়া দিতে চাও, অথচ লোকের নিকটে আমার প্রেমী বলিয়া আপনার পরিচয় দেও! প্রীতিভাজনকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়াই কি প্রীতির লক্ষণ? সত্য কি কেবল তোমার মুখে—তোমার অন্তরে নহে? তোমার অন্তরে যদি সত্য না থাকে, তবে তোমার প্রেমও অসত্য, জ্ঞানও অসত্য, কথাও অসত্য; সকলই মৌখিক! সত্যের জন্য তুমি যদি সত্যকে ভাল বাসিতে, তবে কি তোমার আত্মা হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দিতে চাহিতে? কিন্তু ইহা স্থির জানিও যে, তোমার প্রেমে সত্যের বৃদ্ধি হয় না, তোমার অপ্রেমেও সত্যের হ্রাস হয় না; সত্যকে আত্মা হইতে বাহির করিয়া দিলে তোমার আপনারই তাহাতে ক্ষতি, সত্যকে আত্মার অভ্যন্তরে প্রকাশমান দেখিলে তোমার আপনারই তাহাতে পুরুষার্থ; তোমার চক্ষুতে দোষ জন্মিলে সূর্য্যেতে সে দোষ পৌঁছে না, তোমার চক্ষু অন্ধ হইলে সূর্য্যের আলোক নির্ব্বাণ হয় না! আত্মা হইতে সত্যকে বাহির করিয়া দিতে সহস্র যদিও চেষ্টা কর, সত্য এক পদও চলিবে না; সত্য যেখানকার সেইখানেই থাকিবে। সত্য অন্ধকার নহে, সত্য আলোক; মিথ্যাই অন্ধকার। শশ যেমন চক্ষু মুদিত করিয়া মনে করে "আমাকে কেহ দেখিতেছে না" তুমি আপনি সেইরূপ জ্ঞানচক্ষু মুদিত করিয়া সত্যের সত্যকে অন্ধ মনে করিতেছ, আলোককে অন্ধকার মনে করিতেছ, চেতনকে জড় মনে করিতেছ। তোমার চক্ষু মোহান্ধ বলিয়া চক্ষুর চক্ষুকেও মোহান্ধ মনে করিতেছ!"

এক্ষণকার পাশ্চাত্য বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতেরা নূতন এক যুক্তি বাহির করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, পূর্ব্বকার অজ্ঞান মনুষ্যেরা আপনাকেই এবং আপনার পৃথিবীকেই সকল জগতের কেন্দ্র মনে করিত, এক্ষণকার জ্ঞানবান্ মনুষ্যেরা আপনার বহির্দ্দেশেই কেন্দ্র-সমর্থন করিয়া থাকেন। কিন্তু এ কথাটি অতীব অযথার্থ কথা। পূর্ব্বেই বা কি আর এখনই বা কি, সকল কালেই লোক ঈশ্বরকে পূর্ণ এবং আপনাকে অপূর্ণ বলিয়া অনুভব করিয়া আসিতেছে, এবং সেই পূর্ণ পরাৎপর পরমেশ্বরকেই সকলের মধ্য-বিন্দু বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া আসিতেছে। আপনার অপূর্ণতা ঈশ্বরে আরোপ করিয়া অনেকে

যদিও ভ্রমে পড়িয়াছেন, কিন্তু সে ভ্রম কিছু এমন নহে যে তাহার সহিত অন্য কোন জাতীয় ভ্রমের সাদৃশ্য নাই; অন্যান্য ভ্রমও যেমন কাল-ক্রমে চলিয়া যায়, উহাও সেইরূপ কাল-ক্রমে চলিয়া যাইতেছে এবং যাইতে থাকিবে। ভৌতিক-বিদ্যাই যাঁহাদের সর্ব্বস্ব তাঁহারা বলেন যে, লোকে পূর্ব্বে পৃথিবীকে কেন্দ্র বলিত, এখন সূর্য্যকে কেন্দ্র বলিতেছে; তেমনি লোকে পূর্ব্বে আপনা আপনাকে কেন্দ্র বলিত, এক্ষণে বহির্জ্জগৎকে কেন্দ্র বলিতেছে। কিন্তু এ উপমাটির গোড়াতেই ভুল। যাহা বলিলে ঠিক হইত, অর্থাৎ সত্যের ব্যাঘাত হইত না, সে কথা এই যে, পূর্ব্বে লোকে ঈশ্বরেতে আপনার অপূর্ণ ভাব আরোপ করিত, এক্ষণে লোকে ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিতেছে যে, সে অপূর্ণ ভাব আমারদের নিজের, ঈশ্বরেতে তাহার সংস্পর্শ-মাত্র নাই। পূর্ব্বে লোকে মনে করিত বটে যে, সূর্য্য-কর্ত্তৃক কেবল এই পৃথিবীরই উপকার সাধিত হইতেছে; এক্ষণে ইহা স্থির হইয়াছে যে, পৃথিবীর কেবল নয়, তৎকর্ত্তৃক সকল গ্রহেরই উপকার সাধিত হইতেছে। সূর্য্যকে পৃথিবীর বেষ্টন-চক্রের নাভি-দেশস্থ জানাতে জ্ঞানের গভীরতা হইল, এবং কেবল পৃথিবীর নয় কিন্তু সকল গ্রহের সম্বন্ধে সূর্য্যের প্রভাব-বিস্তার উপলব্ধি করাতে জ্ঞানের প্রশস্ততা হইল। আধ্যাত্মিক বিষয়েও মনুষ্যের জ্ঞান পূর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত এবং গভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বে যখন লোকে ভাবিত যে কেবল একমাত্র এই পৃথিবীর সম্বন্ধে সূর্য্য বিচেষ্টিত হইতেছে, তখনই তাহারা ভাবিত যে, কেবল মাত্র আমার জন্যই ঈশ্বর তাবৎ জগৎ নিয়মিত করিতেছেন—আর কাহারো জন্য নহে। এখন লোকে জানিতেছে যে কেবল পৃথিবীর সম্বন্ধে নহে সকল গ্রহেরই সম্বন্ধে সূর্য্য যন্ত্র-স্বরূপ; তেমনি ইহাও জানিতেছে যে, ঈশ্বর কেবল-মাত্র আমার জন্য জগৎ-সংসার নিয়মিত করিতেছেন না, যেমন আমার জন্য তেমনি অন্যের জন্য সকলের জন্য তিনি জগৎসংসার নিয়মিত করিতেছেন। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও আমারদের জ্ঞানের গভীরতা ও প্রশস্ততা সাধিত হইল। পরমাত্মা সকল মঙ্গলের মূলাধার জানাতে জ্ঞানের গভীরতা হইল, এবং তাবতেরই মঙ্গল-বিধাতা জানাতে জ্ঞানের প্রশস্ততা হইল। আন্তরিক সত্য অপেক্ষা বাহ্যিক সত্যের যাঁহারা অধিক অনুরাগী, তাঁহাদের সহিত উপমা হয় এমন একজন জ্যোতির্ব্বেত্তা যদি কখন জন্মগ্রহণ করেন তবে তিনি সূর্য্যকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া চন্দ্রকে গ্রহ-রাজ-পদে অভিষিক্ত করিবেন। কেন না উক্ত ভৌতিক পণ্ডিতগণ যেমন অধম শ্রেণীস্থ জড় বস্তুকে উত্তম শ্রেণীস্থ জ্ঞান-বস্তু অপেক্ষা উচ্চ পদ প্রদান করেন সেইরূপ তাঁহারদের জ্যোতির্বিদ্ ভ্রাতারা পৃথিবী অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীস্থ চন্দ্রকে পৃথিবী অপেক্ষা উচ্চপদ প্রদান করিবেন, ইহাই সঙ্গত। পৃথিবী এবং গ্রহগণ পূর্ব্বে সূর্য্যকে চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া ছিল, এবং এক্ষণে সূর্য্যকে নিয়মিতরূপে প্রদক্ষিণ করিয়া সেই চক্রাকারকেই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেছে। সুতরাং সূর্য্যকে পৃথিবীর অন্তরস্থিত এবং পৃথিবীকে সূর্য্যের বহিঃস্থিত বলাই সঙ্গত। সূর্য্য যে কারণে পৃথিবীর অন্তরস্থিত, চন্দ্র সেই কারণে পৃথিবীর বহিঃস্থিত। অতএব যাঁহারা বাহিরে কেন্দ্র অন্বেষণ করেন তাঁহারা চন্দ্রকে সূর্য্য-স্থানে ধরিয়া তুলিতে চেষ্টা করুন। সূর্য্যের বহিঃস্থিত যে পৃথিবী অথবা আরো বহিঃস্থিত যে চন্দ্র, তাহাকে কেন্দ্র মনে করা যেমন অজ্ঞানের লক্ষণ, সেইরূপ পরমাত্মার বহিঃস্থিত যে জীবাত্মা অথবা আরো বহিঃস্থিত যে ভৌতিক

পদার্থ তাহাকে কেন্দ্র মনে করা অজ্ঞানের লক্ষণ; অপিচ যেমন অন্তরতম সূর্য্যকেই কেন্দ্র মনে করা জ্ঞানের লক্ষণ, সেইরূপ অন্তরতম আত্মাকেই কেন্দ্র মনে করা জ্ঞানের লক্ষণ। অন্তরস্থিত সূর্য্য যেমন আলোক উত্তাপ এবং তাড়িত পদার্থের আকর-স্বরূপ, অন্তরস্থিত আত্মা সেইরূপ জ্ঞান প্রেম এবং মঙ্গল ভাবের আধার স্বরূপ। আদিম কালেরই বা কি এবং বর্ত্তমান কালেরই বা কি, অজ্ঞান লোক মাত্রেই আপনাকে এবং আপনার স্বার্থকে সকলের কেন্দ্র মনে করে, জ্ঞানবান্ মাত্রেই ঈশ্বরকে এবং পরমার্থকে (অর্থাৎ সর্ব্ব জগতের মঙ্গলকে) সকলের কেন্দ্র মনে করেন। এক জন আদিম লোকই বলিয়াছেন "সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ।" এইরূপ সূর্য্যের সহিত পরমাত্মার উপমাই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ; পৃথিবীর সহিত কেহই পরমাত্মার উপমা দেন নাই। সুতরাং যাঁহারা বলেন যে, আপনার ভাব এবং আপনার পৃথিবীকেই আদিম কালের লোকেরা সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিত তাঁহাদের কথা ঠিক নহে। আদিম কালেরই বা কি এবং বর্ত্তমান কালেরই বা কি, সর্ব্বকালেই জ্ঞানবান্ লোকে বাহ্য জগতে সূর্য্যের এবং অধ্যাত্ম জগতে পরমাত্মার প্রাধান্য উপলব্ধি করেন। তবে আদিম কালে জ্ঞানী ব্যক্তির সংখ্যা এবং অধিকার অল্প ছিল, এক্ষণে উভয়ই সমধিক বিস্তৃত হইয়াছে—এই যাহা প্রভেদ।

পাশ্চাত্য (ইউরোপাদি) দেশে এক্ষণে ভৌতিক বিদ্যার যেমন প্রাদুর্ভাব অধ্যাত্ম বিদ্যার তেমন দেখা যায় না। পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় আমারদের দেশকে অনেকে বর্ব্বর বলেন। যাঁহারা বলেন তাঁহাদের দোষ নাই, পাশ্চাত্য (ইউরোপীয়) বিদ্যা-সমূহের ঐন্দ্রজালিক প্রভাব তাঁহাদিগকে ঐরূপ বলায়, তাঁহারা করিবেন কি? নল রাজার রথ-চালন বিদ্যা, অর্জ্জুনের অস্ত্র-বিদ্যা, বিশ্বকর্ম্মার শিল্পবিদ্যা সমস্তই যেখানকার ঘরের সামগ্রী, সেখানকার তুলনায় আমারদের দেশ কি আর দেশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে? "দেশে দ্বেষ কি কারণ", ইহা যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তবে তাহার উত্তর ঐ-যাহা বলা হইল। কিন্তু এক দিকে সকল লাভ, আর এক দিকে সকল ক্ষতি, এরূপ অসংগত বৈষম্য জগৎ সংসারের রীতি নহে। বৈষম্যকে সাম্য করিবার দিকেই জগতের গতি। বৈষম্যের সাম্য করিতে গিয়াই পৃথিবী ঘুরিতেছে, বৈষম্যের সাম্য করিতে গিয়াই ঋতুচক্র ঘুরিতেছে, মানবসমাজের গতিও ঐ নিয়মের বশবর্ত্তী। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যে এক বিদ্যার স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, ঐ নিয়মের গুণে তাহা আবার পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিবে। কাল-চক্রকে কে রোধ করিতে পারে? জগতের গতি পর্য্যালোচনা করিলে আর একটি এই দেখা যায় যে, প্রভূত বৈষম্যের মধ্যেও সাম্য-ভাবের বীজটি আশ্চর্য্য-রূপে রক্ষিত হইয়া থাকে। সে বীজটির অভিজ্ঞান-চিহ্ন কি? না দ্বন্দ ভাব। একটা লৌহ-শলাকার এক দিকে যদি একতর চুম্বক শক্তি জন্মে তবে আর দিকে অন্যতর চুম্বক শক্তি জন্মিবে—ইহা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। একদিকে একতম বিষয়ের প্রাদুর্ভাব হইলে অন্যদিকে অন্যতম বিষয়ের প্রাদুর্ভাব হইবে, এ নিয়মটিকে দ্বন্দ-নিয়ম বলিয়া সংক্ষেপে বলা যাউক্। সকল সদ্‌গুণই একদিককে একেবারে বঞ্চিত করিয়া, অন্যদিকে গিয়া সঞ্চিত হইবে, একাংশেরই একাধিপত্য হইবে, ইহা জগৎ সংসারের নিয়ম-বিরুদ্ধ। এক প্রকারের সদ্‌গুণরাশি যখন এক দিকে গিয়া পুঞ্জীভূত হয়, তখন আর এক দিকে

অবশ্যই আর এক প্রকারের সদ্গুণচ্ছটা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। পৃথিবীর এক দিকে যখন সূর্য্য উদিত হয়, আর এক দিকে তখন তারকারাজি গগনের ললাটকে শোভিত করে। এইরূপ সর্ব্বত্রই। "পূর্ব্ব আর্য্যদেশ এবং পশ্চিম আর্য্যদেশ উভয়ের মধ্যে কালক্রমে যেরূপ প্রভূত বৈষম্য ঘটিয়াছে তাহা দেখিলে কোন কালে যে, সাম্য সংস্থাপন হইতে পারিবে এমন আশা থাকে না। কিন্তু দ্বন্দ-নিয়ম ব্যর্থ হইবার নহে। পশ্চিম-প্রদেশে ভৌতিক বিদ্যার যেমন আদরাধিক্য, আমারদের দেশে অধ্যাত্ম-বিদ্যার সেইরূপ আদরাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিম প্রদেশে ভৌতিক-বিদ্যার শাখা প্রশাখা এত বিস্তীর্ণ হইয়াছে যে, আর শাখা-বাহুল্য-কার্য্যে প্রধান পক্ষীয় পণ্ডিতগণের অরুচি জন্মিয়াছে; ইহাঁরা এখন মূল ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। অনির্দ্দেশ্য আদিম কালের বাষ্পাৎ বাষ্পতম ভূতাদি হইতে মনুষ্যের মস্তিস্ক পর্য্যন্ত পৌঁছে, এমনি একটি ভৌতিক সোপান খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য ইহাঁরা সবিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। মনে কর যেন তাঁহারা কৃতকার্য্য হইলেন। মনে কর সেই ভৌতিক সোপান অবলম্বন করিয়া মস্তিস্ক পর্য্যন্ত উঠিলেন। তাহার পর কোথায় যাইবেন? তাঁহারদের গম্যস্থান কোথায়? মস্তিস্ক যদি জ্ঞানের বাসস্থান না হইত তাহা হইলে তাহা মৃৎপিণ্ড অপেক্ষা অধিক আর কি হইত? জ্ঞানের বাসস্থান বলিয়াই ত মস্তিস্কের এত আদর। যাহার অধিষ্ঠান জন্য মস্তিস্কের এত গৌরব তাহাকে বিস্মৃত হইয়া মস্তিস্কের গুণগান করিলে ফলের মধ্যে হয় এই যে, রাজা কেহই নহে, সিংহাসনই সর্ব্বস্ব!

মস্তিস্কের পরমাণু-সকলের নিয়তই যোগ বিয়োগ হইতেছে, আহার দ্বারা মস্তিস্কে নূতন পরমাণুর সংযোগ এবং ব্যবহার দ্বারা পুরাতন পরমাণুর বিযোগ এইরূপে মস্তিস্কের স্রোত নিয়তই প্রবাহিত হইতেছে। সেই পরিবর্ত্তনশীল মস্তিস্ক-স্রোতের উপর আত্ম-জ্ঞান (অর্থাৎ "আমি" এই জ্ঞান স্থির-ভাবে ভাসমান হইতেছে। মনে কর স্রোতের মধ্য দিয়া বাড়বানল জ্বলিতেছে, অথবা স্রোতের উপরে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব নিপতিত হইয়াছে। এ অবস্থায় জলের স্রোত বাড়বানলের তাপলাঘবের, অথবা সূর্য্যের প্রতিবিম্ব উৎপাদনের কারণ, ইহা অবশ্যই স্বীকার করি। কিন্তু বাড়বানলের প্রধান আধার গভীর পাতালে, এবং সূর্য্যালোকের প্রধান আধার মহোচ্চ গগনে—ইহাতে আর কাহারও সংশয় হইতে পারে না। জলের স্রোত যদি আলোকোত্তাপের আধার হয়, তবে স্থান-বিশেষে যে-জল হইতে উত্তাপালোক বহির্গত হয়, স্থানান্তরে সেই জল শীতল এবং অনুজ্জ্বল হয় ইহার অর্থ কি? মস্তিস্ক-স্রোত যদি চেতনের আধার হয়, তবে জীবের শরীরাভ্যন্তরে আইলেই মস্তিস্ক চেতিত হয়, শরীর হইতে বহিস্কৃত হইলেই তাহা অচেতন হয়, ইহার অর্থ কি? যেমন কেবল মাত্র জলে ঔজ্জ্বল্য সম্ভবে না, সেইরূপ কেবল মাত্র পরমাণু-পুঞ্জে সজীবতা থাকিতে পারে না; কেবল মাত্র সজীব পদার্থে চেতন থাকিতে পারে না; কেবল মাত্র চেতন-পদার্থে বিজ্ঞত্ব থাকিতে পারে না। জলের কোথাও যদি ঔজ্জ্বল্য থাকে তবে আলোক পদার্থই তাহার কারণ, পরমাণু-পুঞ্জের মধ্যে যদি সজীবতা থাকে তবে প্রাণ-পদার্থই তাহার কারণ; সজীব পরমাণু-পুঞ্জে যদি চৈতন্য থাকে, তবে চেতন-পদার্থই তাহার কারণ, সচেতন জীবে যদি বিজ্ঞতা থাকে তবে বিজ্ঞান-পদার্থই তাহার কারণ। পরমাণু-পুঞ্জ কেবল আকর্ষণ-শক্তিরই আধার; তদ্ভিন্ন প্রাণের আধার স্বতন্ত্র,

মনের আধার স্বতন্ত্র, বিজ্ঞানের আধার স্বতন্ত্র, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পরমাণু-পুঞ্জ, প্রাণ পদার্থ, মনঃ পদার্থ, বিজ্ঞান-পদার্থ, ইত্যাদি সমস্তকে যদি একটি মাত্র মূল পদার্থের আশ্রিত বলিয়া স্বীকার কর, তবে তাহাতে আমাদের কিছু মাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু যদি উল্লিখিত চারিটি পদার্থের মধ্য হইতে একটিকে বাছিয়া লইয়া, তাহাকে সেই মূলাধার-পদে বরণ কর, তবে তাহাতে আমাদের বিশেষ আপত্তি আছে। কেন না জড়-শক্তি যদি স্থান বিশেষে প্রাণরূপ ধারণ করে, তবে তাহার (প্রাণরূপে পরিণত হইবার) যে কারণ তাহা অবশ্য জড়-শক্তি হইতে ভিন্ন। জল স্থান বিশেষে যদি উজ্জ্বলরূপ ধারণ করে, তবে তাহার কারণ কি জল, না জল হইতে ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ? তেজঃ পদার্থ কি তাহার কারণ নহে? সেইরূপ জড়-শক্তি যদি স্থল-বিশেষে প্রাণিত হয়, তবে প্রাণ-পদার্থই তাহার কারণ, প্রাণ যদি স্থল-বিশেষে চেতিত হয় তবে মনঃপদার্থই তাহার কারণ, মন যদি স্থল-বিশেষে বিজ্ঞাত হয়, তবে বুদ্ধি-পদার্থই তাহার কারণ, এইরূপ ব্যাপার-ভেদে কারণ-ভেদ এবং আধার-ভেদ অবশ্যই মানিতে হইবে। যেমন দর্শন শক্তির আধার চক্ষুরিন্দ্রিয়, শ্রবণ শক্তির আধার শ্রোত্রেন্দ্রিয়, ইহার বিপর্য্যয় সম্ভবে না, অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয় শ্রবণ শক্তির আধার হইতে পারে না, শ্রবণেন্দ্রিয়ও দর্শন শক্তির আধার হইতে পারে না, সেইরূপ পরমাণুও প্রাণ শক্তির আধার হইতে পারে না, প্রাণ-পদার্থও পারমাণব বলের আধার হইতে পারে না। তবে যদি এরূপ বল যে, যেমন ব্যক্তি বিশেষের সকল প্রাণন ক্রিয়ার আধার তাহার প্রাণ-পদার্থ বা সকল মনন-ক্রিয়ার আধার তাহার মনঃ পদার্থ; সেইরূপ সকল জগতের আধার কোন্ পদার্থ? তবে তাহার উত্তর আপাতত এই পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে যে, তাহা উক্ত সমুদায় বিশেষ বিশেষ পদার্থ হইতে ভিন্ন। যেমন ভাষাবিৎ পণ্ডিতেরা মূল আর্য্য ভাষাকে বর্ত্তমান সমুদায় আর্য্য ভাষা হইতে ভিন্ন বলেন, এমন কি, সংস্কৃত ভাষাকেও মূল আর্য্য ভাষা বলেন না; সেইরূপ আমরা ইহা বলিতে পারি যে, কি পরমাণু-পুঞ্জ কি প্রাণ-পদার্থ, কি মনঃ পদার্থ, কি বুদ্ধি পদার্থ, ইহার কেহই মূলাধার নহে, মূলাধার সকল হইতে ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র।

উপযুক্ত অবস্থা-প্রাপ্ত পরমাণু-পুঞ্জের সান্নিধ্য ব্যতীত ইহ জীবনে মনোবৃত্তি চালনা করা যায় না, এই পর্য্যন্তই কেবল পরীক্ষাতে পাওয়া যায়। কিন্তু পরমাণু-পুঞ্জের সত্তার উপরে যে মানসিক সত্তা নির্ভর করে, ইহা কোন পরীক্ষাতেই পাওয়া যায় না। অতএব মস্তিস্কের আকৃতি এবং প্রকৃতি দেখিয়া যদিও ব্যক্তি-বিশেষের মানসিক শক্তির পরিচয় পাওয়া সম্ভবে, তথাপি সেই আকৃতি এবং প্রকৃতি মনোবৃত্তি পরিচালনের সহায়তা ভিন্ন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে মনোবৃত্তি পরিচালন করে ইহা কোন পরীক্ষাতেই পাওয়া যায় না। ভৌতিক পরীক্ষাতে যাহা পাওয়া যায় না তাহাই বলা হইল। আধ্যাত্মিক পরীক্ষাতে যাহা পাওয়া যায়, তাহা এক্ষণে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

লবণাহার।

মনুষ্য উন্নতির অধিকারী হইয়াই এই জগতের আর আর জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, মনুষত্ব লাভ করিয়াছেন, ইহা সত্য বটে, কিন্তু তাঁহার কোন বিষয়ে সেই উন্নতি লাভ করা কঠিন হইতেও কঠিন ব্যাপার। ঈশ্বর তাঁহার আত্মাতে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা গুলিকে যত্নের সহিত পরিপোষিত করিয়া

তত্তাবতের বিষয় গুলিকে এরূপ নিবিড় অন্ধকারময় মহারণ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন যে, তাঁহাকে অবিশ্রামে তাহার মধ্যে ইহা নহে, ইহা নহে, করিয়া দিগ্বিদিক্ ভ্রমণ করিতে হইতেছে। সেই অরণ্যে অদ্য যিনি যে বিষয়টি লাভ করিয়া কোন দিকে অনেক দূর উন্নত হইলেন মনে করিয়া, নিজে মহানন্দে উৎসব করিতে লাগিলেন এবং পার্শ্ববর্ত্তি লোকমণ্ডলীকে সেই আনন্দের অংশী করিলেন, কিছু দিনের মধ্যে আবার তিনি না হয় তাঁহার কোন ভ্রাতা, বিষণ্ণবদনে স্বীকার করিলেন, ঘোষণা করিলেন যে, সেই লব্ধ বিষয়টি বিশেষ অবনতি ভিন্ন কোন মতেই উন্নতির উপকরণ নহে; সুতরাং তাহা অবিলম্বে পরিত্যজ্য। অপরন্তু এরূপ ঘটনাও বিরল নহে যে, যাহা সেই অরণ্যে এক সময়ে মনুষ্যের অবনতির কারণ বলিয়া অশ্রদ্ধার সহিত পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাই আবার কিছুদিন পরে তাহার বিশেষ উন্নতির সোপান বলিয়া আদরের সহিত পরিগৃহীত হইতেছে। ফলতঃ উন্নতির উপকরণ সকল সন্ধান করিয়া লওয়ার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে যে অরণ্যে বিচেষ্টমান করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার দৈনন্দিন ব্যাপার সকল অতীব রহস্যজনক, তৎসমুদায় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়।

শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিষয় সকল স্থূল ও প্রতিনিয়ত দরিদ্র, ধনী, মূর্খ, পণ্ডিত, সকল ব্যক্তি দ্বারাই পরীক্ষিত হইতেছে বটে, কিন্তু তত্তৎ বিষয়ক উন্নতিও সম্পূর্ণ অনিশ্চয়াত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অদ্য আমরা যে বিষয়টির প্রস্তাবনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা যদিও শুনিতে অতি সামান্য বটে, তথাচ সকলেই বোধ হয় তদ্দ্বারা আমাদিগের শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় উন্নতির ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

পৃথিবীর প্রায় সমুদায় সভ্য দেশীয় লোকেরাই অতি প্রাচীন কাল হইতে নানাবিধ আহার দ্রব্যের সহিত লবণ ভক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। আহার্য্য বস্তুর স্বাদ ও পরিপাক-যন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি করিবার জন্যই সকলে লবণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং সকল দেশের লোকেরাই যে চির দিনই লবণকে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর নিতান্ত অনুকূল সামগ্রী বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন তাহাতে আর কিছুমাত্র বিচিত্রতা নাই। অন্যের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা শারীরতত্ত্ব রসায়ন শাস্ত্র এবং চিকিৎসা শাস্ত্রাদির অনুশীলনে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেক ব্যক্তি মনুষ্যের লবণ ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তর অনুকূল মত প্রচার করিতে ত্রুটি করেন নাই।

আমরা যে সকল পদার্থ সচরাচর ভক্ষণ করিয়া থাকি তাহার কঠিন ভাগ জীর্ণ করিবার নিমিত্ত শারীরিক ক্রিয়া দ্বারা জঠরে যে যে পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে একটির নাম লবণ-দ্রাবক (ইংরেজী ডাইড্রোক্লোরিক বা মিউরিয়েটিক এসিড) এই পদার্থটি ক্লোরিণ ও হাইড্রজেন নামক দুইটি পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ হইতে সমুৎপন্ন। লবণের মধ্যে ক্লোরিণ পদার্থ একটি প্রধান উপাদান, এই হেতুতে অনেকে মনে করেন যে, আহার্য্য পদার্থের সহিত লবণ ভক্ষণ করিলে জঠরে মিউরিয়েটিক দ্রাবকের কখনই অসদ্ভাব ঘটিতে পারে না, সুতরাং অজীর্ণ দোষ সংঘটনেরও আশঙ্কা থাকে না। লবণের অনুকূলবাদিগণের আর একটি যুক্তি এই যে, লবণ অত্যন্ত পচন-নিবারক পদার্থ; সুতরাং আহার্য্য বস্তুর সহিত লবণ মিশ্রিত থাকিলে তৎসমুদায় শীঘ্র দূরিত হইয়া কোন প্রকার অনিষ্টোৎপাদন করিতে পারে না। যাহা হউক, এবংবিধ যুক্তি গুলির

প্রতিকূলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের যে সকল মত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইতে পারিলে, প্রত্যেকেই স্ব স্ব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের উন্নতি-স্রোতের ভঙ্গ কিরূপ তাহাও লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইতে পারিবেন, এই জন্য তৎসমুদায় সংক্ষেপে সংগৃহীত হইল।

ডাক্তার গ্রেহেম বলেন যে, লবণ মাত্রেই খনিজ পদার্থ, ইহা শরীরের পক্ষে যেমন অপুষ্টিকর তেমনি অজীর্ণ দোষের জনক। যদি এক তোলা লবণ এক পোয়া জলে দ্রব করিয়া কাহাকেও সেই জল পান করাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ক্ষণ কাল মধ্যেই তাহার পাকাশয়ে বিষম উদ্বেগ উপস্থিত হয়। লবণের দাহক-ক্রিয়া হইতে পাকাশয়ের অন্তরাবরণকে রক্ষা করিবার জন্য নৈসর্গিক নিয়মানুসারে তৎক্ষণাৎ তাহার অভ্যন্তরে প্রভূত পরিমাণ রস নিঃসৃত হইয়া পড়ে এবং শরীর হইতে উক্ত বিষবৎ পদার্থকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য অবিলম্বেই সেই নিয়মানুসারে বমনের উদ্বেগ উপস্থিত হয়। অপরন্তু লবণ দ্রবের যে অংশ বমন দ্বারা বহিষ্কৃত না হইয়া অধঃস্থ অন্ত্রে (ক্ষুদ্র পাকাশয়ে) প্রবেশ করে তাহাকে আবার তরল করিয়া নিস্তেজ করিবার জন্য রক্ত হইতে যথেষ্ট পরিমাণ জলীয়াংশ যাইয়া তাহার সহিত মিলিত হয় এবং ভেদের আকার ধারণ করিয়া উভয়ই শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। জীবের শরীর মঙ্গলময় বিধাতার গঠন বলিয়া তাহার অভ্যন্তরে এরূপ একটি পরমাশ্চর্য্য শক্তি বিরাজিত রহিয়াছে যে, যখনই কোন বিষ পদার্থ তাহাতে প্রবেশ করে তখনই সেই শক্তি প্রভূত বলের সহিত বিবিধ উপায়ে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার নিমিত্ত চেষ্টা করে এবং বিশেষ প্রতিরন্ধক না থাকিলে বহিষ্কৃত না করিয়াও ক্ষান্ত হয় না। কোন পদার্থ আমাদিগের শরীরের পক্ষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিষবৎ কি না, তাহা যেমন সেই শক্তি দ্বারা সপ্রমাণিত হয় এরূপ আর কিছুতেই হয় না।

কিন্তু যদি আহার্য্য পদার্থের সহিত অল্প পরিমাণে লবণ ভক্ষণ করা যায় তাহা হইলে তাহার ফল ওরূপ ভয়ঙ্কর হয় না। যিনি আহারের সহিত অল্প পরিমাণে লবণ ভক্ষণ করেন, তাঁহার যদি উক্তরূপ ভক্ষণে দীর্ঘ অভ্যাস না জন্মিয়া থাকে এবং যদি তাঁহার শারীরিক ক্রিয়া সকল সতেজ থাকে, তাহা হইলে তাঁহার ভুক্ত লবণের মাত্রা যতই অল্প হউক না কেন, তিনি কোন মতেই তজ্জনিত বিবিধ অসুখেয় হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে পারেন না। ঐরূপ ভোজনে শুদ্ধ যে তাঁহার কিয়ৎ পরিমাণে অসুখ জন্মে এমত নহে, অন্য দিন অপেক্ষা সে দিন তাঁহার পাকাশয়ে শ্লৈষ্মিক ও স্নৈহিক ঝিল্লি হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে রস নিঃসৃত হইয়া উক্ত লবণাংশকে এরূপ ভাবে দ্রবীভূত করে যে তাহার আর তাদৃশ অনিষ্টকারিতা থাকে না। এইরূপে দ্রবীভূত হইবার পর সেই লবণ রক্তের সহিত শোষিত হইয়া সমস্ত শরীর ভ্রমণ করে এবং ক্রমে প্রস্রাব ঘর্ম্ম প্রভৃতির সহিত শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। সুতরাং আহার্য্যের সহিত অল্পপরিমাণে লবণ ভক্ষণ করিলেও তাহা শরীরের কিছুমাত্র উপকারে আইসে না, অথচ তদ্দ্বারা গ্লানি ও শ্লৈষ্মিক রসাদির অযথাক্ষয় এবং রক্তের নিকৃষ্টতা সঙ্ঘটিত হয়। যাঁহারা আহার্য্য পদার্থের সহিত লবণ ভক্ষণ করা অভ্যস্ত করিয়া ফেলেন তাঁহাদিগের আর তজ্জনিত কিছুমাত্র গ্লানিও হয় না এবং তাহাদিগের শারীর ধর্ম্ম প্রভাবে তাহা শরীর হইতে বহির্গতও হয় না;

বরং ক্রমে তাঁহাদের রক্ত রস ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল এরূপ লবণময় হইয়া উঠে যে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সকলেই লবণ পদার্থকে তাঁহাদের শরীরের প্রধান উপাদান বলিয়া সিদ্ধান্ত না করিয়া থাকিতে পারেন না। যেরূপ গবাদি পশুরা সর্ব্বদা মঞ্জিষ্ঠা লতা ভক্ষণ করিলে তাহার বর্ণদ্রব্য দ্বারা ক্রমে তাহাদের অস্থি পর্য্যন্তও রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, তদ্রূপ নিত্য-লবণ-ভোজীদিগের শারীরিক পদার্থ সকলও ক্রমশঃ লবণাক্ত হইয়া পড়ে। অনেক রাসায়নিক পণ্ডিত পরীক্ষা দ্বারা মানবদেহে যথেষ্ট পরিমাণ লবণ প্রাপ্ত হইয়া স্থির করিয়াছেন যে, মনুষ্যের লবণ ভক্ষণ করা বিধেয়। কিন্তু তাঁহারা যাহাদের শারীরিক পদার্থ সকল পরীক্ষা করিতে পাইয়াছেন, তাহারা অতিরিক্ত লবণভোজী কি না, তাহা তাঁহারা একবারও মনে করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত নির্ভরযোগ্য নহে, আহারের সহিত লবণ ব্যবহার সম্বন্ধে ডাক্তর গ্রেহেম সাহেবের আপত্তি সমুদায়ের সারাংশ এই—১ লবণ সম্পূর্ণরূপে অপুষ্টিজনক; শরীরের কোন অংশেই লবণ দ্বারা পুষ্টি জন্মিতে পারে না। ২—উহাকে কোন মতেই জীর্ণ করা যায় না। উহা কোনরূপে শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, উহা অবিকৃতরূপেই রক্তের সহিত মিলিত হইয়া অবিকৃতাবস্থাতেই রক্তপ্রবাহ দ্বারা শরীরের সর্ব্বত্র পরিচালিত হয় এবং অবশেষে শ্বাসযন্ত্র মূত্রযন্ত্র ও ঘর্ম্মাদি দ্বারা শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। ৩—উহার তীব্রতা পাকাশয়াদি যন্ত্রের পক্ষে অতিশয় গ্লানিজনক। পাকাশয়ে প্রবিষ্ট হইবা মাত্রেই উহা জীবনী শক্তি দ্বারা পরিত্যক্ত ও বহিষ্কৃত হইবার উপক্রম হয়; ইহাতে যেমন পাচক রস সমুদায়ের অপক্ষয় তেমনি আবার শরীরে বিলক্ষণ দুর্ব্বলতার সঞ্চার হয়। এতদ্ভিন্ন ইহা দ্বারা পাকাশয়, অন্ত্র, শোষক শিরা, হৃৎপিণ্ড ও রক্তপ্রবাহিনী শিরা সকল সর্ব্বদাই অযথারূপে উত্তেজিত হওয়ায় নানারূপ পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ৪—লবণ দ্বারা পরিপাক ক্রিয়ার কোন প্রকার সাহায্য হওয়া দূরে থাকুক, সর্ব্বাংশেই তাহার ব্যতিক্রম সংঘটিত হয়। পরিপাক কার্য্যের নিমিত্তে যে পরিমাণ মিউরিয়েটিক্ দ্রাবকের প্রয়োজন, তাহার ক্লোরিণ উপাদান প্রায় সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিদাহার হইতেই সংগৃহীত হইতে পারে, তাহার নিমিত্ত সামুদ্রিক বা খনিজ লবণের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। গোধূম চাউল প্রভৃতি উদ্ভিদ অন্নের মধ্যে যে, কিঞ্চিৎ লবণ বিদ্যমান আছে, তাহা দ্বারাই শরীরের সমুদায় প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে; সুতরাং আহারের সহিত লবণ ভক্ষণ করিলে তাহার উগ্রতা ও তীব্রতা নিবন্ধন শরীরে অবশ্যই নানাপ্রকার পীড়ার উৎপত্তি হইবেই হইবে। সত্য বটে, যাঁহারা লবণ ভক্ষণ অভ্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহারা যদি কোন দিন অলবণ আহার করেন, তাহা হইলে সে দিন তাঁহাদের পরিপাক কার্য্যের ব্যতিক্রম হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা কস্মিন কালেও লবণস্পর্শ করেন নাই, তাঁহারা লবণ ভক্ষণ করিলে কোন মতেই অসুখ বোধ না করিয়া থাকিতে পারেন না। ৫—লবণ দ্বারা খাদ্য দ্রব্যের আস্বাদ-সুখের অনেক ব্যাঘাত জন্মে। অনেকেরই বিশ্বাস এই যে, কোন কোন প্রকার আহার্য্য বস্তুর সহিত লবণ মিশ্রিত করিলে তাহার স্বাদ বৃদ্ধি হয় এবং কোন কোনরূপ দ্রব্যের সহিত লবণ মিশ্রিত না করিলে তাহা রুচি পূর্ব্বক ভক্ষণ করা যায় না। এইরূপ বিশ্বাসকে সত্যমূলক না বলিয়া সম্পূর্ণরূপে অভ্যাসমূলক বলাই কর্ত্তব্য। যাঁহারা লবণ ভক্ষণ অভ্যস্ত করিয়াছেন তাঁহারা লবণবিরহে যে সকল খাদ্য

দ্রব্য সম্পূর্ণ বিস্বাদ বলিয়া পরিত্যাগ করেন, যাঁহাদের সেরূপ অভ্যাস নাই তাঁহারা কখনই তৎসমুদায়কে বিস্বাদ জ্ঞান করেন না, বরং বিলক্ষণ সুস্বাদ জ্ঞান করিয়াই তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করেন। সকলেই জানেন যে অলবণ ঘৃতান্ন অপেক্ষা বিস্বাদ সামগ্রী আর কিছুই নাই, কিন্তু এদেশে যাঁহারা পিতৃ বা মাতৃবিয়োগ নিবন্ধন শাস্ত্রের বিধানানুসারে একমাস পর্য্যন্ত অলবণ হবিষ্যান্ন ভোজন করেন, তাঁহারা চিরাভ্যাস বশতঃ প্রথম কয়েক দিন মাত্র অতৃপ্তি বোধ করিবার পরেই বিলক্ষণ রুচি পূর্ব্বক তাহা ভোজন করেন, তাহাতে কিছু মাত্র কষ্ট অনুভব করেন না। অনেক ব্যক্তিকে দুগ্ধের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহার স্বাদ বৃদ্ধি করিতে দেখা গিয়াছে। এরূপ রুচি আবার অনেকের নিকটেই ঘৃণিত। অতএব লবণ দ্বারা খাদ্য দ্রব্যের উপাদেয়তা বৃদ্ধিবিষয়ক যে বিশ্বাস, তাহা কল্পনা ও অভ্যাসমূলক ভিন্ন কখনই স্বভাব ও সত্যমূলক হইতে পারে না। ৬—লবণের পচননিবারণী শক্তি আছে সত্য বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া লবণ ভক্ষণ দ্বারা আমাদিগের ভুক্ত মাংসাদির পচন নিবারণ করা আবশ্যক হইতেছে না। মাংসাসী পশু পক্ষিরা যে মাংস ভোজন করিয়া কখনই তাহার পচন নিবারণার্থে বিন্দুমাত্রও লবণ ভক্ষণ করে না, তাহাতে কি তাহাদের কিছুমাত্র অনিষ্ট হইয়া থাকে? যদি লবণ ভক্ষণ করা আবশ্যক হইত, তাহা হইলে করুণাময় ঈশ্বর অবশ্যই তাহাদের লবণ প্রাপ্তির কোন সহজ উপায় করিয়া দিতেন। অতএব আমরা মাংসাদি পচনপ্রবণ দ্রব্য ভোজন করি বলিয়াই তাহার সঙ্গে সঙ্গে পচননিবারক লবণ ভক্ষণ করা আমাদের সম্পূর্ণরূপে অনাবশ্যক।

কেহ কেহ বলেন যে, পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণ লবণ আছে এবং বন্য ও গৃহপালিত পশুরাও অনেক সময়ে দূরবর্ত্তী স্থানে যাইয়া লবণ সন্ধান করিয়া ভক্ষণ করে; সুতরাং ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, মনুষ্য জাতিও লবণ ভক্ষণ করিতে পারেন। এই রূপ যুক্তির সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। পৃথিবীতে যাহা অধিক পরিমাণে আছে, তাহাই যে মনুষ্যের ভক্ষ্য হইবে, এরূপ যুক্তি কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না; তাহা হইলে মৃত্তিকাও আমাদের ভক্ষ্য দ্রব্য হইতে পারে? কোন কোন পশু কখন কখন দূরবর্ত্তী স্থান সকল অনুসন্ধান করিয়াও লবণ ভক্ষণ করে বটে, কিন্তু সে ভক্ষণের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পশ্বাদির উদরে কৃমি জন্মিলে তাহারা তাহাদিগের ঈশ্বর-প্রদত্ত চিকিৎসাজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া, লবণ অনুসন্ধান করিয়া ভক্ষণ করে। এতদ্ভিন্ন, তাহারা অন্য কোন সময়ে তাহার অনুসন্ধান করে না। অতএব পশ্বাদির দৃষ্টান্ত অনুসারে ঔষধের নিমিত্তই লবণ ভক্ষণ করা যাইতে পারে, কিন্তু নিত্য আহার্য্য দ্রব্যাদির সঙ্গে ভক্ষণ করা যাইতে পারে না।

বিশেষ বিশেষ রোগের পক্ষে লবণ একটি চমৎকার ঔষধ। বোধ হয়, চিকিৎসক মাত্রেই জানেন যে, অজীর্ণ দোষ, উদরাময়, বিসূচিকা, কাশরোগ, কৃমিরোগ এবং পচনপ্রবণ ক্ষত রোগ প্রভৃতিতে লবণকে ঔষধ রূপে ব্যবহার করিলে বিস্তর উপকার দর্শে। অপরন্তু, এরূপ সিদ্ধান্তও বোধ হয় অধুনা কাহারো অপরিজ্ঞাত নাই যে, যাহা দ্বারা যে রোগের প্রতিকার হয়, তাহাই আবার অধিক পরিমাণে সেবন করিলে সেই রোগ জন্মে। এই পরীক্ষিত সত্য সিদ্ধান্তানুসারে মনুষ্যের রোগ নিবারণার্থেই লবণ ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু প্রতিনিয়ত আহারের সঙ্গে

তাহা ব্যবহার করা কোন মতেই উচিত নহে। আহারের সহিত নিত্য উহা ব্যবহার করিলে শুদ্ধ যে প্রোক্ত রোগ সকলই জন্মিতে পারে এমত নহে, ঐ সকল রোগের সময়ে লবণকে আর ঔষধ রূপে ব্যবহার করিলে তাদৃশ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। জাহাজের নাবিকগণ একাদিক্রমে অধিক কাল পর্য্যন্ত লবণাক্ত মৎস্য মাংসাদি ভোজন করিয়া যে স্কার্ভি নামক ভয়ানক ক্ষত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে, তাহা ডাক্তর মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ডাক্তর গ্রেহেম আবার বলেন যে, অতিরিক্ত লবণ ব্যবহার দ্বারা স্ক্রোফিউলা কাশ ও নানাবিধ চর্ম্ম রোগ জন্মিয়া থাকে। আবার ডাক্তর পার্কস প্রভৃতি বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেন যে, তাঁহারা উৎকট অজীর্ণ রোগ ও যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে কিছু কাল পর্য্যন্ত অলবণ আহার করিতে দিয়া অরোগী করিয়াছেন। অতএব যখন আহারের সহিত লবণ ভক্ষণ ও অভক্ষণের ফল সকল এরূপ বিভিন্ন ও চমৎকার তখন আমাদিগকে সর্ব্ব প্রযত্নে আহারের সহিত লবণের ব্যবহার রহিত করা উচিত হইতেছে। সামান্য অভ্যাসের অনুরোধে অর্থ ব্যয় করিয়া বহুবিধ রোগ ক্রয় করা সম্পূর্ণ অমানুষিক ব্যাপার।

এস্থলে আর একটি কথা না বলিয়া প্রস্তাবটীর উপসংহার করিতে পারিতেছি না। আমাদিগের দেশে যাঁহারা পূর্ব্বকালে শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থা অনুসারে ব্রহ্মযোগ সাধন করিতেন ও এখনও করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রাণান্তেও লবণ সংযোগ করিয়া কোন বস্তু আহার করেন না। শরীরের স্বাস্থ্য ও স্থৈর্য্য সাধনই তাঁহাদের সমুদায় আহারের একমাত্র লক্ষ্য। এখনও বিধবা প্রভৃতি যাঁহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিতে হয়, তাঁহাদিগের পক্ষেও সলবণ আহার নিষিদ্ধ। ব্রহ্মচারী মাত্রেই বিলক্ষণ সুস্থ(১)। অতএব যখন স্পষ্টাক্ষরে দেখা যাইতেছে যে, অলবণ আহার দ্বারা শরীরের কিছুমাত্র অনিষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যই পরিলব্ধ হয়, তখন আমাদিগকে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া শরীরসম্বন্ধে অবনতির হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য হইতেছে।

(১) ব্রহ্মচারীরা অভাবকল্পে সামুদ্রিক লবণের পরিবর্ত্তে সৈন্ধব ব্যবহার করিয়া থাকেন। অলবণ হবিষ্যান্নই প্রকৃত ব্যবস্থা।

মনুষ্যের উন্নতির ত্রিবিধ সোপান।

জনসমাজের শৈশবাবস্থায় দৈহিক বলই মনুষ্যের প্রধান সম্বল ছিল। তৎকালে আত্মরক্ষা ও জীবনোপায় প্রত্যেক ব্যক্তির শারীরিক বল বীর্য্যের উপরেই প্রধানরূপে নির্ভর করিত। সেই প্রথমাবস্থায় যদিও অতি সামান্য উপকরণ দ্বারা মনুষ্যের জীবন ধারণ হইত, কিন্তু তখন মনুষ্যের জ্ঞান ও বুদ্ধিশক্তি সমধিক পরিস্ফুট না হওয়াতে জীবনোপযোগী সামান্য অভাব সকল পূরণ করিবার চেষ্টায় লোকের সমস্ত আয়াস ও সমস্ত সময় পর্য্যবসিত হইত; সুতরাং সে অবস্থায় বুদ্ধির পরিচালনা ও জ্ঞানোপার্জ্জনের অবকাশ স্বল্পমাত্রই থাকিত। তখন শারীরিক বল বিক্রমই মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠাধিকার বলিয়া পরিগণিত হইত। এই অবস্থার আদর্শ এক্ষণকার অসভ্য জাতিদিগের দৃষ্টান্তে অনেকাংশে প্রতীয়মান হইবেক। ইহারা মৃগয়া বা পশুচারণ অথবা সামান্য কৃষিকার্য্য দ্বারা কথঞ্চিৎরূপে আপনাদের জীবন ধারণ করিয়া অতি হীনাবস্থায় কালাতিপাত করে। শিল্প বাণিজ্যাদি কার্য্য যাহাতে বুদ্ধির পরিচালনার আবশ্যক হয় তাহার চিহ্ন ইহাদের মধ্যে অত্যল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে সকল কার্য্য একমাত্র দৈহিক বলসাপেক্ষ অথবা যাহা সাতিশয় কায়িক ক্লেশ বা পরিশ্রম সাধ্য, তাহাতে অসভ্য জাতিরা অবলীলাক্রমে ও অসঙ্কুচিত চিত্তে প্রবৃত্ত হয়। মৃগয়া এবং যুদ্ধ বিগ্রহ যাহাতে দৈহিক বল বীর্য্যের পরীক্ষা ও চরিতার্থতা সাধন হয়, তাহাই লইয়া তাহাদের উৎসাহ ও আমোদ। এই সকল কার্য্যে তাহারা সামর্থ্য ও বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারিলেই জীবনকে সার্থক বিবেচনা করে এবং স্বজাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠা-ভাজন হয়। এই প্রকারে যে ব্যক্তি বলবিক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, সেই ব্যক্তিই প্রায় প্রধান পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব মনুষ্যের প্রথমাবস্থায় একমাত্র দৈহিক বলেরই গৌরব সকল বিষয়ে দৃষ্ট হয় এবং তাহাই মনুষ্যত্ব ও বীরত্বের পরিচায়ক হয়।

কিন্তু জনসমাজের এই ভাব চির কাল থাকিবার নহে। কালক্রমে কৃষি বাণিজ্যাদির উন্নতি সহকারে মনুষ্যের ধন সঞ্চয় ও তজ্জন্য জীবিকা আহরণের শ্রম লাঘব হইলে, বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা ও জ্ঞানোপার্জ্জনের অবকাশ হইতে থাকে এবং লোকের সমবেত চেষ্টায় সমাজ ক্রমশঃ শৃঙ্খলাবদ্ধ ও তাহাতে শান্তি স্থাপন হইয়া শিল্প সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোচনা ক্রমশঃ বিস্তার হইতে থাকে, ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য আপনার মানসিক উন্নত শক্তিও অধিকার সকলকে আয়ত্তাধীন ও প্রয়োজনোপযোগী করিতে থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ বিদ্যা বুদ্ধির পরিচালনা ও উন্নতি সহকারে নূতন নূতন শিল্প নূতন নূতন যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়া মনুষ্যের শরীরগত সুখ স্বচ্ছন্দতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং তাহাতে দিন দিন কায়িক পরিশ্রমের পরিমাণ লাঘব হওয়ায় বিদ্যালোচনা ও জ্ঞানের উন্নতি সাধনার্থে লোকে ক্রমশঃ অধিকতর অবকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে। এইরূপে শারীরিক বলের প্রাধান্য ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া মানসিক শক্তির গৌরব ও প্রাধান্য স্থাপিত হয়। এই অবস্থাটি অসভ্যতা হইতে সভ্যাবস্থায় আরোহণের প্রথম সোপান হইতেছে। যে জাতির মধ্যে এইরূপ বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় নাই, সে জাতি এপর্য্যন্ত অসভ্যতারূপ ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিতে হইবেক। যেখানে বিদ্যার গৌরব নাই এবং জ্ঞানিগণের মর্য্যাদা নাই, কেবল বলীয়ান যুদ্ধজেতা এবং সমরপ্রিয় বীরগণেরই একমাত্র প্রাদুর্ভাব, সে স্থলে প্রকৃত সভ্যতার স্বচ্ছ কিরণ প্রবেশ করিয়াছে একথা কদাপি বলা যাইতে পারে না। আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিগণ ও হিন্দুসমাজের প্রাচীন ব্যবস্থাপকগণ জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপনের একান্ত প্রয়োজন জানিয়াই ব্রাহ্মণ জাতিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ দিয়াছেন; তাঁহাদের ব্যবস্থানুসারে ব্রাহ্মণগণ নিয়ত শাস্ত্রালোচনায় এবং জ্ঞানোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত থাকিয়া সমাজের মস্তকস্বরূপে সকলের নেতা ও নিয়মকর্ত্তা ছিলেন, এবং ক্ষত্রিয়গণ সমাজের বাহুস্বরূপে, নিজ পরাক্রম-বলে শত্রু-দমন করিয়া, সমাজ সংরক্ষণ ও প্রজাপালন করিতেন। এক্ষণে জন-সাধারণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার ও বিজ্ঞানের আলোচনা হেতু দিন দিন নূতন নূতন শিল্প নূতন নূতন যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়া মনুষ্যের ক্ষমতা ও অধিকার ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের বাহ্য সুখ স্বচ্ছন্দতা সাধনোপযোগী নানা প্রকার সামগ্রী আয়োজনের উদ্ভাবন হইতেছে। মনুষ্য এক্ষণে আপন বুদ্ধিবলে প্রাকৃতিক পদার্থ ও নৈসর্গিক শক্তি সকলকে নিজ আয়ত্তাধীন করিয়া তদ্দ্বারা আশ্চর্য্য ও অভাবনীয় ব্যাপার সকলের যোজনা করি-

তেছে। ধূম, জ্যোতি, সলিল, মরুতাদি রূপ অসীম প্রভাবশালী ভৌতিক পদার্থ সকলকে ভৃত্যের ন্যায় নিজ কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া আপন সুখ স্বচ্ছন্দতার পরিবর্দ্ধন করিতেছে। কালক্রমে যে আরো নূতন নূতন নৈসর্গিক শক্তিকে পরাজয় করিয়া মনুষ্য স্বীয় সামাজিক ও শারীরিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারিবে, তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্ব কালে যে সকল কার্য্য বহুকালব্যাপক অতি কঠিন শারীরিক পরিশ্রম ব্যতীত নিষ্পন্ন হইত না এক্ষণে তাহা অনায়াসে স্বল্পকাল মধ্যে সম্পাদিত হইতেছে। সুতরাং সামান্য কায়িক পরিশ্রম হইতে অনেকাংশে আমরা অবসর প্রাপ্ত হইয়া মানসিক উন্নতির প্রতি অধিকতর যত্ন ও মনোনিবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছি।

এইরূপ জনসমাজের দ্বিতীয় অবস্থায় বুদ্ধিবল ও বিদ্যাবলই সর্ব্ব প্রধান রূপে পরিগৃহীত হয়, তখন দৈহিক বলকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীতি হয়। অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সংগ্রামে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক নরমুণ্ড পাত করিয়াছে, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সুসভ্য জনপদে বুদ্ধিজীবি ও বিদ্বজ্জনগণই সমাজের অলঙ্কার-স্বরূপে পরিগনিত হয়েন এবং বিদ্যাই খ্যাতি প্রতিপত্তি ও উন্নত পদলাভের প্রধান উপায় হইয়া উঠে। বাস্তবিক জ্ঞানের উন্নতি ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের মত ও বিশ্বাস এবং সামাজিক অবস্থার বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে। পুরাবৃত্ত পাঠে দৃষ্ট হইবেক যে, পূর্ব্ব কালে প্রায় সকল জাতি যুদ্ধবিগ্রহ লইয়াই নিয়ত ব্যস্ত থাকিত, কিন্তু কালক্রমে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সহকারে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর সদ্‌ভাব ও সন্ধি সংস্থাপিত হওয়ায় যুদ্ধ বিগ্রহ বিবাদ বিসম্বাদ অনেকাংশে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। মনুষ্যসমাজে অপেক্ষাকৃত অধিকতর শান্তি স্থাপন হইয়াছে এবং তৎপ্রযুক্ত সকল সভ্য জাতি মধ্যে উন্নত শিল্প ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনার সমধিক উদ্রেক ও উৎসাহ হইয়াছে। পূর্ব্ব কালের বীর পুরুষগণ যুদ্ধকে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি ও পদমর্য্যাদা লাভের একমাত্র সোপান জানিয়া তাহাতে অতি আগ্রহের সহিত প্রবৃত্ত হইতেন। পরাক্রমশালী ভূপতিগণ আপন আপন রাজ্যাধিকার বিস্তার ও পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণকে স্বীয় শাসনাধীন করিবার আকাঙ্ক্ষায় সমারোহ পূর্ব্বক সমর-সজ্জা করিয়া দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করিতেন। কিন্তু এক্ষণে যদিও সময়ে সময়ে সভ্য জাতিদিগের মধ্যেও ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা জনসমাজের অনিবার্য্য অমঙ্গল স্বরূপে সর্ব্বত্র পরিগণিত হয়। পূর্ব্বকালে স্বাধীন জাতির মাধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য যুদ্ধ ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। পরস্পর সমকক্ষ ও তুল্য পরাক্রমশালী জাতিদিগের মধ্যে যে সকল গুরুতর বিবাদ বিসম্বাদ হেতু এক শতাব্দী পূর্ব্বে মহাপ্রলয়ের ন্যায় ভয়ঙ্কর সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত ও নর শোণিতে ধরা সিক্ত হইয়া গিয়াছে, সেই সকল বিবাদের এক্ষণে মধ্যস্থ দ্বারা মীমাংসা হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিগণ সেই মীমাংসা শিরোধার্য্য করিয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করিতেছে(১)। ইহা সামান্য পরিবর্ত্তনের চিহ্ন নহে, ইহার দ্বারা অবশ্য ভরসা করা যাইতে পারে যে, কালক্রমে পৃথিবী হইতে যুদ্ধ বিগ্রহ অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, ধরাধাম নিরবচ্ছিন্ন

(১) কিছু কাল হইল ইংরাজ ও আমেরিকান জাতির মধ্যে আলেবামা সংক্রান্ত যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে পরস্পরের যুদ্ধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল কিন্তু উভয়ে মধ্যস্থ দ্বারা ঐ বিরোধ মীমাংসা করিয়া লইয়াছে।

শান্তি রসাস্পদ হইবে এবং মনুষ্যের সুখ-স্বচ্ছন্দতাবর্দ্ধক শিল্প ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি নির্ব্বিঘ্নে হইতে থাকিবে। যাহার বল তাহারই স্থল, যাহার পরাক্রম তাহার জয়, এই নিয়মেই পূর্ব্বকালে স্বত্বাস্বত্বের নির্ণয় হইত। কিন্তু এক্ষণে সভ্য জাতিদিগের মধ্যে কি ব্যক্তি কি জাতি সম্বন্ধে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে ন্যায় বিচারানুসারে তাহার মীমাংসা করাই বিধি হইতেছে। এইরূপে ইহা দৃষ্ট হইবেক যে, পূর্ব্বকালে মনুষ্যের দৈহিক বল ও পরাক্রমের যেমন গৌরব ছিল, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে মানসিক শক্তি ও জ্ঞানের সেইমত প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বিদ্যা বুদ্ধি জনসমাজে পদমর্য্যাদা ও খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের প্রধান সোপান হইয়া আসিতেছে। বিদ্যা-বলে ও বুদ্ধি-কৌশলে অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সম্পাদিত হইতেছে, এবং ভবিষ্যতে তদ্দ্বারা যে জনসমাজের অশেষবিধ মঙ্গল সাধন হইবেক তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এ অবস্থা মনুষ্যের উন্নতির চরম অবস্থা নহে; ইহা অপেক্ষা আর এক উচ্চতর সোপান আছে, যাহাতে সকল প্রকার বল ও শক্তির উপর ধর্ম্মবলই প্রধানরূপে বিরাজিত হইবেক। মনুষ্যের মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিবল যেমন ক্রমে শারীরিক বল বীর্য্যকে পরাজয় করিয়াছে, সেইরূপে বুদ্ধি-বলও ক্রমে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম-বলের আয়ত্তাধীন ও অনুবর্ত্তী হইবেক। তাহা হইলেই মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন এবং জনসমাজ প্রকৃত মনুষ্যত্বের আস্পদ হইবেক। এক্ষণে সাংসারিক সকল কার্য্যেই প্রায় আমরা বিদ্যা ও বুদ্ধিশক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকি। কিন্তু হৃদয়ের প্রীতি, ভক্তি, দয়া, দক্ষিণ্যাদি ভাব ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল যাহাতে বিকসিত ও বলিষ্ঠ হইয়া বুদ্ধি-শক্তিকে সৎপথে ও উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত করে, তাহার প্রতি আমরা সমুচিত যত্নবান হই না। বিদ্যার প্রভাবে এক্ষণে বাহ্যিক সভ্যতার দিন দিন উন্নতি হইয়া আসিতেছে এবং তৎসহ আমাদের অশেষবিধ নূতন অভাবের সৃষ্টি হইতেছে; সেই সকল অভাব মোচন করাই এক্ষণে আমাদের একটি গুরুতর কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে ও তাহারই চিন্তায় লোকে অহরহঃ ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছে; সুতরাং, আন্তরিক ধর্ম্মভাব সকলের বলাধান ও চরিতার্থতা সাধন করিবার চেষ্টা ও অবকাশও থাকে না ও তৎপ্রতি জনসাধারণের দৃষ্টিও সচরাচর পতিত হয় না। এক্ষণে বিদ্যা বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারিলেই লোকে প্রতিষ্ঠা ভাজন ও সকলের মান্য গণ্য হইয়া থাকে। বিদ্বান ব্যক্তির ধর্ম্মবিষয়ক মতামত অথবা চরিত্রগত দোষাদোষের প্রতি আমরা অধিক লক্ষ্য করি না। সামাজিক নিয়ম ও শাসন এবং লৌকিক ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এক্ষণে আমরা চলিয়া থাকি; সকল কার্য্যে সাংসারিক ফলাফলের প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিয়া থাকি। রাজশাসন ও সামাজিক নিন্দা এই দুইটি প্রধানরূপে আমাদের কার্য্যনিয়ামক হইয়াছে; এইটি যে এক্ষণকার সভ্য সমাজের প্রতিকৃতি তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। যিনি এই সংসারের ভাব গতিকের সহিত আপনার ভাবকে সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে পারিলেন, তাঁহারই সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা ও পদোন্নতির সম্ভাবনা। কিন্তু অন্তঃসারবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সংসারের প্রবল স্রোতের সহগামী হইতে সক্ষম বা অভিলাষী হয়েন না, সুতরাং তাঁহারা পশ্চাতে পড়িয়া থাকেন; তাঁহাদের প্রতি কেহই লক্ষ্য করে না। সংসাররূপ বিপণীতে যে সকল দ্রব্য সর্ব্বদা বিক্রয় হয়, তাহা তাঁহারা সংগ্রহ করিতে বা আনিতে পারেন না, এজন্য তাঁহাদের ব্যবসায় অচল; কোন ক্রেতা তাঁহা-

রদের নিকটে আইসে না, বা তাঁহারদের যত্ন-সঞ্চিত বহুমূল্য দ্রব্য জাতের গুণ বা পরিচয় জিজ্ঞাসা করে না।

এইরূপে জনসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও হৃদয়ের উন্নত ভাব সকল উৎসাহ বিহীনে পরিস্ফুট হইবার সুযোগ পায় না ও তজ্জন্য মনুষ্যের প্রকৃত মঙ্গলোন্নতির অনেকাংশে ব্যাঘাত হইতেছে। ধর্ম্ম-বিরহিত হইয়া কেবল বুদ্ধিজীবি হইলে মনুষ্য যে অতি ভয়ঙ্কর জীব হইয়া উঠে ইহার দৃষ্টান্ত আমরা সচরাচর দেখিতে পাই। অতএব বুদ্ধিবৃত্তি ও বিদ্যার পরিচালনা হেতু যদিও মনুষ্যসমাজের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হইয়াছে কিন্তু ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে সে উন্নতি কদাপি স্থায়ী হইতে পারে না; এই নিমিত্ত আমাদের বুদ্ধি শক্তি যাহাতে ধর্ম্ম-বলের অধীন থাকিয়া তদ্দ্বারা নীয়মান হয় তাহারই যত্ন করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই প্রকৃত শুভ ফল উৎপন্ন হইবেক। মনুষ্যের হৃদয়ের সদ্‌ভাব সকল যখন প্রস্ফুটিত হইয়া স্বীয় স্বীয় শক্তি ও প্রভাব প্রকাশ করিবেক তখনই মানসিক শক্তির অপেক্ষা ধর্ম্মভাবের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠতা আমরা বুঝিতে পারিব এবং তখন মানসিক প্রবৃত্তি সকল হৃদয়ের বশবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরের মঙ্গল কার্য্যের নিয়ত অনুবর্ত্তী হইবেক। তখন পৃথিবী প্রকৃত শান্তির আস্পদ হইবে। এইরূপে জনসমাজের উন্নতির তিনটি ক্রমের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে সামাজিক অবস্থাগত অনেক ব্যাপারের প্রকৃত ভাব ও উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়। মনুষ্যের প্রথম অবস্থায় একমাত্র শারীরিক শক্তিরই উপর নির্ভর থাকে, সুতরাং তখন একমাত্র দৈহিক বলেরই গৌরব দেখা যায়; দ্বিতীয় অবস্থায় আমরা বুদ্ধি-শক্তিরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তাহারই প্রশংসায় মত্ত হই এবং তৃতীয় অবস্থা যাহার আভাস মাত্র আমরা এক্ষণে কথঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারি, তাহাতে ধর্ম্মভাব সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া, মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও অন্যান্য শক্তি সকলকে সামঞ্জস্যরূপে স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত করিয়া মনুষ্যকে শান্তি ও মঙ্গলের পথে প্রবর্ত্তিত করিতে থাকিবে। এই অবস্থার অঙ্কুর মাত্র এক্ষণে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্রমে সেই অঙ্কুর প্রস্ফুটিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া অপূর্ব্ব ও রমণীয় বৃক্ষে পরিণত হইবেক ও কালে অমৃত ফল প্রসব করিবেক।

বাহ্য জগৎ আধ্যাত্মিক জগতের ছায়া।

ধর্ম্ম-বিষয়ক গ্রন্থকর্ত্তারা আধ্যাত্মিক জগতের পদার্থ ও ব্যাপার-সকলের ভাব আমাদিগের মনে মুদ্রিত করিবার জন্য বাহ্য জগৎ হইতে উপমা গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহার কারণ এই যে, বাহ্য জগতে সেই সকল পদার্থ ও ব্যাপারের প্রতিরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল প্রতিরূপ অতি ক্ষীণ প্রতিরূপ মাত্র, তথাপি তাহা প্রতিরূপ না বলিয়া থাকা যাইতে পারে না। সূর্য্যকিরণ দ্বারা কুজ্‌ঝটিকা বিনষ্ট হইলে আমাদিগের মনে এই ভাবের উদয় হয় যে, জ্ঞানালোক ঐরূপ মোহান্ধকারকে বিনাশ করে। সুধাংশু চন্দ্রের বিমল জ্যোতি দ্বারা রজনীর অন্ধকার দূরীভূত হইলে আমাদিগের মনে এই ভাবের উদয় হয় যে, দুঃখান্ধকার এইরূপ সেই প্রেমশশী ঈশ্বরের জ্যোতি দ্বারা দূরীকৃত হয়। পূর্ণ-চন্দ্রের সুধাময় জ্যোতি দর্শন করিলে মনে এই ভাবেরও উদয় হয় যে, ধার্ম্মিক ব্যক্তির মনে এইরূপ প্রশান্ত আনন্দের জ্যোতি সর্ব্বদা বিরাজমান থাকে। পর্ব্বত দর্শন করিলে মনে এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয় যে, দৃঢ়চিত্ত ধর্ম্মাত্মারা উহার ন্যায় ধৈর্য্যশীল। বাল্মিকী রামের চরিত্র বর্ণন কালে বলিয়া গিয়াছেন যে, তিনি হিমালয়ের ন্যায় ধৈর্য্যশীল ছিলেন। "ধৈর্য্যে চ হিমবানিব"। বহুদূরপ্রবাহিনী সমুদ্রগামিনী স্রোতঃস্বতী দর্শন করিলে মানব-জীবনের গতি স্মরণ হয়। সেই স্রোতঃস্বতীর সাগরসঙ্গম-স্থান দর্শন অনন্ত কালসমুদ্রে মানবী জীবনের বিলীন অবস্থার ভাব মনে উদিত করায়। এক দিনে পুষ্পের রূপ লাবণ্যের হ্রাস দেখিলে এইরূপ মনে হয় যে, সৌন্দর্য্যও এই রূপ অস্থায়ী। নলিনী-দল-গত তরল জলবিন্দুকে দেখিলে জীবনের চপলতা স্মরণ হয়। এইরূপ বসন্ত বাল্যকালকে গ্রীষ্ম যৌবনকে শরৎ প্রৌঢ়াবস্থাকে এবং শীত বৃদ্ধাবস্থাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। বাহ্য জগৎ আধ্যাত্মিক জগতের ছায়া।

বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা উল্লিখিত সাদৃশ্যের একটি বিশেষ অংশ পর্য্যালোচনা করিব। সে অংশ শরীরের সহিত আত্মার উপমাত্মক সাদৃশ্য। শরীরের যেমন দর্শন শক্তি আছে, আত্মারও সেইরূপ দর্শন শক্তি আছে বলা যাইতে পারে। এই জন্য বেদে অনেক স্থলে ঈশ্বর-দর্শনের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে উক্ত আছে, চর্ম্মচক্ষু যেমন প্রসারিত আকাশকে দেখে আত্মাও সেইরূপ ঈশ্বরকে দেখিতে পায়। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং"। উপনিষদে উক্ত আছে "যদাপশ্য পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং" "তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ" "যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ", "তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" এইরূপ উপনিষদে ঈশ্বর-দর্শনের কথা নানা স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঈশ্বরের অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ যখন সহজ জ্ঞান তখন দর্শন শব্দ তাঁহাতে বিলক্ষণ খাটিতে পারে। যেমন আমরা সহজ জ্ঞান দ্বারা সম্মুখস্থ প্রাচীর উপলব্ধি করিয়া থাকি তেমনি সহজ জ্ঞানের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকি। আমরা যেমন শারীরিক চক্ষু দ্বারা প্রাচীর দেখিতে পাই সেইরূপ আত্মার চক্ষু দ্বারা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই। শরীর যেমন রসনেন্দ্রিয় দ্বারা আহার্য্য দ্রব্য আস্বাদন করে সেইরূপ আত্মাও ঈশ্বরকে আস্বাদন করে বলা যাইতে পারে; এই জন্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে ঈশ্বর "রসোবৈ সঃ" "রস-স্বরূপ" অর্থাৎ আস্বাদ্য পদার্থ এবং ব্রহ্ম সমশ্নুতে" "আত্মা ঈশ্বরকে আহার করে"। শরীরের যেমন স্পর্শ শক্তি আছে আত্মারও সেইরূপ স্পর্শ শক্তি আছে বলা যাইতে পারে। এই জন্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, ঋষিরা করতলন্যস্ত আমলকবৎ ঈশ্বরকে প্রতীতি করেন; এই জন্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে "ব্রহ্ম সংস্পর্শাৎ অত্যন্তং সুখমশ্নুতে" "যে ব্যক্তি ব্রহ্মের সংস্পর্শ লাভ করিয়াছেন তিনি অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হয়েন"। শরীরের যেমন শ্রবণ শক্তি আছে তেমনি আত্মার শ্রবণ শক্তি আছে এই জন্য আমরা বলিয়া থাকি যে ঈশ্বর আমাদিগকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেক দ্বারা যে আদেশ করিতেছেন তাহা আমরা শুনিয়াও শুনি না।

ব্রহ্মকে সর্ব্বদা দর্শন, ব্রহ্মাস্বাদন ব্রহ্ম-সংস্পর্শ ধর্ম্মের উচ্চতম অবস্থায় লাভ করা যায়। ইহা অনেক সাধনের ফল। ঈশ্বর করুন যে, আমরা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন ও ব্রাহ্মধর্ম্মের জল্পনাতে ব্যস্ত না থাকিয়া সাধন-পরায়ণ হই ও ব্রহ্মনামের সার্থকতা সম্পাদন করি।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ বৈশাখ রবিবার প্রাতঃকাল ৭ ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

বর্ষ শেষ হওয়াতে যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষের নিমিত্ত অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। অগ্রিম মূল্য অগ্রে প্রদান না করিলে সমাজের ক্ষতি করা হয়।

যাঁহাদিগের নিকট পত্রিকার মূল্য চাদশ মাস অনাদায় আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান মার্সের মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন। নতুবা সমাজ তাঁহাদিগের নিকট মাশুল দিয়া পত্রিকা প্রেরণে অসমর্থ হইবেন।

আগামী ২০ বৈশাখ সোমবার প্রাতে ৭॥০ ও সন্ধ্যা ৭॥১ ঘটিকার সময় নন্দন-বাগানস্থ মৃত বাবু কাশীশ্বর মিত্র মহাশয়ের ভবনে শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়োদশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

আয় ব্যয়।

মাঘ ও ফাল্গুন ১৭৯৭ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়		৮২৭ ॥৶১৫
পূর্ব্বকার স্থিত		৪০৬ ॥৶১৫
সমষ্টি		১২৩৪ ।৶১০
ব্যয়		৮৬১ ।১৫
স্থিত		৩৭৩ ৶১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৩০৪ ॥৶১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৩৬ ॥৶
পুস্তকালয়	৫৫ ॥৶১৫
যন্ত্রালয়	১৭৮
গচ্ছিত	১৫২ ৸১০
সমষ্টি	৮২৭ ॥৶১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	২৪২ ।৶১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২৪২ ৸৶১৫
পুস্তকালয়	৪৪ ।৶১০
যন্ত্রালয়	১৮৮ ৸ ১৫
গচ্ছিত	১৪২ ॥৶ ৫
সমষ্টি	৮৬১। ১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ...	১২০ ৲
৲ " কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ...	২৫
" নীলকমল মুখোপাধ্যায় ...	১০
" হরিমোহন রায় ...	১০
" শিবচন্দ্র দেব ...	৬
" ভুজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় ...	৫
" রাজারাম মুখোপাধ্যায়	৫
" কাশীনাথ দত্ত ...	৪
মৃত নীলমাধব মিত্রের বনিতা ...	৪
" রামলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	৫০
শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ বসু ...	৩
" হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৩
" হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ...	২
" হরকুমার সরকার ...	২
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ ...	২
" প্রেমচাঁদ বড়াল ...	২
" ভূমেশচন্দ্র বসু ...	২
" নৃপালচন্দ্র মল্লিক ...	২
" নবগোপাল মিত্র ...	১
" গুরুচরণ মিত্র ...	১
" রাজকৃষ্ণ আঢ্য ...	১
" প্রসন্নকুমার বিশ্বাস ...	১
" জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	১
" হরিমোহন রায় ...	১
" ক্ষেত্রমোহন ধর ...	১
" তিনকড়ি বসু ..	১
" বনমালী চন্দ্র ...	১
" কালীনাথ বসু ...	১
" কার্ত্তিকচরণ মল্লিক ...	১
" কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	।০
	২৬৮ ।০

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	১৫
" হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ...	২
	১৭
দানাধারে প্রাপ্ত	১৪ ।৶০

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯৩৩। কলিগতাব্দ ৪৯৭৭। ১ বৈশাখ বুধবার।

Registered No 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৮ শক

৩২৪ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৭

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ।

৩০ চৈত্র ১৭৯৭ শক।

ভারতের যে দিকে দৃষ্টিপাত কর—বঙ্গের যে স্থানে উপনীত হও, দেখিবে যে, প্রায় সেই সকল স্থানেরই কিছু না কিছু অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রায় সমস্ত ভারতই বাহ্য শোভা, বাহ্য ভূষণ ধারণ করিয়া দর্শকবৃন্দের নয়ন মন আকর্ষণ করিতেছে। যে সকল স্থান এক সময়ে জন-সাধারণের পক্ষে দুর্গম ছিল, তথায় প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। যে স্থানে বাণিজ্য কার্য্যের কোন নাম-গন্ধ ছিল না, লৌহ-বর্ত্ম দ্বারা তথায় দিগ্‌দেশীয় নানাবিধ বাণিজ্য দ্রব্য প্রেরিত হইতেছে। যে প্রদেশের কোন সংবাদ পাইবার প্রত্যাশা ছিল না, তাড়িত-সূত্র সহকারে নিমেষ মধ্যে তথাকার সংবাদ আনীত হইতেছে। যে অঞ্চলে কৃষি-কার্য্যের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইত না, সেখানে নানা-উপায়ে,—নানা-কৌশলে বহুবিধ ফল-শস্য উৎপন্ন হইতেছে। যেখানকার লোক-সাধারণ বিদ্যার বিহিত আস্বাদ প্রাপ্ত হয় নাই, তথায় বহুবিধ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত এবং জ্ঞান-চর্চ্চার বাহুল্য দৃষ্ট হইতেছে; তথাচ কেন চতুর্দ্দিক হইতে ভারতের নিদারুণ গভীর আর্ত্তনাদ শ্রুত হওয়া যায়?—বঙ্গের বক্ষঃবিদারক বিলাপ-ধ্বনি কেন গগন ভেদ করিয়া উত্থিত হয়? উৎকট রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তিকে যেমন দিব্য সাজে সজ্জিত করিয়া রাখিলেও, তাহার রোগ-যন্ত্রণার লাঘব হয় না, প্রত্যুত তাহার মুখমণ্ডলে আভ্যন্তরিক যন্ত্রণার আভাস প্রতিভাসিত হইয়া থাকে—সকরুণ রোদন-ধ্বনি নির্গত হইয়া যেমন লোকের হৃদয় মনকে বিদীর্ণ করে, আমাদের বঙ্গেরও সেই রূপ দুর্গতি!—সমগ্র ভারতভূমিরই সেই প্রকার দুর্দ্দশা!

বঙ্গের দেশব্যাপী সর্ব্বনাশক জ্বররোগের সুনিশ্চিত কারণ অবগত না হইয়া, যেমন তাহার চিকিৎসা-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়াতে কোন স্থায়ী শুভ ফল লব্ধ হইতেছে না, প্রত্যুত বিবিধ ঔষধ বিধান দ্বারা কেবল রোগান্তরই উপস্থিত করিতেছে—লোকের শরীরকে অন্তঃসার-শূন্য করিয়া ফেলিতেছে, তেমনি বঙ্গের অন্তঃশ্রী—ভারতের আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য নাশের প্রকৃত কারণ অবধারণ

না করিয়া যত তাহার বাহ্য শোভা, বাহ্য উন্নতি, বাহ্য জ্ঞান বর্দ্ধিত হইতেছে, ততই চতুর্দ্দিকে অকৌশল অপ্রণয়, অধর্ম্ম অত্যাচারের নূতন স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া, ভারতের রত্নরাজি ধৌত হইয়া যাইতেছে, ততই অভাব-অনটন-জনিত চতুর্দ্দিকে হাহাকার উপস্থিত হইয়াছে। যদি স্থানগত উন্নতি, কৃষি-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং অপরা বিদ্যা চর্চ্চার বহুলতাতেই দেশের প্রকৃত উন্নতি হয়, তবে কেন আমারদের ভারতের এই বিষমতর আভ্যন্তরিক অধোগতির নিদর্শন সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে? রোগে ঔষধ সেবন করিলে যদি সে রোগ নির্ম্মূল না হয়—রোগীর প্রকৃত পূর্ব্বশ্রী, বলবীর্য্য আনয়ন করিতে না পারে, তবে যেমন সে রোগের পক্ষে সে ঔষধই নয়, তেমনি যে বিদ্যা চর্চ্চার দ্বারা লোক-সাধারণের কর্ত্তব্য জ্ঞান, ঈশ্বর-প্রীতি, পরলোক-বিশ্বাস প্রদীপ্ত না হয়, আভ্যন্তরিক অভাব অনটন তিরোহিত হইয়া জন-সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন হইতে না পারে; তবে সে বিদ্যা, বিদ্যা-নামেরই যোগ্য নহে! সে কৃষি-বাণিজ্য-জনিত বাহ্য সভ্যতা প্রকৃত সভ্যতা শব্দেরই বাচ্য নহে! যে পরিমাণে ঈদৃশ সভ্যতা বঙ্গ ভূমিতে প্রবেশ করিতেছে—যে পরিমাণে ঈদৃশ জ্ঞান চর্চ্চা ভারতের নগর গ্রাম পল্লী মধ্যে আরম্ভ হইয়াছে, সেই পরিমাণেই আবার কারাগৃহের বিস্তার বৃদ্ধি করা বিচারক-সংখ্যা বর্দ্ধন করা, প্রহরী-দল পরিপুষ্ট করা প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিতেছে। ইহার দ্বারা অপকর্ম্ম-স্রোতঃ অবরুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, বর্ষে বর্ষে চৌর্য্য-সংখ্যা, অপরাধ-পরিমাণ বর্দ্ধিত হইতেছে। যে প্রকার দুষ্কর্ম্মের নামমাত্রও কখন শ্রুত হওয়া যায় নাই, বর্ত্তমান-সভ্যতা এমন কত-শত পাপ-প্রবাহ প্রবাহিত করিতেছে। অশিক্ষিত মূর্খ লোকের কথা দূরে থাকুক, বিজাতীয় তীব্র মাদক গরল সেবন, উদ্বন্ধনাদি দ্বারা অপমৃত্যু-সংবাদ কৃতবিদ্য-দলের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে শ্রুত হওয়া যাইতেছে। নাস্তিকতার ভাব এখনকার সুশিক্ষিত সমাজের মধ্যে গৌরবস্থল হইয়া পড়িয়াছে!

জন-সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার আভ্যন্তরিক দুর্দ্দশা সন্দর্শন করিলে, কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়? অনেক স্থলে পিতা মাতা, সন্তান সন্ততির নিকট হইতে যথা-যোগ্য সম্মান প্রাপ্ত না হইয়া নিদারুণ মনস্তাপ সহ্য করিতেছেন; পুত্র কন্যাও জনক জননীর আশানুরূপ অকৃত্রিম স্নেহে প্রতিপালিত না হইয়া আন্তরিক দুর্ব্বলতায় ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছেন; গুরু, শিষ্যের নিকট হইতে মান মর্য্যাদা অপ্রাপ্তি বশত নিরতিশয় মনোবেদনা সহ্য করিতেছেন; শিষ্যগণও, আচার্য্য সন্নিধানে বিহিত শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হওত, উদ্ধত ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া, অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছেন; বৃদ্ধ, বালক যুবার নিকটে তাঁহার বয়োচিত সম্মান মর্য্যাদা লাভে কৃতকার্য্য না হইয়া ক্ষুব্ধ হইতেছেন; বালক যুবাও যথাযোগ্য রূপে প্রবীণ-জন-সন্নিধানে স্নেহ মমতা প্রাপ্ত না হওয়াতে স্বদেশ ও স্বজাতির উপরে বীত-স্নেহ হইয়া পড়িয়াছেন। স্বামী, পত্নীর নিকটে আপনার পদোচিত সম্মান না পাইয়া এবং পত্নী, স্বামি-সন্নিধানে সমুচিত প্রীতি প্রাপ্ত না হইয়া, পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়ে জলাঞ্জলি দিতেছেন। জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠের অবাধ্যতা অবশীভূততা দৃষ্টে ক্ষুব্ধ হইতেছেন; কনিষ্ঠও জ্যেষ্ঠের স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্বে রুষ্ট হইয়া, প্রকৃতিগত ভ্রাতৃভাবকে বিদায় দিতেছেন। রাজা, প্রজার স্বত্ব বিলোপে কৃতসঙ্কল্প; প্রজা, রাজার স্বার্থ-প্রধান শাসনে খড়্গহস্ত হইয়া ভারতের ভাগ্য-লক্ষ্মীকে বিদায় দিতেছেন।

এই রূপে সকলে স্বার্থপর, স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ হইয়া, সমবেত যত্ন দ্বারা ভারতের আভ্যন্তরিক বন্ধন ছিন্ন করত ধর্ম্মপ্রধান হিন্দুভূমি হইতে আর্য্য জাতির গৌরব স্থল, অবলম্বন-যষ্টি ধর্ম্মকে দূরে নিক্ষেপ করত অন্তঃসার-শূন্য হইয়া পড়িতেছেন!

ভারতের প্রকৃত উন্নতি—সমগ্র মনুষ্য-সমাজের যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি সাধনের যদি কোন অব্যর্থ উপায় থাকে, তবে তাহা ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে! ধর্ম্মই প্রতি আত্মার উজ্জ্বল ভূষণ, ধর্ম্মই প্রতি পরিবারের কল্যাণ-প্রস্রবণ, ধর্ম্মই সমুদায় মনুষ্য জাতির এক-মাত্র বন্ধন—ধর্ম্মই ঐহিক পারত্রিকের মঙ্গল উন্নতির অদ্বিতীয় সাধন। মনুষ্যের আত্মা হইতে ধর্ম্মের আভরণ একবার উন্মোচন করিয়া দেখ, সে দ্বিপদ পশু ভিন্ন আর কিছুই নহে! সকল প্রকার হিতকর, মঙ্গলকর কার্য্যের অভ্যন্তর হইতে ধর্ম্মভাবকে প্রত্যাহার কর, দেখিবে তৎসমূহের আর কোন শোভা সৌন্দর্য্য নাই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভ্যন্তর হইতে একবার ধর্ম্ম-স্রোতকে স্বতন্ত্র কর, সকলই অর্থশূন্য, লক্ষ্যশূন্য, প্রাণশূন্য হইয়া পড়িবে। শোণিতই যেমন মনুষ্য-শরীরের প্রধানতম জীবন-উপাদান, ধর্ম্মই তেমনি আত্মার একমাত্র জীবনী শক্তি। শোণিতের বিকৃতি বা অল্পতা হইলে যেমন মৃত্যুর আর বড় অপেক্ষা থাকে না, তেমনি ধর্ম্মের প্রতি মনুষ্য উদাসীন হইলে তাহার অধোগতির আর পরিসীমা থাকে না। যে সময়ে আর্য্য সন্তান-সকলের ধর্ম্মেরই প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা, ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল; তখন এই ভারত বহুবিধ বাহ্য শোভা সৌন্দর্য্য-শূন্য থাকিলেও ইহার সুখ্যাতি সৌরভ সমুদায় পৃথিবীকে আমোদিত করিয়াছে। ইহার আভ্যন্তরিক মহত্ত্ব, ভুবনবিজয়ী সম্রাটের গর্ব্বিত চিত্তকেও অবনত করিয়াছে। ইহার প্রকৃত বল বিক্রম, অনেকানেক দিগ্‌দেশীয় জনগণকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিয়াছে। এখন যে পরিমাণে ভারতে ধর্ম্ম-চর্চ্চার অল্পতা হইতেছে, সেই পরিমাণেই আর্য্যসমাজ শিথিল-বন্ধন হইয়া পড়িতেছে। পঞ্চাষ্টম বা প্রকৃত অষ্টম বর্ষ হইতে যে দেশে ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ হইত—যেখানকার সুকুমার-মতি বালক-বৃন্দ দূর দূরান্তরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ তপোবনে—গুরুগৃহে দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রধান বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত, এখন সেই স্থানের নগর গ্রামের শোভনতম বিদ্যালয়ে বহু প্রকার উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাত-শ্মশ্রু, পূর্ণবয়স্ক যুবকদলও প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে না পারিয়া, পরলোকের আভাস মাত্রও প্রাপ্ত না হইয়া, ভারতের ভবিষ্যত্ সুখোন্নতির আশা-পথ রোধ করিতেছেন। বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজে ব্রহ্মবিৎ আচার্য্য, উপদেষ্টা বা নেতার অভাবে লোক-সাধারণ লক্ষ্যশূন্য পথিকের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সোপান-পরম্পরায় ক্রমাগতই ঘূর্ণিত হইয়া অবসন্ন হইতেছেন। যখন শরীর প্রকৃতিস্থ থাকে, তখন তাঁহার যে অঙ্গে আঘাত কর, সর্ব্ব-শরীরেই বেদনা অনুভূত হইবে, তেমনি যত-ক্ষণ ধর্ম্মজনিত জনসমাজে প্রাণ সঞ্চরণ করে, ততক্ষণ উহার একটি ক্ষুদ্রতম অংশে যৎস্বল্প অধর্ম্ম অত্যাচার আরম্ভ হইলে অমনি সমুদায় জনসমাজ জাগ্রত হইয়া, সমবেত বল প্রয়োগ দ্বারা তাহার প্রতীকারার্থ প্রবৃত্ত হয়। আর্য্য-সমাজের সে জীবন কোথায়? দেখ, ধর্ম্মের অভাবে আমারদের আত্মা কেমন প্রাণশূন্য হইয়াছে। আমরা এক পিতার পুত্র কন্যা, এক জননীর সন্তান সন্ততি, এক পথের যাত্রী হইয়া পরস্পরের সুখ দুঃখে কেমন উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি! আমারদের সম্মুখে কত ভ্রাতা ভগিনী কুপথে ধাবিত

হইতেছে, কত শত লোক ধর্ম্ম ঈশ্বর পরকাল বিস্মৃত হইয়া, দীন ভাবে জীবনকাল অতিবাহিত করিতেছে, প্রবলের অত্যাচারে কত নিরীহপ্রকৃতি নর নারী নিদারুণ কষ্টে দিনপাত করিতেছে, কত শত প্রিয়দর্শন যুবা অভক্ষ্য ভক্ষণ, অপেয়-পান-দ্বারা অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইয়া, ভারত-জননীর ক্রোড়শূন্য করিতেছে! আমরা তাহার কি প্রতিবিধান করিতেছি? আমারদের চেতনা থাকিলে—জনসমাজের প্রকৃত প্রাণ থাকিলে, কি কখন এরূপ অধর্ম্ম অত্যাচার এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পাইত? প্রকৃত স্বদেশ-প্রেম যথার্থ ভ্রাতৃ ভাব থাকিলে কি কখনও আমরা এই সকল বিষয়ে উদাসীন থাকিতে পারিতাম?

হে ব্রহ্মপরায়ণ সাধু সজ্জন সকল! তোমরা ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়াছ, তোমরা সত্যের স্বর্গীয় বল বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছ; ব্রহ্মোপাসনার অক্ষয় ফল আপনাপন জীবনে প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিয়াছ, তোমারদেরই মস্তকে কর্ত্তব্যের গুরু ভার অর্পিত হইয়াছে; আজ্ বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে একবার আলোচনা করিয়া দেখ দেখি, যে সংবৎসরকাল আমরা জ্ঞান ও কার্য্যে, বিশ্বাস ও আচরণে মিলিত করিয়া জীবনের লক্ষ্য সাধন করিয়াছি কি না? একমাত্র ঈশ্বর-প্রীতি কামনায় সংসার ধর্ম্ম পালনে কৃতকার্য্য হইয়াছি কি না? বিচ্ছিন্নপ্রায় আর্য্যসমাজের ধর্ম্মবন্ধন দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্নচেষ্টা করিয়াছি কি না? ভ্রাতা ভগিনীদিগকে—প্রাণসম স্বদেশ স্বজাতিকে ধর্ম্মের উজ্জ্বল ভূষণে অলঙ্কৃত করিবার চেষ্টা পাইয়াছি কি না? ব্রাহ্মধর্ম্মের বিমল মঙ্গল জ্যোতিতে ভারতের আভ্যন্তরিক অন্ধকার তিরোহিত করিতে যত্নশীল হইয়াছি কি না? বঙ্গের সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা, ভারতের নির্জ্জীবতা নিশ্চেষ্টতা পরিহারের যদি কোন অব্যর্থ বিধান থাকে, তবে করুণা-নিধান পরমেশ্বর সেই অমোঘ ঔষধ ব্রাহ্মধর্ম্মকেই আমারদের স্বদেশ স্বজাতির মধ্যে, প্রতি আত্মার অভ্যন্তরে প্রেরণ করিয়াছেন। এই পরম ঔষধ সেবন বিতরণে যদি আমরা ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া থাকি, আজ আইস সকলে বিনীত ভাবে সেই পরম পিতার নিকটে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করি। ভবিষ্যতে এই মৃত-সঞ্জীবন ব্রাহ্মধর্ম্মকে আত্মার ভূষণ করিয়া রাখিবার জন্য বল বুদ্ধি শক্তি প্রার্থনা করি।

করুণা-নিধান! সংবৎসর-কাল তোমার আদেশ প্রতিপালনে—তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনে ঔদাস্য প্রদর্শন করিয়া যাহা কিছু পাপ-কলঙ্ক সঞ্চয় করিয়াছি, কৃপা করিয়া তুমি তাহা মার্জ্জনা কর! তোমার ইচ্ছানুসারে ভবিষ্যতে নববর্ষে বা নবলোকে যেখানে থাকি, যাহাতে সমুদায় হৃদয় মন আত্মার সহিত তোমাতে অনুরক্ত থাকিয়া তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে পারি, এরূপ ধর্ম্মবল, শুভ বুদ্ধি প্রদান কর। সমুদায় ভারত-সন্তানকে তোমার ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালনে সমর্থ করিয়া ভারত-ভূমিকে রক্ষা কর। যোড়-করে তোমার সন্নিধানে এই মাত্র প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে

নব-বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ।

১ বৈশাখ ১৭৯৮ শক।

অদ্য আকাশে নব সূর্য্যের উদয় হইবে, তাই পূর্ব্বদিকে অরুণের অশ্ব যোজিত হইতেছে। সম্মুখের বৎসর এই দণ্ডেই বা অতিক্রম করে, এমনি তাহারদের অভিনব

স্ফূর্ত্তি, এমনি তাহারদের জাজ্বল্যমান মুখশ্রী, এমনি তাহারদের অপরাজিত বলবীর্য্য! উহারা পল দণ্ড প্রহর দিন সপ্তাহ পক্ষ মাস ঋতু সম্বৎসর যুগ যুগান্তর, কাহারো মধ্যে কোন প্রভেদ দেখে না, উহারদের নিকটে এক মুহূর্ত্তও যা, এক যুগও তা! অনন্ত কালের অনন্ত পথ পরিভ্রমণ করিবে, তন্দ্রা জানিবে না, বিশ্রাম জানিবে না, সেই মহা-প্রচণ্ড তপঃসাধন-ব্রতে উহারা দীক্ষিত হইয়াছে, তাহারি উপযুক্ত করিয়া উহাদের তেজোময় শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে; মঙ্গল পথের রেখা-মাত্রও ব্যতিক্রম করিবে না, মঙ্গল-রশ্মির ইঙ্গিত মাত্রও অমান্য করিবে না, এমনি করিয়া উহারা শিক্ষিত হইয়াছে। কালের গর্ভে যেমন নব বর্ষ প্রসুপ্ত রহিয়াছে, সেইরূপ সূর্য্যের গর্ভে এই পৃথিবী এককালে প্রসুপ্ত ছিল; তাহার কত কাল পরে তবে প্রসূত হইল। প্রসূত হইয়া অবধি একাল পর্য্যন্ত সূর্য্যের আলোকরূপ স্নেহ-দৃষ্টিতে এবং উত্তাপরূপ স্তন-দুগ্ধে লালিত পালিত হইয়া, পৃথিবী ক্রমশই নূতন শ্রী নূতন শোভা ধারণ করিয়া আসিয়াছে। মাতৃক্রোড়ে শিশু যেমন দোলায়িত হয়, সৌর-পরিধিতে পৃথিবী সেইরূপ স্নেহের সহিত দোলায়িত হইতেছে। সূর্য্য যেমন পৃথিবীর প্রসবিতা, কাল যেমন বৎসরের প্রসবিতা, পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয় শক্তি সেইরূপ জগতের প্রসবিতা, আত্মার প্রসবিতা। সেই মাতার সত্যরূপ স্নেহ-দৃষ্টি এবং মঙ্গলরূপ স্তন-দুগ্ধে লালিত পালিত হইয়া আমারদের আত্মা দিন দিন নূতন শ্রী নূতন শোভা ধারণ করিবে, এই আশীর্ব্বাদ পরম পিতা পরমেশ্বর আমারদের প্রতি প্রদান করিয়াছেন। অতএব বর্ত্তমান বর্ষের উদ্যন্ত নব সূর্য্যের মহিমার মধ্যে আইস আমরা সেই সূর্য্যের সূর্য্যকে একবার ধ্যানেতে প্রত্যক্ষ করিয়া দেহকে পবিত্র করি, হৃদয়কে মধুময় করি, জীবনকে কৃতার্থ করি। তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ। সেই জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন। গায়ত্রী ধ্যানের কি মুখ্য সময় অদ্য উপস্থিত হইয়াছে। এই ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে আইস আমরা গায়ত্রী উচ্চারণ পূর্ব্বক সূর্য্যের সূর্য্য আত্মার অন্তরাত্মাকে ধ্যান করি। হৃদয়ে প্রেম-সূর্য্যের উদয় করিয়া নব বর্ষের সূর্য্যোদয়ের সহিত আইস আমরা যোগ দিই। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ। ভর্গ কি না সমুদায় পাপ তাপকে ভর্জ্জন করিয়া ফেলে, (অর্থাৎ দগ্ধ করিয়া ফেলে) এমন যে সেই অদ্বিতীয় আদি সবিতা-দেবের বরণীয় মহিমা, এমন যে সেই জ্ঞান-শক্তি-সমন্বিত অতুল প্রভাব, তাহা আইস আমরা ধ্যান করি, তাহা হইতেই আমারদের বুদ্ধি-বৃত্তি সকল নিঃসৃত হইতেছে। পরমাত্মার সেই যে জ্ঞান-শক্তি-সমন্বিত ভর্গ তাহা আমারদের আত্মার প্রকৃতির অভ্যন্তরে গূঢ়রূপে প্রবিষ্ট রহিয়া আমাদের আত্মার মূল পর্য্যন্ত সিক্ত করিতেছে। সেই অলৌকিক জ্যোতি আমারদের আত্মার অভ্যন্তরে এমনি প্রগাঢ়রূপে পুঞ্জীভূত রহিয়াছে যে, লোক হইতে লোকে আমরা যতই উত্থান করিব, ধ্রুব তারার ন্যায় তাহা আমারদিগকে ততই উচ্চে আকর্ষণ করিতে থাকিবে। আমারদের আত্মার অভ্যন্তরে সে যে এক অমৃতের অক্ষয় ভাণ্ডার বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আমারদের অনন্ত জীবনের সম্বল হইবে। আমরা বুদ্ধি-চালনা দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান এবং শক্তি উপার্জ্জন করিয়া বলি যে, আমার এই জ্ঞান আমার এই শক্তি, কিন্তু

আত্মার মূল প্রদেশে যে এক স্বভাব-সিদ্ধ জ্ঞান-জ্যোতি বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, পরিবর্ত্তন নাই, সে জ্যোতি কাহার? হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ। হিরণ্ময় শ্রেষ্ঠ কোষ-মধ্যে, অর্থাৎ জ্ঞানশক্তিময় আত্মার অন্তরতম প্রকৃতির মধ্যে নিরঞ্জন নির্বিকার পর ব্রহ্ম বাস করেন, তিনি সেই শুভ্র জ্যোতির জ্যোতি, যাঁহাকে আত্মজ্ঞানীরা জানেন। সেই যে আমারদের আত্মার প্রকৃতি-সিদ্ধ সহজ জ্ঞান, তাহা আমারদের আত্মার অভ্যন্তরস্থিত পরমাত্মারই জ্ঞানময় শক্তি, তাহাই ভর্গ, তাহা হইতেই আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি সকল নিঃসৃত হইতেছে। আমারদের মনের উপরে পরমেশ্বরের সেই জ্ঞানময় শক্তিময় তেজ নিপতিত হইলে মনের সমুদায় পাপতাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়। মনকে সেই অন্তরতম জ্ঞান-জ্যোতির প্রতি উন্মুক্ত করিলেই, সে জ্যোতির এমনি অতুল প্রভাব যে, তাহা আমারদের সমুদায় পাপতাপ ধ্বংস করিয়া ফেলে। অদ্য বৎসরের প্রথম দিবসে সেই অমৃত-সাগরে আইস আমরা অবগাহন করিয়া অহোরাত্র মাস পক্ষ ঋতু সম্বৎসর সকলকেই মধুময় করিয়া লই। গ্রীষ্ম ঋতুর সন্ধ্যা-সমীরণ, বর্ষা ঋতুর নব মেঘোদ্গীরিত জলধারা, শরৎকালের শুভ্রকান্তি, শীত ঋতুর শ্রম-সহ উদ্যম-স্ফূর্ত্তি, বসন্তের পুষ্পিত বনশ্রী, এ সকলই মধুময়। কিন্তু আত্মাতে পরমাত্মার যে আবির্ভাব তাহা সাক্ষাৎ মধু-স্বরূপ। সেই সুধা আইস আমরা পান করি, তাহাতেই আমাদের পাপ তাপ দূরে যাইবে, তাহাতেই মাস ঋতু সম্বৎসর সকলই মধুময় হইবে, তাহাতেই আমারদের আত্মা অমর হইবে।

হে পরমাত্মন্! প্রথম সূর্য্যকে তুমি যে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছিলে, সে আশীর্ব্বাদ সকল স্থানেই ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহা দ্যুলোক ভূলোক অন্তরীক্ষ সমস্তই ভরিয়া রহিয়াছে! তেমনি তোমার অমোঘ আশীর্ব্বাদের জন্য তৃষিত হইয়া আমরা সকলে তোমার চরণে প্রণিপাত করি, তুমি আমারদের মনস্কামনা পূর্ণ কর।

ধর্ম্মসাধন।

সৃষ্টির মধ্যে চারিটি শ্রেণীবিভাগ আছে। প্রথম—ধাতু, দ্বিতীয়—উদ্ভিদ, তৃতীয়—পশু পক্ষী, চতুর্থ—মনুষ্য। ধাতু এক স্থানে থাকে এবং উহার কোন চেষ্টা নাই, সুতরাং উহা জড়ধর্ম্মী। 'উদ্ভিদ জড় বটে, কিন্তু উহার হ্রাস বৃদ্ধি আছে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা দ্বারা উহার সর্ব্বাঙ্গে রস প্রবাহিত হয়, সুতরাং উহা প্রাণধর্ম্মী; পশুপক্ষীর জড়দেহ ও প্রাণ আছে, কিন্তু উহাতে স্নেহ ভয় প্রভৃতি কতকগুলি মনের কার্য্য দেখা যায়, সুতরাং উহা মনোধর্ম্মী; মনুষ্যে জড় প্রাণ ও মন এই তিনেরই সমবায় দৃষ্ট হয়, কিন্তু যাহা ধাতু উদ্ভিদ ও পশু পক্ষীতে নাই উহাতে এমন একটী পদার্থ আছে, তাহা আত্মা।

এই আত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা সহজ নয়। ইহাতে কোনরূপ বায়বীয় পদার্থ নাই বা তৈজস কোন বস্তুও নাই। ইহা রূপ নহে, রস নহে, গন্ধ নহে, ও স্পর্শও নহে। জড়ের কোন ধর্ম্ম ইহাতে দৃষ্ট হয় না। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। তবে ইহার স্বরূপ কি? এস্থলে উত্তরে এইমাত্র বলিতে পারি, ইহা আলঙ্কারিকদিগের নিরূপিত রসের ন্যায় স্বসংবেদ্য। আমি আছি এই মাত্রই আমি জানিতেছি, ইহা অন্য কোনরূপে নির্দ্দেশ করা যায় না। ইহাকে নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণতর আলোক পরাস্ত হয়, গুরূপদেশ পর্য্যবসিত হয় এবং আপ্ত বাক্যও কুণ্ঠিত হইয়া থাকে।

যেমন চক্ষু আছে, তাহার বিষয় বাহ্য রূপ, জিহ্বা আছে তাহার বিষয় অন্ন, এবং স্নেহ আছে তাহার বিষয় পোষ্য পরিবার, সেইরূপ এই আত্মার বিষয় স্বয়ং ধর্ম্ম। সুতরাং যখন আত্মদৃষ্টি জন্মে আহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মদৃষ্টিও ভূরপনেয় হয়।

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, "ধর্ম্ম নৈসর্গিক বস্তু নহে, উহা একটী পরম্পরাগত সংস্কার মাত্র। কারণ, যদি কোন মনুষ্য জাতমাত্র অরণ্যে পশুদিগের রাজ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার ধর্ম্মভাব কিছুই দৃষ্ট হইবে না।" এইরূপ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। যেমন স্বজাতি-সমাজ-ভ্রষ্ট মনুষ্যের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ তাহার দয়া স্নেহ প্রভৃতি অন্যান্য মানসিক বৃত্তিও সম্পূর্ণ অবিকশিত দেখা যায়। কিন্তু সে যখন স্বজাতি-সমাজের আশ্রয় পায়, তখন দেশ কাল ও অবস্থার অবৈষম্যে তাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অন্যান্য মানসিক বৃত্তির সহিত পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে বীজ না থাকিলে কখনই বৃক্ষের অঙ্কুর হইতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্ম স্বাভাবিক, ইহা কি ধনী কি দরিদ্র কি মূর্খ কি পণ্ডিত কি বালক কি বৃদ্ধ কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই নিজস্ব, জলবায়ুর ন্যায় ইহা সাধারণের সম্পত্তি।

ধর্ম্ম একমাত্র। রসান্তরাণ্যেকরসং যথা দিব্যংপয়োশ্নুতে, যেমন আকাশের জল এক রস হইয়াও স্থানভেদে রসান্তর লাভ করে, সেইরূপ ধর্ম্ম এক হইয়াও দেশ কাল ভেদে নানারূপ হইয়াছে। ফলত ইহা স্বয়ং অবিকৃত। ইহা নির্ব্বিশেষে সকলেরই আত্মাতে আছে কেবল অবস্থা বৈচিত্রে ইহার বিকার দৃষ্ট হয়। সত্যের উদ্বোধ সহজ, আত্মা প্রস্তুত থাকিলেই তাহাতে সত্যের বিকাশ হইয়া থাকে, সুতরাং যখন পৃথিবীতে জ্ঞান প্রচার হইতেছে, কুসংস্কার দূর হইতেছে, তখন সম্পূর্ণ আশা করি যে, এক সময়ে সমুদায় জাতি ও সকল ব্যক্তির ধর্ম্ম এক হইবে।

ধর্ম্মের দুইটী অঙ্গ; এক অঙ্গে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল এবং অপর অঙ্গে সমস্ত পৃথিবী। যিনি এই তিনের একটীকে পরিত্যাগ করেন, তাঁহার প্রকৃত ধর্ম্ম সাধন করা হয় না। ঈশ্বর ও পরকাল সহজ বিশ্বাসের বিষয়, ধর্ম্ম কেবল এই দুইটীকে আমাদিগের সেব্য করিয়া দেয়। কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম, ঈশ্বর ও পরকালের প্রতি আমাদের যাহা কর্ত্তব্য আমরা ধর্ম্মের প্রসাদে তাহা শিক্ষা করি। কর্ম্ম না হইলে ধর্ম্ম হয় না এ কথা যথার্থ; এই জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে এই কর্ম্মক্ষেত্র পৃথিবীতে আনিয়াছেন। কেহ মুষ্টি ভিক্ষার জন্য লালায়িত হইতেছে তাহাকে ভিক্ষা দেও ইহা ধর্ম্ম। কেহ রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে তাহার পরিচর্য্যা কর ইহা ধর্ম্ম। কেহ বিপদে পড়িয়া তোমাকে ডাকিতেছে তুমি গিয়া তাহার সাহায্য কর ইহা ধর্ম্ম। বৃদ্ধ পিতা মাতার অবলম্বনের যষ্টি হও ইহা ধর্ম্ম। পতিপ্রাণা পত্নীকে অকপটে প্রীতি কর, পুত্র কন্যাকে স্নেহ কর, ভ্রাতা ভগিনীকে আত্মনির্ব্বিশেষে দর্শন কর ইহা ধর্ম্ম। কেহ জ্ঞানের অভাবে কাতর হইতেছে তাহাকে শিক্ষা দেও ইহা ধর্ম্ম।

মনুষ্য স্বভাবতই মঙ্গলার্থী; তাহার মনের গতি শ্রেয়ের দিকে; কেবল শিক্ষা ও অবস্থার বৈগুণ্যে সে প্রমাদী হইয়া থাকে, সুতরাং মনকে সর্ব্বাগ্রে স্বাধীন করা আবশ্যক। মন নিজের আয়ত্ত হইলে বিষয় সকল তাহার নিকট আর বল প্রকাশ করিতে পারে না। এ অবস্থায় ধর্ম্মসাধন নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ। 'প্রবৃত্তির দাসত্ব করিও না, স্বাধীন মন যাহা বলিবে বাক্য

ও কার্য্যে তাহা গ্রহণ কর, হৃদয় ও বুদ্ধিকে কোনরূপ কৃত্রিমতা শিক্ষা দিও না, ধর্ম্ম সাধন সহজ হইবে। স্বার্থকে বিসর্জন দেও, অনুতাপ অভ্যাস কর, জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া সরল শিশু হও, হৃদয়ে দীনতা বহন কর, সংসারের ক্ষণভঙ্গুরত্বে স্থিরনিশ্চয় থাক, ধর্ম্ম সাধন সহজ হইবে। স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধি শূন্য হও, নিদেশানুবর্ত্তী ভৃত্যের ন্যায় নত হইয়া থাক, সুখ আইসে উৎফুল্ল হইও না, দুঃখ উপস্থিত হয়, উদ্বিগ্ন হইও না, ঘোর বিপদে অটল থাক, ধর্ম্ম সাধন সহজ হইবে।

ধর্ম্মের পথে আপাতত অনেক কষ্ট। এক এক বার বোধ হয় যেন "পৃথিবীর ভোগ বিলাসে বঞ্চিত হইয়া অকারণ যাতনা সহিতেছি। আশু কোন ফল নাই কেবল ভবিষ্যতের শুষ্ক আশা। যে সময় টুকু ধর্ম্ম সাধনে ক্ষেপণ করি ইহাতে কিছু পরিমাণে পার্থিব সৌভাগ্য সঞ্চয় হইত, ধন আসিত, মানও বৃদ্ধি হইত।" মানিলাম, ধর্ম্মসাধনের পথে সময়ে সময়ে এইরূপ শুষ্কতা আইসে, সময়ে সময়ে আপনাকে নির্ব্বোধ বলিয়া ধিক্কার উপস্থিত হয়। কিন্তু ধর্ম্মসাধনের এই যে শুষ্কতা ইহা ক্ষণিক। যিনি সিদ্ধি-সংকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এইরূপ নৈরাস্য তাঁহাকে ক্ষান্ত করিতে পারে না। যেমন মহাসমুদ্রে প্রবল বায়ু হিল্লোলে ক্রমান্বয়ে তরঙ্গ উত্থিত হইতে থাকে, সেইরূপ আমাদিগের মনে ক্রমান্বয়ে পাপের তরঙ্গ উঠিতেছে। প্রকৃত সাধক পাপের প্রতিস্রোতে চলেন, এই এক একটী তরঙ্গ অতিক্রম করিতে, হয় ত তিনি এক হস্ত অগ্রসর হইতেছেন, আবার দশ হাত পশ্চাতে পড়িতেছেন। তাঁহার জীবনী শক্তি অবসন্ন হইতেছে। কিন্তু তিনি যখন এই সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হন তখন তাঁহার কি আনন্দ! তিনি একটী পাপের উপর জয় লাভ করিয়া যেরূপ উৎফুল্ল হন, সমস্ত বিশ্বরাজ্য লাভেও সেরূপ হৃষ্ট হয় না; আর কোন রূপ আনন্দ তাঁহার সেই আনন্দের মাত্রাও স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি তখন আপনাকে বঞ্চিত মনে করেন না, প্রত্যুত লাভবান বোধ করেন। ঐ অদূরে একটী অশীতিপর বৃদ্ধকে দেখ, উনি ধন মান তুচ্ছ করিয়া ধর্ম্ম সাধন করিতেছেন। উহাঁর কি আশ্চর্য্য মুখশ্রী! চক্ষু দিয়া যেন ধর্ম্মের জ্যোতি নির্গত হইতেছে। উনি কি সৌম্য! কেমন গম্ভীর! উনি স্বেচ্ছাক্রমে ভোগ ত্যাগ করিয়া যোগানন্দে কাল যাপন করিতেছেন। উনি রাত্রিশেষে যেন উন্মত্ত, কাতর স্বরে "তু আওরে" বলিয়া কাহাকে ডাকিতেছেন। নিদ্রার উৎসঙ্গে যেন কাহাকে হারাইয়াছেন তাই সকাতরে ডাকিতেছেন। উহাঁর কি মনের সুখ, কি উৎসাহ, কি সাহস, উহাঁর পুণ্যজ্যোতি যেন সকলকে পরাভব করিতেছে। ঐ দেখ, উহাঁর নিকট আর একটি বৃদ্ধ আসীন, উহার মুখে কুঞ্চিত মাংস যেন কলঙ্করেখা অঙ্কিত করিতেছে। সে সততই নিরানন্দ, পাপের সঙ্কোচ ভাব উহার মুখ অবনত করিয়া রাখিয়াছে। হৃদয়ে মালিন্য, অনুতাপের শিখা এক একবার জ্বলিয়া উঠিতেছে। বিষয় কামনা উহাকে মোহিত করিয়াছিল, ধর্ম্ম সাধন কিছুমাত্র হয় নাই। এক্ষণে পৃথিবীর দিন অবসান হইতেছে, কি করিবে কোথায় যাইবে সেই জন্য আকুল, সাধুর শরণাপন্ন হইয়াছে। এই বৃদ্ধকে দেখিয়া কাহার না মনে হয় যে যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ। কে না বলিবে যে, ধর্ম্ম সাধনে যদিও কষ্ট আছে কিন্তু পরিণামে অতুল সুখ।

ধর্ম্মের প্রভাব অতি চমৎকার। ইহা সভ্য অসভ্য মূর্খ পণ্ডিত সকলকেই অধিকার করিয়া আছে। পৃথিবীর আদিম অধিবাসীরা পূর্ব্বদিকে জ্বলন্ত প্রাতঃসূর্য্যকে দেখিয়া বিস্ময়ভরে এই ধর্ম্মেরই বলে বলিয়াছিল, সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ। তাঁহারা বায়ুর জন্য স্তুতিগীতি রচনা করিল, অগ্নির জন্য নানারূপ হব্য কব্যের কল্পনা করিল, জলের জন্য ভক্তি ভাবে বিগলিত হইয়া পড়িল, প্রকাণ্ড বনস্পতির জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল, পশুপক্ষিকে অর্চনা করিতে লাগিল, এবং মনুষ্যেরও পূজা আরম্ভ করিল। এ সমস্ত ধর্ম্মেরই মহিমা; ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু। এই ধর্ম্মরস পানে উন্মত্ত হইয়া কত লোকে গৃহবাস পরিত্যাগ করিতেছেন। অরণ্যে নির্জনে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একপদে সূর্য্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক ধ্যান করিতেছেন। তাঁহাদের মস্তকে জটাভার, মুখে শ্বেত শ্মশ্রু, পরিধান চীরবাস, আহার নাই, নিদ্রা নাই; তাঁহারা তরুমূলে মুকুলিত চক্ষে বসিয়া আছেন; তাঁহাদের মস্তকের উপর বৃষ্টিপাত বজ্রাঘাত হইতেছে, তথাচ চেতনা নাই, এক পক্ষের সূর্য্য জ্বলদঙ্গার বর্ষণ করিয়া চলিয়া গেল তথাচ সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দনশূন্য; দুরন্ত শীত শিরামধ্যে শোণিত স্তম্ভিত করিয়া রাখিল, অথাচ অটল। মনুষ্য ধর্ম্মেরই প্রভাবে এইরূপ কঠোরতা শিখিয়াছিল। ধর্ম্ম জীবিত পুত্রকে গঙ্গাজলে বিসর্জন দিল। প্রস্তর-স্তূপের মধ্য হইতে দেবমূর্ত্তি প্রকাশ করিল এবং ভর্ত্তৃবিয়োগ-বিধুরা বাল বিধবাকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ দিল। এই ধর্ম্মেরই বলে এক সময়ে কত শত কুলনারী পতির মৃত দেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রফুল্ল মনে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছে; প্রাণসম পুত্রকে দেবপ্রীতির উদ্দেশে বলি প্রদান করিয়াছে, এবং কত রক্তপাত ও কত রাজপাত হইয়াছে।

এক্ষণে আমাদিগের পূর্ব্বকার ভাব স্মরণ কর। আমরা প্রথমে অতি হীন অবস্থায় ছিলাম, আম মাংসে তৃপ্তিলাভ করিতাম, দিগম্বর বেশে বেড়াইতাম। আমাদিগের গৃহ ছিল না; ভাষা ছিল না এবং কোনরূপ অধিকারও ছিল না। আমাদিগের প্রণয় স্বাধীন, এবং পুত্র প্রাকৃতিক; পরে আমাদিগের ধর্ম্ম ভাব পরিস্ফুট হইল। ধর্ম্ম সমাজ বন্ধন করিল, স্বত্ব নিরূপণ করিয়া দিল, চিন্তাশক্তি উদ্রিক্ত করিয়া তুলিল, মনের ভাব ব্যক্ত করাইল, প্রীতির বিশুদ্ধতা প্রদর্শন করিল, কৃষির সূত্রপাত করিল, বাণিজ্যের অবতারণা করাইল, রোগের ঔষধ আনিল, লজ্জার বস্ত্র প্রস্তুত করিল; জ্ঞানের গ্রন্থ দেখাইল, উপাসনার মন্দির নির্ম্মাণ করিল এবং সর্ব্বশেষে আমাদিগকে মনুষ্য করিয়া তুলিল।

দেখ, মনুষ্যের কতদূর যন্ত্রণা; প্রথমে আমরা জরায়ুর দুর্ভেদ্য ঘোর অন্ধকারে ছিলাম, তৎকালে কেহ আমাদের অভিভাবক ছিল না, আমরা একান্ত অসহায়। পরে এই পৃথিবীর আলোক দেখিলাম, তখন সম্পূর্ণ অস্বাধীন, আমাদের ভাষা নাই যে কিছু বলিব, আমরা কাতর হইলে কেবল রোদনই করিতাম। পরে আমাদিগের বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমরাও পৃথিবীর হইলাম। এখন নানারূপ উৎকণ্ঠা, বন্ধুত্ব-সূত্রে অনেকের সহিত মিসিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু অবৈষম্যে হয় ত কেহ আমারদের প্রতি দৃকপাত করিল না। ধন পাইলাম, হয় ত অন্যের লোলুপ দৃষ্টি তাহা সহিতে পারিল না; মর্য্যাদা পাইলাম, হয় ত কোন ক্রূর হস্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে তাহা আচ্ছিন্ন করিয়া লইল; সরল হইলাম, হয় ত কেহ সুযোগ ভাবিয়া নির্য্যাতনের চেষ্টা করিতে লাগিল; জ্ঞানী হইলাম, হয় ত চতুর্দ্দিক হইতে ঈর্ষানল জ্বলিয়া উঠিল; প্রভুত্ব পাইলাম, হয় ত কেহ পূর্ব্বসূত্র ধরিয়া সর্ব্বসমক্ষে বিষ উদ্গার করিতে লাগিলেন। ঐ যে তোমার সুন্দর যৌবনশ্রী, উহাকে জরা-রাক্ষসী শ্বেত পরিচ্ছদে বিলোপ করিয়া ফেলিবে; ঐ যে তোমার

সুস্থ সবল দেহ, রোগ-যন্ত্রণা উহাকে অস্থির করিয়া তুলিবে; পরিশেষে তোমাকেও এই পৃথিবীতে দণ্ডীবেশে বিদায় লইতে হইবে। তুমি একাকী আসিয়াছিলে, আবার একাকী যাইবে। ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি,কেবল ধর্ম্মই তোমার সঙ্গে যাইবে। শ্বঃকার্য্যমদ্য কর্ত্তব্যং; ধর্ম্মের জন্য বিলম্ব করিও না। পৃথিবীর এত যে দুঃখ যন্ত্রণা এত যে রোগ শোক এই একমাত্র ধর্ম্মের প্রসাদে তাহা সহ্য হইবে। ভয় নাই, নিরাস হইও না, ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা করিবে।

অন্তর্য্যামি! এই ভবসাগরের তরঙ্গ দেখিয়া মনে বড় ভয় হয়, কখন কি হইবে কেবল এই আতঙ্কই উপস্থিত হয়। সংসারের যাহা সুখ তাহা বিষমিশ্রিত আমরা সে সুখের প্রার্থী নহি। কাতর প্রাণে কেবল তোমাকে চাই; তুমি হৃদয়ে থাক, নির্ভয় হইব, তুমি সহায় হও, সাহস পাইব।

অধ্যাত্ম-বিদ্যা।

আত্মা সমুদায় জগতের সার এবং তাহা হইতেও অধিক! সমুদায় জগতের তত্ত্ব বুঝিয়া উঠা যেমন কঠিন, আত্ম-তত্ত্ব বুঝিয়া উঠাও তেমনি কঠিন। কিন্তু মনুষ্যের বুদ্ধি কি চমৎকার পদার্থ—তাহার কি ভয়ানক সাহস। একটি ক্ষুদ্র আতা-ফলের পতন মাত্রের উপর ভর করিয়া লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি যোজন-ব্যাপী সৌর জগতের রহস্য ভেদ করিতেও কুণ্ঠিত নহে! জগতের কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে মনুষ্যের বুদ্ধি কত দূর জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহা একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। মনুষ্যের বুদ্ধি যেমন দূর হইতে বহু দূরে তেমনি আবার নিকট হইতেও নিকটে প্রবেশ করত কতই না অমূল্য সত্য আবিষ্কার করে। আবার বহির্বস্তু আত্মার উপরে কিরূপ কার্য্য করে, আত্মাই বা বহির্বস্তুর উপরে কিরূপে কার্য্য করে, ইহাও বুদ্ধির তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। আত্মা এবং বহির্বিষয়ের মধ্যে কিরূপ সেতু বর্ত্তমান আছে, ইহারও অনুসন্ধানে মনুষ্য পশ্চাদ্‌গামী নহে।

আত্মার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যদি ভৌতিক জগতের বিষয় পর্য্যালোচনা করা যায়, তবে প্রথমেই এই তিনটি ব্যাপার আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়; কি? না(১) স্থূল পদার্থ এবং তদীয় গতি বিধি, (২) সূক্ষ্ম পদার্থ এবং তদীয় গতি বিধি এবং তদনন্তর (৩) প্রাণন ব্যাপার। উদাহরণ; স্থূল পরমাণুপুঞ্জ এবং তাহারদের গতিবিধি দ্বারা একটি বৃক্ষের উৎপত্তি হইল; (২) সূক্ষ্ম আলোক-পদার্থের কম্পন তদ্দ্বারা প্রতিহত হইল, (৩) সেই সূক্ষ্ম আলোক পদার্থ যাহা সর্ব্বত্র গূঢ় রহিয়াছে, তাহার কম্পন উক্ত স্থূল পদার্থ-কর্ত্তৃক প্রতিহত হইয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরস্থিত সূক্ষ্মতর পদার্থে তরঙ্গ উপস্থিত করিল; শেষোক্ত পদার্থকে প্রাণ-পদার্থ বলা যাউক। এইরূপ প্রথমে স্থূলভূত পরে সূক্ষ্মভূত পরে প্রাণ, উত্তরোত্তর ক্রমে এই তিনটি পদার্থ প্রকম্পিত হইলে,তবে ভৌতিক বস্তুর গুণ-বিশেষ (এস্থলে বর্ণ-বিশেষ) আমারদের মনে উদ্বোধিত হয়। যাহাকে আমরা বাহ্য বস্তুর গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি তাহার আধার কে? না মন; তাহার নিমিত্ত-কারণ কে? না প্রাণ পদার্থের কম্পন। সে কম্পনের কারণ কে? না আলোকাদি সূক্ষ্ম ভূতের কম্পন। তাহারও কারণ আছে, সে কে? না স্থূলভূতের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন। সর্ব্ব প্রথমে স্থূল ভূতের সংস্পর্শ দ্বারা আলোক পদার্থের কম্পন প্রতিহত হয়; পরে সেই প্রতিহত হওয়া কম্পনের সংস্পর্শে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরস্থিত প্রাণ পদার্থে তদনুরূপ

কম্পন উপস্থিত হয়, তাহার পরে অন্তঃকরণে বর্ণ-বোধ উদ্ভূত হয়। ইহাতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, স্থূল ভূত, সূক্ষ্ম ভূত, এবং প্রাণ, এই যে তিনটি ক্রমাবচ্ছিন্ন বস্তু পরম্পরা, ইহারদের প্রত্যেকেই কম্পন ক্রিয়ার আধার-স্বরূপ। স্থূল ভূত হইতে কম্পন-ক্রিয়া আরব্ধ হইয়া সূক্ষ্ম প্রাণ-পদার্থে পর্য্যবসিত হইলেই মনেতে বিষয়-জ্ঞান উদ্বোধিত হয়। অতএব বিষয়বোধের আধার হইতেছে মন; কারণ হইতেছে প্রাণ-কম্পন। প্রাণ-কম্পনের কারণ কে? না সূক্ষ্মভূতের কম্পন। শেষোক্তের কারণ কে? না স্থূল ভূতের কম্পন।

স্থূল বস্তুর কম্পন এবং সূক্ষ্ম বস্তুর কম্পন উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যও আছে, বৈষম্যও আছে; সূক্ষ্ম বস্তুর কম্পন এবং প্রাণ-পদার্থের কম্পন, এ দুয়ের মধ্যেও ঐ প্রকার সাম্য-বৈষম্য বিদ্যমান আছে; কিন্তু প্রাণ-পদার্থের কম্পন এবং রূপরসাদি বিষয়ের বোধ, এ দুয়ের মধ্যে নিতান্তই বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়; এক প্রকার কম্পন হইতে অন্য প্রকার কম্পন যতই বিসদৃশ হউক্ না কেন, কিন্তু তথাপি তাহা কম্পন বটে; কিন্তু প্রাণ-কম্পন হইতে রূপ রসাদি বিষয়-বোধ যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা (বিষয় বোধ) একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার; তাহার সহিত কোন প্রকার কম্পনেরই তুলনা হয় না। কম্পনাদি ক্রিয়া-সকলের আধার যে বহির্বস্তু তাহা স্বতন্ত্র এবং বোধ-ক্রিয়ার আধার যে মন তাহা স্বতন্ত্র।

উপরে যাহা প্রদর্শিত হইল,তাহার মধ্যে এই আর একটি বিষয় প্রণিধান করা কর্ত্তব্য; যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, উপরি স্থলে সূক্ষ্ম ভূতের যে কম্পন কথিত হইল,তাহার কারণ কে? তবে স্থূলরূপে বলা যাইতে পারে যে, স্থূল ভূতের কম্পনই তাহার কারণ; কিন্তু বস্তুত তাহা আংশিক কারণ মাত্র; সূক্ষ্ম ভূতের নিজের কম্পন-শক্তি থাকাতেই অন্য বস্তুর কম্পন দ্বারা তাহা অনুকম্পিত হয়; কম্পিত করিবার শক্তি যদিও অন্য বস্তুতে (স্থূল বস্তুতে) বিদ্যমান, কিন্তু কম্পিত হইবার শক্তি স্বয়ং তাহাতেই বিদ্যমান; এই দ্বিবিধ শক্তির সাহায্যেই সূক্ষ্ম ভূতে কম্পন সংঘটিত হইয়া থাকে। কারণের এইরূপ দ্বিত্ব। পরন্তু যে কারণেই হউক্,সূক্ষ্ম ভূত যখনই কম্পিত হয়, তখন তাহার সে কম্পন-ক্রিয়ার আধার সে নিজেই—অন্য কোন বস্তু নহে। আধারের এইরূপ একত্ব। স্থূল-বস্তু কর্ত্তৃক সূক্ষ্ম বস্তু আহত হইলে শেষোক্ত বস্তুতে যখন কম্পন উপস্থিত হয় তখন স্থূল বস্তুকে তাহার (সেই কম্পন ক্রিয়ার) নিমিত্ত কারণ এবং সূক্ষ্ম বস্তুকে তাহার উপাদান কারণ বলা যাইতে পারে। সর্ব্বত্রই এই দুই প্রকার কারণের যোগে কার্য্য উৎপন্ন হয়। অতএব কারণের দ্বিত্ব এবং আধারের একত্ব যেন মনে থাকে।

প্রাণ কম্পিত হইলে মনেতে বিষয়-বোধ উপস্থিত হয়। অতএব বিষয়-বোধের নিমিত্ত-কারণ প্রাণ-কম্পন, উপাদান-কারণ মন; এই দুই কারণের সাহায্যে বিষয়-বোধ উপস্থিত হয়। যাঁহারা বলেন যে, কেবল মাত্র প্রাণ-কম্পন, অথবা মস্তিষ্ক-কম্পন দ্বারা বিষয়-বোধ উপস্থিত হয়, তাঁহাদের কথা ঠিক্ নহে। প্রাণের কম্পন বা মস্তিষ্কাভ্যন্তর-স্থিত সূক্ষ্ম ভূতের কম্পন (যাহারই কম্পন বল না কেন) মনের সহিত সংযোগ ব্যতিরেকে একাকী তাহা বিষয়-বোধের কারণ হইতে পারে না। অতএব স্থূল ভূত হইতে যেমন সূক্ষ্ম ভূত ভিন্ন,সূক্ষ্ম ভূত হইতে যেমন প্রাণ ভিন্ন, প্রাণ হইতে সেইরূপ মন ভিন্ন, তাহার আর সন্দেহ নাই। কেন ভিন্ন? না যে হেতু উপাদান এবং নিমিত্ত এই দুই

প্রকার কারণ ব্যতিরেকে কোন কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। সূক্ষ্ম ভূতে যখন কম্পন উপস্থিত হয়, তখন তাহার নিমিত্ত কারণই বা কে? তাহার উপাদান কারণই বা কে? এই দুইটি প্রশ্নই সমান জিজ্ঞাস্য। মনে যখন বিষয়-বোধ উপস্থিত হয় তখনও তাহার নিমিত্ত কারণই বা কে? উপাদান কারণই বা কে? দুইটিই তুল্য-জিজ্ঞাস্য। বিষয়-বোধ-রূপ কার্য্যের অবশ্যই একটা উপাদান-কারণ আছে—তাহাই মন শব্দে উক্ত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে প্রাণ-কম্পন অথবা প্রাণন-ক্রিয়া, পরে বোধ-ক্রিয়া; প্রথম ক্রিয়াটি যেখানে উত্থিত হয়, তাহারো উত্তর-প্রদেশে দ্বিতীয়-ক্রিয়াটি উত্থিত হয়; প্রথম-স্থানে যে বস্তু কম্পিত বা প্রাণিত হয়, তাহা স্বতন্ত্র, এবং দ্বিতীয় স্থানে যে বস্তু প্রবুদ্ধ বা চেতিত হয় তাহা স্বতন্ত্র—প্রথম বস্তুর নাম প্রাণ, দ্বিতীয় বস্তুর নাম মন। আপাতত মনে হইতে পারে যে, বীণা-যন্ত্রের তন্ত্রী-কম্পন এবং তদীয় ধ্বনি উভয়ই একত্র সঙ্ঘটিত হয়, কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রথমে তন্ত্রীরূপ স্থূল পদার্থ কম্পিত হয়, তাহার উত্তর-প্রদেশে শাব্দিক সূক্ষ্ম-পদার্থ কম্পিত হয়, তাহার উত্তর-প্রদেশে প্রাণ (যাহা ততোধিক সূক্ষ্ম পদার্থ তাহা) কম্পিত হয়; তাহারো উত্তর-প্রদেশে (মনে) শব্দ বোধ আবির্ভূত হয়। স্থূল বস্তু সূক্ষ্ম বস্তু প্রাণ এবং মন এই বস্তু-চতুষ্টয়ের মধ্যে ঐরূপ যে এক ক্রম-পরম্পরা বিদ্যমান আছে, তাহার প্রতি কেহ যে অন্ধ হইবেন, তাহার জো নাই; কেন না আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্র, প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র এবং যুক্তি সকলে মিলিয়া উহার পোষকতা করিতেছে। অস্মদ্দেশীয় দর্শন-শাস্ত্র এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্র, উক্ত বিষয়ে উভয়ের মত-সাদৃশ্য পরে প্রদর্শিত হইবে। মন পর্য্যন্ত বিষয়ের সীমা, তদূর্দ্ধে বিষয়ের অধিষ্ঠান-ভূমি, এইটি এখন বিচার করিয়া দেখা যাইতেছে।

দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের সমন্বয়।

প্রাচীন অদ্বৈতবাদীদিগের অর্থাৎ উপনিষদ-প্রণেতাদিগের মত ঠিক্ অধুনাতন অদ্বৈতবাদীদিগের ন্যায় ছিল এমন বোধ হয় না। "তত্ত্বমসি" "সোঽহমস্মি" ইত্যাদি বাক্য অধুনাতন অদ্বৈতবাদীরা যেরূপ অর্থে লইয়া থাকেন, ঠিক সেইরূপ অর্থ তাঁহারা লইতেন এমন বোধ হয় না। অধুনাতন অদ্বৈতবাদীরা ঐ সকল বাক্য এই অর্থে লয়েন যে "তুমিই সেই ব্রহ্ম" "আমিই সেই ব্রহ্ম" প্রাচীন অদ্বৈতবাদীরা ঐ সকল বাক্য যদি ঠিক্ ঐ অর্থে লইতেন তাহা হইলে তাঁহারা ঈশ্বরকে "আত্মনো অন্তরো" "আত্মা হইতে ভিন্ন" এবং "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" "দুই সুন্দর পক্ষযুক্ত পক্ষী অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক বৃক্ষে বাস করেন" এইরূপ স্পষ্ট দ্বৈতমত-প্রতিপাদক বাক্য সকল কহিতেন না। তাঁহারা বোধ হয় "তত্ত্বমসি" "সোঽহমস্মি" এই সকল বাক্য এই অর্থে লইতেন যে, পরমাত্মা যেমন সমস্ত বস্তুর অবলম্বন তেমনি জীবাত্মারও অবলম্বন, জীবাত্মা হইতে যদি পরমাত্মা আপনাকে পৃথক্ করিয়া লয়েন তাহা হইলে জীবাত্মার আর কিছুই থাকে না, অতএব ইহা এক প্রকার বলা যাইতে পারে যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক। অধুনাতন অদ্বৈতবাদীরা "ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং" এই বাক্যের এই অর্থ করেন যে সমস্ত জগতই স্বরূপত ব্রহ্ম কিন্তু প্রাচীন অদ্বৈতবাদীরা ঐ বাক্য ঠিক এই অর্থে লইতেন এমন বোধ হয় না। তাঁহারা যদি ঐ বাক্য ঠিক এই অর্থে লইতেন তাহা হইলে "সর্ব্বেষাং ভূতানাং অন্তরঃ" "ঈশ্বর সর্ব্বভূত হইতে ভিন্ন" "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" "তিনি বিদিত অবিদিত সকল বস্তু হইতে ভিন্ন এ প্রকার বাক্য সকল প্রয়োগ করিতেন না। প্রাচীন অদ্বৈতবাদীরা বোধ হয় "ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং" এই বাক্য এই অর্থে লইতেন যে যখন ঈশ্বর জগতের অবলম্বন স্বরূপ তখন তিনি যদি আপনাকে জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া লয়েন তবে জগতের আর কিছুই থাকে না, অতএব ঈশ্বরই জগৎ ইহা এক প্রকার বলা যাইতে পারে!

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রাচীন অদ্বৈতবাদীরা আদোবেই ঐ সকল আপাত-প্রতীয়মান অদ্বৈতবাদ-পোষক বাক্য কেন ব্যবহার করিয়াছিলেন; তাহার কারণ এই যে, যে সকল ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি ঈশ্বর জগতের অথবা জীবাত্মার অবলম্বন এই সত্য গাঢ়রূপে চিন্তা করেন কিম্বা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগ সাধন করেন এবং সমাধির সময় যাঁহাদিগের সম্বন্ধে বাহ্য জগৎ বিলুপ্ত হয় এবং সেই সময়ে যাঁহারা কেবল ঈশ্বরকেই দেখেন তাঁহারা আপাত-প্রতীয়মান অদ্বৈতবাদে উত্তীর্ণ না হইয়া থাকিতে পারেন না। যে সকল ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিরা ঈশ্বর জগতের অবলম্বন-স্বরূপ অথবা জীবাত্মার অবলম্বন-স্বরূপ এই সত্য গাঢ়রূপে চিন্তা করেন তাঁহারা মনের ভাব প্রকাশ জন্য ঈশ্বরই জগৎ" "ঈশ্বরই জীবাত্মা" এই সকল আপাত-প্রতীয়মান অদ্বৈতবাদ পোষক বাক্য স্বভাবত ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারেন না। যে ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি ঈশ্বর অপরিচ্ছিন্নরূপে জগৎ ব্যাপিয়া আছেন এই সত্য গাঢ়রূপে চিন্তা করেন তিনি মনের ভাব প্রকাশ জন্য স্বভাবতঃ এইরূপ বাক্য উচ্চারণ না করিয়া থাকিতে পারেন না যে, সমস্ত জগৎই ঈশ্বর। যাঁহারা যোগের সময় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মাকে একেবারে যুক্ত করেন, তাঁহারা যে যোগাগ্নি দ্বারা উত্তাপিত হইয়া বলিবেন যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ইহার আশ্চর্য্য কি? সমাধি-কালে যাঁহাদিগের অন্তশ্চক্ষু হইতে জগৎ একেবারে বিলুপ্ত হয়, যাঁহারা ঐ সময়ে কেবল ঈশ্বরকে দেখেন, তাঁহারা যে বলিবেন যে জগৎ আর ঈশ্বর একই ইহার আশ্চর্য্য কি?

"জগৎ ব্রহ্ম" "জীব ব্রহ্ম" এই সকল বাক্য কতক গুলি পরম সত্যের অত্যুক্তি মাত্র। সেই সকল পরম সত্য এই যে ঈশ্বর জগৎ অথবা জীবাত্মার অবলম্বন-স্বরূপ; ঈশ্বর যদি জগৎ কিম্বা জীবাত্মা হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া লয়েন তাহা হইলে জগৎ কিম্বা জীবাত্মার আর কিছুই থাকে না, এবং ঈশ্বর অপরিচ্ছিন্নরূপে জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। প্রথমোক্ত বাক্য গুলি শেষোক্ত পরম সত্য সকলের অত্যুক্তি মাত্র এইরূপ করিয়া লইলে অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের সমন্বয় সাধন হইতে পারে।

সাংখ্য দর্শন।

তন্মাত্রা বা পরমাণু।

অন্যান্য দর্শনে যাহা পরমাণু নামে ব্যবহৃত হয়, তাহাই সাংখ্য দর্শনের তন্মাত্রা। এই তন্মাত্রা সমস্ত স্থূল জগতের উপাদান। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুতর অংশ পুঞ্জীভূত হইলে তাহা স্থূলতার উৎপত্তি করে, আবার সেই সেই অংশ প্রক্রিয়া-বিশেষে বিশ্লিষ্ট হইলে সেই স্থৌল্যের ধ্বংস করে ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ব্যাপার।

সাঙ্খ্যাচার্য্যদিগের ব্যবহৃত উক্ত 'তন্মাত্রা' শব্দটি যৌগিক। স্থৌল্যজনক বিশেষ বিশেষ

মৌলিক পদার্থ লক্ষ্য করিয়া তৎ শব্দের প্রয়োগ; আর, তাহার পরিমাণগত অল্পতা লক্ষ্য করিয়া মাত্রা শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অপিচ, মাত্রা শব্দের অর্থ অল্প হইলেও এস্থলে সে অল্প সাধারণ অল্প নহে। যে অল্প নিরঙ্কুশ অর্থাৎ অল্প-কল্পনা যত দূর গমন করিতে পারে বা যেখানে গিয়া অল্প-কল্পনার বিশ্রাম হয়, সেই বিশ্রান্তি-সীমা-প্রাপ্ত অল্পই এখানকার বোধ্য। অতএব অপকর্ষ বা ক্ষুদ্রতার শেষ সীমা প্রাপ্ত অবিনশ্বর মৌলিক পদার্থের নাম তন্মাত্রা। এই তন্মাত্রা আর পরমাণু তুল্য পদার্থ। ইহার নামান্তর সূক্ষ্ম ভূত, মহাভূত, পরিমণ্ডল ও মূলধাতু। নৈয়ায়িকেরা যেমন পার্থিব পরমাণু, আপ্য পরমাণু ও তৈজস পরমাণু প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নামে বিশেষ বিশেষ জাতীয় তন্মাত্রার ব্যবহার করেন, সেইরূপ, সাঙ্খ্যাচার্য্যেরাও গন্ধ তন্মাত্রা, রস তন্মাত্রা ও রূপ তন্মাত্রা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নামে বিশেষ বিশেষ জাতীয় পরমাণুর ব্যবহার করিয়া থাকেন। কখন বা সূক্ষ্মতম গন্ধ রসাদির আধারীভূত তত্তৎ দ্রব্যকে স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করিয়া পৃথিবীতন্মাত্রা জলতন্মাত্রা ও তেজস্তন্মাত্রা এবং আদিক্রমে উল্লেখ করিয়া থাকেন।

সাঙ্খ্যোক্ত তন্মাত্রা শব্দের ন্যায় ন্যায়-শাস্ত্রোক্ত পরমাণু শব্দও যৌগিক। তাঁহারা বস্তুনিষ্ঠ পরিমাণ পদার্থকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীভুক্ত করিয়া থাকেন। অণু, মধ্যম ও মহৎ। ক্ষুদ্রতা-বোধক প্রথমোক্ত পরিমাণ, আর, বৃহত্ত্ব বোধক তৃতীয় শ্রেণীর পরিমাণ যদি শেষ সীমা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে, তদ্বোধের নিমিত্ত ঐ 'অণু' ও 'মহৎ' শব্দের পূর্ব্বে একটি পরম শব্দের সন্নিবেশ করিতে হইবে। এই নিয়মানুসারে তাদৃশ সূক্ষ্ম বস্তুর নাম পরমাণু। আর ঈশ্বর, আকাশ ও কালাদিগত পরিমাণের নাম পরম মহৎ।

অনুমান প্রকার।

পরমাণু পদার্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। কেবল যুক্তিবলেই উহার স্বরূপ সত্তা ও পরিমাণাদি নির্দ্ধারিত হয়, সাঙ্খ্যাচার্য্যেরা পরমাণুর স্বরূপ নির্ণয়ের নিমিত্ত যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তত্তাবতের নিষ্কর্ষ এই—"স্থূল বস্তু মাত্রেই বিভাজ্য অর্থাৎ ভাগার্হ। যাহা বিভাজ্য তাহার অংশ আছে; যে হেতু, উপায় প্রয়োগ করিলে তাহা অংশে অংশে বিভক্ত হইতে দেখা যায়। এই নিয়ম স্থূল বস্তু মাত্রেই উপগত আছে, সুতরাং ঘট, পট, গৃহ, পর্ব্বতাদির ন্যায় ক্ষিতি, জল ও পবনাদি স্থূল ভূতেও আছে। অপিচ, বিভাগ-কালে প্রত্যেক বিভক্ত-অংশ গুলি প্রত্যেক বিভাজ্য অপেক্ষা সূক্ষ্মাকার ধারণ করে। বিভক্ত-অংশ-গত সূক্ষ্মতা যখন ইন্দ্রিয়-শক্তিকে অতিক্রম করে, তখনও বিভাগ হয়। সে বিভাগ বাহ্য উপকরণ সাপেক্ষ নহে, তাহা বিশুদ্ধ যুক্তি বা শুদ্ধতম কল্পনার অধীন। সেই কল্পনা আবার যুক্তি-যুক্ত স্থান প্রাপ্ত হইয়া বিরত হয়। অনাদি অনবস্থারূপ দোষই (তর্ক বিশেষ) কল্পনার প্রবাহের অবরোধক। অতএব, যেখানে গিয়া অপকর্ষ-কল্পনার শেষ হইবে, সেই অপকর্ষ-কাষ্ঠাপন্ন (সূক্ষ্মতার শেষ সীমা প্রাপ্ত) মৌলিক অংশ গুলি তখন অবিভাজ্য বা অবিনশ্বর স্বরূপে ব্যবস্থিত হইবে। সেই অবিভাজ্য বা অবিনশ্বর সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতম নিরবয়ব মৌলিক পদার্থের নাম পরিমণ্ডল, পরমাণু, মহাভূত বা তন্মাত্রা এবং তাহারই সাংহত্য সমস্ত জগতে বিদ্যমান। পরমাণুদিগের সংযোগ বিয়োগ ঘটনা ব্যতীত জগতে অন্যবিধ ঔৎপত্তিক ব্যাপার নাই *।

* "স্থূলাৎ পঞ্চতন্মাত্রস্য" (কাপিল সূত্র)। "অত্রেদমনুমানং—অপকর্ষকাষ্ঠাপন্নানি স্থূলভূতানি স্ববিশেষগুণ বদ্দ্রব্যোপাদানানি স্থূলত্বাৎ ঘট পটাদিবৎ ইত্যাদি—" (ভাষ্য)। "অন্যৎ যোগ ভাষ্যে—"

পরিমাণ।

বলা হইল অপকর্ষ-কাষ্ঠাপন্ন অমিশ্র মৌলিক (মূলধাতু) পদার্থের নাম তন্মাত্রা বা পরমাণু। কিন্তু, সেই অপকর্ষভাবের বিশ্রামস্থান ইন্দ্রিয়ের অধিকৃত ভূমি হইতে কত দূর নিম্নে, তাহার কিছু বলা হয় নাই। এক্ষণে প্রস্তাবগত অপূর্ণতা দোষ পরিহারের নিমিত্ত তাহারও কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। এতদ্বিষয়ে অনেক মত আছে, কোন মতে ইন্দ্রিয়বৃত্তির অধিকার স্থান হইতে অষ্টাদশ অংশ দূরে অপকর্ষকল্পনার বিশ্রামস্থান। কোন মতে ষট্‌ত্রিংশৎ অংশ দূরে, আবার কোন মতে ত্রিংশৎ অংশ দূরে। এই মত সাংখ্য ও বৈদ্যক সম্মত। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, ত্রিংশটি পরমাণু সংহত হইলে তাহা ইন্দ্রিয়ের অধিকারে আসিতে পারে। ইন্দ্রিয়-জগতের মধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয়ই সমধিক সামর্থ্যবান্, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে চক্ষুরিন্দ্রিয়েরই অধিকার; কিন্তু, নিরুপাধিক অর্থাৎ স্বচ্ছ কাচ বা অনভিভাবক সূর্য্যকিরণ চক্ষুকে অনুগ্রহ না করিলে সেই সংহত ত্রিংশৎ পরমাণু তাহার প্রত্যক্ষে উপস্থিত হইবে না। প্রাতঃসূর্য্যালোক যখন গবাক্ষ-রন্ধ্র দিয়া ধারাকারে নিস্রুত হইতে থাকে, তখন, সেই অনভিভাবক কিরণ-স্রোতের প্রতি লক্ষ্য করিলে শত শত ত্রসরেণু অর্থাৎ সংহত ত্রিংশৎ পরমাণু অনুভূত হইতে পারে †।

আর এক মত আছে। তন্মতে ষষ্টি সংখ্যক পরমাণু সংহত হইলে তবে তাহা প্রত্যক্ষ হয়। পরমাণুর সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে এতদধিক দূর উক্তি অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন, তন্মাত্রা পদার্থ অস্মাদাদির সর্ব্বথা অভোগ্য, কেবল যোগীপুরুষ ও দেবতাদিগেরই ভোগ্য।

† "জালান্তরগতে সূর্য্যকরে ধ্বংসী বিলোক্যতে। ত্রসরেণুস্তু বিজ্ঞেয়স্ত্রিংশতা পরমাণুভিঃ।" ইতি বৈদ্যকম্। "জালগত তরুণারুণ-কিরণে স্বচ্ছ প্রসাদ স্বাভাব্যবৎ কাচ যোগেঽপি।" (মীমাংসাকুসুমাঞ্জলি)।

জাতি-সঙ্খ্যা।

আকাশ যেমন অসীম, অনন্ত—পরমাণুও তেমনি অসীম অনন্ত। গ্রহ-নক্ষত্র-তারকা-সাগর-শৈল প্রভৃতি সমস্ত বিশ্ব বিধ্বস্ত হইলে তত্তৎ পরমাণু যেমন আকাশের অন্তর্গর্ভের এক কোণে বিলীন হইতে পারে,—তেমনি, হয় ত এই জগদবস্থায়ও আকাশের উদয়াকাশে এত পরমাণু লুক্কায়িত আছে যে তদ্দ্বারা এমন শত শত দৃশ্য (বাহ্য জগৎ) জন্ম লাভ করিতে পারে। এই জন্য, এতদ্বিধ অনুভবের বলে, সংস্কৃত দার্শনিকেরা বলিয়া থাকেন, যে পরমাণু পদার্থ সঙ্খ্যাতীত; অর্থাৎ তাহার সংখ্যা নাই, অন্তও নাই, কিন্তু তাহার জাতিগত সংখ্যা আছে।

পরমাণুর জাতিনিষ্ঠ সংখ্যা সংস্কৃত মতে অতি অল্প। পার্থিব (১) আপ্য (২) তৈজস (৩) ও বায়বীয় (৪),—এই চারি জাতি পরমাণুর সত্তা সংস্কৃত মতে নির্ণীত হয়। কোন কোন মতে আকাশিক পরমাণুও স্বীকার আছে ‡। "নান্যূনং নাতিরিক্তং" ইহার অতিরিক্ত বা উহার ন্যূন জাতীয় পরমাণু এ জগতে বিদ্যমান নাই।

বিচারণা।—অমিশ্র অবিকার্য্য নিরবয়ব সূক্ষ্মতম মূল ধাতুর নাম ভূত—কিন্তু অমিশ্রতা নির্ণয় উপায়সাধ্য নহে—তাহা কেবল যুক্তি সাপেক্ষ।

‡ এই মত সাঙ্খ্যসম্মত। বৌদ্ধমতে আকাশ কোন পদার্থ নহে। আবরণাভাব অর্থাৎ অবকাশ বা কিছু না থাকার নামই আকাশ। সুতরাং আকাশের অনুভব অসম্ভব। যে মতে আকাশ একটি স্বতন্ত্র পদার্থ, উহা সে মতে প্রথম ভূত। উহার মাত্রাভাব (সৌক্ষ্ম্য) আছে। শব্দের মাত্রাভাব অবলম্বন করিয়া তদাধার আকাশের মাত্রাভাব (অণুত্ব) অনুভব করিতে হয়। ফল, এ মত আমাদের হৃদয়-গ্রাহী নহে।

যে বাহ্য বস্তুর দ্বারা যে বাহ্য বস্তুর সংযোগ-বিয়োগাদি ক্রিয়া উন্মীলিত হয়, তাদৃশ বাহ্য উপকরণের নাম উপায়—তৎ প্রয়োগের নাম উপায়-প্রয়োগ—এই উপায়-প্রয়োগ যুক্তি ও লক্ষণহীন হইলে ভূতত্ব-নির্ণায়ক অমিশ্রবত্তা নির্ণয়ে সমর্থ হয়েন না, যে হেতু উপায় প্রয়োগ দ্বারা সমস্ত বস্তুর বা অনন্ত বস্তুর পরীক্ষা সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই, হয় ত সমস্ত উপায় পরিজ্ঞান মানব জাতির অন্তরে অবস্থিত নাই—হয় ত উপায় পরীক্ষিত জ্ঞান সুসংস্কৃত মনের নিকট অবিশ্বাস্য অর্থাৎ ভ্রমকলুষিত। (মনে কর, উপায় প্রয়োগ দ্বারা যেন ব্যবহার্য্য বা ভোগ্য বায়ু হইতে দুই বা ততোধিক পদার্থের বিয়োগ সিদ্ধি হইল—হয় ত উহাতে ততোধিক পদার্থের যোগ আছে—তোমরা তাহা নিষ্কাশন করিতে জান না,) অতএব

" মুনয়োপি পদার্থানাং নান্তং যান্তি পৃথক্ত্বশঃ।
লক্ষণেন চ সংসিদ্ধৌ পারং যাতা বিপশ্চিতঃ॥ "

এক একটি করিয়া পরীক্ষা করিতে গেলে পরীক্ষা শেষ হয় না, যে হেতু পদার্থের অন্ত নাই। তবে, যদি যুক্ত্যুপেত লক্ষণ নির্ণয় করা যায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা দৃষ্টাদৃষ্ট সমস্ত তজ্জাতীয় পদার্থের নির্ণয় হইতে পারে। পণ্ডিতেরা যুক্তিমূলক লক্ষণ অবলম্বন করিয়া পদার্থ-সমুদ্রের পারে গমন করিয়া থাকেন।

যুক্তি।

এ সংসারে যে কিছু পদার্থ আছে, সমস্তই ঈশ্বরপ্রেরিত বা নৈসর্গিক মানবেন্দ্রিয়ের ভোগ্য। যাহা মানবেন্দ্রিয়ের অভোগ্য, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার নাই। ইহা তর্কশাস্ত্রের সার। যদি তাহাই স্থির হইল, তবে অন্বেষণ কর ভোগ্যসংগ্রাহক ইন্দ্রিয় কয়টি। তাদৃশ ইন্দ্রিয় পাঁচটি মাত্র আছে, শ্রোত্র (১) ত্বক (২) চক্ষু (৩) রসনা (৪) নাসিকা (৫)। যদিও এতদ্ভিন্ন ইন্দ্রিয়ান্তর বর্ত্তমান আছে, তথাপি তাহা ভোগ্য অর্থাৎ বিষয়সংগ্রাহক নহে। তাহা কার্য্যজনক ইন্দ্রিয়। উহারা কি কি জাতীয় ভোগে প্রসর্পিত হয় তাহাও লক্ষ্য কর। দেখিবে,—শব্দ (১) স্পর্শ (২) রূপ (৩) রস (৪) গন্ধ (৫),—এই পঞ্চবিধ ভোগ্যেই উহাদের প্রসর্পণ, অন্যত্র নহে। যে হেতু এ জগতে উক্ত পঞ্চবিধের অতিরিক্ত ভোগ্যের (বিষয়ের) অভাব আছে, সেই হেতু কথিত পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ের অসত্তা আছে। যদি কথিত পঞ্চবিধের অতিরিক্তবিধ ভোগ্য এ জগতে থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার গ্রাহক ইন্দ্রিয়ান্তর থাকিত! যখন পঞ্চাতিরিক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় নাই—তখন নিশ্চিত কথিত পঞ্চাতিরিক্ত ষষ্ঠ জ্ঞেয় এ জগতে নাই।

যুক্তিমূলক লক্ষণ।

দেখা যায়, কোথাও রূপ আছে কিন্তু রস নাই। কোথাও বা রস আছে গন্ধ নাই। কোথাও স্পর্শ আছে গন্ধাদি নাই। এইরূপ নির্ব্বাচন দ্বারা নির্ণীত হয় যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ,—এই পাঁচটি পরস্পর পার্থক্য-ধর্ম্ম বিশিষ্ট এবং প্রধান। ঐ পার্থক্য ধর্ম্মানুসারে ঐ পাঁচটিকে বিশেষ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা যায়। অপিচ, উক্ত পঞ্চবিধ পদার্থ যে দ্রব্য নহে তাহাও নির্ণীত আছে। উহারা দ্রব্যের অধীন গুণ। অতএব আত্মা ভিন্ন যে কিছু বিশেষগুণবদ্বস্তু অর্থাৎ উক্ত পঞ্চবিধ গুণের নির্দ্দিষ্ট আধার তাহাই ভূতসংজ্ঞায় নিবিষ্ট *। অগ্নি, বায়ু, জল, আকাশ ও মৃত্তিকা, এ সমস্তই ভূত। যে হেতু পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে শব্দ গুণ আকাশের,—স্পর্শ গুণ বায়ুর,—রূপ তেজের,—রস জলের,—গন্ধ পৃথিবীতে বিশেষরূপে অবস্থান করিতেছে।

* আত্মা ভিন্ন, এই বিশেষণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে আত্মা নামক দ্রব্য ভূত হইতে পৃথক্ এবং তাহার গুণও পৃথক্। ইহা অগ্রে বক্তব্য।

সাঙ্খ্য শাস্ত্রের মত এই যে ভূত সকল যুগপৎ উৎপন্ন হয় নাই, ক্রম-পরিণাম দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। যথা, ব্যোম ভূতের পরিণাম বায়ু—বায়ু ভূতের পরিণাম অগ্নি—অগ্নি হইতে জল—জল হইতে পৃথিবী। উপাদান দ্রব্যের গুণ উপাদেয় কার্য্যে সংক্রান্ত হয় এই নিয়ম অনুসারে উত্তরোত্তর সঞ্জাত ভূত নিচয়ের গুণাধিক্য জন্মিয়াছে। যথা, আকাশের শব্দ গুণ বায়ুতে সংক্রামিত হইয়া বায়ুর বিশেষ গুণের যোগে গুণদ্বয় জন্মিল; শব্দ ও স্পর্শ। এইরূপ, বায়ুজন্মা অগ্নিতে শব্দ স্পর্শ রূপ, অগ্নিজন্মা জলে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস, জলজন্মা পৃথিবী ভূতে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ বর্ত্তমান আছে। ন্যায় মতে ভূত সকল অনুৎপন্ন পদার্থ। সুতরাং তন্মতে কথিত গুণ সকল তত্তৎ ভূতের সম্বন্ধে স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ বৈশেষিক। যে মতে আকাশের পদার্থ ভাব স্বীকার নাই সে মতে শব্দ গুণ বায়ুর, ইহাও মনে রাখিতে হইবে।

এইরূপে সংস্কৃত দার্শনিকেরা ভূত পদার্থের নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। পঞ্চেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত পঞ্চবিধ গুণের আধার-স্বরূপ ক্ষিত্যাদি পঞ্চবিধ ভূতের অতিরিক্ত ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। 'অমিশ্র পদার্থই ভূত' এরূপ লক্ষণের উপর বিশ্বাস রক্ষা করেন না। পার্থক্যধর্ম্মবিশিষ্ট বিশেষ গুণের আধার মাত্রেই ভূত' এইরূপ লক্ষণই তাহাদের মতে নির্দ্দোষ *।

সাঙ্কর্য্য পরিহার।

ভিন্ন দেশীয় নবীন দার্শনিকেরা বর্ত্তমান কালিক জীবভোগ্য জল বায়ুকে ভূত বলেন না। স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, ইহারাই ভূত। "অমিশ্র মৌলিক পদার্থই ভূত"—এই লক্ষণই তাঁহাদের সম্মত। উপায় প্রয়োগই তাঁহাদের অবলম্বন, ও বল। তাঁহারা জলাদি বস্তু সঙ্করজাত আর স্বর্ণাদি বস্তু 'অমিশ্র'—এই ব্যাপার উপায় প্রয়োগে অবগত হইয়া উক্ত সিদ্ধান্তে আস্থা নিক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত দার্শনিকেরা এ বিষয়ে কিছু বলিয়াছেন কি না একবার তাহার অনুসন্ধান করা যাউক।

* "আত্মান্যত্বে সতি বিশেষগুণযোগিত্বং ভূতত্বম্" (ন্যায়গ্রন্থ)। "শান্তাদি বিশেষশূন্যশব্দাদিমত্ত্বং ভূতানাং শব্দাদি তন্মাত্রত্বং" (সাঙ্খ্য)। এই দুই মতের ঐক্য আছে।

স্ত্রীশিক্ষা।

অদ্য প্রায় অষ্ট পঞ্চাশৎ বৎসর হইল রাজা সার্ রাধাকান্ত দেব একটি কল্পিত নাম ধারণ করিয়া "স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক" নামে এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থে তিনি স্ত্রী শিক্ষার উপকারিত্ব বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা শিক্ষা করিলে স্বামীকে পত্র লিখিয়া, শিশু সন্তানদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাইয়া এবং বাটীর হিসাব রাখিয়া, অনেক পরিমাণে গৃহস্থের উপকারী হইতে পারে। ঐ গ্রন্থে তিনি রুক্মিণী, লীলাবতী, খনা, অহল্যা বাই, ফরিদপুরের সুন্দরী, সোঞাই গ্রামের হঠী বিদ্যালঙ্কার এবং অন্যান্য বিদ্যাবতী স্ত্রীর উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ পরে স্কুলবুক্ সোসাইটি দ্বারা পুনঃপ্রকাশিত হয়। অদ্য ষট্ত্রিংশৎ বৎসর হইল ঐ গ্রন্থের বিপক্ষে "স্ত্রী দুরাচার" নামে এক খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। স্ত্রী দুরাচার প্রণেতা স্বকীয় গ্রন্থে প্রথমোক্ত গ্রন্থকর্ত্তার যুক্তি গুলি খণ্ডন করিতে গিয়া অন্যায়রূপে স্ত্রীলোকদিগের অনেক নিন্দাবাদ করিয়াছেন।

রাধাকান্ত দেবের উল্লিখিত গ্রন্থ আমাদিগের দেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তক বলিতে হইবে। অদ্য প্রায় অষ্টাবিংশতি বৎসর হইল মহাত্মা ড্রিঙ্ক ওয়াটর বিটন্ সাহেব কলিকাতা মহানগরীতে প্রথম বালিকা

বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। মহা মহোৎসবের সহিত ঐ বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। সে দিবস বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থানে অশোক বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল, দ্বারে পূর্ণ কুম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল এবং ধ্বজা উড্ডীন করিয়া ফ্রিমেসন সম্প্রদায়ের লোকেরা বাদ্যোদ্যম সহকারে বিদ্যালয়ের মূল প্রস্তর প্রোথিত করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাত্মা বিটন সাহেবকে উল্লিখিত বিদ্যালয় সংস্থাপন কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎপরে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বঙ্গদেশে অনেক গুলি বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। সেই অবধি আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা ক্রমশঃ প্রচলিত হইতেছে; কিন্তু যেরূপ আশা করা যায় সেরূপ ফল প্রদান করিতেছে না। বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অল্প বয়সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করাতে ততোধিক বিদ্যাবতী হইতে পারে না, ইহাতে অল্প বিদ্যার যে সকল অনিষ্ট তাহা ঘটিয়া থাকে। বালিকাবিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রীরা কেবল অলীক উপন্যাস ও কুৎসিত নাটক পাঠে সময় ক্ষেপণ করে। যে পর্য্যন্ত না অন্তঃপুর-শিক্ষা-প্রণালী বিশিষ্ট রূপে অবলম্বিত হইতেছে সে পর্য্যন্ত আমাদিগের দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিশেষ ফলোপধায়িনী হইবে এমন আশা করা যাইতে পারে না। আমরা এক্ষণে খৃষ্টান স্ত্রীলোকদিগের উপরে এই বিষয়ে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত আছি। কিন্তু আর এরূপ নিশ্চিন্ত থাকা আমাদের উচিত হয় না। কালপ্রভাবে কলিকাতা মহানগরে ও পল্লিগ্রামে কতক গুলি বয়স্কা বিদ্যাবতী হিন্দু স্ত্রী প্রস্তুত হইয়াছেন, যাঁহারা অন্তঃপুর-শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহাদিগের অবস্থা তত ভাল নয়, অতএব উল্লিখিত কার্য্য অবলম্বন করিতে তাঁহাদিগকে লওয়ান যাইতে পারে। অন্তঃপুর-বাসিনীদিগকে কি প্রকারে শিক্ষা দেওয়া উচিত তাহা তাঁহাদিগকে প্রথমে বলিয়া দিয়া উল্লিখিত শিক্ষা কার্য্যে তাঁহাদিগকে প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসুর প্রস্তাবিত শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় এ বিষয়ের কত দূর উপযোগি হইবে তাহা আমরা বলিতে পারি না। যে পর্য্যন্ত না তাঁহার প্রস্তাবিত প্রণালী আমরা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হই সে পর্য্যন্ত আমরা তদ্বিষয়ে কোন মতামত প্রদান করিতে পারি না। যাঁহারা অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে শিক্ষা দিতে নিযুক্ত হইবেন তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য যে অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্ন লিখিত চারিটি বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে রামায়ণ ও মহাভারত ভাল করিয়া অধ্যয়ন করাইবেন। দ্বিতীয়তঃ, আলঙ্কারিক শিল্প অপেক্ষা উপকারী শিল্প অধিক শিক্ষা করাইবেন। তৃতীয়তঃ, সূপ শাস্ত্রে শিক্ষা প্রদান করিবেন। চতুর্থতঃ, গার্হস্থ্য চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষা প্রদান করিবেন।

আমাদিগের মতে রামায়ণ ও মহাভারত যেরূপ উন্নত নীতি শিক্ষা প্রদান করে, বোধ হয়, পৃথিবীতে এমন অল্প পুস্তক আছে যাহা ঐরূপ করে। কেহ কেহ এই আপত্তি করিবেন যে ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিলে মনে কুসংস্কারের সঞ্চার হইতে পারে কিন্তু এ আশঙ্কা অমূলক। যেরূপ কাল পড়িয়াছে তাহাতে উল্লিখিত কুসংস্কার সঞ্চারের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণকার গৃহস্থ লোকের স্ত্রীরা কার্পেট বুনিতে অধিক মনোযোগী, কন্থা সীবন, অপমানের কার্য্য জ্ঞান করে, কিন্তু এরূপ হওয়া উচিত নহে। আমাদিগের স্মরণ হয় যে বাল্য কালে ভদ্র রমণীরা প্রতিবাসীর বাটীতে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে পাক করিতে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিত, কিন্তু এক্ষণে সে কাল বিগত হইয়াছে। এক্ষণে স্বামীর আয় অতি অল্প হইলেও তিনি সর্ব্বাগ্রে আপন সীমন্তিনীর মনোরক্ষার জন্য পাচক অথবা পাচিকার অন্বেষণ করেন। পাককিয়ার প্রতি গৃহস্থের রমণীদিগের অবজ্ঞা শোচনীয় বলিতে হইবে। গৃহস্থ রমণীদিগের পাক-বিদ্যা যেমন জানা কর্ত্তব্য তেমনি গার্হস্থ্য চিকিৎসা বিদ্যা জানাও কর্ত্তব্য। যাহাদিগের আয় সঙ্কীর্ণ তাহাদিগের শিশু সন্তানের সামান্য বালসা হইলে ডাক্তারকে ডাকিতে হয় ইহা বিলাতি সভ্যতার উদ্ভাবিত সহস্র বিড়ম্বনার মধ্যে একটি বিশেষ বিড়ম্বনা বলিতে হইবে। পূর্ব্বকালের গৃহিনীরা সামান্য সামান্য দেশীয় ঔষধ দ্বারা ছেলেদিগের পীড়ার যেরূপ আরোগ্য সাধন করিতেন ডাক্তারেরা সেরূপ পারে না। ছেলেদিগের ধাতুর পক্ষে ঐ সকল ঔষধ যেমন উপযুক্ত এমন বিদেশীয় তীব্র ঔষধ নহে। এক্ষণে পল্লিগ্রামে যে সকল গৃহিণীরা ঐ সকল ঔষধ জানেন তাঁহাদিগের নিকট হইতে তাহা শিক্ষা করিয়া এবং ইংরাজি গ্রন্থে এই বিষয়ে যাহা পাওয়া যায় তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া "গার্হস্থ্য চিকিৎসা বিদ্যা" নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। ইংরাজি গ্রন্থে এ বিষয়ে যাহা পাওয়া যায় তাহা এ দেশের প্রকৃতির সঙ্গে মিলাইয়া লওয়া উচিত। উল্লিখিত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া অন্তঃপুর-শিক্ষয়িত্রীরা অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে গার্হস্থ্য চিকিৎসা বিদ্যা বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিবেন।

গৃহকর্ম্ম হইতে উদ্ধৃত।

ভ্রাতা ভগিনী।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃ-তুল্য মর্য্যাদা করিবে। নিয়ত জ্যেষ্ঠের অনুগত হইয়া থাকিবে। জ্যেষ্ঠও কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীকে সন্তান নির্ব্বিশেষ স্নেহ মমতা করিবেন। তাহারা তাঁহার নিকটে সহস্র অপরাধ করিলেও তাহাতে বিশেষ উত্ত্যক্ত না হইয়া মৃদু-মধুর উপদেশ দ্বারা তাহাদিগের চরিত্র শোধন করিবেন। ভ্রাতা ভগিনীতে যে পরস্পর সদ্ভাব ও সদালাপ থাকে, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। ভ্রাতা ভগিনীতে এক গৃহে এক জননীর উদরে জন্ম গ্রহণ করে, এক প্রকার পিতৃ-স্নেহেই লালিত পালিত হয়। জননীর এক ক্রোড়-প্রাঙ্গনেই উভয়ে ক্রীড়া কৌতুকে বর্দ্ধিত ও উন্নত হইয়া থাকে। ইহারদিগের মধ্যে পরস্পর প্রীতিভাব সন্দর্শন করা তো সকলেরই প্রার্থনীয়।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কত গৃহে ঘটনাক্রমে ভ্রাতৃ-বিরোধরূপ দুর্নিবার অনল প্রজ্বলিত হইয়া সেই সেই পরিবারের সৌভাগ্য-তরুকে এক কালে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতেছে। কত ভ্রাতা ভগিনী আপন আপন সঞ্চিত জ্ঞান-ধন তাহাতে আহুতি দিয়া আজন্মের মত দারিদ্র্য-ব্রত অবলম্বন করিতেছে। নিতান্ত হতভাগ্য না হইলে আর কেহ ভ্রাতৃভাবে বঞ্চিত হয় না।

মাতৃ-ক্রোড়কেই পরমেশ্বর আমারদিগের ভ্রাতৃভাব শিক্ষা করিবার একমাত্র স্থান অবধারিত করিয়া দিয়াছেন। আমরা পরিবারের মধ্যগত হইয়া ভ্রাতৃভাব উপার্জ্জন করি, পরস্পর পরস্পরের হিতসাধনে নিযুক্ত এবং পরস্পরের উপভোগ্য সুখকে দ্বিগুণীভূত করি, উপস্থিত দুঃখ-ভার পরস্পর বণ্টন করিয়া গ্রহণ করত তাহার তীব্রতাকে মন্দীভূত করত মনের আনন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করি, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যগত থাকিয়া অল্পে অল্পে প্রীতি ও সদ্ভাবে আমরা উন্নত হই, পরে সেই ভ্রাতৃভাব ক্রমে জনসমাজে বিস্তার করি ইহাই প্রকৃত ধর্ম্মের অনুমোদিত।

আজন্মকাল এক জননীগর্ভজাত ভ্রাতা ভগিনীর সহিত একত্র ভোজন উপবেশন, একত্র জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াও যদি তাহাদিগের সহিত একহৃদয় হইয়া জীবন যাপন করিতে না পারি, পরস্পরের প্রতি পরস্পর প্রীতি ও সদ্ভাব রক্ষা করিতে সমর্থ না হই, তবে জগদীশ্বরের বিশাল সংসার রাজ্যের নানা দেশীয় বিভিন্নপ্রকৃতি জনগণকে কেমন করিয়া ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিব—কেমন করিয়াই বা তাহারদিগের জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতিসাধন জন্য ধন প্রাণ সমর্পণ করিতে সমর্থ হইব।

আমরা সামাজিক জীব, আমারদিগের আশা অধিকার সকলই বিস্তৃত। আমারদিগের কর্ত্তব্যের ভাব, ধর্ম্মের ভাবও অনন্ত। ঈশ্বরের কৌশলই এই, যে একটী ক্ষুদ্র কারণ কোন একটী বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করে—কোন একটী সামান্য বিষয়, কোন এক অসাধারণ ব্যাপার সম্পন্ন বিষয়ে অনুকূল হইয়া থাকে। আমারদিগের যখন প্রত্যেক মনোবৃত্তি নিদ্রিত অবস্থায় অবস্থান করে, প্রত্যেক ভাব, কলিকাবস্থায় অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে বিরাজ করিতে থাকে, তখন জগদীশ্বর জননী-ক্রোড়কেই আমারদিগের একমাত্র শিক্ষাভূমি করিয়া দেন। পরে যখন ক্রমে আমারদিগের শরীরের বলাধানের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল উন্নত ও প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন তাঁহার প্রসাদে আবার আমারদিগের জ্ঞান-বুদ্ধি সঞ্চালনের

বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। মহা মহোৎসবের সহিত ঐ বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। সে দিবস বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থানে অশোক বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল, দ্বারে পূর্ণ কুম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল এবং ধ্বজা উড্ডীন করিয়া ফ্রিমেসন সম্প্রদায়ের লোকেরা বাদ্যোদ্যম সহকারে বিদ্যালয়ের মূল প্রস্তর প্রোথিত করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাত্মা বিটন সাহেবকে উল্লিখিত বিদ্যালয় সংস্থাপন কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎপরে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বঙ্গদেশে অনেক গুলি বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। সেই অবধি আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা ক্রমশঃ প্রচলিত হইতেছে; কিন্তু যেরূপ আশা করা যায় সেরূপ ফল প্রদান করিতেছে না। বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অল্প বয়সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করাতে ততোধিক বিদ্যাবতী হইতে পারে না, ইহাতে অল্প বিদ্যার যে সকল অনিষ্ট তাহা ঘটিয়া থাকে। বালিকাবিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রীরা কেবল অলীক উপন্যাস ও কুৎসিত নাটক পাঠে সময় ক্ষেপণ করে। যে পর্য্যন্ত না অন্তঃপুর-শিক্ষা-প্রণালী বিশিষ্ট রূপে অবলম্বিত হইতেছে সে পর্য্যন্ত আমাদিগের দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিশেষ ফলোপধায়িনী হইবে এমন আশা করা যাইতে পারে না। আমরা এক্ষণে খৃষ্টান স্ত্রীলোকদিগের উপরে এই বিষয়ে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত আছি। কিন্তু আর এরূপ নিশ্চিন্ত থাকা আমাদের উচিত হয় না। কালপ্রভাবে কলিকাতা মহানগরে ও পল্লিগ্রামে কতক গুলি বয়স্কা বিদ্যাবতী হিন্দু স্ত্রী প্রস্তুত হইয়াছেন, যাঁহারা অন্তঃপুর-শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহাদিগের অবস্থা তত ভাল নয়, অতএব উল্লিখিত কার্য্য অবলম্বন করিতে তাঁহাদিগকে লওয়ান যাইতে পারে। অন্তঃপুর-বাসিনীদিগকে কি প্রকারে শিক্ষা দেওয়া উচিত তাহা তাঁহাদিগকে প্রথমে বলিয়া দিয়া উল্লিখিত শিক্ষা কার্য্যে তাঁহাদিগকে প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসুর প্রস্তাবিত শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় এ বিষয়ের কত দূর উপযোগি হইবে তাহা আমরা বলিতে পারি না। যে পর্য্যন্ত না তাঁহার প্রস্তাবিত প্রণালী আমরা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হই সে পর্য্যন্ত আমরা তদ্বিষয়ে কোন মতামত প্রদান করিতে পারি না। যাঁহারা অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে শিক্ষা দিতে নিযুক্ত হইবেন তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য যে অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্ন লিখিত চারিটি বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে রামায়ণ ও মহাভারত ভাল করিয়া অধ্যয়ন করাইবেন। দ্বিতীয়তঃ, আলঙ্কারিক শিল্প অপেক্ষা উপকারী শিল্প অধিক শিক্ষা করাইবেন। তৃতীয়তঃ, সূপ শাস্ত্রে শিক্ষা প্রদান করিবেন। চতুর্থতঃ, গার্হস্থ্য চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষা প্রদান করিবেন।

আমাদিগের মতে রামায়ণ ও মহাভারত যেরূপ উন্নত নীতি শিক্ষা প্রদান করে, বোধ হয়, পৃথিবীতে এমন অল্প পুস্তক আছে যাহা ঐরূপ করে। কেহ কেহ এই আপত্তি করিবেন যে ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিলে মনে কুসংস্কারের সঞ্চার হইতে পারে কিন্তু এ আশঙ্কা অমূলক। যেরূপ কাল পড়িয়াছে তাহাতে উল্লিখিত কুসংস্কার সঞ্চারের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণকার গৃহস্থ লোকের স্ত্রীরা কার্পেট বুনিতে অধিক মনোযোগী, কন্থা সীবন অপমানের কার্য্য জ্ঞান করে, কিন্তু এরূপ হওয়া উচিত নহে। আমাদিগের স্মরণ হয় যে বাল্য কালে ভদ্র রমণীরা প্রতিবাসীর বাটীতে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে পাক করিতে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিত, কিন্তু এক্ষণে সে কাল বিগত হইয়াছে। এক্ষণে স্বামীর আয় অতি অল্প হইলেও তিনি সর্ব্বাগ্রে আপন সীমন্তিনীর মনোরক্ষার জন্য পাচক অথবা পাচিকার অন্বেষণ করেন। পাকক্রিয়ার প্রতি গৃহস্থের রমণীদিগের অবজ্ঞা শোচনীয় বলিতে হইবে। গৃহস্থ রমণীদিগের পাক-বিদ্যা যেমন জানা কর্ত্তব্য তেমনি গার্হস্থ্য চিকিৎসা বিদ্যা জানাও কর্ত্তব্য। যাহাদিগের আয় সঙ্কীর্ণ তাহাদিগের শিশু সন্তানের সামান্য বালসা হইলে ডাক্তারকে ডাকিতে হয় ইহা বিলাতি সভ্যতার উদ্ভাবিত সহস্র বিড়ম্বনার মধ্যে একটি বিশেষ বিড়ম্বনা বলিতে হইবে। পূর্ব্বকালের গৃহিনীরা সামান্য সামান্য দেশীয় ঔষধ দ্বারা ছেলেদিগের পীড়ার যেরূপ আরোগ্য সাধন করিতেন ডাক্তারেরা সেরূপ পারে না। ছেলেদিগের ধাতুর পক্ষে ঐ সকল ঔষধ যেমন উপযুক্ত এমন বিদেশীয় তীব্র ঔষধ নহে। এক্ষণে পল্লিগ্রামে যে সকল গৃহিণীরা ঐ সকল ঔষধ জানেন তাঁহাদিগের নিকট হইতে তাহা শিক্ষা করিয়া এবং ইংরাজি গ্রন্থে এই বিষয়ে যাহা পাওয়া যায় তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া "গার্হস্থ্য চিকিৎসা বিদ্যা" নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। ইংরাজি গ্রন্থে এ বিষয়ে যাহা পাওয়া যায় তাহা এ দেশের প্রকৃতির সঙ্গে মিলাইয়া লওয়া উচিত। উল্লিখিত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া অন্তঃপুর-শিক্ষয়িত্রীরা অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে গার্হস্থ্য চিকিৎসা বিদ্যা বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিবেন।

গৃহকর্ম্ম হইতে উদ্ধৃত।

ভ্রাতা ভগিনী।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃ-তুল্য মর্য্যাদা করিবে। নিয়ত জ্যেষ্ঠের অনুগত হইয়া থাকিবে। জ্যেষ্ঠও কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীকে সন্তান নির্ব্বিশেষ স্নেহ মমতা করিবেন। তাহারা তাঁহার নিকটে সহস্র অপরাধ করিলেও তাহাতে বিশেষ উত্ত্যক্ত না হইয়া মৃদু-মধুর উপদেশ দ্বারা তাহাদিগের চরিত্র শোধন করিবেন। ভ্রাতা ভগিনীতে যে পরস্পর সদ্ভাব ও সদালাপ থাকে, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। ভ্রাতা ভগিনীতে এক গৃহে এক জননীর উদরে জন্ম গ্রহণ করে, এক প্রকার পিতৃ-স্নেহেই লালিত পালিত হয়। জননীর এক ক্রোড়-প্রাঙ্গনেই উভয়ে ক্রীড়া কৌতুকে বর্দ্ধিত ও উন্নত হইয়া থাকে। ইহারদিগের মধ্যে পরস্পর প্রীতিভাব সন্দর্শন করা তো সকলেরই প্রার্থনীয়।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কত গৃহে ঘটনাক্রমে ভ্রাতৃ-বিরোধরূপ দুর্নিবার অনল প্রজ্বলিত হইয়া সেই সেই পরিবারের সৌভাগ্য-তরুকে এক কালে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতেছে। কত ভ্রাতা ভগিনী আপন আপন সঞ্চিত জ্ঞান-ধন তাহাতে আহুতি দিয়া আজন্মের মত দারিদ্র্য-ব্রত অবলম্বন করিতেছে। নিতান্ত হতভাগ্য না হইলে আর কেহ ভ্রাতৃভাবে বঞ্চিত হয় না।

মাতৃ-ক্রোড়কেই পরমেশ্বর আমারদিগের ভ্রাতৃভাব শিক্ষা করিবার একমাত্র স্থান অবধারিত করিয়া দিয়াছেন। আমরা পরিবারের মধ্যগত হইয়া ভ্রাতৃভাব উপার্জ্জন করি, পরস্পর পরস্পরের হিতসাধনে নিযুক্ত এবং পরস্পরের উপভোগ্য সুখকে দ্বিগুণীভূত করি, উপস্থিত দুঃখ-ভার পরস্পর বণ্টন করিয়া গ্রহণ করত তাহার তীব্রতাকে মন্দীভূত করত মনের আনন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করি, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যগত থাকিয়া অল্পে অল্পে প্রীতি ও সদ্ভাবে আমরা উন্নত হই, পরে সেই ভ্রাতৃভাব ক্রমে জনসমাজে বিস্তার করি ইহাই প্রকৃত ধর্ম্মের অনুমোদিত।

আজন্মকাল এক জননীগর্ভজাত ভ্রাতা ভগিনীর সহিত একত্র ভোজন উপবেশন, একত্র জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াও যদি তাহাদিগের সহিত একহৃদয় হইয়া জীবন যাপন করিতে না পারি, পরস্পরের প্রতি পরস্পর প্রীতি ও সদ্ভাব রক্ষা করিতে সমর্থ না হই, তবে জগদীশ্বরের বিশাল সংসার রাজ্যের নানা দেশীয় বিভিন্নপ্রকৃতি জনগণকে কেমন করিয়া ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিব—কেমন করিয়াই বা তাহারদিগের জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতিসাধন জন্য ধন প্রাণ সমর্পণ করিতে সমর্থ হইব।

আমরা সামাজিক জীব, আমারদিগের আশা অধিকার সকলই বিস্তৃত। আমারদিগের কর্ত্তব্যের ভাব, ধর্ম্মের ভাবও অনন্ত। ঈশ্বরের কৌশলই এই, যে একটী ক্ষুদ্র কারণ কোন একটী বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করে—কোন একটী সামান্য বিষয়, কোন এক অসাধারণ ব্যাপার সম্পন্ন বিষয়ে অনুকূল হইয়া থাকে। আমারদিগের যখন প্রত্যেক মনোবৃত্তি নিদ্রিত অবস্থায় অবস্থান করে, প্রত্যেক ভাব, কলিকাবস্থায় অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে বিরাজ করিতে থাকে, তখন জগদীশ্বর জননী-ক্রোড়কেই আমারদিগের একমাত্র শিক্ষাভূমি করিয়া দেন। পরে যখন ক্রমে আমারদিগের শরীরের বলাধানের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল উন্নত ও প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন তাঁহার প্রসাদে আবার আমারদিগের জ্ঞান-বুদ্ধি সঞ্চালনের

প্রশস্ত ক্ষেত্রও লাভ করিয়া থাকি। তদবধি পিতার আলয় পিতার পরিবারই আমাদিগের প্রীতি ভক্তি কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি প্রত্যেক বৃত্তিকেই সতেজ করিতে আরম্ভ করে।

সেই অসহায় অবস্থাতে যে ভ্রাতার মুখশ্রী সন্দর্শন করিয়া আমাদিগের নয়নযুগল স্ফূর্ত্তি লাভ করে, যে ভগিনীর সস্নেহ মধুর বাক্য আমাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুখ সাধন করিয়া থাকে, যাঁহারা আমাদিগের বাল্য জীবনের সর্ব্বস্ব, বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহাদিগের প্রতি উদাসীন হওয়া সামান্য বিড়ম্বনার কার্য্য নহে।

ভ্রাতৃভাব শিক্ষা করিব বলিয়াই জগদীশ্বর আমারদিগকে জনশূন্য তৃণবর্জ্জিত মরুভূমিতে নিক্ষেপ না করিয়া জন-সমাজে এক এক পরিবারের মধ্যেই আমারদিগকে অর্পণ করিয়াছেন। আমরা যদি স্বার্থানুরোধে সেই জনপূর্ণ স্থানকেও মরুভূমি করিয়া তুলি, সেই ভ্রাতা ভগনীদিগের মধ্যেও বিরহানল প্রজ্বলিত করিয়া দিই, তাহাতে আমারদেরই অনিষ্ট। আমরাই সংসারের সুখ-সম্পদ্ হইতে পরিভ্রষ্ট হই—আমরাই সংসারের অপূর্ব্ব সুখমাধুরী কিছুই উপভোগ করিতে না পারিয়া অতি দীন ভাবে জীবন কাল অতিবাহিত করিতে থাকি।

অতএব ঈশ্বরের সুখ-রাজ্যে—মঙ্গল-রাজ্যে এমন অমঙ্গল-স্রোত প্রবাহিত করা বুদ্ধি-জীবি মনুষ্যের কার্য্য নহে। ভ্রাতৃ-বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া পরিবারগণকে দুঃখ-দাবানলে দগ্ধীভূত করা জ্ঞান-ধর্ম্মাধিকারী মানবের কর্ত্তব্য নহে।

তোমরা ক্ষমাকে হৃদয়ের ভূষণ, শান্তিকে চির সহচর করিয়া ধর্ম্মের আদেশে সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে। সংসারের হিতসাধন, ভ্রাতা ভগিনীর সুখ সম্পাদন বিষয়ে যত্নশীল থাকিয়া সংসার-আশ্রমের গৌরব রক্ষা করিবে। এইরূপে যদি তোমরা ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট থাকিতে শিক্ষা কর, নিত্য প্রীতি করিতে অভ্যাস কর, তাহা হইলে সংসারে তোমাদের প্রীতিস্রোত অতি সহজেই প্রবাহিত হইবে। লোক-সমাজে তোমাদের ভ্রাতৃভাব শীঘ্রই বিস্তৃত হইবে। নতুবা যে ব্যক্তি গৃহ-প্রাঙ্গনে এক পাদও গমন করিতে পারে না, সে কেমন করিয়া দুরারোহ উন্নত পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিবে। যার আপনার গৃহ চির অন্ধকারে পরিপূর্ণ, সে অন্যের প্রদীপ কেমন করিয়া প্রজ্বলিত করিয়া দিবে। অতএব তোমরা এই সময় হইতেই ভ্রাতৃভাব শিক্ষা কর। প্রাণপণে পরস্পর ভ্রাতা ভগিনী গুলির মঙ্গল চেষ্টায় নিযুক্ত থাক। তাহা হইলে ক্রমে তোমাদিগের সেই সাধু ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া সংসারক্ষেত্রকে প্লাবিত করিবে—তোমাদের প্রীতিভাব সকল হৃদয়কে মধুময় করিবে!

আয় ব্যয়।

চৈত্র ১৭৯৭ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	২ ৮ ৩ ৶১৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৩ ৭ ৩ /১৫
সমষ্টি	৬ ৫ ৬ ।/১০
ব্যয়	২ ৩ ৬ । ১০
স্থিত	৪ ২ ০ /০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	১ ১ ২ ।/১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৯ ০
পুস্তকালয়	৯ ।৶০
যন্ত্রালয়	৬ ৪ ॥৶ ৫
গচ্ছিত	৬ ৮০
সমষ্টি	২ ৮ ৩ ৶১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৬ ০ ।৶১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৮ ৩ ॥/১০
পুস্তকালয়	১ ৪ /০
যন্ত্রালয়	৫ ২ ৶১০
গচ্ছিত ...	২ ৬
সমষ্টি	২ ৩ ৬ ।১০

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২ ০
" প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর মধ্য হইতে ...	১ ৭
" আশুতোষ মল্লিক ...	১ ০
" হরিমোহন নন্দী ...	১ ০
" শিবচন্দ্র নন্দী ...	১ ০
" আশুতোষ ধর ...	৫
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাতুরেঘাটা)	৪
" ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	৪
" শ্রীনাথ মিত্র ...	৩
" নিত্যানন্দ চট্টোপাধ্যায় ...	২
" দয়ালচাঁদ শিরোমণি ..	২
" লক্ষ্মীনারায়ণ বসু ..	২
" মণিলাল মল্লিক ...	২
" নৃপালচন্দ্র মল্লিক ...	১
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন ...	১
" গোপাল চন্দ্র মল্লিক ...	১
" উমাচরণ মল্লিক ...	১
	৯ ৫

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর ...	১ ০

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজারাম মুখোপাধ্যায়	১
দানাধারে প্রাপ্ত	১ । ১০
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	৫ /০
	১ ১ ২ ।/১০

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২ জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতঃকালে ৭ ঘণ্টার সময় মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

ভ্রমসংশোধন।

শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের শুভকর্ম্মের দান দুই টাকা গত মাসের পত্রিকায় ভ্রমক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু নৃপালচন্দ্র মল্লিকের নামে প্রাপ্তি স্বীকার করা হইয়াছে।

Registered No 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
আষাঢ় ১৭৯৮ শক।

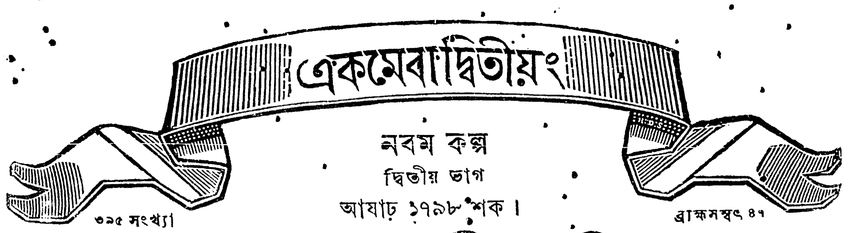

৩৯৫ সংখ্যা। ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৭

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

উপদেশ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

২ মাঘ ১৭৯৭ শক।

হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তোযএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

"ইনি হৃদগত সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন॥"

অনেকে অনেক প্রকার তর্কবিতর্ক ও যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপ প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন। সময়ে সময়ে এই আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সহজজ্ঞান-লব্ধ মূল সত্য প্রতিপাদনার্থে কত প্রকার বাগ্‌বিতণ্ডা ও কলহ উপস্থিত হইয়াছে; তাহাতে যদিও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সর্ব্বব্যাপিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহার পরম মঙ্গল-স্বরূপ ও পূর্ণ প্রীতির ভাব তদ্দ্বারা কোন মতেই উপলব্ধ হয় নাই। তিনি সকলের স্রষ্টা ও পাতা এবং তিনি দেশেতে অনন্ত কালেতে অনন্ত ও শক্তিতে অনন্ত, এই কথা যদিও যুক্তি ও তর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়; কিন্তু তিনি যে সর্ব্বমঙ্গল-স্বরূপ আমাদিগের নেতা, তিনি যে আমাদিগের অন্তরের প্রিয়তম ধন, তিনি যে জননী অপেক্ষা অনন্ত গুণ স্নেহ সহকারে আমাদিগকে পালন করিতেছেন, তিনি যে আমাদিগের চির জীবনের সুহৃৎ, তাঁহার সমান আমাদিগের আপনার যে আর কেহই নাই, আমাদিগের সমুদয় প্রীতি প্রাণ মন আত্মা সমস্ত যে তাঁহাতেই অর্পণ করা আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, কেবল তর্ক বা যুক্তি দ্বারা তাহা কোন মতেই আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না; এবং তাহার আবশ্যকতা সম্যক রূপে প্রতিপন্ন হইলেও তদ্দ্বারা প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান কখনই জন্মে না। শুষ্ক নীরস ঈশ্বরজ্ঞানে আত্মা পরিতৃপ্ত হয় না, কিন্তু যুক্তি বা তর্কজনিত যে ঈশ্বরজ্ঞান তাহা শুষ্ক ও নীরস ভিন্ন কখন মধুর হইতে পারে না। পরিমিত মানব বুদ্ধি কেবল বুদ্ধিবলে বাক্যমনের অগোচর সর্ব্বমঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হয় না; অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে সর্ব্বক্ষণ আত্মার অন্তরতম প্রদেশে বিরাজিত দেখিয়া অহরহ তাঁহার পূর্ণ প্রীতি সম্ভোগে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। তবে প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান কিসে হয়, কি উপায়ের দ্বারা আমরা তাঁহার পূর্ণ

প্রীতি ও মঙ্গলভাব সম্যক রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই, কোন্ পথ অবলম্বন করিলে আমরা নিয়ত সেই করুণাময়ের সন্নিধানে উপস্থিত থাকিতে পারি, কি রূপে তিনি প্রকাশিত হয়েন? তাহার উত্তরে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন "হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো যঃ" "ইনি হৃদ্গত সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন"। যদি কেবল যুক্তি ও তর্কই ঈশ্বরলাভের প্রধান উপায় হইত, যদি বিদ্যার আলোচনা বা বুদ্ধির পরিমার্জ্জনা ঈশ্বরজ্ঞানের একমাত্র সোপান হইত, তাহা হইলে পবিত্র ঈশ্বরজ্ঞান কেবল বিদ্বান ও বুদ্ধিমানেরই সাধ্যায়ত্ত থাকিত, করুণাময় পরমেশ্বর কেবল জ্ঞানীর ঈশ্বর হইতেন, বিদ্যাবিহীন ব্যক্তিরা পরম পিতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চির দিন তাঁহার অপার করুণা ও পূর্ণপ্রীতি সম্ভোগে বঞ্চিত থাকিত। কিন্তু করুণানিধান পরমেশ্বর যেমন কোন পদার্থকেই কেবল লোকবিশেষের জন্য সৃষ্টি করেন নাই; তাঁহার সূর্য্য যেমন জ্ঞানী অজ্ঞান, ধনী নির্ধন সকলেরই নিমিত্ত সমান রূপে প্রকাশিত হয়, তাহার আলোক সম্ভোগে যেমন সকল ব্যক্তিই সমান রূপে অধিকারী; ঈশ্বরের জ্যোতিও সেইরূপ সকলেরই নিমিত্ত; জ্ঞানীর নিমিত্ত এক প্রকার, জ্ঞানহীনের নিমিত্ত অন্য প্রকার নহে। সকলেরই যেরূপ চক্ষু আছে, এবং চক্ষু উন্মীলন করিলে সকলেই সূর্য্যের আলোক দৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়েন, ঈশ্বরকে জানিবার শক্তি ব্রহ্মজ্ঞাপক চক্ষুও সেইরূপ সকলেরই আত্মাতে নিহিত আছে; এবং সেই চক্ষু উন্মীলন করিলেই পরম ব্রহ্মকে আত্মাতে ও সর্ব্বত্র প্রকাশিত দেখা যায়। কিন্তু যেমন চক্ষু সত্তেও নিমীলিত নয়ন সূর্য্যের আলোক অনুভব করিতে সক্ষম হয় না; সংশয়াপন্ন মোহমুগ্ধ আত্মাও সেইরূপ ঈশ্বরজ্যোতি অবলোকনে বঞ্চিত থাকে। এই নিমিত্ত প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য "হৃদ্গত সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা" ঈশ্বরকে দৃষ্টি করা আবশ্যক। এই সংশয়-রহিত বুদ্ধি সকলেরই হৃদ্গত, পদ্মিনীর ন্যায় অপরিস্ফুট ভাবে অথচ বিকাশোন্মুখী হইয়া সকল আত্মাতেই নিহিত আছে। সংশয়-কুজ্ঝটিকা দ্বারা হৃদয়াকাশ তমসাচ্ছন্ন হইলে সেই হৃদ্গত কলিকা ম্রিয়মাণ হয়, নতুবা ঈশ্বরালোকে প্রস্ফুটিত হইয়া কল্পান্তস্থায়ী স্ফূর্ত্তি লাভ করে। এই সংশয়-রহিত বুদ্ধি কি? ঈশ্বরে অটল শ্রদ্ধাই সেই সংশয়রহিত বুদ্ধি; এই স্বর্গীয় শ্রদ্ধার প্রভাবেই আমাদিগের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত এবং অপ্রত্যক্ষ পদার্থ সমূহ প্রত্যক্ষবৎ পরিলক্ষিত হয়। শ্রদ্ধাবিহীন আত্মা চক্ষুহীন দেহ অপেক্ষা অশেষ গুণে শোচনীয়। চক্ষু না থাকিলে প্রকৃতির মনোহর কান্তি ও নিরুপম বাহ্য সৌন্দর্য্য অবলোকনে অসমর্থ হই, কিন্তু শ্রদ্ধা না থাকিলে আমরা ঈশ্বরের পূর্ণ মঙ্গলভাব ও অপার করুণা অনুভবে অক্ষম এবং পবিত্র শান্তি উপভোগে পরাঙ্মুখ হই। যাঁহার চক্ষু নাই তিনি কেবল পরিমিত কালের নিমিত্ত পরিমিত সুখে বঞ্চিত, কিন্তু যাঁহার শ্রদ্ধা নাই তিনি অনন্ত কালের নিমিত্ত অনন্ত সুখে বঞ্চিত। চক্ষু কেবল ইহ লোকের, শ্রদ্ধা উভয় লোকের। শ্রদ্ধা না থাকিলে আমাদিগের জীবনের প্রকৃত সারভাগ কিছুই থাকে না। শ্রদ্ধাহীন আত্মা প্রাণশূন্য দেহ অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর। শ্রদ্ধা না থাকিলে আমরা ঈশ্বরকে জানিতে পারি না, কাজেই জীবনের জীবন হইতে বঞ্চিত হইয়া মৃত্যুমুখে গমন করি। পবিত্র শ্রদ্ধাকে হৃদয়ে ধারণ করিলে, শ্রদ্ধা-নেত্রে করুণাময়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে, সংশয়রহিত বুদ্ধি দ্বারা বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্বকৌশল এবং তাঁহার পরম মঙ্গল স্বরূপ চিন্তা

করিলে সেই করুণাময় আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হয়েন। তখন ঈশ্বরজ্যোতিতে আত্মা আলোকিত হইয়া সংসারের মলিনতা ও পাপের কুটিলতা নির্ব্বাচনে সমর্থ হয়, এবং আমরা করুণাময় পিতার সাক্ষাৎকার লাভে আত্মার দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হইয়া বিগতশোক হই, এবং বিমল শান্তিচ্ছায়া লাভে তাপিত আত্মাকে শীতল করত অসীম আনন্দ উপভোগ করি। করুণাময় পরমেশ্বরই আত্মার প্রকৃত জীবন, কেবল মাত্র ঈশ্বরজ্ঞানই আত্মাকে মহাবিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারে। যতক্ষণ আমরা ঈশ্বরসন্নিধানে থাকি, যতক্ষণ সেই বিশ্ববিধাতাকে হৃদয়ে ধারণ করি, যতক্ষণ তাঁহাকে প্রীতি করি এবং তাঁহার প্রসাদে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে রত থাকি ততক্ষণই আমরা প্রকৃত শ্রদ্ধাবান। এই প্রকৃত শ্রদ্ধা যাঁহাদিগের আছে, জীবন্ত জাগ্রত শ্রদ্ধা যাঁহাদিগের মনে স্থান পাইয়াছে; অনন্ত জীবনের লক্ষ্য পরাৎপর পরমেশ্বরকে যাঁহারা সর্ব্বদা সম্মুখে রাখেন, তাঁহারাই প্রকৃত রূপে অমৃতের অধিকারী; তাঁহারাই অমর। "যাঁহারা ইঁহাকে জানেন তাঁহারা অমর হয়েন।" অতএব যাহাতে আমরা প্রকৃত শ্রদ্ধাবান হইতে পারি, যাহাতে সকল সময়ে সকল অবস্থাতে করুণাময় ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি এবং সর্ব্বক্ষণ অবিচ্ছেদে তাঁহার পূজায় ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে রত থাকিতে পারি, সেই নিমিত্ত যেন দৃঢ়ব্রত হই। যেন আমাদের সমুদায় কার্য্য প্রকৃত শ্রদ্ধাবানের কার্য্যের ন্যায় সকল সময়ে সকল অবস্থাতে ঈশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়। যেন আমাদের কার্য্যের নিমিত্ত আমাদিগকে শ্রদ্ধাহীন বলিয়া পরিগণিত হইতে না হয়। ঈশ্বর আমাদিগের নেতা, বিধাতা ও এক মাত্র আশ্রয়; তিনি আমাদিগের অনন্যগতি মুক্তিদাতা ও এক মাত্র অবলম্বন, যেন এই সত্য অহরহ আমাদিগের হৃদয়ে জাগরূক থাকে, এবং কি সম্পদে কি বিপদে, কি সাগরে অরণ্যে বা জনপদে যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থাতেই অবস্থিত হই না কেন, যেন কিছুতেই আমরা ঈশ্বরকে না ভুলি, আমাদিগের পরম ধনকে উপেক্ষা না করি। যাহাতে প্রকৃত রূপে অমৃতের অধিকারী হইতে পারি, যাহাতে আমাদিগের স্বভাব বা কার্য্যদোষে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম কলঙ্কস্পৃষ্ট না হয়; যাহাতে আমরা প্রকৃত শ্রদ্ধাবান ও ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত হইতে পারি, কায়মনোবাক্যে যেন সকল সময়ে সকল অবস্থাতে তজ্জন্য সচেষ্ট থাকি। ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! সাবধানে যেন সংসারের প্রলোভন ধনতৃষা বিষয়লালসা বা পাপের আপাতমনোরম চিত্তপ্রলোভকর মূর্ত্তি আমাদিগকে আমাদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতে—আমাদিগের অনন্ত জীবনের লক্ষ্য হইতে—মনকে বিচলিত করিতে না পারে। দিগ্‌দর্শনের শলাকার ন্যায় আমাদিগের দৃষ্টি সকল সময়ে সকল অবস্থাতে যেন ঈশ্বরের দিকে স্থির থাকে, এবং আমাদিগের সর্ব্ব প্রকার চিন্তা বা কার্য্য যেন ঈশ্বর-ভাবে পূর্ণ হয়।

প্রার্থনা ও ব্রহ্মদর্শন।

(শ্যামবাজার ত্রয়োদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে পঠিত)

পরমেশ্বর সকল প্রাণীর শরীরে ও সকল প্রাণীরই জীবাত্মার মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞ ও সখারূপে বিরাজমান আছেন, কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করিবার অধিকার তিনি কেবল মানবকেই দিয়াছেন এবং স্বয়ং দর্শন দিবার নিমিত্তে মানবের আত্মাতে উপস্থিত আছেন। কিন্তু যেমন তৃষ্ণাব্যতীত জল ভাল লাগে না, সেইরূপ প্রার্থনা ব্যতীত তাঁহার দর্শন লাভ করা

প্রীতি ও মঙ্গলভাব সম্যক রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই, কোন্ পথ অবলম্বন করিলে আমরা নিয়ত সেই করুণাময়ের সন্নিধানে উপস্থিত থাকিতে পারি, কি রূপে তিনি প্রকাশিত হয়েন? তাহার উত্তরে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন "হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো যঃ" "ইনি হৃদ্গত সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন"। যদি কেবল যুক্তি ও তর্কই ঈশ্বরলাভের প্রধান উপায় হইত, যদি বিদ্যার আলোচনা বা বুদ্ধির পরিমার্জ্জনা ঈশ্বরজ্ঞানের একমাত্র সোপান হইত, তাহা হইলে পবিত্র ঈশ্বরজ্ঞান কেবল বিদ্বান ও বুদ্ধিমানেরই সাধ্যায়ত্ত থাকিত, করুণাময় পরমেশ্বর কেবল জ্ঞানীর ঈশ্বর হইতেন, বিদ্যাবিহীন ব্যক্তিরা পরম পিতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চির দিন তাঁহার অপার করুণা ও পূর্ণপ্রীতি সম্ভোগে বঞ্চিত থাকিত। কিন্তু করুণানিধান পরমেশ্বর যেমন কোন পদার্থকেই কেবল লোকবিশেষের জন্য সৃষ্টি করেন নাই; তাঁহার সূর্য্য যেমন জ্ঞানী অজ্ঞান, ধনী নির্ধন সকলেরই নিমিত্ত সমান রূপে প্রকাশিত হয়, তাহার আলোক সম্ভোগে যেমন সকল ব্যক্তিই সমান রূপে অধিকারী; ঈশ্বরের জ্যোতিও সেইরূপ সকলেরই নিমিত্ত; জ্ঞানীর নিমিত্ত এক প্রকার, জ্ঞানহীনের নিমিত্ত অন্য প্রকার নহে। সকলেরই যেরূপ চক্ষু আছে, এবং চক্ষু উন্মীলন করিলে সকলেই সূর্য্যের আলোক দৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়েন, ঈশ্বরকে জানিবার শক্তি ব্রহ্মজ্ঞাপক চক্ষুও সেইরূপ সকলেরই আত্মাতে নিহিত আছে; এবং সেই চক্ষু উন্মীলন করিলেই পরম ব্রহ্মকে আত্মাতে ও সর্ব্বত্র প্রকাশিত দেখা যায়। কিন্তু যেমন চক্ষু সত্তেও নিমীলিত নয়ন সূর্য্যের আলোক অনুভব করিতে সক্ষম হয় না; সংশয়াপন্ন মোহমুগ্ধ আত্মাও সেইরূপ ঈশ্বরজ্যোতি অবলোকনে বঞ্চিত থাকে। এই নিমিত্ত প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য "হৃদ্গত সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা" ঈশ্বরকে দৃষ্টি করা আবশ্যক। এই সংশয়-রহিত বুদ্ধি সকলেরই হৃদ্গত, পদ্মিনীর ন্যায় অপরিস্ফুট ভাবে অথচ বিকাশোন্মুখী হইয়া সকল আত্মাতেই নিহিত আছে। সংশয়-কুজ্ঝটিকা দ্বারা হৃদয়াকাশ তমসাচ্ছন্ন হইলে সেই হৃদ্গত কলিকা ম্রিয়মাণ হয়, নতুবা ঈশ্বরালোকে প্রস্ফুটিত হইয়া কল্পান্তস্থায়ী স্ফূর্ত্তি লাভ করে। এই সংশয়-রহিত বুদ্ধি কি? ঈশ্বরে অটল শ্রদ্ধাই সেই সংশয়রহিত বুদ্ধি; এই স্বর্গীয় শ্রদ্ধার প্রভাবেই আমাদিগের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত এবং অপ্রত্যক্ষ পদার্থ সমূহ প্রত্যক্ষবৎ পরিলক্ষিত হয়। শ্রদ্ধাবিহীন আত্মা চক্ষুহীন দেহ অপেক্ষা অশেষ গুণে শোচনীয়। চক্ষু না থাকিলে প্রকৃতির মনোহর কান্তি ও নিরুপম বাহ্য সৌন্দর্য্য অবলোকনে অসমর্থ হই, কিন্তু শ্রদ্ধা না থাকিলে আমরা ঈশ্বরের পূর্ণ মঙ্গলভাব ও অপার করুণা অনুভবে অক্ষম এবং পবিত্র শান্তি উপভোগে পরাঙ্মুখ হই। যাঁহার চক্ষু নাই তিনি কেবল পরিমিত কালের নিমিত্ত পরিমিত সুখে বঞ্চিত, কিন্তু যাঁহার শ্রদ্ধা নাই তিনি অনন্ত কালের নিমিত্ত অনন্ত সুখে বঞ্চিত। চক্ষু কেবল ইহ লোকের, শ্রদ্ধা উভয় লোকের। শ্রদ্ধা না থাকিলে আমাদিগের জীবনের প্রকৃত সারভাগ কিছুই থাকে না। শ্রদ্ধাহীন আত্মা প্রাণশূন্য দেহ অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর। শ্রদ্ধা না থাকিলে আমরা ঈশ্বরকে জানিতে পারি না, কাজেই জীবনের জীবন হইতে বঞ্চিত হইয়া মৃত্যুমুখে গমন করি। পবিত্র শ্রদ্ধাকে হৃদয়ে ধারণ করিলে, শ্রদ্ধা-নেত্রে করুণাময়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে, সংশয়রহিত বুদ্ধি দ্বারা বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্বকৌশল এবং তাঁহার পরম মঙ্গল স্বরূপ চিন্তা

করিলে সেই করুণাময় আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হয়েন। তখন ঈশ্বরজ্যোতিতে আত্মা আলোকিত হইয়া সংসারের মলিনতা ও পাপের কুটিলতা নির্ব্বাচনে সমর্থ হয়, এবং আমরা করুণাময় পিতার সাক্ষাৎকার লাভে আত্মার দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হইয়া বিগতশোক হই, এবং বিমল শান্তিচ্ছায়া লাভে তাপিত আত্মাকে শীতল করত অসীম আনন্দ উপভোগ করি। করুণাময় পরমেশ্বরই আত্মার প্রকৃত জীবন, কেবল মাত্র ঈশ্বরজ্ঞানই আত্মাকে মহাবিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারে। যতক্ষণ আমরা ঈশ্বরসন্নিধানে থাকি, যতক্ষণ সেই বিশ্ববিধাতাকে হৃদয়ে ধারণ করি, যতক্ষণ তাঁহাকে প্রীতি করি এবং তাঁহার প্রসাদে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে রত থাকি ততক্ষণই আমরা প্রকৃত শ্রদ্ধাবান। এই প্রকৃত শ্রদ্ধা যাঁহাদিগের আছে, জীবন্ত জাগ্রত শ্রদ্ধা যাঁহাদিগের মনে স্থান পাইয়াছে; অনন্ত জীবনের লক্ষ্য পরাৎপর পরমেশ্বরকে যাঁহারা সর্ব্বদা সম্মুখে রাখেন, তাঁহারাই প্রকৃত রূপে অমৃতের অধিকারী; তাঁহারাই অমর। "যাঁহারা ইঁহাকে জানেন তাঁহারা অমর হয়েন।" অতএব যাহাতে আমরা প্রকৃত শ্রদ্ধাবান হইতে পারি, যাহাতে সকল সময়ে সকল অবস্থাতে করুণাময় ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি এবং সর্ব্বক্ষণ অবিচ্ছেদে তাঁহার পূজায় ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে রত থাকিতে পারি, সেই নিমিত্ত যেন দৃঢ়ব্রত হই। যেন আমাদের সমুদায় কার্য্য প্রকৃত শ্রদ্ধাবানের কার্য্যের ন্যায় সকল সময়ে সকল অবস্থাতে ঈশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়। যেন আমাদের কার্য্যের নিমিত্ত আমাদিগকে শ্রদ্ধাহীন বলিয়া পরিগণিত হইতে না হয়। ঈশ্বর আমাদিগের নেতা, বিধাতা ও এক মাত্র আশ্রয়; তিনি আমাদিগের অনন্যগতি মুক্তিদাতা ও এক মাত্র অবলম্বন, যেন এই সত্য অহরহ আমাদিগের হৃদয়ে জাগরূক থাকে, এবং কি সম্পদে কি বিপদে, কি সাগরে অরণ্যে বা জনপদে যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থাতেই অবস্থিত হই না কেন, যেন কিছুতেই আমরা ঈশ্বরকে না ভুলি, আমাদিগের পরম ধনকে উপেক্ষা না করি। যাহাতে প্রকৃত রূপে অমৃতের অধিকারী হইতে পারি, যাহাতে আমাদিগের স্বভাব বা কার্য্যদোষে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম কলঙ্কস্পৃষ্ট না হয়; যাহাতে আমরা প্রকৃত শ্রদ্ধাবান ও ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত হইতে পারি, কায়মনোবাক্যে যেন সকল সময়ে সকল অবস্থাতে তজ্জন্য সচেষ্ট থাকি। ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! সাবধানে যেন সংসারের প্রলোভন ধনতৃষা বিষয়লালসা বা পাপের আপাতমনোরম চিত্তপ্রলোভকর মূর্ত্তি আমাদিগকে আমাদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতে—আমাদিগের অনন্ত জীবনের লক্ষ্য হইতে—মনকে বিচলিত করিতে না পারে। দিগ্‌দর্শনের শলাকার ন্যায় আমাদিগের দৃষ্টি সকল সময়ে সকল অবস্থাতে যেন ঈশ্বরের দিকে স্থির থাকে, এবং আমাদিগের সর্ব্ব প্রকার চিন্তা বা কার্য্য যেন ঈশ্বর-ভাবে পূর্ণ হয়।

প্রার্থনা ও ব্রহ্মদর্শন।

(শ্যামবাজার ত্রয়োদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে পঠিত)

পরমেশ্বর সকল প্রাণীর শরীরে ও সকল প্রাণীরই জীবাত্মার মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞ ও সখারূপে বিরাজমান আছেন, কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করিবার অধিকার তিনি কেবল মানবকেই দিয়াছেন এবং স্বয়ং দর্শন দিবার নিমিত্তে মানবের আত্মাতে উপস্থিত আছেন। কিন্তু যেমন তৃষ্ণাব্যতীত জল ভাল লাগে না, সেইরূপ প্রার্থনা ব্যতীত তাঁহার দর্শন লাভ করা

যায় না। সেই সর্ব্বলোকপিতা প্রার্থনা ব্যতীত কাহাকেও দর্শন দেন না। যদি দিতেন তবে যাহার তৃষ্ণা হয় নাই সে যেমন সুশীতল জলপূর্ণ পাত্রকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ যে তাঁহাকে চাহে না সে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিত। অতএব যিনি তাঁহাকে পিপাসাতুর হইয়া প্রার্থনা করেন তিনিই তাঁহার দর্শন লাভ করেন।" যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্।" যে সাধক সেই পরমাত্মাকে প্রার্থনা করেন তিনিই তাঁহাকে লাভ করেন। পরমাত্মা সেই সাধকের সন্নিধানে স্বীয়রূপ প্রকাশ করেন।

ফলে যাঁহাদের চিত্ত বিত্তমোহে বিমূঢ়, অথবা বিদ্যাভিমানে অন্ধ, তাঁহারা সেই ঋষিবন্দিত ও সুরসেবিত পরমাত্মার মুক্তিজনদ প্রকাশ দেখিতে পান না। তাঁহারা পরমেশ্বরকে লইয়া ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু, তাঁহার বিশ্বপূজিত চরণারবিন্দ দর্শনে তাঁহাদের মতি হয় না। কেন না, ধন সম্পৎ-লোভী সংসারাভিমানী জীব কেবল সম্পৎ ও পার্থিব সুখের নিমিত্তে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহাকে একবারও চাহেন না। তাদৃশ ফলকামনাসক্ত স্বার্থপরায়ণ জীবের চিত্ত সংসারকাননের কুটজপুষ্পরস পানেই উন্মত্ত। তিনি যদি ভগবানকে ডাকেন তবে কেবল ঐরূপ ফলার্থিত্ব চরিতার্থের নিমিত্তেই ডাকিয়া থাকেন। তাঁহার অমরবাঞ্ছিত চরণকমলবিগলিত মকরন্দ-পানপিপাসায় নহে। বিষয়সেবায় সাহায্য লাভের নিমিত্তে এইরূপ ফলকামনাসক্ত ব্যক্তিরা সময়ে সময়ে যে ভগবানকে আহ্বান করেন তাহাই ধরিয়া তাঁহারা বলিয়া থাকেন "আমরা ভগবানের উপাসক।" বাসনাজালে জড়িত জনসমাজও মনে করেন উহাঁরা ভগবানের উপাসক ও ধার্ম্মিক বটেন, কিন্তু ভাবিয়া দেখ, উহাঁরা কেবল সাংসারিক সুখের উপাসক। ভগবানকে সেই সুখের দাতা ও বিধাতা মাত্র জানিয়া ডাকিয়া থাকেন। অতএব এ প্রকার ফল কামনায় তরঙ্গাকুলিত অশান্তচিত্ত জীব ব্রহ্মদর্শনের অধিকারী নহেন। তিনি শতবর্ষ পর্য্যন্ত যদি ব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি লইয়া থাকেন তো শতবর্ষই এক জন ধর্ম্মবণিক্ থাকিয়া যাইবেন এবং ব্রহ্মকে আপনার সেই বাণিজ্যালয়ের একজন কর্ম্মচারীরূপে, ব্রহ্মজ্ঞানকে বাণিজ্যবিজ্ঞানরূপে, ব্রাহ্মধর্ম্মকে বাণিজ্যের ধর্ম্মরূপে এবং ব্রাহ্মসমাজকে তাদৃশ বাণিজ্যের উন্নতিসাধক সভা রূপে বুঝিয়া লইবেন।

সংসার-বাসনা-পাশে বদ্ধ জীবের যেমন ব্রহ্মলাভ সম্ভবে না, বিদ্যাভিমানে অন্ধ জনগণেরও পক্ষে সেইরূপ। কেননা "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন" এই পরমাত্মাকে বচনপাণ্ডিত্য, বা গ্রন্থার্থধারণাশক্তি বা বহুবক্তৃতা ও উপদেশ শ্রবণ দ্বারা লাভ করা যায় না। "যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্।" যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করেন। পরমাত্মা তাঁহার সন্নিধানে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। যাঁহারা বিদ্যাভিমানে অন্ধ তাঁহারা ব্রহ্মকে প্রার্থনা করেন না বিদ্যাকেই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সাধনার উদ্দেশ্যই বিদ্যা, ব্রহ্ম নহেন। যদিও তাঁহারা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাহা বিদ্যার দ্বারা অথবা বিদ্যাবৃদ্ধির নিমিত্ত করিয়া থাকেন। হৃদয়ের দ্বারা দর্শন লাভেচ্ছা করিয়া তাঁহার অস্তিত্বানুভব করেন না। তাঁহাদের দেহ ও মনে বিদ্যা উপার্জ্জনের যত উপায় আছে ব্রহ্মকে বুঝিবার নিমিত্তে তাঁহারা তাহাই নিযোগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিষয়াতীত পরমাত্মাকে

বিষয়বিদ্যার যোগে বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাহাতে সিদ্ধান্ত লাভ হয় না। সুতরাং তাদৃশ অনেকে মনে মনে পরমেশ্বর থাকা সন্দেহ করেন এবং অনেকে সেই সন্দেহ প্রকাশও করেন। যুক্তি, তর্ক, দর্শনবিদ্যা বা পদার্থবিজ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে স্থির করিতে পারা গেল না দেখিয়া, বিদ্যামোহে বিমোহিত জনেরা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক বিদ্যারই প্রামাণ্য স্থাপন করিয়া থাকেন। কেন না, বিদ্যার বন্ধন ছিন্ন করিয়া বিদ্যার অতীত পুরুষে তাঁহাদের চিত্ত প্রধাবিত হইতে পারে না। তাঁহারা জানেন না যে, ভগবানের প্রকাশ ইন্দ্রিয়ের তর্কের দর্শনের বা বিজ্ঞানের গোচর নহে। তাঁহারা জানেন না, কেন ঐ সকল বিদ্যাকে শাস্ত্রে অপরা বিদ্যা ও অবিদ্যা কহিয়াছেন এবং ব্রহ্মবিদ্যাকে ঋষিরা যে হৃদয়াকাশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাঁহারা তাহাও জানেন না। সুতরাং "অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ন্ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।" ঐ প্রকার অবিদ্যার অন্তরে থাকিয়া যাহারা মনে করে আমরা বড়জ্ঞানী বড়পণ্ডিত; সেই সকল মূঢ় ব্যক্তি দন্দ্রম্যমান হইয়া ভ্রমণ করে; যেমন অন্ধেরা অন্য অন্ধের দ্বারা নীয়মান হয়। ফলাভিসন্ধি বিশিষ্ট সংসারসুখাসক্ত ব্যক্তিদিগের ন্যায় এই বিদ্যাভিমানীরাও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে বঞ্চিত থাকেন।

ফলে সংসারে ঐ দুই প্রকার লোকের সংখ্যাই অধিক। কাহাকেও বিদ্যাভিমান ও ফলকামনা দুই আশ্রয় করিয়া আছে, কেহবা উহার অন্যতর কর্ত্তৃক নিগড়বদ্ধ রহিয়াছেন। যতদিন ঐ শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া জীব ভগবানকে না প্রার্থনা করিবে ততদিন তাহার মুক্তি নাই। কেন না "তস্মাৎমুক্তস্বরূপং ব্রহ্মাভিন্নং" ব্রহ্মলাভ আর মুক্তিলাভ এ দুইয়েতে স্বরূপতঃ ভেদ নাই। মুক্তি এমন কোন পদার্থ নহে যাহাকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্ররূপে ভোগ করা যাইতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মসহবাস, ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মলাভ এ সকল একই কথা। তাহারই নাম মুক্তি। কিন্তু মানবের দুর্জ্জয় সংসারবাসনা চিরদিনই মোক্ষবাসনার বাধক হইয়া আছে। অতএব সংসারবাসনা ও স্বার্থনাশ ব্যতীত ব্রহ্মদর্শনে মোক্ষলাভে ব্যাকুলতা জন্মে না। তাদৃশ ব্যাকুলতাই জীবকে প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মলাভের অধিকারী করে, সেইরূপ ব্যাকুলতাই চিত্তশুদ্ধির নামান্তর, কেন না জীব এই সংসারে অনবরত যে, বিষয়বাসনায় অথবা দেহাত্ম বা ইতরাত্ম জ্ঞানে জড়িত থাকেন চিত্ত হইতে সেই মোহপাশ তিরোহিত হওয়ার নামই চিত্তশুদ্ধি, তখন সেই বিশুদ্ধ চিত্তই ভাগবতী মতি আখ্যা পাইয়া থাকে। ব্রহ্মলাভের নিমিত্তে ব্যাকুলতাযুক্ত হৃদয়গত প্রার্থনা সেই ব্রহ্মৈকনিষ্ঠা মতির ষোড়শোপচার-বিশিষ্ট অবশ্যম্ভাবী ক্রিয়া। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা পরমাত্মা সেই শুভানুষ্ঠানের একমাত্র ফল। সংসারবাসনা চরিতার্থের নিমিত্তে যত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয় পরমেশ্বর সে সকলের ফলদাতা বটেন, কিন্তু তাঁহাকে কামনা করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত সাধক যে হৃদয় ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন সে ক্রিয়ার ফল স্বয়ং তিনিই।

সংসারাসক্ত মোহজালসমাবৃত ব্যক্তি দিবারাত্রি অর্থের ও যশের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া যে অভিলষিত ফল লাভ করেন তাহাতে তাঁহার স্থূলবিষয়ভুক্ চক্ষু কর্ণ এবং দেহ পরিতৃপ্ত হইতে পারে, অহঙ্কার চরিতার্থ হইতেও পারে। বিদ্যার উপাসক বিদ্যার পশ্চাতে পরিশ্রম করিয়া যে ফল লাভ করেন তাহাতে তাঁহার মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত অন্তঃকরণ-বৃত্তিই

উন্নতি লাভ করিতে পারে; কিন্তু দেহেন্দ্রিয়াদি স্থূল শরীরের দ্বারা আবৃত এবং মন বুদ্ধি চিত্ত অভিমান প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন যে আত্মা তাঁহার বিশুদ্ধ আনন্দ বিদ্যারূপ ব, অর্থরূপ ফলের দ্বারা সম্পাদিত হয় না। বিদ্যা ও অর্থ সংসারাবস্থায় প্রয়োজনীয় বটে কিন্তু সংসারাবস্থত বাসনাপরিমুক্ত জীবাত্মার পক্ষে ব্রহ্মই গতি। ব্রহ্মই তাঁহার কৈবল্যের অর্থাৎ মোক্ষের অভিন্ন স্বরূপ। তিনিই যথার্থ ক্রিয়াবান। তাঁহারই ক্রিয়ার যথার্থ ফল। "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।" যে ব্যক্তি পরমাত্মাতে ক্রীড়া ও পরমাত্মাতে রতি করেন তিনিই যথার্থ ক্রিয়াবান এবং ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে প্রধান। সেই ক্রিয়ার যে মোক্ষরূপ মহা ফল অর্থাৎ স্বয়ং ব্রহ্ম তাঁহাকে কেবল আত্মবিদেরাই জানেন, কেন না আত্মাতেই তাঁহাকে জানা যায়। অর্থের দ্বারা, রাজত্বের দ্বারা, ইন্দ্রত্বের দ্বারা, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, বুদ্ধিকৃত তর্ক বিতণ্ডার দ্বারা, দর্শনশাস্ত্রের দ্বারা অথবা অন্য কিছুরই দ্বারা তাঁহাকে জানা বা পাওয়া যায় না। বাসনাবিনিবৃত্ত বিশুদ্ধ ঈশ্বরার্থব্যাকুল প্রার্থনাবান্ আত্মাই তাহার মোক্ষদ বরণীয় রূপের হিরণ্ময় কোষ স্বরূপ। "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিস্কলং। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদোবিদুঃ॥ হিরণ্ময় কোষ স্বরূপ যে অভ্যন্তরবাসী জীবাত্মা তাহাই অবিদ্যাদি দোষ রজ মল বর্জ্জিত নিরবয়ব ব্রহ্মোপলব্ধির পরম স্থান। যাঁহারা দেহ প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ইত্যাদি মোহকর আবরণ ভেদ করিয়া তদতীত দেশে জীবাত্মাকে দৃষ্টি করেন তাঁহারাই আত্মবিদ্। সেই আত্মবিদ্ বিবেকী জনেরা তত্রাবির্ভূত শুদ্ধ এবং জ্যোতির প্রকাশক স্বরূপ পরমাত্মাকে আত্মার দ্বারা উপলব্ধি করেন। অতএব জীবাত্মাই বিশুদ্ধাবস্থায় তাঁহার সুধাময় অধিষ্ঠান অনুভব করে। তাহাতে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, অহঙ্কার, বিজ্ঞান, ইত্যাদির কোন কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব নাই। দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধ্যাদি কেবল সংসারাবস্থায় কার্য্যকারী হইয়া থাকে, কিন্তু অধ্যাত্মযোগে ব্রহ্মদর্শনের সময় তাহারা নিষ্পন্দ হইয়া যায়। তখন একমাত্র ভাগবতী বুদ্ধি জাগরূক থাকে। যখন জীবেতে এই শুভবুদ্ধির উদয় হয় "তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ" তখন শ্রোতব্য ও শ্রুত সমুদয় বস্তু ও অনর্থক সংবাদে বৈরাগ্য জন্মে। "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা। সমাধাবচলাবুদ্ধিস্তদাযোগমবাপ্স্যসি॥" ফল শ্রুতি জ্ঞাপক বৈদিকার্থ ও অর্থপ্রদ লৌকিকার্থ শ্রবণ দ্বারা অনবরত যে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা যখন শান্ত হইয়া সমাধিতে থাকে তখন আর বুদ্ধি বিষয়ান্তরে আকর্ষিত হয় না। কেবল সৎস্বরূপ পরমেশ্বরই নিশ্চল রূপে স্থির হয়। সে অবস্থায় অধ্যাত্মযোগের ফল স্বরূপ তাঁহাকেই লাভ হইয়া থাকে। যে বুদ্ধি বিদ্যার সংসারে প্রতিপত্তি তাহার উৎপাত স্থগিত না হইলে যেমন ব্রাহ্মী মতি উৎপন্না হয় না, সেইরূপ যে কামনা অকিঞ্চিৎকর বিষয়-ক্ষেত্রে বিচরণ করে তাহার অবসান না হইলেও ঐ মতি জন্মে না। কেন না "ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শোমলেনচ। যথোল্বেনাবৃতোগর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতং" যেরূপ ধূম অগ্নিকে, মল দর্পণকে, জরায়ু চর্ম্ম গর্ভকে আবৃত করিয়া রাখে, ঐ দুষ্পূর সংসার-বাসনাও তদ্রূপ পরমাত্মজ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। অতএব কামনাশূন্য না হইলে ব্রহ্মলাভার্থ প্রার্থনা জন্মে না। এই প্রকার প্রার্থীরা কেবল ঈশ্বরের ভক্ত। তাঁহারা ঈশ্বরবুদ্ধিবিবর্জ্জিত বিষয়ের ভক্ত নহেন। ফলতঃ এতাদৃশ ভগবদ্‌ভক্ত ধনসম্পত্তির প্রার্থনা না করিলেও তাঁহার জীবিকার নিমিত্তে ভগবান বিধান করিয়া দেন। "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং।" শাস্ত্রেতে ভগবানের উক্তিরূপে কহিয়াছেন যে অনন্যভক্ত হইয়া যে ব্যক্তি আমার উপাসনা করে, সেই নিত্যাভিযুক্ত ভক্তকে আমি ধনাদি লাভ ও ধনাদি রক্ষাবিষয়ে শক্তি প্রদান করি। তাদৃশ ভগবদ্‌ভক্ত কেবল ঈশ্বরপ্রীতির অনুকূল ব্যাপার নির্ব্বাহার্থে এবং ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে উক্ত ধন লাভ ও ধন পালন করেন মাত্র, কিন্তু বিষয়বাসনা চরিতার্থের নিমিত্তে নহে।—"আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃপ্রবিশন্তিযদ্বৎ। তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী। যেমন নানা নদীর প্রবাহ দ্বারা পরিপূর্ণ অচলপ্রতিষ্ঠ সমুদ্র মধ্যে অন্য জল সকল প্রবেশ করে, তদ্রূপ আত্মদৃষ্টিবিশিষ্ট এবং ভোগেচ্ছারহিত মুনির প্রতি বিষয় সকল ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়। কিন্তু তাহাতে উক্ত সাধক ভোগকামনাশীল হয়েন না—কেবল তাঁহার প্রার্থিত শান্তিই লাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ বিষয়বাসনা বিরহিত ব্যক্তিতে ও সংসারবাসনায় জড়িত ব্যক্তিতে বাহ্যতঃ কোন প্রভেদ নাই। বাহ্যতঃ কামনাসক্ত ব্যক্তিরও যেমন দেহ ইন্দ্রিয় আহার নিদ্রা ইত্যাদি আছে, ব্রহ্মজ্ঞানীরও সেইরূপ থাকিতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞানী স্বতন্ত্র প্রকারের অপ্রাকৃত জীব নহেন। বেদান্তশাস্ত্রে একথা স্বীকার করিয়া কহিয়াছেন যে. "প্রকৃতৌ বা নিবৃত্তৌ বা দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়াং। ন কিঞ্চিদপি বৈষম্যমস্ত্যজ্ঞানিবিবুদ্ধয়োঃ। দেহ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি ইহাদিগের প্রবৃত্তিতে বা নিবৃত্তিতে অজ্ঞানীর ও জ্ঞানীর কোন প্রভেদ নাই। কেবল বোধ বিষয়ে অর্থাৎ অভিসন্ধি বিষয়ে উহাদের মধ্যে প্রভেদ থাকে এই মাত্র। অজ্ঞানীরা বিষয়কে দৃঢ়রূপে অহঙ্কার ও আশা ভরসার সহিত ধারণ করত তাহার মায়াজালে বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরেতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন, কিন্তু জ্ঞানীরা ঈশ্বরপ্রীতি ও তৎপ্রিয়কার্য্যে যুক্ত হইয়া ব্রহ্মভিন্ন বিষয়ক্ষেত্রে উদাসীনবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। "উদাসীনবদাসীন ইতিগ্রন্থিভিদোচ্যতে" এইরূপ সমস্ত কর্ম্মে তাঁহাদের যে আন্তরিক উদাসীনবৎ ব্যবহার এবং ঈশ্বরে নির্ভর, তাহাকেই হৃদয়গ্রন্থির বিনাশ বলা যায়। ফলতঃ ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য জ্ঞানে ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে যে কর্ম্ম কৃত হয় তাহাকে বন্ধন বলে না, প্রত্যুত তাহারই নাম কর্ম্মসন্ন্যাস, স্বার্থন্যাস, বা বাসনাত্যাগ।

অতএব বীতমোহ ও ব্রহ্মভিন্ন বিষয়ের কামনা হইতে মুক্ত হইয়া যে চিত্ত স্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীনবৎ ব্যবহার করত ঈশ্বরার্থে সর্ব্ব কার্য্যের অনুষ্ঠান করে এবং এক ধারায় প্রবাহিত হয় তাহারই নাম শুদ্ধচিত্ত অথবা বৈষ্ণবী মতি। স্বার্থমাখা বিষয়-ব্যাপার সম্বন্ধে সে চিত্ত শূন্যক্ষেত্র এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন, কিন্তু ভগবৎপ্রীতি ও তৎপ্রিয়কার্য্য সম্বন্ধে তাহা পরিপূর্ণ ও দিবালোকে সমুজ্জ্বলিত। যাঁহার মন এবম্প্রকারে ব্রহ্মবুদ্ধিবিশিষ্ট হয় তিনিই মুনি। "স চক্ষুরচক্ষুরিব, সকর্ণোঽকর্ণইব সমনা অমনাইব, স প্রাণোঽপ্রাণইব" ব্রহ্মদৃষ্টিতে উন্নত হওয়াতে তিনি চক্ষু থাকিতেও যেন চক্ষুহীন, কর্ণ থাকিতেও যেন কর্ণহীন, মন সত্তেও যেন মনোরহিত, প্রাণ সত্তেও যেন প্রাণরহিত হইয়া বিচরণ করেন। "সুষুপ্তবজ্জাগ্রতি যোন পশ্যতি, দ্বয়ঞ্চ পশ্যন্নপি চাদ্বয়ত্বতঃ। তথাপি কুর্ব্বন্নপি নিষ্ক্রিয়শ্চ যঃ স আত্মবিন্নান্যইতিহ নিশ্চয়ঃ।" এইরূপে যে উদাসীন পুরুষ জাগ্রত থাকিয়াও বাহ্য বিষয়ে নিদ্রিত থাকেন এবং জগ-

তের সর্ব্ব পদার্থে ও সর্ব্ব কর্ম্মে যিনি একই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে দৃষ্টি করেন, আর বাহ্য কর্ম্ম করিয়াও যিনি ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি জন্য ও অহঙ্কার ও স্বার্থ ত্যাগ বশতঃ অন্তঃকরণে নিষ্ক্রিয় তিনিই জীবন্মুক্ত, তদ্ভিন্ন ব্যক্তি জীবন্মুক্ত নহে ইহা নিশ্চয়।

এতাবতা ব্রহ্মবোধবিহীন বিষয় প্রার্থনার বিরতি আর তৎপরিবর্ত্তে ভগবৎ প্রার্থনায় রতিই পরমেশ্বরকে লাভ করিবার উপায়। জীবেতে সেই পারমার্থিকী প্রার্থনার উদয় না হইলে সেই দেবদুর্লভ ধন লব্ধ হয় না। ফলতঃ আদৌ প্রার্থনা না করা ও বিনা ব্যাকুলতায় ত্রিসন্ধ্যা প্রার্থনা করা এ উভয়ই একই কথা। তাদৃশ উপায়ে তাঁহার দর্শন লাভ হয় না। কেবল অশ্রুপূর্ণ প্রার্থনাই আত্মার ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের নয়ন-স্বরূপ। পরমেশ্বর সর্ব্বত্রে পূর্ণ হইয়া আছেন, কিন্তু প্রার্থনা ব্যতীত, অনুরাগ ব্যতীত তাঁহার সেই বর্ত্তমানতার উপলব্ধি হয় না। ভগবৎ-প্রার্থনা বিরহিত মানবের পক্ষে পরমেশ্বর যেন থাকিয়াও নাই। সে তাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে সত্য কিন্তু তাঁহাকে দর্শন স্পর্শ করাই প্রয়োজনীয়। নতুবা পূজা অর্চ্চাতেই বা কি ফল; প্রকাশ্যরূপে ব্রহ্মোপাসনাসূচক মন্ত্রপাঠে বা বক্তৃতা শ্রবণেই বা কি ফল। যাঁহার পূজার জন্য এত আয়োজন, এত পর্য্যটন, যদি তাঁহার দর্শন না পাইলাম, তাঁহার কার্য্য না করিলাম, তবে সকলই নিষ্ফল। অতএব আমাদিগের সকলের উচিত যে আমরা স্বার্থবিশিষ্ট বিষয়কামনাকে দমন করত আত্মাতে নিয়ত ভগবৎ প্রার্থনাকে জাগরূক রাখি, এবং তাঁহার আদেশে তাঁহার কর্ম্ম করি। ঈশ্বর করুন, আমাদের সেই প্রার্থনা পূর্ণ হইয়া আমরা হৃদয়ের দ্বারা অন্তরে বাহিরে তাঁহার আবির্ভাব উপলব্ধি করি। আমরা তাঁহাকেই দেখিবার জন্য ব্রাহ্ম নাম লইয়াছি, অতএব তাঁহাকে দেখিয়া যেন আমাদের উদ্দেশ্য সফল করি। এই সভাস্থানে অদ্যকার এই পবিত্র আহ্বানে তিনি বর্ত্তমান আছেন সকলে সভার বাহ্য আবরণ এবং অন্তরের পঞ্চকোষ ভেদ করিয়া তাঁহাকে দর্শন পূর্ব্বক তাঁহার বিশ্ববিজয়ী পাদপদ্মে কোটি কোটি নমস্কার করুন। আজকার বিশেষ আহ্বানে তিনি এই পবিত্র স্থানে বিশেষরূপে অধ্যাসীন হইয়াছেন, অতএব বন্ধুগণ! আজ তাঁহাকে বিশেষরূপে ধারণ করুন। আমরা তাঁহারই দ্বারের চিরভিখারী। আমরা দশ দিন স্বার্থে জড়িত হইয়া তাঁহাকে ভুলিতে পারি কিন্তু অন্তে তিনি ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই। ধিক্ সেই প্রার্থীকে যে তাঁহাকে ত্যজিয়া অন্য সুখের কামনা করে, কেননা তাঁহাকে ভুলিয়া রাজ্যসুখও অসুখ, কিন্তু তাঁহাকে লইয়া বনবাসী হওয়াও সুখ। সেই নিদান কালের বন্ধুকে আমরা পুনশ্চ নমস্কার করি।

জ্ঞান ও প্রীতির সমন্বয়।

জ্ঞান শব্দ আমরা যেমন সঙ্কীর্ণ অর্থে লইয়া থাকি, প্রাচীনেরা সেইরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে লইতেন না। তাঁহারা অনেক স্থানে বলিয়া গিয়াছেন যে জ্ঞান দ্বারা মনুষ্য ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয় ও অমৃতত্ব লাভ করে। যদি জ্ঞান শব্দে তাঁহারা কেবল ঈশ্বরকে জানা বুঝিতেন তাহা হইলে তাঁহারা উল্লিখিত কথা সকল বলিতেন না, যে হেতু মনুষ্য সংযতচিত্ত ও ঈশ্বরপ্রেমী না হইলে কেবল প্রজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। উপনিষদ্‌কারেরা বলিয়া গিয়াছেন, "তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি" যাহারা তাঁহাকে জানে তাহারা মঙ্গল প্রাপ্ত হয়; "জ্ঞাত্বা শিবং শান্তি মত্যন্তমেতি" সেই মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বরকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। "নিচায্য তাং

মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে" যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারা মৃত্যুমুখ হইতে পরিমুক্ত হয়েন। এই সকল বাক্যের অর্থ প্রণিধান করিলে প্রতীতি হইবে যে, আমরা উপরে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা তাহারই পোষকতা করিতেছে। যেহেতু শুদ্ধ ঈশ্বরকে জানিলে এবং ইন্দ্রিয়সংযম না করিলে এবং ঈশ্বরপ্রেমী না হইলে মনুষ্য কি প্রকারে প্রকৃত মঙ্গল অথবা অত্যন্ত শান্তি লাভ করিতে পারে এবং কি প্রকারে বা মৃত্যুমুখ হইতে পরিমুক্ত হইয়া সেই অমৃতধাম, যেখানে সত্যের নিধান পরমেশ্বর আছেন, সেখানে উপনীত হইতে পারে? উপনিষদ্‌কারেরা উপনিষদে ঈশ্বরপ্রীতির বিষয় প্রায় কোন স্থানে উল্লেখ করেন নাই, ইহার কারণ কি? যাঁহারা ঈশ্বরকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ প্রতীতি করিতেন, যাঁহারা ঈশ্বরকে রসস্বরূপ অর্থাৎ আস্বাদ্য পদার্থ বলিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা ব্রহ্মসংস্পর্শকে অত্যন্ত সুখের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা ঈশ্বরকে সুধার্ণব ও মাধুর্য্য রসের এক মাত্র আধার বলিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল সেই আনন্দস্বরূপ অমৃত-স্বরূপের মাধুর্য্যে অহর্নিশি নিমগ্ন থাকিতেন, তাঁহারা কি ঈশ্বরকে প্রীতি করিতেন না? ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীতি হইতেছে, যে তাঁহাদিগের নিকটে জ্ঞান শব্দে প্রীতিও বুঝাইত। তাঁহারা এইরূপ ধরিয়া লইতেন যে, ঈশ্বরকে স্পষ্টরূপ জানিতে পারিলে, তাঁহার মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য উজ্জ্বলরূপে অনুভব করিতে পারিলে মনুষ্য তাঁহাকে প্রেম না করিয়া কখন থাকিতে পারে না। এজন্য তাঁহারা উপনিষদে ঈশ্বরপ্রীতির বিষয় প্রায় উল্লেখ করেন নাই। দুই এক স্থান মাত্রে উল্লেখ করিয়াছেন,—যথা "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।"

বস্তুতঃ জ্ঞান প্রীতি বুঝায় এবং প্রীতি জ্ঞান বুঝায়। ঈশ্বরকে উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাইলে, মনুষ্য তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। এবং ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে গেলে তাঁহার মঙ্গলস্বরূপ ও প্রেমস্বরূপ জানা আবশ্যক। তাহা না হইলে মনে প্রীতিভাবের সঞ্চার হইতে পারে না। আর এ কথাও যথার্থ যে, আমরা যে সকল সত্য প্রথমে অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করি তাহা প্রেমালোকের সহায়ে আরও উজ্জ্বলরূপ দেখিতে পাই। অতএব প্রতীতি হইতেছে যে, প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত প্রেম পরস্পরকে সাহায্য করে। নীরস শুষ্ক জ্ঞান কখনই আমাদিগকে ব্রহ্মলাভে সমর্থ করিতে পারে না। আর জ্ঞানশূন্য ব্রহ্ম-প্রীতি দৃঢ় ও স্থায়ী না হওয়াতে কার্য্যকর হয় না। যাঁহারা অন্ধ ভক্তি ও প্রীতি দ্বারা পরিচালিত হয়েন তাঁহাদিগের ধর্ম্ম ক্ষণিকভাবের ধর্ম্ম। প্রকৃত প্রীতির পত্তনভূমি জ্ঞান। যে প্রীতি ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপের প্রগাঢ় জ্ঞানের উপর সংস্থাপিত নহে তাহা সংশয়বাদীদিগের তর্কে স্বকীয় স্থান হইতে অনায়াসে পরিভ্রষ্ট হয়। ধর্ম্মের অস্থি জ্ঞান এবং রক্ত মাংস প্রীতি। মানবশরীর যেমন কেবল অস্থিময় হইতে পারে না, তেমনি ধর্ম্ম কেবল জ্ঞানময় হইতে পারে না। মানবশরীর যেমন কেবল রক্ত ও মাংসে সংরচিত হইতে পারে না, তেমনি ধর্ম্ম কেবল প্রেম দ্বারা গঠিত হইতে পারে না। পক্ষী যেমন কেবল এক পক্ষ সহকারে উড্ডীন হইতে পারে না, তেমনি মনুষ্য কেবল জ্ঞান অথবা প্রীতি দ্বারা ঈশ্বরের নিকট উপনীত হইতে পারে না। অতএব জ্ঞান ও প্রীতি উভয়েরই অনুশীলন করিবে।

অধ্যাত্ম-বিদ্যা।

মনের উপরে বিষয়ের আধিপত্য যাহা প্রদর্শিত হইল, তাহা সাধারণতঃ সকল জীবেই বর্ত্তমান। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, মনুষ্যের এমন একটি বিশেষ গুণ কি আছে, যাহা অন্য কোন জীবেই নাই। স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিষয়ের আধিপত্য অতিক্রম করিয়া উত্তরোত্তর ক্রমশই মঙ্গলের পথে অগ্রসর হয়, এরূপ আত্ম-কর্ত্তৃত্ব কেবল মনুষ্যেতেই বর্ত্তমান আছে। মনের উৎকর্ষ যত দূর হইতে পারে, পশুদিগের মধ্যে তাহার অসদ্ভাব নাই। কিন্তু মঙ্গল-সাধন দ্বারা আত্ম-কর্ত্তৃত্ব সমর্থন করিতে হইবে, এ জ্ঞান কেবল মনুষ্যতেই সম্ভবে। মন যে প্রাণ হইতে স্বতন্ত্র এবং উৎকৃষ্ট পদার্থ তাহার নিদর্শন, পশু-রাজ্যে, বিশেষতঃ উৎকৃষ্ট পশুগণের মধ্যে, স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। নিকৃষ্ট পশুগণের নৈসর্গিক সংস্কার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পশুগণের অভ্যস্ত সংস্কার মনুষ্যত্বের নিকটবর্ত্তী বটে, কিন্তু তাহা সংস্কার মাত্র তাহাতে আত্মকর্ত্তৃত্ব আত্মপ্রসাদ মঙ্গল সংকল্প, এ সকল উচ্চ অঙ্গের কোন লক্ষণই দৃষ্ট হয় না। মনুষ্য আত্মকর্ত্তৃত্বে মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, এবং তজ্জনিত আত্মপ্রসাদ লাভ করে। মনুষ্যের, সিংহের মত বল নাই, ময়ূরের মত পরিচ্ছদ নাই, পিপীলিকার মত শ্রমশীলতা নাই, কুক্কুরের মত প্রভুভক্তি নাই, ইহা সত্য বটে, কিন্তু তাহার যখন আত্মকর্ত্তৃত্ব আছে তখন সকলি আছে। এই আত্মকর্ত্তৃত্বের প্রসাদে যাহা অন্য কোন জীবেরই নাই এমন একটি অমূল্য বস্তু মনুষ্যেতে বর্ত্তিয়াছে। সেটি কি? না ক্রমাগতই উন্নতি। মনুষ্যের কর্ত্তৃত্ব এবং অন্যান্য জীবের কর্ত্তৃত্ব দুয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথম কর্ত্তৃত্বটি, বিষয়ের অধ্যক্ষস্বরূপ যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের; দ্বিতীয় কর্ত্তৃত্বটি বিষয়ের অধীন যে মন, সেই মনের। যেখানে জ্ঞানের কর্ত্তৃত্ব সেখানে আপনার কর্ত্তৃত্ব আপনার নিকট প্রকাশ পায়; যেখানে মনের কর্ত্তৃত্ব সেখানে আপনার কর্ত্তৃত্ব আপনার নিকট প্রকাশ পায় না। আপনার কর্ত্তৃত্ব যে ব্যক্তিতে প্রকাশ পায়, সেই ব্যক্তিই উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয়; আপনার কর্ত্তৃত্ব যে ব্যক্তি অবগত নহে, সে ব্যক্তি উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টাপরায়ণ হইবে ইহা অসম্ভব। মনুষ্যের অভ্যন্তরে কর্ত্তারূপী বা অধ্যক্ষরূপী যে জ্ঞান বর্ত্তমান আছে তাহা বুদ্ধি, বিজ্ঞান, ইত্যাদি শব্দে উক্ত হইয়া থাকে। সাংখ্যশাস্ত্র বলেন, যে, মনের ঊর্দ্ধে অহংকার এবং তাহার ঊর্দ্ধে মহান্ এই দুই তত্ত্ব উপর্য্যুপরি বর্ত্তমান। ভাবিয়া দেখিলে এইরূপ প্রতীতি হয় যে, বুদ্ধির প্রথম অঙ্কুরাবস্থাই অহঙ্কার এবং চরম সিদ্ধাবস্থাই মহান্ শব্দে উক্ত হইয়াছে। আপনাকে অন্যান্য বস্তু হইতে বিশেষ করিয়া জানাই বিজ্ঞানের প্রথম সোপান—ইহাই সাংখ্য-দর্শনে অহঙ্কার-শব্দে কথিত হইয়াছে। এবং আত্মপর নির্ব্বিশেষ সার্ব্বভৌমিক সত্যের যে জ্ঞান, তাহাই মহান শব্দে কথিত হইয়াছে। চক্র যেমন কেন্দ্র এবং পরিধি এই দুইটি সীমার অভ্যন্তরে অবস্থিতি করে; বিজ্ঞান, সেইরূপ অহংকার এবং মহান্, এই দুইটি সীমার মধ্যে অবস্থান করে। অহংকার, বিজ্ঞানের কেন্দ্র-স্বরূপ; মহান্ বিজ্ঞানের পরিধিস্বরূপ।

মনেতে যখন ইন্দ্রিয়-ঘটিত কোন প্রকার বোধ উৎপন্ন হয়, বুদ্ধি তখন তাহার তত্ত্ব জানিবার জন্য চেষ্টিত হয়। বুদ্ধিতে যে একটু মূল-জ্ঞান আছে, বুদ্ধি তাহাই অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে আপন অধিকার বিস্তার করে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, নিম্নে নিমিত্ত-কারণ, ঊর্দ্ধে উপাদান কারণ; যথা, মানসিক বোধের নিমিত্ত-কারণ প্রাণ, উপাদান কারণ মন। প্রাণন-ক্রিয়ার নিমিত্ত-কারণ সূক্ষ্ম ভূত, উপাদান কারণ প্রাণ; ইত্যাদি। কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে তাহার বিপরীত ভাব দেখা যাইতেছে; বর্ত্তমান স্থলে দেখা যাইতেছে যে, ঊর্দ্ধে নিমিত্ত কারণ, নিম্নে উপাদান কারণ। জ্ঞানের নিমিত্ত কারণ বুদ্ধির মূল-তত্ত্ব, উপাদান কারণ ইন্দ্রিয়-ঘটিত মানসিক বোধ। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত যাহা অতঃপর বিবৃত হইতেছে, তৎপ্রতি প্রণিধান করিলে এক্ষণে যাহা অস্পষ্ট রহিয়াছে তাহা স্পষ্টরূপে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বর্ত্তমান কাল অল্পবিদ্যা ও লঘু চিত্ততার কাল।

বর্ত্তমান কাল অল্প বিদ্যার কাল। পূর্ব্বকালে বিদ্যার্থীরা একটি বিশেষ বিদ্যাকে আপনার অনুশীলনের বিষয় করিতেন এবং অনেক বৎসর ধরিয়া তাহা অধ্যয়ন করিতেন সুতরাং তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। অধুনাতন কালে অধিকাংশ লোকেরা নানা বিষয় জানিতে ইচ্ছা করে ও নানা বিষয়ের অনুশীলন করে সুতরাং কোন বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। রাজসাই প্রদেশের বীল সমুদ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, কিন্তু গভীর নহে, তাঁহাদিগের বিদ্যাও সেইরূপ। বর্ত্তমানকাল পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্যের কাল। লোকে এক্ষণে আপনাদিগের মনাগারকে পঞ্চ প্রকার পুষ্প দ্বারা সজ্জিত পুষ্পাধার স্বরূপ করিতে চাহে। লোকে এক্ষণে দশকর্ম্মান্বিত হইলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। বিশেষতঃ আমরা বুঝিতে পারি না যে, সম্বাদ পত্রের সম্পাদকের আসনে কি ঐন্দ্রজালিক গুণ আছে যে এক জন অজ্ঞ ব্যক্তি তাহাতে উপবিষ্ট হইলে তিনি একেবারে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া উঠেন। বর্ত্তমানকালে যে বিশেষ বিদ্বান ব্যক্তি নাই তাহা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু অধিকাংশ লোকই অপ্রগাঢ়বিদ্যাসম্পন্ন। বর্ত্তমান কালেও কতকগুলি ব্যক্তি একটী বিশেষ বিদ্যাকে অধ্যয়নের বিষয় করিয়া তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন বটে, কিন্তু ইহাঁদিগের সংখ্যা অল্প। অধিকাংশ ব্যক্তিই চঞ্চল ষট্‌পদের ন্যায় পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ করে কোন পুষ্পেতেই সন্তুষ্ট হয় না। তাহারা কবিতা ছাড়িয়া পুরাবৃত্ত, পুরাবৃত্ত ছাড়িয়া বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ছাড়িয়া দর্শন, এই প্রকার অধ্যয়নের বিষয় দিবসের মধ্যে নিয়তই পরিবর্ত্তন করে। অতএব কোন বিষয়েতেই প্রকৃত ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক কিন্তু একটী বিশেষ বিষয়কে অধ্যয়নের বিষয় করিয়া তাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করা উচিত। পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্যে কোন ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

বর্ত্তমান কাল লঘুচিত্ততার কাল। অধিকাংশ লোকই কোন প্রগাঢ় বিষয়ের পুস্তক অধ্যয়ন করে না। অধিকাংশ লোকই কেবল সংবাদ পত্র উপন্যাস ও নাটক পড়িয়া থাকে, ইহাতে তাহাদের চিত্ত লঘু হইয়া পড়ে। গুরুতর বিষয়ের অনুশীলন জন্য যে প্রকার মানসিক পরিশ্রম ও অধ্যবসায় আবশ্যক তাহা তাহাদের থাকে না। তাহারা এমনি পরিশ্রম ও অভিনিবেশে বিমুখ যে, বিজ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতি গুরুতর বিদ্যা বিষয়ক সংবাদ তাহাদিগকে প্রদান করিতে হইলে তাহা তরল ও লোকরঞ্জন আকারে প্রদান করিতে হয়। বিজ্ঞান ও দর্শন উপন্যাসের আকারে না পরিণত করিলে তাহা তাহাদিগের গ্রাহ্য হয় না। লোকে এক্ষণে শিক্ষা অপেক্ষা আমোদ অধিক প্রার্থনা করে। বর্ত্তমান

প্রস্তাবলেখক একবার মেডিকেল কলেজের রসায়ণ বিদ্যার কোন অধ্যাপকের উপদেশ শ্রবণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি উপদেশ-কালে মধ্যে মধ্যে স্ত্রীলোকের বর্ণ ও আকৃতির সহিত রাসায়ণিক পদার্থ ও তদ্বর্ণ পরিবর্ত্তনের উপমা দিয়া আপনার উপদেশকে মনোরঞ্জক করিতেন; তাঁহার ছাত্রেরা এই জন্য তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। বিলাতে লোকে যাহাতে বিজ্ঞান পাঠে প্রবৃত্ত হয় এই জন্য তরল ও মনোরঞ্জক ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান বিষয়ক সারসংগ্রহ পুস্তক সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে। সে গুলি সারসংগ্রহ বলিয়া প্রকাশিত কিন্তু বস্তুতঃ তাহাদের ন্যায় অসার পুস্তক আর নাই ও তাহাতে সচরাচর এত ভুল থাকে যে তাহা গণনা করা দুষ্কর। বিলাতের অধিকাংশ লোকে উপন্যাস পাঠের জন্য সাধারণ পুস্তকাগারের স্বাক্ষরকারী হয় এবং ক্রমাগত উপন্যাস পাঠ করিয়া অত্যন্ত লঘুচিত্ত হয়। এতদ্রূপ লঘুচিত্ততা আমাদিগের দেশেও ক্রমে প্রবল হইতেছে। উপন্যাস ও নাটক আমাদিগের দেশে এক্ষণে যেমন বিক্রীত হয় এমন অন্য কোন প্রকার পুস্তক হয় না। পূর্ব্বকালে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে লোকে যেমন অনুরক্ত ছিল এক্ষণে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমান কাল উন্নতির কাল বলিয়া প্রসিদ্ধ। যদ্যপি বর্ত্তমান কালে উল্লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থানুরাগ থাকিয়া তাহা উপধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থের প্রতি নিয়োজিত না হইয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থের প্রতি নিয়োজিত হইত তাহা হইলেই প্রকৃত উন্নতি বলা যাইতে পারিত, কিন্তু তাহা না হইয়া সাধারণ লোকে যখন লঘুচিত্ত ও আমোদের প্রিয় হইয়া উঠিতেছে তখন বর্ত্তমান কালকে কি প্রকারে প্রকৃত উন্নতির কাল বলা যাইতে পারে।

সাংখ্যদর্শন।

সাঙ্কর্য্য-চিন্তা।

ভারতবর্ষীয় জীর্ণতম তত্ত্বচিন্তকেরা জীবভোগ্য অগ্নি বায়ু ও জল প্রভৃতি স্থূল ভূতের বিষয় যাহা যাহা চিন্তা করিয়া ছিলেন, তত্তাবৎ সঙ্কলন করিলে আমরা তন্মধ্য হইতে নিম্নলিখিত সার সিদ্ধান্ত গুলি উদ্ধার করিতে পারি।

১ ম। "সাঙ্কর্য্য শব্দের অর্থ মিশ্রভাব। সেই সাঙ্কর্য্য বর্ত্তমান ভূতনিবহে আছে কি না অর্থাৎ অগ্নি বায়ু জল প্রভৃতি কি অমিশ্র পদার্থ?, না মিশ্রণোৎপন্ন* ?"

আর্য্যদিগের এই চিন্তার অবসান ফল অনুসন্ধান করিলে প্রতীতি হয় যে বর্ত্তমান কালিক ব্যবহার্য্য স্থূল ভূত সকল অমিশ্র নহে। প্রত্যেক তিন ভূতে বা প্রত্যেক পাঁচ ভূতে, প্রত্যেক তিন বা প্রত্যেক পাঁচ ভূতের মিশ্রণ আছে†।"

এই মত শ্রৌত ও মীমাংসাসম্মত। সাঙ্খ্য ও ন্যায়মত এই যে, প্রত্যেক ভূতে প্রত্যেক ভূতের অনুপ্রবেশ না থাকুক্, কোন কোন ভূতে কোন কোন ভূতের প্রবেশ আছে বটে, কোন সূক্ষ্মভূত ভূতান্তরের সহিত বিক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়া স্থূল কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, আবার কোন কোন ভূত অমিশ্র থাকিয়াই বিক্রিয়া দ্বারা স্থৌলিক কার্য্যে নিযুক্ত আছে। ঈশ্বরোৎপন্ন বা নিত্যস্বভাব সূক্ষ্ম ভূত সকল স্থূল না হইলে কদাচ এমন আকারের জগৎও এবংপ্রকারে জীবভোগ্য হইত না। অতএব যখন স্থূল হইয়াছে, এখনও হইতেছে; তখন অবশ্যই জল বায়্বাদি অনেক ভূতে সাঙ্কর্য্য আছে; যে হেতু স্থৌল্যের প্রতি এক কারণ সাঙ্কর্য্য, অন্য কারণ বিক্রিয়া শক্তি *।"

ফল, অগ্নি বায়ু জল ক্ষিতি ও আকাশ,—এই সকল গুলিকে সকলে মিশ্র বলিয়া স্বীকার না করুন—মিশ্রণোৎপন্ন আশঙ্কা করিয়া সকলেই যে পরীক্ষারূঢ় হইয়াছিলেন, তাহার আর সংশয় নাই। ফল, জল বায়ু ও পৃথিবী, এই ভূতত্রয়ের মিশ্রজাতত্বের বিষয় কাহারো অবিদিত ছিল না; তবে যে তাঁহারা জল এবং বায়ুতে সাঙ্কর্য্য দেখিয়াও আধুনিক তত্ত্বচিন্তকদিগের ন্যায় তাহার ভূতত্ব লোপ করেন নাই, তাহাই তাঁহাদের অপরাধ।

যে মতে সকল বস্তুই পঞ্চাত্মক বা ত্র্যাত্মক, সে মতে স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ প্রভৃতিতেও সাঙ্কর্য্য আছে, কিন্তু তাহা অপরিহার্য্য। ধাতুনিষ্ঠ সাঙ্কর্য্য পরিহারের উপায় অদ্যাপি অবিদিত আছে। আর যাঁহারা (সাঙ্খ্য ও ন্যায়) বলেন, "কোন কোন ভূত অমিশ্র থাকিয়া স্থৌল্য পরিণামে নিযুক্ত আছে" তাঁহাদের মতে উহারা তেজোভূত। বিকারপ্রাপ্ত পার্থিব তেজ উষ্মতা দ্বারা সংহত হইলেই ধাতুভাব প্রাপ্ত হয় *। সুবর্ণাদি ধাতুকে পরমাণু ভাবে উপনীত করিলে যে তাহা হইতে একবিধ পরমাণুই লাভ হয়, ইহা অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের অবিদিত ছিল না; তথাপি তাঁহারা স্বর্ণ একভূত, রৌপ্য একভূত এবং পারদ একভূত স্বীকার করিতেন না। না করিবার কারণ এই—

স্বর্ণং তৈজসমেব অসতি প্রতিবন্ধকে অত্যন্তানলসংযোগেঽপ্যনুচ্ছিদ্যমানজন্যদ্রবত্বাৎ যন্নৈবং তন্নৈবং যথা পৃথিবী—('পদার্থ তত্ত্ব প্রভৃতি ন্যায় গ্রন্থ দেখ)

মর্ম্মার্থ এই যে, স্বজাতীয় পরমাণু স্বজাতীয়ের সহিত অত্যন্ত সংযুক্ত হইলেও সংযোজ্য পরমাণুকে বিলয় ভাবে উপনীত করে না, অর্থাৎ দূরীকৃত করে না। বিজাতীয় পরমাণুকেই দূরীকৃত করে। অতএব, সুবর্ণ যখন অনলের সহিত অত্যন্ত সংযুক্ত হইয়াও উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না, তখন সুবর্ণ অবশ্যই অনল জাতীয় পরমাণু হইবে। শ্যামিকাশূন্য সুবর্ণ যতই অনলসংযোগ করা হউক না, কিছুতেই তাঁহার দ্রব-অবস্থা যাইবে না, গিয়া যদি আণবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, পুনশ্চ দ্রব-অবস্থা—পুনর্ব্বার যখন কঠিন অবস্থা উপস্থিত হয় তখনও তাহার পূর্ব্ববৎ পীতিম ও গুরুত্ব দৃষ্ট হইবে। তবেই স্থির হইল যে সুবর্ণে অনলের বিজাতীয় পরমাণু নাই। যদি থাকিত তাহা হইলে অনল তাহাকে অবশ্য দূরীকৃত করিত।

অপিচ, স্বর্ণ রৌপ্য পারদ ও বহ্নির উপাদান যদি একই হইল, তবে উহাদের রূপ ও স্পর্শাদি বিভিন্ন হয় কেন। সুবর্ণের রূপ

---

* "কথং তদ্বিধান্যেব ভূতানি ব্যবহারাস্পদানি?" (বেদান্তটীকা)

† "ইত্যত আহ" "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ ত্রিবৃতাং ত্রিবৃতামেকৈকাং করবাণি।" "পঞ্চীকরণস্যোপলক্ষণমেতৎ॥ (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ও তাহার টীকা)।

ছান্দোগ্য শ্রুতির "ত্রিবৃত" এই লিখনভঙ্গি দেখিয়া কোন দার্শনিক ক্ষিতি, জল ও অগ্নিকে মিশ্রণোৎপন্ন বলেন। কেহবা ক্ষিতি, জল ও বায়ুকে মিশ্রপদার্থ বলিয়া বর্ণন করেন। অন্য দার্শনিক অর্থাৎ বৈদান্তিকেরা বলেন সকল ভূতই পঞ্চাত্মক। ত্রি শব্দ পঞ্চ শব্দের উপলক্ষক।

* সাঙ্কর্য্যের বিষয় সাঙ্খ্যকার স্পষ্টাক্ষরে কিছু বলেন নাই। ফল, "ন পাঞ্চভৌতিকং শরীরং—" এই সূত্র দ্বারা যখন শরীরের পঞ্চাত্মকত্ব নিষেধ করিয়াছেন, তখন বুঝা যাইতেছে যে, সকল ভূতের পঞ্চাত্মকত্ব পক্ষ কপিলের স্বীকার নাই। গৌতমও "একভৌতিকং—" এবং আদি সূত্র দ্বারা শরীরের পঞ্চাত্মকত্ব নিষেধ করিয়াছেন, সুতরাং সে মতেও সকল ভূতের পঞ্চাত্মকত্ব স্বীকার নাই।

* "অয়ং বিকৃত্য তেজাংসি পৃথিবীস্থানি সোম্যণা।" (ইত্যাদি বাক্য পুরাণসম্মত) অপিচ, "তেজোপি দ্বিবিধং নিত্যমনিত্যঞ্চ।" "অনিত্যং তেজস্ত্রিবিধং শারীরং [১] ঐন্দ্রিয়কং [২] বৈষয়িকঞ্চ [৩]।" "বিষয়োপি বহ্নি স্সুবর্ণাদি।" [পদার্থতত্ত্ব]।

এক প্রকার, পারদের রূপ এক প্রকার, বহ্নির রূপ এক প্রকার স্পর্শও অন্য প্রকার,—এই ভিন্ন ভাবের কারণ কি ?

উত্তর এই যে, ভিন্ন ভিন্ন কারণে উক্ত ভিন্ন ভিন্ন বিকারের জন্ম হইয়াছে, এই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ভিন্ন ভিন্ন স্পর্শ জন্মিয়াছে। কারণ-বিশেষের সংসর্গে সংসৃজ্যমান পদার্থের রূপ রসাদির অভিভব অর্থাৎ অন্যথা হইয়া থাকে*। যে সূর্য্য-কিরণের স্পর্শ অতি উষ্ণ, হিমানীর সংসর্গে তাহার তাদৃশ উষ্ণতার অভিভব হইবে ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সেই জন্যই স্বর্ণে বা পারদে উষ্ণ স্পর্শ নাই; চির কালিক পার্থিব স্পর্শে তাহার অভিভব হইয়া গিয়াছে এবং জন্য-রূপের প্রতি কারণ পাক; যে প্রাকৃতিক-প্রক্রিয়ায় পারদের পাক হয়, সে প্রক্রিয়ায় স্বর্ণের পাক হয় না; সেই জন্যই স্বর্ণের রূপ একবিধ, আর পারদের রূপ অন্যবিধ।

অপিচ, প্রাচীন পণ্ডিতেরা অগ্নি ও স্বর্ণের মৌলিক উপাদান এক বলিয়া স্বর্ণের নাম রাখিয়াছেন অগ্নিভূ, অর্থাৎ অগ্নি হইতে উৎপন্ন হয়। আর, অগ্নির নাম রাখিয়াছেন হিরণ্যরেতাঃ অর্থাৎ হিরণ্যের জন্মদাতা। এইরূপ, রাসায়ণিক পণ্ডিতেরা স্বর্ণের নাম রাখিয়াছেন 'অষ্টাপদ' অর্থাৎ আট প্রকার লৌহ মধ্যে স্বর্ণ আছে। কালায়স অর্থাৎ বিশুদ্ধ লৌহ যদি কোন সুযোগ্য রাসায়ণিক পণ্ডিতের হস্তে পতিত হয়, তবে তিনি তাহা হইতে স্বর্ণ নিষ্কাশ করিতে পারেন। এই রূপ তাঁহারা মৃত্তিকা-বিশেষ লইয়া স্বর্ণের উৎপত্তি এবং বায়ু-বিশেষ লইয়া বহ্নির উৎপত্তি সাধন করিতে পারেন; যে হেতু এক তৈজস পরমাণু মৃত্তিকাতে সাঙ্কর্য্য দশা প্রাপ্ত হইয়াও আছে, বায়ুতেও আছে। যাহা যাহা বায়ুতে আছে, সাঙ্কর্য্য ভঙ্গ করিতে পারিলে তাহা বহ্নিরূপে পরিণত হইবে, আর যাহা মৃত্তিকাতে আছে তাহা ধাতুরূপে পরিণত হইবে। যাহা হউক, আর পল্লবিত করিবার প্রয়োজন নাই। ফল, আর্য্যজাতির সিদ্ধান্তে পঞ্চাতিরিক্ত ভূত নাই এবং জল বায়ুতে মিশ্রভাব আছে।

* "চন্দ্রকিরণাদৌ তদন্তঃপাতিজলস্পর্শেনাভিভবাৎ মরকতকিরণাদৌ পার্থিবস্পর্শেনাভিভবাৎ চক্ষুরাদৌ চানুদ্ভূতত্বাদুষ্ণস্পর্শস্য নোপলব্ধিঃ।"

[পদার্থতত্ত্ব]।

২য় মিশ্রণের পরিমাণ।

যে মতে সকল বস্তুই পঞ্চাত্মক, সে মতে সৃষ্টিকালে যে যে ভূতে কি পরিমাণ যে যে ভূত অনুপ্রবিষ্ট ছিল, তাহার নির্ণয়—

আকাশে বায়ুর এক অষ্টমাংশ, অগ্নির ১=৮, জলের১=৮শ। পৃথিবীর১=৮শ।

বায়ুতে... আকাশের১=৮, তেজের১=৮, জলের ১=৮, পৃথিবীর ১=৮ অংশ।

অগ্নিতে ঐ.........০.........ঐ

জলেতে ঐ,......ঐ.........০

পৃথিবীতে আকাশের ঐ ঐ ঐ

যে মতে কেবল অগ্নি জল ও পৃথিবী; অথবা জল বায়ু ও পৃথিবীতে সামর্থ আছে, সে মতে প্রবিষ্ট ভাগের তারতম্য আছে।

জলেতে বায়ুর এক চতুর্থাংশ এবং পৃথিবীর এক ৪ র্থ অংশ। এইরূপ বায়ুতে জলের এক চতুর্থাংশ এবং পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ।

পৃথিবীতেও জলের এক চতুর্থাংশ এবং বায়ুর এক চতুর্থাংশ প্রবিষ্ট হইয়াছিল। আকাশ ব্যতীত চারি ভূতের সম্মিশ্রণ পক্ষে প্রত্যেক ভূতের এক ষষ্ঠাংশ এক এক ভূতে অনুপ্রবিষ্ট আছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে প্রথমোৎপন্ন অমিশ্র ভূত কীদৃশ? তাহার স্বরূপ এক্ষণে অনুভূত হইতে পারে কি না?

ইহার উত্তর, এক্ষণে কোন ভূতেই অমিশ্র

নাই, সুতরাং অমিশ্র ভূতের স্বরূপ এক্ষণে অনুভূত হইতে পারে না, যদি প্রত্যেক ভূতের সাঙ্কর্য্য পরিহার অর্থাৎ মিশ্রাংশ পরিত্যাগ করা যায় তাহা হইলে কথঞ্চিৎ অনুমিত হইতে পারে বটে কিন্তু সাক্ষাৎকৃত হইতে পারে না। কারণ, যদ্যপি কোন কৌশলে মিশ্রাংশ সকল পৃথক্‌ভাব প্রাপ্ত হয় তথাপি সেই সেই অমিশ্রাংশ সকল উৎপত্তিকালের ন্যায় অসংহতাবস্থা প্রাপ্ত হইবে না, সংহতই থাকিবে। অতএব, প্রথমোৎপন্ন অসংহতাবস্থ ভূতের স্বরূপ এক্ষণে কি প্রকারে অনুভূত হইতে পারে?

সাংখ্যকার এই অসংহতাবস্থ সূক্ষ্মভূতের বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন।

শব্দস্পর্শবিহীনং তৎরূপাদিভিরসংযুতম্।"

তন্মাত্রাবস্থায় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, কিছুই থাকে না। পরস্পর সংযোগ বশতঃ রূপ রসাদি আবির্ভূত হয়। যেমন হরিদ্রা ও চূর্ণ এই উভয়ের মধ্যে কাহারও রক্তভাব নাই অথচ সংযোগজাত গুণান্তর (রক্তভাব) আবির্ভূত হয়।

ন্যায় মত অন্য বিধ। ন্যায় বলেন, শব্দস্পর্শাদি গুণনিচয় সূক্ষ্মভূতে একেবারে অভাব থাকে না, তবে কি না তাহা অননুভূত রূপে থাকে। পরমাণু যেমন অতিসূক্ষ্মতা নিবন্ধন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, সেইরূপ তদাশ্রিত গুণও অতিসূক্ষ্মতা নিবন্ধন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে।

ক্রমশঃ

গৃহকর্ম্ম হইতে উদ্ধৃত।

স্ত্রী পুরুষ।

"পুরুষ যাবৎ স্ত্রী গ্রহণ না করেন, তাবৎ তিনি অৰ্দ্ধেক থাকেন।" ধর্ম্মের আদেশে বিধিমত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়া প্রজাপতি পরমেশ্বরের অব্যর্থ আদেশ। পরিণয় অতি পবিত্র এবং অতি গুরুতর কার্য্য। যে দিন হইতে স্ত্রী পুরুষ পরস্পর পাণিগ্রহণ করেন, সেই দিন হইতেই তাঁহারা এমনি একটী অচ্ছেদ্য ধর্ম্মশাসনের বশবর্ত্তী হন, যে চিরকাল তাহা পালন করিতে হইবেই হইবে। পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরস্পর একশরীর একহৃদয় হওত ঈশ্বরের নির্দ্দেশিত সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করা যারপর নাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পুরুষ অবিবাহিত অবস্থায় যেমন তিনি আপনার শরীরের উন্নতি ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনে যত্নশীল থাকেন, সেইরূপ পত্নীর দেহ মনের উন্নতির ভার গ্রহণ করত প্রাণপণে তাহা সম্পন্ন করা পরিণেতার উচিত। এই রূপে আজন্মকাল পরস্পর সম্মিলিত হইয়া সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে, ইহাই উভয়ের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং অবশ্য প্রতিপাল্য পরম ধর্ম্ম।

'স্বামী স্বীয় পত্নীকে জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত করিবেন। ভয়াবহ সংসার-পথে তিনি তাঁহার নেতা হইয়া অতি সতর্কতার সহিত সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন। কদাপি এক মুহূর্ত্তের জন্যও অসৎ সংসর্গে রাখিবেন না। সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি প্রিয় বাক্য কহিবেন এবং প্রিয় আচরণ করিবেন। গৃহ কার্য্যে তাঁহাকে অপটু বা অশক্ত দেখিলে দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ দ্বারা ভৎসনা না করিয়া উপদেশ-পূর্ণ হিতবচন দ্বারা তাঁহার দোষাদোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে শিক্ষা দিবেন। এবং কার্য্যবিশেষে সময়বিশেষে তাঁহাকে পরিণয়-নিবন্ধন কর্ত্তব্য-ভার বুঝাইয়া দিবেন। প্রাণান্তেও কখন ব্যভিচার-দোষে সংলিপ্ত হইবেন না।

স্ত্রীও সেই রূপ সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত পতির আদেশ প্রতিপালন করিবেন। সর্ব্ব প্রযত্নে পতিসেবা ও পতিমর্য্যাদা করিবেন। এবং কায়-মনোবাক্যে তাঁহার হিত চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিবেন। সহস্র কারণে উত্ত্যক্ত হইলেও কদাপি পতির প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিবেন না, এবং সংসার-ধর্ম্মে ঔদাস্য ও অবহেলা করিয়া ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইবেন না। "ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগতা এবং সখীর ন্যায় তাঁহার হিত কার্য্য-সাধিকা হইবেন।"

অপরিমিত ব্যয়শীলা হইয়া সংসারের অহিত চেষ্টা করিবেন না। অনর্থ বহু-ভাষণ দ্বারা পতির অসন্তোষ সাধন এবং গৃহের শান্তিভঙ্গ করিবেন না। বিবাদ কলহে সংলিপ্ত হইয়া গৃহধর্ম্মের বৈপরীত্যাচরণে প্রাণান্তেও প্রবৃত্ত হইবেন না। সর্ব্বদা সকল বিষয়ে বিশুদ্ধ থাকিয়া স্বামীর শ্রী সৌভাগ্য সম্পাদন করিবেন, স্বামীর তুষ্টিসাধন করিবেন। ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে অবিরোধিনী হইয়া স্বামীর মুখ উজ্জ্বল করিবেন। সর্ব্বদা অসৎ চিন্তা, অসৎ কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র থাকিবেন। ভ্রমেও কখন কোন পুরুষের প্রতি কুদৃষ্টিপাত

করিবেন না। ধর্ম্মকে আপনার উজ্জ্বল ভূষণ-রূপে সর্ব্বদা হৃদয়ে রক্ষা করিবেন। "যে পতিপ্রাণা স্ত্রী সদাচারা ও সংযতেন্দ্রিয়া হয়েন, তিনি ইহ লোকে অতুল কীর্ত্তি এবং পর লোকে অনুপম সুখলাভ করেন।"

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

ভৈষজ্য-রত্নাবলী। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিনোদলাল সেন-গুপ্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিত, আয়ুর্ব্বেদ যন্ত্রে মুদ্রিত। ইহার মূল্য তিন টাকা মাত্র।

এই ভারতবর্ষে আর্য্যজাতির আধিপত্য কালে যে আয়ুর্ব্বেদ সম্যক্ উন্নতি লাভ করিয়া কালক্রমে আবার, গ্রীক এবং অপরাপর ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের ভিত্তিভূমি হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা বোধ হয় তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন।

আর্য্য-কুলের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন অপরাপর উন্নতিস্রোত অবরুদ্ধ হইল, তেমনি আর্য্য ঋষিদিগের বহুযত্ন আয়াস ও পরীক্ষাসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও হত প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই ভারতের পূর্ব্বকীর্ত্তিকলাপ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া কাল-প্রোথিত রত্নরাজি উদ্ধার করত স্বদেশ ও বিদেশীয় অনেকানেক বিচক্ষণ পণ্ডিতবর্গকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিয়া তুলিতেছেন।

ভারত-শাস্ত্র-সিন্ধুগর্ভে যে কত অমূল্য নিধি নিহিত রহিয়াছে তাহা গণনা দ্বারা নিঃশেষ করা দুঃসাধ্য। এমন কি ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞান-শাস্ত্র অদ্যাপি এমন কোন একটী ব্যাপার সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারেন নাই, আর্য্য ভূমিতে যাহার সূত্রপাত হয় নাই, ইহা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

এখানকার উদ্ভিদ যেমন এখানকার প্রকৃতির উপযোগী তেমনি আয়ুর্ব্বেদবিহিত চিকিৎসাও এখানকার পক্ষে বিশেষ মঙ্গলকর। প্রকৃতির নিয়মই এই যে, যে বস্তু যেখানকার প্রয়োজন তাহা সেইখানেই প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। রোগের ঔষধ সম্বন্ধে সে নিয়মের ব্যতিক্রম কদাচ সম্ভবপর নহে।

ভৈষজ্য-রত্নাবলীবিহিত ঔষধ সকল অনায়াসলভ্য, সুতরাং যৎস্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ। প্রত্যেক ভারতবাসীর গৃহপ্রাঙ্গনে না হয় উদ্যানকাননে তাহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঔষধ প্রস্তুত-প্রণালীও যার পর নাই অল্পায়াসসাধ্য। প্রাচীন ও জটিল রোগের তো কথাই নাই, অভিনব ব্যাধির পক্ষেও দেশীয় ঔষধ, বিশেষ ফলোপধায়ক। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সম্যক্ উন্নতি হয়, ইহা আমারদের আন্তরিক ইচ্ছা।

ইহার অনুবাদ মূলানুরূপ অতি সহজ ও সরল হইয়াছে। প্রকৃত ভৈষজ্য-রত্নাবলীতে অনেকগুলি ঔষধ আসব ও অরিষ্ট সংযোজিত হওয়াতে আকার পরিবর্দ্ধিত হইয়া একখানি নূতন গ্রন্থরূপে পরিণত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রচার দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম।

সংবাদ।

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পাঠকগণকে জ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ মুখ্যোপাধ্যায় ১২ জ্যৈষ্ঠ বুধবারে পরলোক গমন করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার নিমিত্ত যে অল্পসংখ্যক লোক নিয়মিত উপস্থিত হইতেন তাহার মধ্যে শ্যামবাবু একজন ছিলেন, এই বিষয় প্রধান আচার্য্য মহাশয় তাঁহার পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি পত্রিকার প্রথম অবস্থায় কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। তিনি কতকগুলি উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীতও রচনা করিয়াছিলেন। তিনি উল্লিখিত দিবসে ব্রাহ্মসমাজ হইতে গৃহে যাইয়া বক্ষে হঠাৎ একটি বেদনা অনুভব করিলেন। পরে দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। আহা! এই দেহের আমরা কত অহঙ্কার করিয়া থাকি কিন্তু দেহ কি ক্ষণভঙ্গুর! তাঁহার রচিত একটি সঙ্গীত নিম্নে দেওয়া গেল।

"মনে স্থির ভেবে আছ চির দিন সুখে যাবে। জীবন যৌবন ধন মান রবে সমভাবে।

এই আশা তরুতলে, বসে আছ কুতূহলে, বিষয় করিয়া কোলে যেন না ত্যজিতে হবে।

কিন্তু জেনো মনে সার, দিবা অন্তে অন্ধকার, সুখান্তে দুঃখেরই ভার বহিতে হবে।

অতএব সাবধান, যে অবধি থাকে প্রাণ, ব্রহ্মে কর সমাধান নির্ম্মল আনন্দ পাবে।"

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ আষাঢ় রবিবার প্রাতঃকালে ৭ ঘণ্টার সময় মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

আগামী ৯ আষাঢ় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘণ্টার সময়ে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের চতুর্ব্বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবেক।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ
১ আষাঢ় ১৭৯৮ শক।

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯৩৩। কলিগতাব্দ ৪৯৭৭। ১ আষাঢ় বুধবার।

Registered No 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
শ্রাবণ ১৭৯৮ শক।

৩২৬ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৭

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

অধ্যাত্ম-বিদ্যা।

বাহির হইতে বহির্বস্তু যেমন মনের উপরে কার্য্য করে, অন্তর হইতে বুদ্ধিও সেই রূপ মনের উপরে কার্য্য করিয়া থাকে। মনে কর, হঠাৎ কোন এক অশুভ সংবাদ কর্ণগোচর হইল, এবং তজ্জন্য মন অতিশয় বিচলিত হইল, এ অবস্থায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মনকে অধীর হইতে দেন না। যাহার অবলম্বনে বুদ্ধি মনঃসংযমে কৃতকার্য্য হয়, তাহা কি? না কর্ত্তব্য-বোধ। "আমি কর্ত্তা—মন দ্বারা আমি চালিত হইব না, আমি মনকে চালনা করিব" এই বোধটিই কর্ত্তব্য-বোধের মূল। বিষয়ের উত্তেজনা অনুসারে যে কার্য্য কৃত হয়, তাহা বুদ্ধির কার্য্য নহে, তাহা মনের কার্য্য। পরন্তু অগ্রে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তদনুসারে যে কার্য্য কৃত হয়, তাহাই বুদ্ধির কার্য্য। যে দিকে বিষয়ের আকর্ষণ, সেই দিকেই মন ধাবিত হয়, মন আপাত-দর্শী। বুদ্ধি মধ্যস্থলে থাকিয়া, সকল দিক্ দেখিয়া শুনিয়া, কর্ত্তব্য স্থির করে; বুদ্ধি বহুদর্শী। এমন একটি কর্ত্তব্য-সিদ্ধান্ত যাহাতে বিবেচ্য বিষয়ের সকল দিক্ যথোচিত মতে রক্ষিত হয়, তাহাই বুদ্ধির সিদ্ধান্ত। মনেতে যে-সকল বিষয় প্রতিভাত হয় তাহা উপাদান স্বরূপ; তাহার উপরে বুদ্ধি আপনার কর্ত্তৃত্ব খাটাইয়া, যে স্থানের যে উপযুক্ত, যে সময়ের যে উপযুক্ত, যে কার্য্যের যে উপযুক্ত, তাহাকে সেই স্থানে, সেই সময়ে, সেই কার্য্যে নিয়োগ করে। মনোবৃত্তি সকলকে যদি সেনা বল, বুদ্ধি তবে সেনাপতি। মনোবৃত্তি সকলকে যদি অশ্ব বল, বুদ্ধি তবে সারথি। মনোবৃত্তি সকলকে যদি পরিধি বল, বুদ্ধি তবে কেন্দ্র। বুদ্ধির কর্ত্তৃত্বই আমারদের আপনারদের কর্ত্তৃত্ব, মনের কর্ত্তৃত্ব আমারদের আপনারদের কর্ত্তৃত্ব নহে; কেন না মন যেখানে বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব অমান্য করিয়া স্বতন্ত্র-ভাব ধারণ করে, সেখানে তাহা বিষয়ের হস্তে আপনাকে সমর্পণ করে; মনের স্বাতন্ত্র্য স্বেচ্ছাচার শব্দে উক্ত হয়, তাহা বিষয়ের অধীনতা মাত্র। কর্ত্তৃত্ব-বোধ-সম্বলিত যে জ্ঞান তাহারই নাম বুদ্ধি বা বিজ্ঞান। বিজ্ঞান আমারদের আত্মাতে ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছে, এই হেতু আত্মা বিজ্ঞান-ঘন শব্দে উক্ত হইয়াথাকে। আমারদের বুদ্ধি সীমাবিশিষ্ট। বুদ্ধিতে যেটুকু জ্ঞানালোক আছে তাহা অজ্ঞানান্ধকারে পরিবৃত। বেদান্ত

শাস্ত্রে পাওয়া যায় যে, বিজ্ঞানময় কোষের উত্তরে আনন্দময় কোষ, এবং সাংখ্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়, বুদ্ধির উত্তরে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি; প্রকৃতির আর এক নাম অব্যক্ত; প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তি ইহা শাস্ত্রের অভিপ্রেত। প্রকৃতির উত্তরে পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা। বেদান্তের মতে আনন্দময় কোষ অবধি জীবাত্মার ভান হয়; সেই সূক্ষ্ম মায়াময় ব্যবধানটি অপনীত হইলে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত তন্ময় ভাব প্রাপ্ত হয়। বেদান্ত এক রূপ বলেন, সাংখ্য আর এক রূপ বলেন; কিন্তু সকল শাস্ত্রের ভাব এবং তাৎপর্য্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে ফলে যেরূপ দাঁড়ায় তাহা এই; ঈশ্বর আপনার অব্যক্ত শক্তিকে ক্রমশই ব্যক্ত করিতেছেন, তাঁহার শক্তির চরম ব্যক্তভাব জ্ঞানবান্ মনুষ্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। মনুষ্য-সৃষ্টি ঈশ্বরের মুখ্য সংকল্প। মনুষ্য সকলের শেষে সৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু জগতের সার আদর্শরূপে এবং ঈশ্বরের নিকটতম ভাবরূপে মনুষ্য (ব্যক্তিরূপী মনুষ্য নহে ভাবরূপী মনুষ্য) সৃষ্টির আদিতে বর্ত্তমান ছিল। শস্য সকলের শেষে উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু বীজরূপে তাহা সকলের আদিতে বর্ত্তমান থাকে। গ্রন্থের শেষ-ভাগে যাহা সুব্যক্ত হয়, তাহাই গ্রন্থকারের আদি-সংকল্প। সাংখ্যশাস্ত্র এই কারণে বুদ্ধিকে প্রথম সৃষ্টি বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। বুদ্ধিরূপ আদর্শে জগৎ সংসার বিরচিত হইয়াছে, ইহা দেখিয়াই সাংখ্য বুদ্ধিকে আদি সৃষ্টি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। জগৎ যদি প্রথমে বুদ্ধির আদর্শে বিরচিত না হইত, তাহা হইলে চরমে তাহা বুদ্ধির দ্বারা আয়ত্তীকৃত হইতে পারিত না। আদিতে যদি ভাবের আদর্শে গীত বিরচিত না হয়, তবে চরমে তাহা ভাব উদ্দীপন করিতে পারে না। যে ব্যক্তি আপনি মাতিয়াছে সেই অন্যকে মাতাইতে পারে—ইহা প্রসিদ্ধ। জগৎ জ্ঞানের আদর্শে বিরচিত বলিয়াই, তাহা আমারদের জ্ঞানের উপযোগী হইয়াছে। সাংখ্য-দর্শনে প্রকৃতি এবং বুদ্ধি সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত স্থির করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা পৃথিবীস্থ প্রধান প্রধান ধর্ম্ম-সম্প্রদায় এখনো পর্য্যন্ত চালিত হইতেছে। শাক্ত এবং বৈষ্ণব এই যে দুই প্রধান সম্প্রদায় আমারদের দেশে আধিপত্য করিতেছে, তাহার মধ্যে প্রথমোক্ত সম্প্রদায় প্রকৃতির উপাসক; শেষোক্ত সম্প্রদায় আদর্শরূপী মনুষ্যের উপাসক। ঈশ্বরের শক্তিস্বরূপা প্রকৃতি দুর্গা জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি নানা নামে রূপকচ্ছলে পুরাণে গীত হইয়াছে এবং আদর্শরূপী আদিম মনুষ্য-ভাব নারায়ণ প্রভৃতি নানাবিধ নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সাংখ্যসার নামক একখানি সাংখ্য গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়া তাহার যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা অত্রোক্ত অনুমানের বিলক্ষণ পোষকতা করিতেছে।

"বিষ্ণুরেবাদি সর্গেষু স্বয়ম্ভূর্ভবতি প্রভুঃ॥"

ইহার ব্যাখ্যা

"ব্রহ্মশঙ্করাপেক্ষয়াপ্যাদৌ বিষ্ণুরূপেণৈব মহানাবির্ভবতীতি বিষ্ণুরেবেত্যর্দ্ধেনোক্তং।"

ইহার তাৎপর্য্য এই মহান্ বা বুদ্ধি আদিতে বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত হন। যদিও বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে মৎস্য, বরাহ, নৃসিংহ এইরূপ কয়েকটি পশুমূর্ত্তিকে স্থান দেওয়া হইয়াছে তথাপি বিষ্ণুর উপাসকেরা মনুষ্যত্বেরই বিশেষ অনুরাগী। প্রথমে পশ্বাদি সৃষ্ট হইয়া, ক্রমে তবে মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছে, ইহার আভাস প্রদান করিবার জন্যই মৎস্য বরাহাদির উল্লেখ করা হইয়াছে। আদর্শরূপী মনুষ্যই যে বিষ্ণু-উপাসকের উপাস্য দেবতা তাহার একটি অতি সহজ প্রমাণ এই যে, বিষ্ণুকেই নরোত্তম নাম দেওয়া হইয়াছে, নরোত্তম কি না সকল মনুষ্যের

মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ মনুষ্য, অর্থাৎ আদর্শরূপী মনুষ্য।

"ফলেন পরিচীয়তে" এইটি স্মরণ রাখিয়া কর্ত্তাভজা প্রভৃতি বৈষ্ণব ধর্ম্মের শাখা-গুলির প্রতি প্রণিধান করিয়া দেখিলেই মূল বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্মের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। "কর্ত্তা-ভজা" এই নাম দ্বারাই উহার লক্ষ্য এবং তাৎপর্য্য স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। যদিও কর্ত্তাভজারা সামান্যতঃ ব্যক্তি-বিশেষকে কর্ত্তা জানিয়া তাহাকে ভজনা করিয়া থাকে, কিন্তু ভাবে এই রূপ জানা যাইতেছে যে উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানবান্, তাঁহারা আদর্শরূপী মনুষ্যকেই কর্ত্তা, সহজ মানুষ, ইত্যাদি সম্বোধনে ভজনা করিয়া থাকেন। দর্শন-শাস্ত্রে মহান্ বুদ্ধি বা বিজ্ঞান কর্ত্তা-শব্দে উক্ত হইয়া থাকে। আদর্শ-রূপী আদিম মনুষ্য এবং চরম সিদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত অনন্ত ভাবী মনুষ্য উভয়ই ভাবে এক; এই চরম এবং আদিম মনুষ্যই জ্ঞানী বৈষ্ণবদিগের উপাস্য দেবতা। শাক্ত এবং বৈষ্ণব এ দুই সম্প্রদায় কেবল ভারতবর্ষে নহে, ইউরোপেও প্রকারান্তরে এবং নামান্তরে আধিপত্য করিয়া আসিতেছে। যাঁহারা মেরির উপাসক তাঁহারা শাক্তের সহিত এবং যাঁহারা ঈশার উপাসক তাঁহারা বৈষ্ণবের সহিত উপমিত হইতে পারেন। শাক্তদিগের মতে জীবহিংসা বৈধ, বৈষ্ণবদিগের মতে জীবহিংসা নিষিদ্ধ, এই একটি বৃত্তান্ত দ্বারা ইহা অনুমিত হইতে পারে যে, আমারদের দেশে প্রথমে শাক্ত-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল, পরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। শাক্ত এবং বৈষ্ণব এ দুই সম্প্রদায় ত আধুনিক, বৈদিক ধর্ম্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম এ দুই ধর্ম্মের মধ্যেও জীবহিংসার বৈধতা অবৈধতা লইয়া তুমুল বিবাদ চলিয়া গিয়াছে। বৈদিক ধর্ম্মে যখন ব্রাহ্মণের আধিপত্য অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল তখন তাহার প্রতিবিধান জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা যাগ যজ্ঞরূপ বাহ্য আড়ম্বর ও পশুহিংসা রূপ প্রলোভন দ্বারা জনসাধারণের মনের উপরে যাহাতে আধিপত্য করিতে না পারে, তাহার জন্য বৌদ্ধেরা যাগ যজ্ঞের নিষ্ফলতা এবং পশুহিংসার অবৈধতা প্রদর্শনে কৃতসংকল্প হইয়াছিল। লুথরও পোপের আধিপত্য সহ্য করিতে না পারিয়া ঐ প্রকার কারণে রোমান কাথালিক ধর্ম্মের দোষাবিষ্কারে যত্ন পাইয়াছিল। বৌদ্ধেরা প্রথমে "বেদ মানিব না" এই ভাবে চলিয়াছিল বোধ হয়। লোকের এইরূপ বিশ্বাস যে বেদ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাক্য; এই বিশ্বাসের প্রতিবিধান করিবার জন্য বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের অস্তিত্বও স্বীকার করিলেন না। এজন্য এক কালে তাঁহারা নাস্তিক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সাংখ্যের অধিকাংশ মত বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে প্রসূত হইয়াছে, এইরূপ বোধ হয়। কেননা সাংখ্য বেদের প্রতি অতি অল্পই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের অবিষয় বলিয়া তত্ত্বাবলীর মধ্যে তাহার স্থান রাখেন নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের পর পৌরাণিক ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা একপ্রকার বুঝিতে পারা যায়। কেন না প্রায় তাবৎ পুরাণই সৃষ্টি-বর্ণন কালে প্রকৃতি মহান্ অহংকার তন্মাত্র ইত্যাদি সাংখ্যোক্ত শব্দ সকল ভূয়োভূয়ঃ ব্যবহার করিয়াছেন। প্রকৃতি এবং প্রকৃতির প্রথম জাত বুদ্ধি উভয়ই বিজ্ঞেয় তত্ত্ব স্বরূপে সাংখ্য দর্শনে আলোচিত হইয়াছে। পুরাণ তন্ত্রাদিতে উভয়ের পূজার্চ্চনা বিধি প্রকটিত হইয়াছে। তদনুসারে শাক্তেরা প্রকৃতি-পূজা এবং বৈষ্ণবেরা মনুষ্য-পূজা করিয়া থাকেন। সকল দেশেই মানব-প্রকৃতি সমান;

আমারদের দেশেও যেরূপ ইউরোপেও সেইরূপ। বাইবল গ্রন্থে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের কেবল-জাত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কত লোক খ্রীষ্টের পূর্ব্বে জন্মিয়াছে তবে কেন খ্রীষ্ট-ঈশ্বরের কেবল-জাত পুত্র বলিয়া উক্ত হইল। এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর হিন্দুশাস্ত্র ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। আর্য্যভাষার মূল-ধাতু সকল যেমন সংস্কৃত ভিন্ন আর কোন ভাষাতে অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না, সেইরূপ মনুষ্য-পূজার মূল বৃত্তান্ত অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্র ভিন্ন আর কোথাও অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। সেণ্ট্ জন্ লিখিত গস্পেল বাইবলের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হয়। এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই এইরূপ লিখিত আছে।

1. In the beginning was the word and the word was with god and the word was God.

2. The same was in the beginning with God.

আর কতিপয় পংক্তি পরে এইরূপ আছে

And the word was made flesh and dwelt ammong us (and we beheld this glory, the glory as of the only begotten of the Father) full of grace and truth.

ইংরাজি বাইবলে যদিও "word" এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু ঐ শব্দটি গ্রীক ভাষান্তর্গত "Logos" শব্দের অনুবাদ। Logos শব্দের আর এক অর্থ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। সাংখ্য-শাস্ত্রে মহান্, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মহান্ প্রকৃতির প্রথম-জাত বলিয়া সাংখ্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তি বলিয়া অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্রান্তরে, এবং বিশেষতঃ পুরাণ তন্ত্র এবং অন্যান্য শাখা-শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ বর্ণিত হইয়াছে। খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের কেবল-জাত পুত্র বলিবার তাৎপর্য্য এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। আদর্শরূপী মনুষ্য যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে প্রজ্ঞারূপে বিরাজ করিতেছে, তাহা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আবির্ভাব; যখন অন্য কোন পদার্থ সৃষ্ট হয় নাই তখন প্রজ্ঞা ঈশ্বরেতে জাগরূক ছিল। "The same was in the beginning with God." আমরা যখন কোন প্রকার রচনা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তখন তাহার প্রথম আবির্ভাব আমারদের জ্ঞানের অভ্যন্তরেই হইয়া থাকে। তাহা কেবল নয়, রচিতব্য বিষয়ের চরম পরিণাম পর্য্যন্ত আমারদের জ্ঞানে জাগরূক হইয়া উঠিলে, তবে আমরা বুদ্ধি পূর্ব্বক রচনা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি। জগৎ কার্য্যের চরম পরিণাম মনুষ্যের প্রজ্ঞা-স্ফূর্ত্তি; সুতরাং জগতের সার উদ্দেশ্যরূপে প্রজ্ঞা ঈশ্বরের জ্ঞানেতে প্রথমাবধি বর্ত্তমান্ রহিয়াছে। আদর্শরূপা মনুষ্যকে কেবল-জাত বলিবার তাৎপর্য্য কি এতক্ষণে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল। অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তির সাক্ষাৎ আবির্ভাব প্রজ্ঞা; জীবের মধ্যে ঈশ্বরের মধ্যে অহঙ্কার রূপ ব্যবধান বিদ্যমান আছে; প্রজ্ঞার মধ্যে ঈশ্বরের মধ্যে ব্যবধান নাই। প্রজ্ঞা অহঙ্কার দ্বারা কলুষিত নহে; প্রজ্ঞাই সাক্ষাৎ ঐশী-শক্তির আবির্ভাব, প্রজ্ঞাই ঈশ্বরের পুত্র নামের যোগ্য। আদর্শরূপী মনুষ্যকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে "The only begotten of the Father" এবং খ্রীষ্টকে তাঁহার অবতার কল্পনা করিয়াই বলা হইয়াছে "and the word was made flesh and dwelt among us." বাইবল হইতে উদ্ধৃত করিয়া উপরে যতটা বলা হইল সমুদায়েতেই গ্রীক দেশীয় তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাব-স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতেছে। ঈশা যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময় গ্রীক এবং রোমীয় জাতির সহিত ইহুদী জাতির সবিশেষ ঘনিষ্টতা ছিল। সে যাহা হউক্, মনুষ্য-পূজার মূল কোথায় তাহা অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্র আলোচনা করিলেই

বিশেষরূপে জানা যাইতে পারে। আমারদের শাস্ত্রমতে বিষ্ণুই যুগে যুগে অবতার-স্বরূপে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা এবং শঙ্কর সেরূপ করেন না। ঈশ্বর জগতের পালন-কর্ত্তা এই ভাবটিকেই বিষ্ণু উপাধি দেওয়া হইয়াছে। মনুষ্যই পালনের প্রধান আস্পদ। অন্যান্য জীব জন্তু যাহারা ক্রমাগত হইতেছে যাইতেছে, তাহারদের ভিতরে এমন কোন উন্নতিশীল স্থায়ী পদার্থ নাই যাহা চিরকালই প্রতিপাল্য। আদর্শরূপী মনুষ্য কিম্বা মনুষ্যত্বের মহান্ আদর্শ এমন কোন সীমাবদ্ধ বিষয় নহে যে তাহা মনুষ্য কোন কালে করায়ত্ত করিতে পারিবে। সেই অসীম আদর্শ মনুষ্যকে অনন্ত কালে বিধৃত রাখিয়াছে, মনুষ্যের অন্ত নাই। মনুষ্যের সেই মহান্ আদর্শ মনুষ্যকে চিরকালই উন্নতির পথে পালন করিতেছে এবং পালন করিবে। এই কারণেই বিষ্ণু যিনি পালনের অধিদেবতা তিনি মনুষ্যের পরাকাষ্ঠা আদর্শরূপে পূজিত হইয়া থাকেন। ইউরোপে খ্রীষ্ট ত্রাণ-কর্ত্তা রূপে পূজিত হইয়া থাকেন। খ্রীষ্টানদিগের মতে ঈশ্বর যদিও সৃষ্টিকর্ত্তা বটেন, কিন্তু ত্রাণ-কর্ত্তা তিনি নহেন, তাঁহার পুত্র খ্রীষ্টই ত্রাণ-কর্ত্তা। ত্রাণ করা কি? না বিপদ্ হইতে রক্ষা করা। রক্ষা-কার্য্য পালন-কার্য্যেরই অন্তর্ভূত। মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ দিয়া অনন্ত কাল মনুষ্যকে রক্ষণ পালন করিবার যিনি অধীশ্বর, তিনি হিন্দুশাস্ত্রমতে বিষ্ণু, বাইবল শাস্ত্রমতে খ্রীষ্ট। খ্রীষ্ট এক-স্থানে এইরূপ বলিয়াছেন।

16. For God so loved the world that he gave his only begotten son *

* খ্রীষ্ট সম্প্রদায়েরা যাহা বলুন না কেন এস্থলে ঈশা যে আপনাকে লক্ষ্য করিয়া Son of God এই কথা বলিতেছেন এমন বোধ হয় না; পরে যাহা উদ্ধৃত হইতেছে তাহা আরো স্পষ্টরূপে এ কথার পোষকতা করিবে।

(কি না প্রজ্ঞা—সেই মনুষ্যত্বের আদর্শ যাহা ঈশ্বরের আবির্ভাবরূপে প্রতি জনের অন্তরে নিহিত আছে) that whosoever believeth in him should not perish but have ever lasting life.

17. For god sent not his son (প্রজ্ঞা, মনুষ্যত্বের আদর্শ এইভাব) into the world to codemn the world; but that the world through him might be saved.

18. He that believeth on him is not condemned; but he that believeth not is condemened already because he hath not believed in the name of the only begotten son of god. (প্রজ্ঞার প্রতি যাঁহার শ্রদ্ধা নাই, ভাবী মঙ্গলে তাঁহার আশা থাকিতে পারে না এই তাঁহার শাস্তি)

19. And this is the condemnation that light (প্রজ্ঞাজ্যোতি) is come into the world and men loved darkness rather than light because their deeds were evil.

20. For everyone that doeth evil hateth the light neither cometh to the light lest his deeds should be reproved.

21. But he that doeth truth cometh to the light, that his deed may be made manifest that they are wrought in God.

মহান্‌কে যদি সৃষ্টির অন্তর্গত সমুদায় জ্ঞানের সমষ্টি বলিয়া ভাবা যায়, তবে তাহা ভ্রাতৃভাবের প্রধানতম বন্ধন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। যে জ্ঞান আত্মপর-নির্ব্বিশেষ তাহাতে স্বার্থপরতা অহংকার অভিমান প্রবেশ পাইতে পারে না, সুতরাং তাহা বিশুদ্ধ প্রীতির নিকেতন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মে ভ্রাতৃ-প্রেম বিশেষ-রূপে আদৃত হইয়াছে। পাণ্ডবগণের সহিত বিশেষতঃ অর্জ্জুনের সহিত কৃষ্ণের দেখ কি অসাধারণ সখ্য ছিল! কৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুনের সারথ্য করিতেও কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিলেন না। "মানং হিত্বা প্রিয়ো ভবতি" এ বচনটির এমন আর একটি দৃষ্টান্ত কোথাও পাওয়া যাইবেনা। খ্রীষ্ট ভ্রাতৃ-প্রেমের এক জন প্রধান

উপদেষ্টা এবং প্রচারক ছিলেন। খ্রীষ্টিয়ানেরা খ্রীষ্টকে ভ্রাতার ন্যায় দৃষ্টি করেন। জাতি-ভেদ ভ্রাতৃভাবের বিরোধী, এ জন্য বৈষ্ণব-ধর্ম্মে জাতি-ভেদের আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ভাব এবং তাৎপর্য্য সংক্ষেপে দেখান হইল; শাক্ত ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম কি তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। তাহা হইলে প্রকৃতি এবং বুদ্ধি উভয়ের আধ্যাত্মিক মর্ম্মবিশদ-রূপে বোধগম্য হইবে।

শরীর হইতে নবোন্মুক্ত আত্মার উক্তি *।

একি ? আমার শরীর সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, আর আমি এখানে! কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! শরীররূপ বিড়ম্বনা হইতে মুক্ত হইয়া আপনাকে কি সহজ ও লঘু বোধ হইতেছে। কি সুখের অবস্থা! যথার্থই মর্ত্তলোকের কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন "শিশুরা যেমন অন্ধকারে যাইতে ভয় করে তেমনি মনুষ্য মৃত্যুকে ভয় করে।" শরীর পরিত্যাগ করিয়া কত দুঃখ ও যন্ত্রণার হাত এড়াইয়াছি। প্রিয়তম বন্ধু অনুরোধ করিলেও ঐ স্নায়ুযুত মাংসশোণিতলিপ্ত চর্ম্মবদ্ধ মূত্রপুরীষের দুর্গন্ধপূর্ণ জরাশোকসমাকীর্ণ রোগায়তন শরীরে পুনঃ প্রবেশ করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। হে ক্রন্দনশীল পরিজনগণ! তোমরা আমার জন্য কেন বিলাপ করিতেছ? আমি অতি সুখের অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছি। আমার ইচ্ছা হইতেছে ক্রন্দন করিতে তোমারদিগকে নিবারণ করি কিন্তু এক্ষণে আমার তোমাদিগের সহিত আলাপ করিবার ক্ষমতা নাই। আর কিছু দিন অপেক্ষা কর তোমরাও এইরূপ অবস্থায় অবস্থাপিত হইবে। সর্প যেমন স্বীয় নির্ম্মোক বল্মীকের উপর পরিত্যাগ করিয়া নবতর কল্যাণতর রূপ ধারণ করে, সেইরূপ তোমরাও আর কিছু দিন পরে শরীর পরিত্যাগ করিয়া আমার ন্যায় নবতর কল্যাণতর রূপ ধারণ করিবে। একি? দিব্যরূপধারী অনেক দিনের পরিচিত আত্মীয় স্বজন সুহৃদ্‌বর্গ আমার নিকট আগমন করিতেছেন, ইহাঁদিগকে প্রেমালিঙ্গন করিতে মন অতীব ব্যগ্র হইতেছে। হে বরণীয় আত্মা সকল! এস, তোমাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া অনেক দিনের শোক সন্তাপ নিবারণ করি। "দুখের বিভাবরী পোহাইল।" "আজ এই উচ্চতর লোকে তোমাদিগকে দেখিয়া কি আনন্দ মিলিল।" আহা! কি সুখের অবস্থা! যে সকল মহাত্মাগণ অনেক দিন পূর্ব্বে এই অবস্থাতে উপনীত হইয়াছেন, যাঁহাদিগের কীর্ত্তি শ্রবণ অথবা গ্রন্থ পাঠ করিয়া মন প্রেমপুলকে পূর্ণ হইত এবং যাঁহাদিগকে কখন না দেখিয়াও চিরপরিচিত সুহৃদের ন্যায় জ্ঞান করিতাম, অদ্য তাঁহাদিগকে দেখিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিব। আহা! কি অননুভূতপূর্ব্ব অনুভব ও বোধ সকল চতুর্দ্দিক হইতে আমার মনের উপর বর্ষিত হইতেছে, তাহাদের জনতাতে আমি অভিভূত হইতেছি।

হে মর্ত্তলোকবাসী দার্শনিকগণ! তোমরা অনেক চিন্তা করিয়া যাহা লিখিয়াছ তাহার অধিকাংশ এক্ষণে আমার অলীক বোধ হইতেছে। তোমরা বৃথা ঊর্ণনাভজাল সংরচন

* মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আত্মার কি রূপ অবস্থা হইবে তাহা কেহই নিশ্চয় রূপে বলিতে পারে না কিন্তু যত দূর সম্ভব বোধ হয় তাহা অবলম্বন করিয়া এই প্রস্তাব লিখিত হইল।

* "অহির্নির্ল্লয়নী" প্রভৃতি——বৃহদারণ্যক উপনিষদ্।

করিয়া তাহাতে আপনা আপনি জড়িত হইতেছ। আহা! এক্ষণে এই অভিনব লোকে ঈশ্বরের অভিনব কীর্ত্তি সকল অভিনব চক্ষে দর্শন করিয়া কি আনন্দ লাভ করিতেছি। "হা! বুহা! বূ!" ধন্য জগদীশ্বর! তুমিই ধন্য! এই উচ্চতর লোক হইতে আরও উচ্চতর লোকে যাইতে যখন তুমি আদেশ করিবে তখন আমি আহ্লাদিত চিত্তে তোমার আদেশ পালন করিব। আমি এমন কোন লোকে যাইব না যেখানে তোমার প্রেমময় হস্ত দেদীপ্যমান নাই। সেখানে গমন পূর্ব্বক নূতন নূতন ভক্তি ও প্রীতিপুষ্প চয়ন করিয়া তোমার চরণে অর্পণ করিব।

পার্থিব পদার্থের অকিঞ্চিৎকরতা।

মনুষ্য অপেক্ষা এমন সকল শ্রেষ্ঠ জীব থাকিতে পারে যাহাদিগের দৃষ্টিতে এই মহদায়তন পৃথিবী ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীত হয়। বর্ষার সময় গৃহের প্রাঙ্গণ জলপূর্ণ হইলে পিপীলিকার দৃষ্টিতে যেমন তাহা সমুদ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয় কিন্তু আমাদিগের দৃষ্টিতে অতীব ক্ষুদ্র জলরাশির ন্যায় বোধ হয়, তেমনি আমাদের দৃষ্টিতে সমুদ্র অসীম বলিয়া প্রতীয়মান হয় কিন্তু শ্রেষ্ঠতর জীবদিগের দৃষ্টিতে অতীব ক্ষুদ্র জলাশয় বলিয়া বোধ হইতে পারে। এমন সকল জীবের দৃষ্টিতে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য সকল অতি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড বলিয়া বোধ হয়। কোন প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি, এক জন গর্ব্বিত ধনবান যুবক ভূস্বামীকে পৃথিবীর মানচিত্রের নিকট লইয়া গিয়া, তাহার উপরে তাঁহার অধিকারকে দেখাইতে বলিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার গর্ব্বের খর্ব্বতা হইল। ভূসম্পত্তি যেমন অকিঞ্চিৎকর, মুদ্রাসম্পত্তিও সেইরূপ অকিঞ্চিৎকর। মুদ্রাকে ধন বলা যাইতে পারে না, দুর্ভিক্ষের সময় লোকে মুদ্রা চর্ব্বণ করিয়া প্রাণধারণ করিতে পারে না। কোন পথিক আরব দেশের বিস্তীর্ণ বালুকাময় মরুভূমি পর্য্যটন সময়ে যখন জল না পাইয়া তৃষ্ণায় অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার কটিদেশে লম্বমান মুদ্রাধারস্থিত স্বর্ণমুদ্রার অকিঞ্চিৎকরতা প্রতীতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মুদ্রা প্রকৃত ধন নহে, তদ্বিনিময়ে যে সকল ব্যবহার্য্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই প্রকৃত ধন। কিন্তু পৃথিবীতে মনুষ্যের প্রয়োজন অল্প এবং সেই প্রয়োজন অধিক দিনের নিমিত্ত নহে। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীয় আবাস নগরীর আপণ সকল দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, এখানে কত দ্রব্য আছে, যাহা আমার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। ঐশ্বর্য্য দ্বারা মনুষ্যের স্বাভাবিক দীনতা দূরীকৃত হয় না। পীড়ার সময় যখন ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিকে দেখা যায়, এক জন তাঁহাকে তুলিয়া না ধরিলে তিনি উঠিতে পারেন না, মুখে খাদ্য দ্রব্য উত্তোলন করিয়া না দিলে তিনি আহার করিতে পারেন না, তখন দরিদ্র ব্যক্তিকে যেমন দীন বোধ হয়, তাঁহাকেও সেই রূপ দীন বোধ হয়। ধনও যেমনি অকিঞ্চিৎকর মানও তেমনি অকিঞ্চিৎকর। একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকা পিপীলিকারাজের নিকট হইতে নিজ শরীরের আয়তনানুযায়ী "ভারতনক্ষত্র" উপাধিসূচক ভূষণ প্রাপ্ত হইয়া তাহা পরিধান পূর্ব্বক যদি গর্ব্বিত ভাবে ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করে তাহাকে যেমন হাস্যাস্পদ বোধ হয়, তেমনি মনুষ্য ঐ প্রকার ভূষণ বক্ষোদেশে স্থাপিত করিয়া গর্ব্বিত ভাবে ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিলে জ্ঞানের দৃষ্টিতে হাস্যাস্পদ বোধ হয়। মানও যেমন অকিঞ্চিৎকর, যশও তেমনি অকিঞ্চিৎকর। যদি এক পিপীলিকাগর্ত্ত হইতে অন্য পিপীলিকাগর্ত্ত পর্য্যন্ত কোন পিপীলিকার যশ বিস্তৃত হয়

তাহা যেরূপ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কোন মনুষ্যের যশ আসিয়াখণ্ড হইতে ইউরোপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে সেইরূপ অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়। কালপ্রভাবে সেকস্‌পিয়র ও কালিদাসের যশও বিস্মৃতিসাগরে বিলীন হইবে। মনুষ্য স্বভাবতঃ ধন মান যশ জন্য গর্ব্বিত হইয়া থাকে এবং সেই গর্ব্বভাবে স্ফীত হইয়া পৃথিবীকে শরাবতুল্য দেখে এবং নানা অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু বিবেচনা করিলে ধন মান যশ অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ বোধ হইবে। অতএব পার্থিব ধন অপেক্ষা সেই নিত্যধন উপার্জ্জন করিতে যত্নবান হও। সামান্য অর্থ অপেক্ষা সেই পরমার্থ লাভ করিতে সচেষ্টিত হও। পার্থিব যশ অপেক্ষা হৃদয়স্থিত সেই পুণ্যপাপেক্ষিতা পুরুষের নিকট সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইবার জন্য যত্নশীল হও যে কল্যাণ হইবে।

বিজ্ঞান ধর্ম্মের অবিরোধী।

পৃথিবীতে যে সকল বিদ্যা ব্রহ্মবিষয়ক যথার্থ তত্ত্বের উপদেশ করে তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

এক্ষণে বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে অনেকের ধ্রুব সংস্কার আছে যে, পদার্থ বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা ঈশ্বর-বিষয়ক যথার্থ তত্ত্বের জ্ঞান আমরা প্রাপ্ত হই না, বরঞ্চ পদার্থ-বিজ্ঞান ঈশ্বর হইতে ও ধর্ম্ম হইতে আমাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করে। বাস্তবিক এই সংস্কারটি ভ্রমাত্মক। পদার্থ বিদ্যা মিথ্যাধর্ম্মের উন্মূলক, ইহা প্রকৃত ধর্ম্মের পরিপন্থী নহে। ইউরোপে যেখানে পদার্থবিদ্যার এখন বহুল প্রচার হইতেছে তথায়ও অনেক ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু ব্যক্তি আছেন যাহারা এক এক জন বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত। সুতরাং এক্ষণে ধর্ম্মবিষয়ে পদার্থবিদ্যার শক্তি ও অধিকার নিরূপণ করা অসঙ্গত ও অনাবশ্যক নহে।

সত্যের প্রতি বিশ্বাস উৎপাদন পদার্থ বিদ্যা আলোচনার অব্যর্থ ফল। সত্য যে একেবারে অপরিবর্ত্তনীয় ও অনুল্লঙ্ঘনীয় পদার্থ বিদ্যা তাহাই উচ্চৈঃস্বরে শিক্ষা দিতেছে। জ্যামিতি, যন্ত্রবিজ্ঞান, ও রসায়ণ প্রভৃতি বিদ্যা আলোচনা দ্বারা সত্যের অপরিবর্ত্তনীয়তা বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন হয় ও ঐরূপ বিশ্বাস হইলে মনুষ্যের ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক বল লাভ করে। যাঁহারা কেবল কবিতা ইতিহাস, পুরাণ ও রাজনীতি হইতে শিক্ষা লাভ করেন তাহাদের মন প্রায় এরূপ বিশ্বাসের দিকে ধাবিত হয় যে, সত্য ধর্ম্মনীতি প্রভৃতির ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, অতএব ইহাতে নির্ভর করা যায় না। তাঁহাদের যে ধর্ম্ম তাহা অব্যবস্থিত মতের উপর অথবা দেশ কাল ও অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সুতরাং সর্ব্বদাই শিথিল। সত্যের পরিবর্ত্তন নাই, ঈশ্বরের নিয়ম সকল নিত্য, কেহই তাহার অন্যথা করিতে পারে না, এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় ব্যতীত মনুষ্য প্রকৃত ধর্ম্মবল লাভ করিতে পারে না। পদার্থবিদ্যা সত্যের সৌন্দর্য্য ও নিয়মের অলঙ্ঘ্যতা প্রদর্শন করিয়া মনকে সত্যের অনুরক্ত, ও নিয়মের বশীভূত হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে।

পদার্থবিদ্যা নিষ্ঠুর-রূপে সমুদায় কুসংস্কার হৃদয় হইতে দূর করিয়া দেয়। যেমন সূর্য্য উদয় হইলে সমুদায় প্রকাশ পায় সেইরূপ পদার্থবিদ্যা প্রভাবে সমুদায় পদার্থ ও ঘটনার প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হয়, পৌত্তলিকতা, অলৌকিক ক্রিয়ার ভান ও ধর্ম্মের অমূলক ভয় সকল পলায়ন করে, মনুষ্যের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা বিকশিত হয়, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা লজ্জা পায়, উদারতা বৃদ্ধি হয় ও সমগ্র জগতের মধ্যে এক প্রকার একতানতা দৃষ্ট হয়। এসমস্ত বিষয়ই ধর্ম্মের

পক্ষের সম্বল। ইহা নিশ্চয় যে, এ দেশে যত অধিক পদার্থ বিদ্যার আলোচনা হইবেক ততই লোকের মন সত্যধর্ম্মের প্রতি আকর্ষিত হইবে ও ধর্ম্মবিষয়ক উদারতা বৃদ্ধি পাইবেক।

যখন পদার্থ বিদ্যা অসীম আকাশস্থিত অসংখ্য লোকমণ্ডলের পরিচয় দেয়, তাহাদের পরিমাণ ও গতিবিধি প্রদর্শন করে; পৃথিবীর অপেক্ষা বৃহৎ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমাণ গ্রহ ও উপগ্রহ সকল আবিষ্কার করে, এবং এইরূপ শত শত সৌর জগৎ আবিষ্কার করে; যখন উদ্ভিদ্‌রাজ্যের সূক্ষ্ম কৌশল আমাদিগকে দেখাইয়া দেয়, যখন মনুষ্যদেহের নির্ম্মাণ-কৌশল, পৃথিবীর তাবৎ ভৌতিক পদার্থের গুণ ও শক্তি প্রকাশ করিয়া দেয়; তখন ঈশ্বরের জগৎ কি অপরিমেয় বলিয়া বোধ হয় এবং যে পূর্ণ শক্তি হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহা ধারণ করিবার নিমিত্ত কল্পনা-শক্তি কেমন বিস্তৃত হইতে থাকে ও ইহার নিয়ন্তাকে কেমন নূতন বেশে চিত্রিত করে। ইহাতে আমাদের ধ্যান ও ধারণা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ঈশ্বরের সন্নিহিত হয় ও প্রাশস্ত্য লাভ করে। ইহার প্রভাবে আমাদের বালকোচিত অনেক ভ্রম অল্প হইয়া যায়, আমাদের হৃদয় অপেক্ষাকৃত মহত্ত্ব লাভ করে, এবং ধর্ম্মভাব ক্রমে ক্রমে উন্নত হইতে থাকে।

এইরূপে পদার্থ বিদ্যা হইতে ধর্ম্ম গাম্ভীর্য্য বল সামঞ্জস্য বিশুদ্ধতা মহত্ত্ব ও বিশ্বজনীনতা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু বাহ্য বিষয়ক বিজ্ঞান আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও বিবেক শিক্ষা দিতে পারে না। পদার্থ বিদ্যাতে অধিকার হইলেও পৃথকরূপে মন ও মনোবৃত্তি সমুদায় আলোচনা করা আবশ্যক। এই জন্যই এক জন বিখ্যাত দর্শনশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে, কেবল পদার্থ বিদ্যার আলোচনা করিলে মনুষ্যের মন ক্রমে ক্রমে নাস্তিকতায় ও জড়াত্মবাদে আসিয়া পড়ে, সেই জন্য, পদার্থ বিদ্যার শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মনোবিজ্ঞানে মন নিবিষ্ট করা উচিত। হৃদয়ের উচ্চ ভাব সকল পদার্থ বিদ্যা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়; তদ্দ্বারা জড় রাজ্যের কার্য্য ও নিয়ম অবগত হওয়া যায় কিন্তু আত্মার কার্য্য ও নিয়ম জানা যায় না। এই প্রসঙ্গে এক জন সুপণ্ডিত বলিয়াছেন যে "পদার্থ বিদ্যা ধর্ম্মে আস্থা দান করে, কিন্তু কদাপি প্রাণ দান করিতে পারে না। যাঁহারা কেবল পদার্থ বিদ্যা হইতে শিক্ষা লাভ করিতে যান, তাঁহারা জড়-রাজ্যের ও আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে কি কি সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তাহা অনুসন্ধান করিতে পারেন না। প্রত্যুত আত্মাকে জড়-রাজ্যের ন্যায় বদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করিতে যান। যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ ও তাহার পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে তাহাতেই তাহাদের বিশ্বাস জন্মে, অতীন্দ্রিয় বিষয় সকল তাহাদের মনে ছায়ার ন্যায় বোধ হয়।"

যাঁহারা পদার্থ-বিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান উভয়ই আলোচনা করেন তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, কোন্ বিদ্যার নিকট কি কি প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ উভয়ই ঈশ্বরের সৃষ্ট, সকল সত্যই তাঁহাতে একতান হইয়া আছে। কিন্তু যে বিদ্যাই আমরা আলোচনা করি না—"ব্রহ্মই আমাদিগের লক্ষ্য—ধর্ম্মই আমাদিগের নেতা—ঈশ্বরই আমাদের গুরু—সমস্ত পৃথিবীই আমাদের শাস্ত্র।" এক্ষণে বিদ্যালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় সভ্যতা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের প্রতি উদাসীনতা প্রবেশ করিতেছে। এক্ষণে শিক্ষিতদিগের মধ্যে ধর্ম্মভাবের বিলক্ষণ শৈথিল্য দৃষ্ট হয়। পৌরাণিক ধর্ম্মে তাহাদের

বিশ্বাস শিথিল হইয়াছে, কিন্তু শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্মে বিশ্বাস তাঁহাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় নাই। শিক্ষিত দলের মধ্যে পৌরাণিক ধর্ম্মে আন্তরিক বিশ্বাস প্রায় কাহারও নাই। 'যে সমাজ ধর্ম্মবিষয়ে অসার, সে অন্য সকল বিষয়ে অসার হইয়া পড়ে। যে সমাজে ধর্ম্মবিষয়ে এরূপ অসারতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহার সমূহ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। বঙ্গদেশে এক্ষণে হিন্দুসমাজ এরূপ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এপ্রকার অসুস্থ অবস্থার ঔষধ কেবল প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতেই আমরা ভারতবর্ষের ভাবী মঙ্গল সম্পূর্ণ রূপে আশা করি।

বিদ্যা।

বিদ্যা মাত্রেই জ্ঞান-সাধক, মনোহারী, এবং কার্য্য-সাধক, এই তিনটি অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। দর্শন-শাস্ত্র প্রধানতঃ জ্ঞান-সাধক, কিন্তু তাহাও আংশিকরূপে মনোহারী এবং কার্য্য-সাধক। চিকিৎসা বিদ্যা প্রধানতঃ কার্য্য-সাধক, কিন্তু তাহাও আংশিকরূপে মনোহারী এবং জ্ঞান-সাধক। সঙ্গীত-বিদ্যা প্রধানতঃ মনোহারী কিন্তু তাহাও আংশিক রূপে জ্ঞানসাধক এবং কার্য্য-সাধক।

বিদ্যার মনোহারী এবং কার্য্যসাধক এই দুই অংশকে যদি জ্ঞানাংশ হইতে পৃথক্ করা যায়, তাহা হইলে সেই দ্ব্যংশিক বিদ্যাকে শিল্প, সঙ্গীত, এবং কবিতা এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। হস্ত দ্বারা কোন প্রয়োজন সাধিত অথবা মনোহারী বস্তু বা দৃশ্য রচিত হইলে তাহাকে শিল্প কহা যায়, এবং তৎসংক্রান্ত বিদ্যাকে শিল্পবিদ্যা কহা যায়। বস্ত্রবয়ন-বিদ্যা, স্থাপত্য ইত্যাদি উহার দৃষ্টান্ত রূপে গণ্য হইতে পারে। চিত্রবিদ্যা এবং ভাস্করবিদ্যা এ দুই বিদ্যাও শিল্প বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে; কেন না উভয়ই হস্ত দ্বারা বিরচিত হয়। কিন্তু তথাপি শেষোক্ত বিদ্যাদ্বয়ে মনুষ্যের মনের ভাবকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, এই কারণে উহারা সামান্য শিল্পের মধ্যে গণ্য হয় না। পরন্তু কবিতার সহিত উহারদের উক্ত বিষয়ে সাদৃশ্য থাকাতে উহাদিগকে কবিতা এবং শিল্প উভয়ের সন্ধিস্থলে স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। সঙ্গীত এবং কবিতা উভয়েতে মনের ভাবকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে, বাহ্য সৌন্দর্য্য এবং প্রয়োজন তেমন সমাদৃত হয় না। একটি উত্তম টুপি রচিত হইলে, তাহা শিল্পকার্য্যের মধ্যে অতি প্রধান পদবী প্রাপ্ত হইলেও, তাহাতে মনুষ্য-মনের ভাব-প্রকাশক সৌন্দর্য্য না থাকাতে তাহা সঙ্গীত এবং কবিতার পার্শ্বে স্থান পাইবার অযোগ্য। এই কারণ বশত: সঙ্গীত এবং কবিতার সহিত চিত্র-বিদ্যা ভিন্ন অন্য কোন শিল্প-বিদ্যাই উপমেয় হয় না।

বিদ্যার প্রথম উন্মীলন সময়ে তাহার মনোহারী এবং প্রয়োজনীয় অংশেরই অনুশীলন হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রথমে অস্ত্রের প্রয়োজন হয়—তখন বাসবাটীর কোন প্রয়োজন ছিল না, অস্ত্র না হইলে চলিত না, অস্ত্রের উপর মনুষ্যের খাদ্য আত্ম-রক্ষা সকলই নির্ভর করিত—দৃঢ়-তৃণ-নির্ম্মিত শর বোধ হয় তাঁহাদের প্রথম অস্ত্র। ক্রমে কাষ্ঠ প্রস্তর পিত্তল ও লৌহের নির্ম্মিত অস্ত্র ব্যবহৃত হয়। ক্রীর বর্ষা কুঠার প্রভৃতি কতকগুলি সাধারণ অস্ত্র পৃথিবীর সুসভ্য আর্য্যজাতি হইতে আফ্রিকা-নিবাসী হটেণ্টট্ পর্য্যন্ত সকলি ব্যবহার করে। কিছু দিন পরে হিংস্র জন্তুদের আক্রমণ ও রৌদ্র বৃষ্টি হইতে কতকাংশে রক্ষা পাইবার জন্য পৃথিবীর আদিম নিবাসীরা বেষ্টনবিশিষ্ট বাস স্থানের অভাব অনুভব করে।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে অত্যন্ত দীর্ঘ তৃণ জন্মিত, অসভ্য অধিবাসীরা প্রথমে সেই তৃণের শীর্ষদেশ চূড়ার ন্যায় বাঁধিয়া ও তাহাই লতা পাতায় বেষ্টিত করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিত। ক্রমে তাহার অসুবিধা অনুভব করিয়া সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ আরম্ভ করিল। কিন্তু তখনো তাহারা স্থায়ীভাবে কোথাও বাস করিত না, কিন্তু এরূপ অস্থায়ী বাসস্থানের নানা বিপদ দেখিয়া বাসস্থান স্থায়ী করিবার নিমিত্ত যত্ন পাইল। এই সময়ে হয়ত তাহারা খুঁটি পুতিয়া ও তাহার গাত্রে মৃত্তিকা লেপন করিয়া তাহাদের স্থায়ী বাসস্থান দৃঢ় করিত। আরো দৃঢ় করিবার জন্য হয়ত তাহারা অনেক প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিয়া ও তাহাই উপর্য্যুপরি ভাবে স্থাপন করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা সংযুক্ত করিত। নদী বা সিন্ধুতীরে যাহারা বাস করে, তাহারা বালুকার দ্বারা মৃত্তিকার কার্য্য করিয়া দেখিল, তাহাতে আরো অধিক দৃঢ় হয় এবং তাহাদের অনুকরণে অন্যেরা হয়ত এইরূপ নদীতীর হইতে বালুকা বহন করিয়া নিজ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ইষ্টক আবিষ্কৃত হইল। গিরিগুহার অনুকরণে বাসবাটী নির্ম্মিত হইল, সূক্ষ্মচূড় গিরিশিখরের অনুকরণে মন্দির নির্ম্মিত হইল, স্থাপত্য ক্রমে উন্নতি লাভ করিল।

এইরূপে বাসবাটী অস্ত্র প্রভৃতি মনুষ্য-সমাজে প্রচলিত হইলে পর বস্ত্র ব্যবহৃত হয়—শীতপ্রধান দেশে প্রথম বস্ত্রের ব্যবহার হয়। প্রথম, শীত নিবারণের জন্য তাহারা পশু-চর্ম্ম প্রভৃতি ব্যবহার করিত; গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বল্কলনির্ম্মিত সূক্ষ্মতর বস্ত্রে মনুষ্যেরা সজ্জিত হইত। বস্ত্রের সহিত নানা প্রকার আভরণ সমাজে প্রচলিত হয়—অনুকরণপ্রিয়তার ন্যায় সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা মনুষ্যের স্বাভাবিক। বোধ হয়, প্রথমে লতা পত্র পুষ্প দ্বারা তাহারা আপনাদিগের দেহ সজ্জিত করিত, কিন্তু পুষ্প অস্থায়ী বলিয়া—সেই পুষ্পাদির অনুকরণে প্রস্তরে লৌহে অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিয়া শরীরে ধারণ করিত। অগ্নির আবিষ্কার হইলে পর আম মাংস-ভোজন প্রথা অনেকাংশে দূর হইলে রন্ধন ভোজন পানপাত্র প্রভৃতি প্রচলিত হইল। মনুষ্যেরা স্বভাবতঃ সৌন্দর্য্যপ্রিয় বলিয়া আপনাদের প্রয়োজনীয় বস্তুতে যথাসাধ্য সৌন্দর্য্য অর্পণ করিতে চেষ্টা করে। এই রূপে পুরাকাল হইতে এই সকল পাত্রাদি ক্রমে ক্রমে মধুর গঠন প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে; অনেক অসভ্য দ্বীপেও সুদৃশ্য পাত্র পাওয়া গিয়াছে। আদিম কালের ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় শিল্পের মধ্যে পাত্রই সমধিক উন্নত হয়। অতিশয় প্রাচীন কাল হইতেই এবং পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই কুম্ভকার-চক্র প্রচলিত আছে। গ্রীক ইলিয়াড্ কাব্যে বাইবলে মিশর দেশস্থ প্রাচীন চিত্রপটে এই কুম্ভকার-চক্রের বিষয় লিখিত ও অঙ্কিত আছে। আমাদের প্রাচীন পুস্তকেও কুম্ভকার-চক্রের অনেক উল্লেখ আছে। অনেক প্রাচীন কবরের মধ্য হইতে মনুষ্য-কঙ্কালের সহিত অনেক পাত্র পাওয়া গিয়াছে।

মনোহারী শিল্পও যে আমাদের প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে নাই এমন নহে, প্রয়োজনীয় না হইলেও বোধ হয় ক্রমশঃ এত উন্নত হইতে পারিত না। অনুকরণেচ্ছা হইতে প্রধানতঃ প্রসূত হইয়া চিত্রবিদ্যা মনুষ্যের মনোভাব প্রকাশ করিবার প্রধান উপায় ছিল। অক্ষরের অভাবে বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় বুঝাইবার জন্য চিত্র ব্যবহৃত হইত। এখনো কোন কোন অসভ্যদিগের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত আছে। প্রাচীন কালে

গ্রীশ ও ইজিপ্টে এই রীতি প্রচলিত ছিল। তত্রত্য লোক চিত্রের দ্বারা অক্ষরের অভাব পূরণ করিতেন। এইরূপ চিত্রময় অক্ষরকে হাইরগ্লিফিক্স্ কহে।

চিত্রে মনুষ্যের আর একটি মহান্ প্রয়োজন সাধন হইয়াছে। আমরা যাহাকে অনেক কাল হইতে প্রীতি, স্নেহ, ভক্তি করিয়া আসি, তাহাকে আমরা সহজে ভুলিতে চাহি না—তাহার ধ্বংস হইলেও আমরা তাহাকে মনে রাখিবার জন্য তাহার কোন প্রকার চিহ্ন রাখিয়া দিই—মনুষ্যের এই স্বভাবের জন্য শিল্পের অনেক উন্নতি হইয়াছে, এই জন্যই মনুষ্য মৃত আত্মীয়ের কবরের উপর শিলাস্তম্ভ বা অন্য কোন স্মরণচিহ্ন প্রোথিত করে। এই নিমিত্তই পৃথিবীর মধ্যে একটি আশ্চর্য্যতম শিল্প পিরামিড সৃষ্ট হইয়াছে—মিশরীয়গণ এই জন্যই "মামীর" সৃষ্টি করিয়াছিল। চিত্র-বিদ্যাও মনুষ্যের সেই স্মরণ রাখিবার চেষ্টারই সাহায্য করিয়া আসিয়াছে।

চিত্র-বিদ্যার ন্যায় ভাস্কর্য্যও মনুষ্যের প্রতিকৃতি নির্ম্মাণে নিয়োজিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণেই ভাস্কর্য্য আদিম মনুষ্যদের অধিক ব্যবহারে আসিয়াছিল এবং দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণেই ভাস্কর্য্য গ্রীশে ভারতবর্ষে এত উন্নতি লাভ করিয়া আসিয়াছে।

অনুকরণেচ্ছা মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শিশুরা যাহা প্রত্যহ দেখে তাহারই অনুকরণ করে। সেই অনুকরণেচ্ছা হইতেই শিল্প প্রসূত হইয়াছে। সেই আদিম নিবাসীরা প্রথমে মনুষ্যের অনুকরণে যদৃচ্ছাক্রমে মৃত্তিকাময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেন। এইরূপে কতকখানি মৃৎপিণ্ডে মনুষ্যের সাদৃশ্য অবলোকন করিয়া দর্শকেরা অতিশয় বিস্মিত হইতেন এবং নেত্রতৃপ্তি লাভ করিয়া তাহাতেই দেবত্ব আরোপণ করিতেন। এইরূপে দেবমূর্ত্তির সৃষ্টি হইল, সুতরাং প্রয়োজনীয় হইয়া পড়াতে ও ক্রমশঃ চর্চ্চায় তাহাই উন্নত হইল এবং ক্রমে মৃত্তিকা হইতে কাষ্ঠ ও কাষ্ঠ হইতে প্রস্তরে মূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রথা প্রচলিত হইল। কিম্বা হয়ত কেহ পর্ব্বতের উপত্যকায় রাশি রাশি শিলাস্তূপের মধ্যে এক খানি প্রস্তরে মনুষ্য, পশু বা অন্য কোন ফল পুষ্পের সাদৃশ্য অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং অন্য অন্য প্রস্তরখণ্ড ভগ্ন করিয়া সেই অনুকরণে নির্ম্মাণ করিলেন। এইরূপে হয়ত ভাস্কর্য্যের সৃষ্টি হইল এবং দেব-মূর্ত্তি নির্ম্মাণে তাহার উন্নতি হইল।

ভাস্কর্য্য গ্রীশে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে এমন আর কোন দেশেই নয়। প্রতিমা পূজার চর্চ্চা না থাকিলে গ্রীশ এত ভাস্কর্য্যে উন্নত হইতে পারিত না। কিন্তু ভারতবর্ষেও প্রতিমাপূজার প্রথা প্রচলিত ছিল; তবে ভারতবর্ষে আধুনিক তন্ত্রশাস্ত্র প্রকাশের পর যত দেবদেবীর পূজা প্রচলিত হইয়াছে তৎপূর্ব্বে তত ছিল না, এবং ভারতবর্ষের দেব দেবীর প্রতিমা অধিকাংশই অমানুষিক ভাবে গঠিত হইত; কিন্তু গ্রীশের দেবমূর্ত্তি প্রায়ই মানুষিক এবং গ্রীকেরা প্রাচীন ভারতবাসীদের ন্যায় সজীব মনুষ্যের প্রতিমা গঠনে অমনোযোগী ছিলেন না। ভারতবর্ষে গ্রীশীয়দের ন্যায় বর্ণবিন্যাসরহিত প্রস্তরমূর্ত্তি তত প্রচলিত ছিল না, আমাদের দেশে নানা বর্ণে চিত্রিত দারুময়ী ও ধাতুময়ী প্রতিমূর্ত্তি ধনীদিগের বিলাসসজ্জার অঙ্গ ছিল। কালিদাস জনশূন্যা অযোধ্যা নগরীর বর্ণনায় কহিয়াছেন "স্তম্ভেষু যোষিৎপ্রতিযাতনানাম্ উৎক্রান্তবর্ণক্রমধূসরাণাং" "স্তম্ভোপরি বিন্যস্ত স্ত্রীলোকের দারুময়ী প্রতিমূর্ত্তি সকল বর্ণবিন্যাস বিলুপ্ত প্রায় হওয়াতে ধূসরবর্ণ হইয়া গিয়াছে" কিন্তু আমাদের দেশে স্থাপত্য যেরূপ উন্নত হইয়াছিল এরূপ বোধ হয় কোন দেশেই হয় নাই, যদিও আমরা ইন্দ্রপ্রস্থের প্রাচীন রাজপুরী, সোমনাথের বিখ্যাত মন্দির প্রভৃতি কিছুই দেখিতে পাই না, তথাপি ইলোরার গুহা গুর্জ্জরস্থিত আবু পর্ব্বতের জৈনমন্দির দিল্লির উচ্চ স্তম্ভ যাহাকে মুসলমানেরা "কুতব মিনর" আখ্যা দিয়াছে এই সকল দেখিলেও সেই আর্য্য জাতির স্থাপত্যের উন্নতি অনুভব করা যায়।

রাখালেরা গাবীদিগকে মাঠে ছাড়িয়া দিয়া যখন আতপ নিবারণের জন্য বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে বসিত, তখন হয়ত, এক শিলাখণ্ড লইয়া ভূমিতে গোল এক দাগ কাটিত ও তাহার চতুর্দ্দিকে রশ্মিরেখার লম্ব চিহ্ন দিয়া সূর্য্যের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিত, ক্রমে তাহাই বৃক্ষের গাত্রে অঙ্কিত করিত, নিকটস্থ শৈলের প্রস্তরে অঙ্কিত করিত। এইরূপে ক্রমে সূর্য্য চন্দ্র গো মনুষ্য প্রভৃতি আঁকিতে চিত্রবিদ্যার সৃষ্টি হইল। অনেক প্রাচীন গহ্বরে ঐরূপ প্রস্তরে অঙ্কিত বৃহৎ ভল্লুক গো মনুষ্যের চিত্র পাওয়া গিয়াছে। তদ্ব্যতীত সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাও প্রাচীন শিল্পের উদ্ভাবক বলিয়া পরিচিত হইতে পারে।

ইহা আমরা আধুনিক অসভ্য জাতিদের সমালোচনায় অনুমান করিতে পারি। অসভ্য জাতিরা আপনাদের মুখ ও অন্যান্য অঙ্গ চিত্রিত করে এবং উল্কির দ্বারা মুখশ্রীর শোভা সম্পাদনে যত্নবান হয় এবং এই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার জন্যই তাহারা গৃহাদির ভিত্তি ও ব্যবহার্য্য দ্রব্য নানা রূপে চিত্রিত করে। এইরূপে অসভ্যদের মধ্যে চিত্র প্রচলিত আছে ও পুরাকালের আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও ছিল। অনেক শিল্পের উৎপত্তি দৈবক্রমেও হইতে পারে, হয়ত যদৃচ্ছাক্রমে ভূমি লিখন করিতে করিতে পত্রাদির সাদৃশ্য অঙ্কিত হইয়া যাইতে পারে ও সেই সাদৃশ্য অবলোকনে বিস্মিত হইয়া তাহার অনুকরণে অন্যান্য চিত্রের উৎপত্তি হইতে পারে।

এরূপ গল্প প্রচলিত আছে যে একটী কুম্ভকারকন্যা ভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত তাহার সুপ্ত নায়কের ছায়া অঙ্কিত করে, তাহা হইতেই চিত্রবিদ্যার প্রথম উৎপত্তি। যদিও ইহাকে কল্পিত উপাখ্যান বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়, তথাপি শিল্পের উৎপত্তি সম্বন্ধে এরূপ গল্প অসম্ভব নয়। এই প্রকারে চিত্রের উৎপত্তি না হউক্, উন্নতি হইতে পারে বিশ্বাস করি।

ইটালি চিত্রবিদ্যায় অন্যান্য দেশ অপেক্ষা উন্নত ছিল এবং এখনো আছে। এই রূপে দেখা যায়, শিল্পের কঠিন তিন ভাগ তিন প্রাচীন জাতি অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ স্থাপত্য, গ্রীশ ভাস্কর্য্য ও ইটালি চিত্রবিদ্যা। কিন্তু এখন ভারতবর্ষ, পূর্ব্বকার সেই বিদ্যা হারাইয়াছে; গ্রীশ ও রোমও যদি ভারতবর্ষের ন্যায় এতকাল এক জাতি হইতে অপর জাতির অধীনতা সহ্য করিয়া আসিত তবে ভাস্কর্য্য ও চিত্রও গ্রীশ রোমে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। যদিও গ্রীক ও রোমকেরা কিছু কাল বিদেশীয়দের অধীন ছিল তথাপি তাহা অল্পকাল, ও তাহাদিগের সমকক্ষ সভ্য জাতিদিগেরই অধীন ছিল। গ্রীশ কিছু কাল তুরস্কের অধীন থাকিয়াই এখন এমন নিকৃষ্ট অবস্থাপন্ন হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদের দেশের জগদ্বিখ্যাত কবি দার্শনিক প্রভৃতির নাম অনেকে জানে না। অধীনতার মধ্যে যদি তেমন প্রতিভাসম্পন্ন লোক জন্ম গ্রহণ করেন তাঁহার প্রতিভা বেষ্টনবদ্ধ পাদপের ন্যায় কদাচই বাড়িতে পারে না।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্র।

সত্যং তীর্থং ক্ষমাতীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতদয়াতীর্থং সর্ব্বত্রার্জ্জবমেব চ।
দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থমুচ্যতে।
ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা।
জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং পুণ্যং তীর্থমুদাহৃতং।
তীর্থানামপি তত্তীর্থং বিশুদ্ধির্মনসঃ পরা।

চিত্তশুদ্ধিই প্রশস্ত তীর্থ, কিন্তু মনুষ্য ঈশ্বরকে জগতের মহিমার মধ্যে বিলসিত দেখিতে ইচ্ছা করে, এই ব্যাকুলতার জন্য সে গৃহের বাহির হয় এবং পর্য্যটকের বেশ ধারণ করে। তীর্থ ভ্রমণ কেবল হিন্দুজাতিতে নাই, ইহা প্রায় জাতি-সাধারণ। পৃথিবীর অন্যান্য খণ্ডেও ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

পৃথিবীর কোন কোন স্থান শরীরের অঙ্গ-বিশেষের ন্যায় উৎকৃষ্ট। যথায় মৃত্তিকা জল বায়ু স্বাস্থ্যকর এবং যেস্থানে জ্ঞানিগণের সবিশেষ সমাগম আছে তাহাই পবিত্র তীর্থ*। তীর্থস্থলে পদব্রজে গমন আবশ্যক†। তীর্থের এইরূপ লক্ষণ এবং পর্য্যটন-ব্যবস্থা আলোচনা করিলে বোধ হয়, শাস্ত্রকারগণ লোকের স্বাস্থ্য সাধন ও জ্ঞানোপার্জ্জন হইবার জন্য তীর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। পদব্রজে ভ্রমণ একটী উৎকৃষ্ট ব্যায়াম; ইহাতে শরীর সুদৃঢ় হইয়া ধর্ম্মসাধনের অনুকূল হইয়া থাকে। তীর্থে গিয়া ঋষিনিবাস দেখিতে হয়, ইহাতে লোকের ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মদীক্ষা উভয়ই হইয়া থাকে। এই তীর্থ পর্য্যটন-প্রসঙ্গে নানা দেশ দর্শন ও নানা জাতির সহিত সম্ভাষণ করিয়া বহুদর্শিতা লাভ হয়। পথের কোন স্থানে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, কোন স্থানে নিবিড় অরণ্য, কোন স্থানে গগনস্পর্শী পর্ব্বত ও কোথাও বা দূরপ্রসারিত মহাসমুদ্র, এই সমস্ত দেখিলে চিত্তের প্রাশস্ত্য জন্মে এবং স্রষ্টার সৌন্দর্য্যে সৃষ্টির সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া মনোমধ্যে প্রীতি ও ভক্তির উদ্রেক হয়। পথিমধ্যে নানা বর্ণের নরনারী মহা উৎসাহে চলিয়াছে, কাহারই মনে কোন রূপ অসঙ্গত ইচ্ছা নাই এবং স্বার্থ অস্বতন্ত্র বলিয়া পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বিস্তার হইতেছে। পিতা প্রণাধিক কন্যাপুত্রকে রাখিয়া যাইতেছেন, মাতা মুখাপেক্ষী শিশুকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, ধনী ভোগসুখ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, দরিদ্র 'যত্রসায়ংগৃহ' হইয়া চলিয়াছেন, ইহাতে ধর্ম্মের জন্য কষ্ট ও ত্যাগস্বীকার অভ্যাস পায়। ফলত তীর্থ পর্য্যটন হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে একটী পরম ধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্র একটী তীর্থস্থান। এই স্থানে জগন্নাথ দেবের এক দারুময়ী মূর্ত্তি আছে। মলয়রাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন বহু ব্যয়ে এক প্রস্তরময় মন্দির প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে ঐ দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। পুরুষোত্তম হইতে বহু দূর ব্যবধানে অলূনশালী নামক এক পর্ব্বত আছে। প্রবাদ এইরূপ, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্য ঐ পর্ব্বতের প্রস্তর কচ্ছপ দ্বারা আনয়ন করেন। পরে মন্দির প্রস্তুত হইলে তিনি উহা প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশে ব্রহ্মার নিকট গমন করেন। তৎকালে ব্রহ্মা ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহাকে স্তুতিবাদ সহকারে আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন পূর্ব্বক ধ্যানভঙ্গের কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি হইয়া পুরুষোত্তমক্ষেত্র আপ্লাবিত এবং বালুকারাশি দ্বারা মন্দির আবৃত হইয়া যায়। এই অবস্থায় বহুকাল অতীত হইয়াছিল এবং তথায় যে একটী দেবমন্দির ছিল তাহাও লোকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়।

* যথাশরীরস্যোদ্দেশা কেচিন্মেধ্যতমাঃ স্মৃতাঃ।
তথা পৃথিব্যামুদ্দেশাঃ কেচিৎ পুণ্যতমাঃ স্মৃতাঃ।
প্রভাবাদদ্ভুতাদ্ভূমেঃ সলিলস্য তেজসা।
পরিগ্রহাৎ মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা।

† ঐশ্বর্য্যলাভমাহাত্ম্যাৎ গচ্ছেৎ যানেন যো নরঃ
নিস্ফলং তস্য তত্তীর্থং তস্মাৎ যানং বিবর্জ্জয়েৎ।
মৎস্য পুরাণ।

পরে ঐ স্থান রাজা গলমাধব অধিকার করেন। তিনি প্রতি দিন অশ্বারোহণ পূর্ব্বক ঐ বালুকাময় ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেন। একদা অশ্বের খুর বালুকাবিলীন মন্দিরের নীলচক্রে আহত হয়। গলমাধব সহসা এইরূপ আঘাতে বিস্মিত হইয়া উহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং ঐ বালুকারাশি অপনীত করিয়া একটী দেবমন্দির দেখিতে পান। এই কার্য্যে তাঁহার তিন বৎসর তিন মাস অতীত হইয়া যায়।

ইত্যবসরে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মার সহিত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উপস্থিত হন এবং দেবমন্দির লইয়া গলমাধবের সহিত তাঁহার বিবাদ সংঘটন হয়। উভয়েই মন্দির নিজস্ব বলিয়া খ্যাপন করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা মধ্যস্থ হইয়া কহিলেন, দেখ, তোমরা বৃথা বাক্‌বিতণ্ডা করিও না, তোমাদের মধ্যে যিনি বিশিষ্ট প্রমাণ দেখাইবেন, এই দেবমন্দির তাঁহারই হইবে। তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন, দেব! যে কাক কল্পবর বৃক্ষে বাস করিয়া আছে, সে, এবং যে সকল কচ্ছপ পৃষ্ঠে প্রস্তর-বহন-ক্লেশ সহ্য করিয়াছিল, তাহারাই আমার সাক্ষী। তখন ব্রহ্মা ঐ দুই রাজাকে লইয়া কাকের নিকট গমন করিলেন। দেখিলেন, কাক কোন অলৌকিক শক্তিযোগে চতুর্ভুজ হইয়া এক সরোবরে নিদ্রিত হইয়া আছে। ব্রহ্মা উহার পৃষ্ঠে হস্তার্পণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, কাক! বল, ঐ দেবমন্দির কাহার নির্ম্মিত? কাক কহিল, এই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নই মন্দির প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সমুদ্রের জলপ্লাবনে ইহা বহুকাল যাবৎ বালুকায় বিলীন ছিল। পরে, রাজা গলমাধব ইহা উদ্ধার করেন। অনন্তর ব্রহ্মা ঐ দুই রাজাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যে সরোবরে কচ্ছপেরা রহিয়াছে তথায় উপস্থিত হইলেন। কচ্ছপ সকল রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে দেখিবামাত্র জলমধ্যে নিমগ্ন হইল। তখন ব্রহ্মা উহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা সহসা কেন পলায়ন করিলে? কচ্ছপেরা কহিল, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পুনরায় আসিয়াছেন; এক সময়ে আমরা ইহাঁ হইতে প্রস্তর-বহন-ক্লেশ সহিয়াছিলাম; পাছে আবার তাহাই করিতে হয়, আমরা এই ভয়েই পলায়ন করি। তখন গলমাধব অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং পূর্ব্বাপর আত্মদোষ সমস্তই স্বীকার করিলেন। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই তাঁহাকে দেহত্যাগ করিতে হয়।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী গণ্ডিকা দেবী পুরুষোত্তমে রথযাত্রা প্রবর্ত্তিত করেন। রথের নাম নন্দিঘোষ। গণ্ডিকা দেবী রথযাত্রা মহোৎসবে জগন্নাথ দেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতেন; দেব! আমার বংশে যেন কেহ জীবিত না থাকে, তাহা হইলে সে শ্রীমন্দির নিজের বলিয়া গর্ব্বিত হইতে পারে এবং শ্রীমূর্ত্তি নিজের বলিয়া প্রচার করিতে পারে। ফলত তদবধি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের বংশ লোপ হয়।

অতঃপর পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বৌদ্ধাধিকার। বৌদ্ধেরা তথা হইতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ উন্মূলিত করিয়া স্বমত প্রতিষ্ঠিত করেন এবং জগন্নাথ দেবকে বুদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া প্রচার করিয়া দেন। কিন্তু প্রবাদ এইরূপ যে, জগন্নাথ আদিত বুদ্ধমূর্ত্তি; বস্তুত এই প্রবাদ নিতান্ত অমূলক। ইহা যে বুদ্ধমূর্ত্তি হিন্দু শাস্ত্রে ইহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। ফাহিমান নামে এক জন চীন দেশীয় পর্য্যটক এই ভারতবর্ষে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আইসেন। এখানকার বৌদ্ধমঠ পরিদর্শন ও বৌদ্ধমত সংকলন করাই ইহাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ইনি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যান নাই। তমলুক হইতে এককালে লঙ্কা দ্বীপে উপনীত হন। জগন্নাথ যদিচ বুদ্ধ-

মূর্ত্তি হইতেন তাহা হইলে ইনি অবশ্যই তথায় যাইতেন। আরও হিন্দুজাতি বহুকালাবধি দূর দূরান্তর হইতে এই তীর্থে আসিয়া থাকেন, কিন্তু যে ধর্ম্ম বৈদিকধর্ম্মের বিশেষ পরিপন্থী, হিন্দুরা সেই ধর্ম্মে আস্থাবান হইয়া পুরুষোত্তমে যে বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিবার নিমিত্ত যাইবেন ইহা কোন ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। যাহা হউক, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যে বহুকাল বৌদ্ধধর্ম্মের আধিপত্য ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অনন্তর ঐ স্থান কেশরী রাজবংশের অধিকারে আইসে। এই বংশীয় রাজা যযাতি কেশরীর বৈদিক ধর্ম্মে অত্যন্ত আস্থা ছিল। তিনি খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীতে পুরুষোত্তমে বৌদ্ধধর্ম্ম উচ্ছিন্ন করিয়া বৈদিকধর্ম্ম প্রচার করেন। কিন্তু আজিও দেখা যায়, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জাতিবিচার নাই। যে সমস্ত আচার হিন্দুধর্ম্মের জীবন তথায় তাহার বিলক্ষণ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা বোধ হয় যে আজিও বৌদ্ধ ব্যবহার তথায় প্রচ্ছন্ন ভাবে অধিকার বিস্তার করিয়া আছে।

হিন্দুজাতির আদিম ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে জাতি ভেদের কিছুমাত্র চিহ্ন পাওয়া যায় না, সাধারণ্যে ভোজ্যান্নতাও প্রচলিত ছিল, কিন্তু পৌরাণিকদিগের সময় তাহার উচ্ছেদ হইয়া যায়। পুরুষোত্তমে যে সেই পূর্ব্ব ব্যবহার ধারাবাহী হইয়া আছে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে না। সুতরাং বর্ত্তমানে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ব্যবহারই তথায় প্রচলিত আছে। তন্ত্রশাস্ত্র আধুনিক, তন্ত্রশাস্ত্রকারেরা সম্ভবত এই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধব্যবহার স্ব স্ব গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া থাকিবেন। আমরা পুরুষোত্তমে যেরূপ আচার প্রচলিত দেখি, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে অবিকল সেইরূপ আছে।

নাত্রবর্ণবিচারোস্তি নোচ্ছিষ্টাদিবিবেচনং।
ন কালনিয়মোপ্যত্র শৌচাশৌচং তথৈব চ।
যথাকালে যথাদেশে যথাযোগেন লভ্যতে।
ব্রহ্মসাৎকৃতনৈবেদ্যং অশ্নীয়াদবিচারয়ণ্।
আনীতং শ্বপচেনাপি শ্বমুখাদপি নিঃসৃতং।
তদন্নং পাবনং দেবি দেবানামপি দুর্লভং।
কিং পুনর্মনুজাদীনাং বক্তব্যং দেববন্দিতে।
যদিস্যান্নীচজাতীয়ং অন্নং ব্রহ্মণি ভাবিতং।
তদন্নং ব্রাহ্মণৈর্গ্রাহ্যমপি বেদান্তপারগৈঃ।
জাতিভেদো ন কর্ত্তব্য প্রসাদে পরমাত্মনঃ।
যোঽশুদ্ধবুদ্ধিং কুরুতে স মহাপাতকী ভবেৎ।

আয় ব্যয়।

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৮ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়		২৮৯ ৸১৫
পূর্ব্বকার স্থিত		৪২০ /০
সমষ্টি		৭০৯ ৸/১৫
ব্যয়		৩২০ (৫
স্থিত		৩৮৯ ৸/১০
আয়		
ব্রাহ্মসমাজ		৪২ ॥/০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...		১৬৬ ॥৵০
পুস্তকালয়		১৪ ॥৵ ৫
যন্ত্রালয়		৪৪ ৷৷ ১০
গচ্ছিত		২১ ।৶০
সমষ্টি		২৮৯ ৸১৫
ব্যয়		
ব্রাহ্মসমাজ		১৩৮ । ১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...		৬৫ (১৫
পুস্তকালয়		১৫ ।৵০
যন্ত্রালয়		৭২ ।৶/১৫
গচ্ছিত ...		২৮ ৸/৫
সমষ্টি		৩২০ (৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন ...	১
" জয়গোপাল সেন ...	১
" ভোলানাথ সেন ...	১
" লক্ষ্মীনারায়ণ বসু ...	২
" মথুরামোহন শুর ...	২
" রাখালদাস সেন ...	৬
" শ্রীকণ্ঠ সিংহ	১
" রাজনারায়ণ বসু ...	২
	১৬

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর ...	১২
" অশোকনাথ মুখোপাধ্যায় ...	১
	১৩
দানাধারে প্রাপ্ত	২ ॥/১০
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	১০ ৸৵১০
	৪২ ॥/০

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সম্বৎ ১৯৩৩। কলিগতাব্দ ৪৯৭৭। ১ শ্রাবণ শনিবার।

Registered No 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
ভাদ্র ১৭৯৮ শক।

৩৯৭ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪১

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বনিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীযুক্ত বাবু গোকুলকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের
গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষ্যে

ব্রহ্মোপাসনা।

হুগ্‌লী ২৩ জ্যৈষ্ঠ রবিবার ১৭৯৮ শক।

সকল আশ্রমের মধ্যে সংসার-আশ্রমই শ্রেষ্ঠ আশ্রম। কেন না, সংসার-আশ্রমেই আমরা অধিকতর রূপে ঈশ্বরকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হই। সংসারের মধ্যে এমন শত সহস্র ঘটনা উপস্থিত হয়, এমন সকল অবস্থায় আমরা প্রতিনিয়ত নিপতিত হই, যে সকল ঘটনায়, যে সকল অবস্থায় আমারদের ইচ্ছা না থাকিলেও অনন্ত মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বরের প্রতি আমারদের শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি স্বতই উত্তেজিত হয়। বর্ষার বারি-ধারা, বসন্তের মলয়-সমীরণ, যেমন শুষ্ক তৃণকে সজীব করে, পত্রহীন তরুকে মঞ্জরিত করিয়া তোলে, তেমনি সংসারের মধ্যে সময়ে সময়ে ঈশ্বরের এমনই করুণামৃত বর্ষিত হয়, তাঁহার এমনই স্নেহের হিল্লোল প্রবাহিত হইয়া থাকে যে, তাহাতে আমারদের মৃত-কল্প আত্মা জীবিত জাগ্রত হইয়া সেই সর্ব্বমঙ্গলদাতা বিশ্ববিধাতার প্রতি প্রীতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠে। কোন ক্রমেই তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া থাকিতে পারে না।

সংসারে সুখের ঘটনাও সর্ব্বদাই সংঘটিত হইতেছে, দুঃখের ঘটনাও উপস্থিত হইতেছে। আমরা সুখ সম্পদে হর্ষযুক্ত, না হয় বিপদে আকুল হইয়াই হোক্, সেই সম্পদ্‌বিধাতাকে স্মরণ না করিয়া—সেই বিপদকাণ্ডারীকে না ডাকিয়া কোনরূপেই সুস্থির হইতে পারি না। পৃথিবীতে যেমন দিবসের আলোক, রজনীর অন্ধকার দুইই সমভাবে ওষধিবনস্পতি, জীবজন্তুকে পোষণ করে; তেমনি সংসার-মধ্যে সুখ দুঃখ সম্পদ্ বিপদ উভয়ই একতানে আমারদের আত্মাকে ঈশ্বরের সন্নিহিত করিয়া দেয়। যখন সম্পদে তাঁহাকে স্মরণ না হয়, তখন বিপদে তাঁহাকে ডাকিতে থাকি; যখন বিপদে তাঁহাকে ভুলিয়া যাই, তখন সুখ শান্তি বর্ষণের মধ্যে তাঁহার প্রেমমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া প্রণত মস্তকে তাঁহাকে বার বার প্রণিপাত করি। এই জন্যই সংসার আশ্রমের প্রাধান্য—এই জন্যই গৃহস্থ-আশ্রমের এত

শ্রেষ্ঠতা। সেই করুণাময় পিতা সেই জন্যই আমারদিগকে এই সংসাররূপ শিক্ষালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। সুখের উপর সুখ, শান্তির উপর শান্তি বিধান করিয়া আমারদের হৃদয় মন আত্মাকে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ করিতেছেন। আনন্দের উপর আনন্দ বর্ষণ করিয়া, আমারদিগকে সংসার-ধর্ম্ম শিক্ষায় উৎসাহিত করিতেছেন।

যাহারা এই সাংসারিক সুখে মুগ্ধ হইয়া, সেই সর্ব্বসুখদাতাকে বিস্মৃত হয়—যাহারা সাংসারিক সম্পদে স্ফীত হইয়া, সেই সম্পদ্-বিধাতাকে ভুলিয়া যায়, যাহারা পার্থিব সৌন্দর্য্যের চাক্‌চিক্যে বিমোহিত হইয়া, সেই সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য ঈশ্বরকে সন্দর্শন না করে, তাহারদের ন্যায় কৃতঘ্ন জীব আর কে আছে! তাহারদের সমান অন্ধতম মনুষ্য আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না! এই সংসার, যাহা ঈশ্বরপরায়ণ সাধুর পক্ষে আনন্দ-কানন, ধর্ম্ম-ক্ষেত্র—সাধন ভূমি, তাহা সেই কৃপা-পাত্র বিষয়-সর্ব্বস্ব ব্যক্তির সম্বন্ধে কঠোর কারাগৃহের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সে এই সংসারবাসের তাৎপর্য্য—সাংসারিক সুখ দুঃখের নিগূঢ় উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কখন সুখ, কখন দুঃখ, কখন হর্ষ, কখন বিষাদে কালাতিপাত করে। যখন তাহার ইচ্ছার অনুকূল ঘটনা সকল সংঘটিত হইতে থাকে, সংসার তখনই তাহার প্রিয়। যখন কষ্ট ক্লেশে নিপতিত হয়, তখনই সে চারিদিক্ অন্ধকার দেখে। তখন সংসার তাহার পক্ষে কঠোর মরুক্ষেত্র, নিরানন্দময় শ্মশান-ভূমি হইয়া পড়ে! কেবল সুখেরই সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ, সুখই তাহার নেতা, সুখই তাহার সকল কার্য্যের প্রবর্ত্তক। সে পার্থিব সুখের জন্য শরীরের বল, মনের বীর্য্য সকলই ক্ষয় করিতে থাকে, অথচ সুখ তাহার নিকটে সর্ব্বদা সঞ্চরণ করে না। সে কেবল সুখেরই প্রার্থী হইলেও তাহাকে সর্ব্বদা প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হইতে হয়। সে সুখের ব্যাঘাতভয়ে সর্ব্বক্ষণই শঙ্কিত হইয়া দিনপাত করিতে থাকে। দুঃখের গূঢ় তাৎপর্য্য সে উপলব্ধি করিতে পারুক আর না পারুক, তাহার প্রাণসম সুখ-কণা সকল কোন্ অশেষ সুখ-রত্নাকর হইতে যে ঘটনা-স্রোতে প্রবাহিত হইয়া তাহার সমীপে উপস্থিত হইতেছে, তাহার প্রতিও তাহার অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত হয় না। কে যে এই সংসারকে তাহার উপযোগী এবং তাহাকে সংসারের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিলেন, তাহার প্রতি তাহার বুদ্ধি-নেত্র নিপতিত হয় না। আমরা যে এই সংসারকে সুখের সজ্জায় সজ্জীভূত করিয়া এখানে আগমন করি নাই, আমরা যে এই কৌশল-পূর্ণ শরীর মন আত্মাকে আমারদের মনোমত করিয়া নির্ম্মাণ করত এখানে আসিয়া উপস্থিত হই নাই, এই সামান্য তত্ত্বও তাহার অন্তরে প্রতিভাত হয় না। তাহার জীবন কি শোচনীয়! সে কি দীন দুঃখী! কি কৃপাপাত্র!

ঈশ্বরকে ভুলিয়া যে এই সংসারে অবস্থান করে, এই সংসারই তাহার কারাগৃহ। তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া যে এখানে সুখের অন্বেষণ করে, সেই সুখই তাহার দুঃখের কারণ। তাঁহাকে ভুলিয়া যে বিষয় উপার্জ্জন করে, সেই বিষয়ই তাহার বিনাশের হেতু। তাঁহাকে ছাড়িয়া যে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে যায়, সেই জ্ঞানই তাহার অন্ধতার কারণ। ঈশ্বরের জন্য যে এই সংসারে অবস্থিতি করে, এই সংসারই তাহার শিক্ষাভূমি। তাঁহার উদ্দেশে যে জ্ঞান উপার্জ্জন করে, সেই জ্ঞানই তাঁহাকে দেখাইয়া দেয়। তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন জন্য যে বিষয় বিত্ত লাভের চেষ্টা করে, সেই বিষয়-বিত্তই তাহার ধর্ম্মলাভের কারণ। তাঁহাকে লইয়া

যে সংসারী হয়, তাহারই গৃহ সুখ শান্তির আলয়। লক্ষ্যের দোষেই এক জনের পক্ষে এই সংসার দুর্গতির স্থান, লক্ষ্যের গুণেই অন্যের সম্বন্ধে এই সংসার আনন্দধাম, উৎসবভূমি।

দেখ, এখনই সকলে প্রত্যক্ষ দেখ, এই গৃহ-স্বামী, এই নূতন গৃহ প্রবেশ উপলক্ষ্যে ঈশ্বরের স্নেহ করুণা জাজ্বল্যতররূপে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকেই ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। এই সম্পদ্ সম্ভোগের পূর্ব্বে—সর্ব্বপ্রথমে সেই সম্পদ্‌বিধাতারই পূজায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। তাঁহার স্নেহবিতরিত আবাস-গৃহ, তাঁহাকেই উৎসর্গ করিয়া আপনারা দাস দাসী হইয়া চির-জীবন তাঁহার সেবায়—তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইতেছেন। এই সাধু দৃষ্টান্তে কোন্ বিষয়ীর না পাষাণ-হৃদয় বিগলিত হয়? এই মনোহর দৃশ্য সন্দর্শন করিবার জন্য কাহার না চিত্ত উৎসুক হইয়া থাকে? এই গৃহপ্রবেশ উপলক্ষ্যে আমরা এখানে আহূত হইয়া গৃহস্বামীর সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের স্নেহ প্রেম উপলব্ধি করত কেমন কৃতার্থ হইতেছি! আমারদের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি চরিতার্থ হইতেছে। ইহারই জন্য সংসার-আশ্রমের এত প্রাধান্য! গৃহস্থের এই একটি কার্য্য উপলক্ষ্যে দেখ, আজ্ কতগুলি সাধকের মনে কৃতজ্ঞতার উৎস প্রমুক্ত হইল! কতগুলি আত্মা আজ ঈশ্বর-প্রেমে অভিষিক্ত হইল! এই সাধু দৃষ্টান্তে আজ কত লোকের নিদ্রিত আত্মা জাগ্রত হইয়া উঠিল! সংসারে প্রতিনিয়ত এমন কত শত ঘটনা সংঘটিত হইতেছে; আত্মা প্রকৃতিস্থ থাকিলে সে সর্ব্বদাই অজস্ররূপে ঈশ্বরের প্রেমামৃত পান করিয়া পরিপুষ্ট হইতে পারে। এক একটি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ আপনার পবিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানে কত আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবকেও অনায়াসে ধর্ম্মের পথে—ঈশ্বরের পথে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন্। এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম উপদেশ দিতেছেন যে, "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ। যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥" "গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন, যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন।" এই সুধাময় উপদেশ অনুসারে যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হন, এই সংসার তাঁহার পক্ষে আনন্দকানন ও নিত্য উৎসবভূমি হইয়া উঠে। অতএব সকল সম্পদের বিধাতা, সকল আনন্দের মূল-কারণ সেই আনন্দ-স্বরূপ ঈশ্বরকে কেহ বিস্মৃত হইও না। তাঁহাকে ভুলিলে সকলই নিরানন্দময়—সকলই বিষাদের আলয়! তাঁহাকে ছাড়িলে গৃহ শ্মশানভূমি—সংসার মরুক্ষেত্র হইয়া পড়ে! জড় রাজ্যের মধ্য হইতে আকর্ষণ শক্তিকে প্রত্যাহার করিলে, যেমন শোভাময় সৌর-জগৎ, সৌন্দর্য্য-পূর্ণ ভূমণ্ডল এককালে হতশ্রী হইয়া যায়; তেমনি মনুষ্য-সমাজের অভ্যন্তর হইতে ধর্ম্ম-জ্ঞান ও ঈশ্বর-প্রীতি অন্তরিত করিয়া দিলে, জনসমাজের সকল বন্ধন ছিন্ন হয়, সকল সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয়, সকল উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়, সকল প্রকার সুখের উৎস শুষ্ক হইয়া যায়! ঈশ্বরকে ছাড়িলে কিসের জন্য শরীর, কিসের জন্য মন, কি জন্যই বা এই অমর আত্মা লাভ করিয়াছি; ইহার কোন উদ্দেশ্যই উপলব্ধি করিতে পারি না। তখন সুখেরই বা কি তাৎপর্য্য, দুঃখেরই বা কি উদ্দেশ্য, কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই না।

সংসারে থাকিয়া যদি সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকেই জানিতে না পারিলাম, ইন্দ্রিয়-জনিত, বিষয়-জনিত এবং ধর্ম্ম-জনিত সুখ শান্তি সম্ভোগ করিয়া যদি সেই বিশ্ব-প্রতিপালক পরমেশ্বরকে আমার চিরদিনের আশ্রয়—অনন্ত জীবনের প্রতিপালক বলিয়া উপলব্ধি করিতে না পারিলাম; সুখের মধ্যে,

দুঃখের অভ্যন্তরে যদি সেই মঙ্গলময়ী পরম মাতার অভয় মঙ্গলহস্ত দেখিতে না পাইলাম, তবে আর মনুষ্য-জীবনের মহত্ত্ব কোথায় রহিল! তবে আর জ্ঞানের মর্য্যাদা, শ্রদ্ধা প্রীতি কৃতজ্ঞতার প্রাধান্য কোথায় প্রদর্শিত হইল! এখনই ঈশ্বরের আবির্ভাব এখানে সকলে উপলব্ধি কর, দেখ, তিনি রাজগণ-রাজা ত্রিভুবনপরিপালক হইয়া এখনই এই পিতৃহীন পরিবারের পিতা, মাতৃহীন সন্তান সন্ততির মাতা—এই গৃহের গৃহদেবতা হইয়া এই পরিমিত আকাশের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। আমরা এই মর্ত্তের মলিন কীট হইলেও, তিনি প্রেমভরে আমারদের প্রীতি-পূজা গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার এই অনন্ত প্রেম, অকপট স্নেহ প্রত্যক্ষ অনুভব করত তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া এখনই সকলে কৃতার্থ হও। হে করুণানিধান! তুমি আমারদের চিরকালের আশ্রয়দাতা; অনন্ত জীবনের প্রতিপালক। আমরা যে এই সংসারে আসিয়া সুখের পর সুখ, শান্তির উপর শান্তি উপভোগ করিব, পূর্ব্বে ইহার কিছুই জানিতাম না, তুমি কৃপা করিয়া এ সকলই বিধান করিতেছ। আমরা সংসারের প্রত্যেক ঘটনায়—শরীর মন আত্মার, প্রতি উন্নতি সোপানেই তোমার অতুলন মাতৃস্নেহের পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হইতেছি। আমরা আমারদের অপেক্ষা জ্ঞান ধন ও সম্পদে কোন উচ্চপদস্থ লোককে গৃহে আনিতে কত কুণ্ঠিত হই—কত আয়োজন করি, তুমি সমস্ত জগতের অধিপতি, তোমাকে আনিতে আমারদের কোন আড়ম্বর নাই। আমরা কাতর প্রাণে যেমন তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি তেমনিই স্নেহভরে পুত্রবৎসলা মাতার ন্যায় এখানে প্রকাশ পাইতেছ। বালকের এমন কি গুণ আছে যে, সে মাতাকে আপনার প্রতি আকর্ষণ করিতে পারে, মাতাই আপনার স্নেহগুণে তাহার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, স্বীয় নিরাপদ ক্রোড়ে স্থান দান করেন। তোমার পিতৃভাব, মাতৃস্নেহ পিতা মাতা হইতেও অনন্ত-গুণে অধিক। তোমার স্নেহ-প্রেমের উপমা নাই। তোমার পিতৃ ভাব, মাতৃস্নেহ যখন হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, তখন "পিতা অপিতা ভবতি" "মাতা অমাতা" হইয়া পড়েন। সূর্য্যালোক সন্নিধানে যেমন দীপপ্রভা—খদ্যোতজ্যোতি; তেমনি তোমার জ্বলন্ত অনন্ত প্রেমের নিকটে পার্থিব স্নেহ প্রেম মলিন হইয়া যায়!

তুমি রাজাধিরাজ, ত্রিভুবনপ্রতিপালক, তুমি বিশ্ব-জন-বন্দনীয় মহান্ পুরুষ, আর আমরা কোথায় এই মর্ত্তের কীট! আমারদের আহ্বানে—আমারদের প্রার্থনায় তুমি এখানে প্রকাশ পাইতেছ। তোমার মঙ্গলজ্যোতি এই গৃহ পরিবারের উপর বিস্তার করিয়া, আমারদের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি তোমার প্রতি আকর্ষণ করিতেছ। তোমার সত্ত্বাতে এই আকাশ পরিপূর্ণ, তোমার সত্ত্বাতে এই আত্মা পরিপূর্ণ—তোমার প্রেমে হৃদয় প্লাবিত হইতেছে! করুণাময়! কি দিয়া তোমার এই স্নেহের প্রতিক্রিয়া করিব, তোমাকে কি দিয়া আজ্ প্রাণের ইচ্ছা—মনের ক্ষোভ নিবারণ করিব। এই শরীর মন আত্মা, ধন সম্পদ্, যাহা কিছু আমার বলি সে সব তোমারই। তুমি এ সকলেরই নির্ম্মাতা, তুমি এ সকলেরই একমাত্র বিধাতা। আমরা তোমার সদাব্রতের নিত্য ভিখারী। যোড় করে তোমার সন্নিধানে আবার প্রার্থনা করি, "দেহ জ্ঞান, দিব্য জ্ঞান, দেহ প্রীতি, শুদ্ধ প্রীতি, তুমি মঙ্গল আলয়, ও হে! তুমি মঙ্গল আলয়! ধৈর্য্য দেহ, বীর্য্য দেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ, বিবেক বৈরাগ্য দেহ, দেহ ও পদ-আশ্রয়, ওহে! দেহ ও পদ আশ্রয়॥"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

এই প্রস্তাবে আমরা বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের কারণ, বৌদ্ধমত এবং বৌদ্ধধর্ম্মের ফলাফল বিবেচনা করিব।

বেদ, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণে বিভক্ত। মন্ত্রই প্রধানতঃ বেদ। বৈদিক মন্ত্র সকল ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের স্তব। ঋষিদিগের হৃদয় হইতে দেবতাদিগের সম্বন্ধে যে সকল ভাব আপনা হইতে সমুত্থিত হইয়াছিল তাহা তাঁহারা ছন্দে বদ্ধ করিতেন। এই সকল কবিতা বেদের মন্ত্রবিভাগ। মন্ত্রের কাল হৃদয়ের কাল ছিল, বিচারের কাল ছিল না। ব্রাহ্মণের কালও বিচারের কাল ছিল না। যজ্ঞ কি প্রকারে সম্পাদন করিতে হয়, ব্রাহ্মণে তাহারই বিধান আছে। উপনিষদের কাল হইতেই বিচার আরম্ভ হয়। "কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতাঃ। জীবাম কেন ক্বচসম্প্রতিষ্ঠা অধিষ্ঠিতা কেন সুখেতরেষু বর্ত্তামহে" (১) "ব্রহ্ম কি কারণ? আমরা কোথা হইতে হইয়াছি? কাহাতে আমরা জীবিত আছি? কাহাতে আমরা প্রতিষ্ঠিত আছি? এবং কাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া, আমরা সুখদুঃখে প্রবর্ত্তিত হইতেছি?" "স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।" (২) "কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, স্বভাবই জগতের একমাত্র কারণ; অন্য জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, কালই জগতের একমাত্র কারণ"। ইত্যাদি বিচার উপনিষদের কালে আরম্ভ হয়। সহজ জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া যুক্তি ও বিচারের অত্যন্ত প্রবলতা হইলে, পরিশেষে নাস্তিকতা আনয়ন করে। একজন রোমান কাথলিক পাদ্রির সহিত এই প্রস্তাবলেখকের আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। সেই পাদ্রি একবার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে "প্রটেষ্ট্যাণ্টেরা অর্থাৎ প্রতিবাদকারকেরা পোপের প্রতিবাদ করিয়া, প্রতিবাদ কার্য্য আরম্ভ করে। তাহারা প্রতিবাদ করিতে করিতে চলিয়া যাইবে যে পর্য্যন্ত না প্রতিবাদ দ্বারা স্বয়ং ঈশ্বরকে উড়াইয়া দেয়।" যে বিচার-স্রোত উপনিষদের কালে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা অসংযত বেগে প্রবাহিত হইয়া লোকদিগকে পরিশেষে বৌদ্ধ ধর্ম্মে উপনীত করিয়াছিল। যুক্তি ও বিচার-প্রবাহের অসংযত বেগ বৌদ্ধ ধর্ম্ম অভ্যুদয়ের একটি প্রধান কারণ। বৌদ্ধেরা বুদ্ধির অত্যন্ত পরিচালনা জন্য বৌদ্ধ নামে খ্যাত হইয়াছিল। (৩)

যুক্তি ও বিচারের অসংযত প্রবলতা বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের যেমন এক কারণ তেমনি ব্রাহ্মণদিগের অন্যায় প্রভুত্ব আর এক কারণ। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা ক্ষমা, দয়া, ঋজুতা, নম্রতা প্রভৃতি তাঁহাদিগের আদিম গুণ হইতে প্রচ্যুত হইয়া গর্ব্বিতস্বভাব ও অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শাক্যসিংহ এই উপদেশ প্রদান করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, যে, সমস্ত মনুষ্য এক জাতি এবং জাতিবিভেদ-প্রথা অতি ঘৃণিত প্রথা। সাধারণ লোকের নিকট হইতে দেবসদৃশ সম্মান লাভ করিতে ব্রাহ্মণদিগের চেষ্টা বৌদ্ধ ধর্ম্ম অভ্যুদয়ের আর একটী প্রধান কারণ।

শাক্যসিংহ বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার সমকালবর্ত্তী লোকদিগের বহুল পরিমাণে নিষ্ঠুর পশুবধ দর্শন করিয়া অত্যন্ত করুণার্দ্র হইয়া ছিলেন; সেই দারুণ পশুঘাত নিবারণ জন্য তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন যে সর্ব্বভূতে দয়া করিবে। সর্ব্বভূতে দয়া

(১) শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ।
(২) শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ।
(৩) ইংরাজীতে বৌদ্ধ শব্দের প্রতিশব্দ "Rationalist."

বৌদ্ধ ধর্ম্মের অতি মনোহর লক্ষণ। ইতর জন্তুর প্রতি শাক্যসিংহের সমকালবর্ত্তী লোকদিগের অতীব নিষ্ঠুর ব্যবহার বৌদ্ধ ধর্ম্ম অভ্যুদয়ের আর একটী প্রধান কারণ।

বৌদ্ধ মত তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। দার্শনিক ভাগ, উপধর্ম্ম ভাগ ও নীতি ভাগ। বৌদ্ধ ধর্ম্মের দর্শন ভাগকে ঈশ্বরশূন্য বৈদান্তিক মত বলা যাইতে পারে। বেদান্তে জগত নশ্বর ও মায়ার কার্য্য, মুক্তির জন্য জ্ঞান ও তপস্যা আবশ্যক, এবং মুক্তির অবস্থাতে আত্মা লয় প্রাপ্ত হয় এই সকল মত প্রতিপাদিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মেও এই সকল মত দেখা যায়। বৌদ্ধেরা এই সকল মতে বিশ্বাস করিতেন কিন্তু ঈশ্বর মানিতেন না। কেহ কেহ বলেন যে, বুদ্ধ দেবের ঐ সকল মত হইতে বেদান্ত দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু ইহা সত্য নহে। বেদান্তসূত্র অপেক্ষা বেদান্ত মত প্রাচীন। পূর্ব্বোক্ত মত সকলের আভাস উপনিষদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংস্কৃত অভিধানে ও নিজ উপনিষদে, উপনিষদ বেদান্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অকৃত্রিম উপনিষদ সকল যে শাক্যসিংহের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম বেদান্ত দর্শন ব্যতীত আর কোন দর্শনের নিকট উপকৃত নহে এমন নহে। ঐ ধর্ম্মের অনীশ্বর ভাব ও প্রকৃতি-মাহাত্ম্যে বিশ্বাস, সাংখ্য দর্শন হইতে নীত হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনের ন্যায় সাংখ্য দর্শনেরও যে প্রাচীনতম গ্রন্থ সকল এক্ষণে পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা সাংখ্য মত প্রাচীন।

একটি সামান্য কথা আছে "মস্তক নাই তার মস্তকের ব্যথা"। বৌদ্ধেরা ঈশ্বর মানিতেন না কিন্তু জ্ঞান, তপস্যা, মুক্তি, লয়, সকলই মানিতেন। কাহার জ্ঞান? কাহার তপস্যা? কিসে লয়? এই সকল প্রশ্ন প্রাথমিক বৌদ্ধদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিতেন ইহা কৌতূহলের বিষয়। বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া এই বিষয়ে যতদূর জানা যায় তাহা এই যে, তাঁহারা জ্ঞান শব্দে জগতের নশ্বরত্ব ও অসত্যভাব জ্ঞান, তপস্যা শব্দে এই তত্ত্বের সর্ব্বদা চিন্তা, এবং লয় শব্দে প্রকৃতিতে লয় বুঝিতেন। জগতের নশ্বরত্ব বিষয়ে উপদেশ আদিম বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটি প্রধান লক্ষণ ছিল। একটী মৃত ব্যক্তি ও একটী বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিয়া শাক্যসিংহের মনে ধর্ম্ম ভাব প্রথম উদিত হইয়াছিল।

বৌদ্ধেরা হিন্দু ধর্ম্মের অনেক অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপাদিত দেবদেবী, যোনিভ্রমণ ও স্বর্গ নরকে বিশ্বাস করিতেন। বৌদ্ধ গ্রন্থে উক্ত আছে যে, বুদ্ধ দেবের জন্মসময়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ আসিয়া স্তব করিয়াছিলেন এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া লোকে পরিশেষে তপস্যা ও দয়া প্রভৃতি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। বোধ হয় আদিম বৌদ্ধেরা এইরূপ ভাবিয়াছিলেন যে, যখন স্বভাব হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে তখন মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ জীব অর্থাৎ দেবতারও উৎপত্তি হইতে পারে, কিন্তু স্বভাবের অতীত একটি অনাদি নিত্য পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর অস্বাভাবিক পদার্থ তাহা কখন থাকিতে পারে না; আর যোনিভ্রমণ স্বাভাবিক ক্রম হইতে পারে এই জন্য তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রে প্রতিপাদিত দেবদেবী ও যোনিভ্রমণে বিশ্বাস করিতে সঙ্কোচ করেন নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপধর্ম্ম ভাগ যে কেবল এই সকল হিন্দুমত দ্বারা সংরচিত এমত নহে। বৌদ্ধদিগের নিজের কল্পনাসম্ভূত মত সকল ঐ সকল হিন্দুমতে সংযুক্ত হইয়া ঐ ভাগ পরিপুষ্ট করিয়াছে। তাঁহাদিগের মতে এক একটী বুদ্ধ মধ্যে মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া,

কোটি কোটি বৎসর জগৎ পরিপালন ও শাসন করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন। শাক্যসিংহ আদি বুদ্ধ নহেন; তাঁহার পূর্ব্বে অনেক বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। বুদ্ধ ব্যতীত, তাঁহারা অন্যান্য দেবতাতেও বিশ্বাস করিয়া থাকেন। নেপাল প্রদেশের বৌদ্ধেরা অবলোকিতেশ্বর নামক দেবতাতে এবং তিব্বত প্রদেশের বৌদ্ধেরা পদ্মমণি নামক দেবতাতে বিশ্বাস করেন। তিব্বত প্রদেশের মন্দিরের দ্বারের উপরে এবং ধ্বজাতে এই মন্ত্র অঙ্কিত থাকে "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ।" জৈনসম্প্রদায় একটী বৌদ্ধসম্প্রদায়; তাঁহারা তীর্থঙ্কর নামক দেবতাতে বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের নীতি ভাগ অতীব মনোহর ভাগ। ক্ষমা, দয়া, পরোপকার প্রভৃতি গুণ বিষয়ে অতীব উৎকৃষ্ট উপদেশ সকল বৌদ্ধ গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উল্লিখিত নীতি উপদেশ সকলের মধ্যে একটি প্রধান উপদেশ এই যে সত্য ধর্ম্ম কেবল নিজে লাভ করিয়া যে পরিতৃপ্ত থাকিবে এমন নহে. মনুষ্যের হিতার্থে তাহা সর্ব্বত্র প্রচার করিবে। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বৌদ্ধেরা প্রথমে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই প্রকার কার্য্যে তাঁহাদিগের অসাধারণ উৎসাহ ছিল। অশোক রাজার পুত্র মহেন্দ্র ও দুহিতা সঙ্ঘমিত্রা সিংহল দ্বীপে প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। মহেন্দ্র পুরুষদিগকে ও সঙ্ঘমিত্রা অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উল্লিখিত কার্য্যে এরূপ সুসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে ভারতাধীশ্বর অশোক, পুত্র ও পুত্রী বিরহে শোকাতুর হইয়া তাঁহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পুনঃ পুনঃ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা দেশে আর ফিরিয়া আইলেন না। বৌদ্ধপ্রচারকেরা হিমাদ্রি ও মহাসাগর পার হইয়া অন্যান্য দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভীষণ পর্ব্বত ও অরণ্য অতিক্রম করিয়া তিব্বত চীন ও মহাচীন দেশ সকলে এবং সমুদ্রপার হইয়া সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন।

এক্ষণে আমরা বৌদ্ধ ধর্ম্মের ফলাফল বিবেচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

বৌদ্ধেরা হিন্দুসমাজ মধ্যে স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হয়েন নাই। সাধারণ হিন্দুসমাজ তাঁহাদিগের মত গ্রহণ করে নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া অন্যান্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত হইতে আমাদিগের এই উপদেশ গ্রহণ করা উচিত যে হিন্দুশাস্ত্র সম্যকরূপে অমান্য করিয়া ভারতবর্ষে ধর্ম্ম প্রচার করিতে গেলে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। বৌদ্ধেরা অনেক হিন্দু মত ও আচার গ্রহণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু প্রধান হিন্দুশাস্ত্র বেদ সম্যকরূপে পরিত্যাগ করাতেই তাঁহারা "নাস্তিকোবেদনিন্দকঃ" বলিয়া খ্যাত হওয়াতে সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। সাংখ্যমত-প্রবর্ত্তক কপিল মুনি এক বেদ মান্য করিয়া স্বকীয় নিরীশ্বর মত হিন্দুধর্ম্ম মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধেরা আপনাদিগের মত হিন্দুসমাজে প্রচলিত করিতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

বৌদ্ধেরা নাস্তিকতাতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে নিতান্ত নিকৃষ্ট উপধর্ম্মে উপনীত হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, মনুষ্য নিজের সুখদুঃখের নিয়ন্তা এক অদৃশ্য পুরুষে বিশ্বাস না করিয়া কখনই থাকিতে পারেনা।

বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণদিগের গর্ব্ব ও অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া জাতিভেদের বিপক্ষে উত্থিত হইয়াছিল। কিন্তু জাতিবিভেদপ্রথা সম্যকরূপে উঠাইতে সক্ষম হয় নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজকেরা ব্রাহ্মণের স্থান অধিকার করিয়া বর্ত্তমান বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি বিলক্ষণ অত্যাচার করিতেছে।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম জীবহিংসা হইতে বিরতি বিষয়ে স্বকীয় উপদেশ সাধারণ লোকের অনুষ্ঠেয় করিতে কৃতকার্য্য হয় নাই। এক্ষণে বৌদ্ধ দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজক ব্যতীত সাধারণ লোকের মধ্যে জীবহিংসা বিলক্ষণ চলিতেছে। কেবল জৈন প্রভৃতি কোন কোন বিশেষ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবহিংসা দৃষ্ট হয় না। অতএব প্রতীত হইতেছে যে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম আপনার কোন উদ্দেশ্য সাধন করিতে সক্ষম হয় নাই।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম স্বকীয় কোন অভীষ্ট সাধনে কৃতকার্য্য হয় নাই বটে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফলও হয় নাই। ব্রহ্মবাদী নিউমান সাহেব বলিয়া গিয়াছেন "Much good to India might a flood of Atheism have wrought."(১) "ভারতবর্ষে নাস্তিকতার স্রোত একবার প্রবাহিত হইলে অনেক উপকার হইত।" কিন্তু নিউমান সাহেব বোধ হয় জানেন না যে, ভারতবর্ষে একবার নাস্তিকতার স্রোত বিলক্ষণ প্রবাহিত হইয়াছিল। যেমন ঝঞ্ঝাবাত জলকে আলোড়িত করিয়া তাহার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করে তেমনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম অনেক দিনের বদ্ধমূল কুসংস্কারবিশিষ্ট হিন্দু সমাজকে আলোড়িত করিয়া তাহার বিশুদ্ধতা কিয়ৎ পরিমাণে সম্পাদন করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত শাক্যসিংহের দৃষ্টান্ত যে শঙ্করাচার্য্য, রামানন্দ, কবির, নানক প্রভৃতি পরবর্ত্তি ধর্ম্মসংস্কারদিগের প্রতি কিছুমাত্র কার্য্য করে নাই তাহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? শাক্যসিংহ যে তরঙ্গ উত্থিত করিয়া গিয়াছেন তাহা তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠাইয়া বর্ত্তমান কালের উপকূলে এখনও প্রতিঘাত হইতেছে। উল্লিখিত উপকার ব্যতীত আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট হইতে যে নীতি উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি তাহা অমূল্য। বৌদ্ধেরা একমাত্র ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি গুণকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন, অন্য কিছুকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহারা ধর্ম্মের অপরাঙ্গ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু নীতির প্রতি তাঁহাদিগের বিশেষ মনোযোগ হইতে আমরা যে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার জন্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য। বৌদ্ধেরা ধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা হইতে আমাদিগের উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা ঈশ্বরশূন্য কঠোর দর্শনিক ধর্ম্মমত প্রচারে কেবল যত্ন উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে যদি কৃতকার্য্য হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন তবে আমাদিগের এমন সরস ধর্ম্ম যে ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা যত্ন করিলে বহুলরূপে প্রচারিত হইবার কত সম্ভাবনা। ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে আমরা কি করিতেছি এই রূপ আমাদিগের সর্ব্বদা চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

(১) Newman's Theism, Doctrinal and Practical.

অধ্যাত্ম-বিদ্যা।

আমারদের বুদ্ধি আপন অধিকারের মধ্যে স্বাধীন কর্ত্তা বটে, কিন্তু প্রকৃতির সহিত, ঈশ্বরের শক্তির সহিত, যোগ ভিন্ন বুদ্ধি একাকী পুরুষার্থ সাধনে সমর্থ হয় না। জগৎ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে কখন বোধ হয় যে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন শক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয়, কখন বোধ হয় যে এক মূলশক্তি দ্বারা সকল

কার্য্য সম্পাদিত হয়। ইহার মধ্যে একটি সত্য, আর একটি অসত্য এমন নহে, উভয়ই সত্য। মূল-শক্তি হইতে সকল বস্তু এবং সকল জীব স্ব স্ব শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। মূল-শক্তিই আর আর তাবৎ শক্তির প্রাণ-স্বরূপ। শক্তি-বিশেষকে যেমন তদীয় কার্য্য-সকলের লয়-স্থান বলা যাইতে পারে, সেইরূপ মূল-শক্তিকে আর আর তাবৎ শক্তির লয়-স্থান বলা যাইতে পারে। নিদ্রার সময় আমারদের হস্তপদাদির কার্য্য স্থগিত হয়, কিন্তু শক্তি বর্ত্তমান থাকে; এই ভাবে বলা যাইতে পারে যে, উদ্বোধকের অভাবে কোন কার্য্য যখন স্থগিত হয় তখন সে কার্য্য স্বীয় শক্তিতে বিলীন হইয়া থাকে, উদ্বোধকের সাহচর্য্যে পুনর্ব্বার প্রকটিত হয়। সকল শক্তির লয়-স্থান যে এক মূল-শক্তি তাহাই সাংখ্যের প্রকৃতি এবং বেদান্তের মায়া। সাংখ্যের মতে প্রকৃতি সুখ দুঃখ এবং মোহ এই তিনের সাম্যাবস্থা; বেদান্ত মতে, মায়া আনন্দময় কোষের উপাদান-স্বরূপ।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

আনন্দেরই সকল উৎপাদিকা শক্তি, আনন্দেরই সকল সঞ্জীবনী শক্তি, আনন্দেরই সকল আকর্ষণী শক্তি বেদান্ত শাস্ত্রে গীয়মান হইয়াছে। যে শক্তির গুণে ক্রোড়ের শিশু জননীর এত বশ, প্রাণের বন্ধু পরস্পরের এত বশ, আশ্রিত আশ্রয়দাতার এত বশ, স্নেহ-প্রেম-দয়ার যে সেই আকর্ষণী শক্তি, তাহা আনন্দেরই শক্তি। সেই আকর্ষণী শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া, স্নেহ-প্রেম-দয়া ইত্যাদির পরিবর্ত্তে লোকে সচরাচর মায়া শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। আনন্দশূন্য নির্দয় ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলে তাহার মায়া-দয়া নাই, স্নেহ-প্রেমের অপ্রতুল থাকিলে লোকে বলে মায়া মমতা নাই। যে শক্তিতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, জীবিত রহিয়াছে এবং পরম পুরুষার্থের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, তাহা স্নেহ প্রেম দয়াতে উদ্বেলিত; সেই আনন্দ-সঙ্কুল সঞ্জীবনী এবং আকর্ষণী শক্তি বেদান্তে মায়া শব্দে সংজ্ঞিত হইয়াছে। সেই আনন্দস্বরূপিণী, স্নেহ-প্রেম-দয়ার আধার-স্বরূপিণী, ঈশ্বরের যে অনির্ব্বচনীয় শক্তি, শাক্তেরা তাহাই দেবীরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন।

আমারদের বুদ্ধি যদিও বাহিরে স্বাধীন কর্ত্তা বটে, কিন্তু তাহার মূলে তাহার অন্তরে কি দেখিতে পাওয়া যায়? পরমাত্মার অনির্ব্বচনীয় স্নেহ-প্রেম-দয়া-সমন্বিত শক্তি। মাতার ক্রোড় যেমন শিশুর আনন্দ-নিকেতন, ঈশ্বরের স্নেহ-প্রেম-দয়া সেইরূপ আত্মার আনন্দ-নিকেতন। সেখানকার অমৃত-পান দ্বারা আমারদের বুদ্ধিতে যেরূপ বলের সঞ্চার হয়, যেরূপ প্রগাঢ় শান্তির আবির্ভাব হয়, বুদ্ধির নিজের সহস্র চেষ্টাতেও তাহা সম্ভবে না। যাঁহারা কেবল বুদ্ধি দ্বারা পরমাত্ম-তত্ত্ব উপার্জ্জন করিতে যত্ন করেন, তাঁহারদের সে যত্ন বিফল হয়; হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কেবল মাত্র বুদ্ধির দ্বারা কোন্ ব্যক্তি কোন সার-গর্ভ বচনের মর্ম্ম-গ্রহ করিতে পারেন? কেবল মাত্র বুদ্ধির দ্বারা কোন্ ব্যক্তি মনুষ্য-সমাজের কোন প্রকৃত উপকার সাধন করিতে পারেন? কেবল মাত্র বুদ্ধির দ্বারা কোন্ ব্যক্তি অবিজ্ঞাত পথের সংবাদ আনিতে পারেন? এত উচ্চে যাইবার আবশ্যক কি? সামান্য যে গীত-বিদ্যা, তাহা শুদ্ধ কেবল বুদ্ধি দ্বারা কোন্ ব্যক্তি আয়ত্ত করিতে পারেন? আত্মজ্ঞান যদি জ্ঞানের প্রকৃতি-সিদ্ধ ধর্ম্ম না হইত, অর্থাৎ যেখানে জ্ঞান, সেখানেই আত্মজ্ঞান, যেখানে জানা সেই খানেই আপনাকে

আপনি জানা, জ্ঞানের স্বভাবই যদি এইরূপ না হইত, তাহা হইলে বুদ্ধি কি সহস্র চেষ্টা করিয়াও আপনাকে আপনি জানিতে সমর্থ হইত? এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের স্নেহ-প্রেম-করুণাই আমারদের বুদ্ধির মূলে, বুদ্ধির প্রাণ-রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আত্মার যে ঈশ্বরদত্ত প্রকৃতি, তাহার সহিত যোগ দিয়া চলিলেই বুদ্ধি আলোকে পদ নিক্ষেপ করে, তাহার ব্যত্যয় হইলে অন্ধকারে প্রবেশ করে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, শাক্তেরা ঈশ্বরের শক্তিকে দেবীরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন। শাক্তেরা ভক্তির প্রকর্ষ দ্বারা, এবং বৈষ্ণবেরা মনুষ্যোচিত পবিত্র ভাবের অনুশীলন দ্বারা, উভয়েই স্ব স্ব সাধনের পরিপাক দ্বারা, পরব্রহ্মের উপাসনাতে উত্তীর্ণ হন; ইহার উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়। কোথায় শ্রীমৎ ভাগবৎ, আর কোথায় রামপ্রসাদ সেনের গীত, উভয়ে একবাক্যে ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। বেদান্তে একটি অতি আশ্চর্য্য কথা দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে বিদ্যামুপাসতে ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ"

যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা অন্ধ তিমিরে প্রবেশ করে, বিদ্যাতে যাহারা রত তাহারা তাহা হইতেও অন্ধ তিমিরে প্রবেশ করে।

"বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে"॥

যাঁহারা বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কে একসঙ্গে জানেন তাঁহারা অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃত লাভ করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অবিদ্যা বা প্রকৃতি আমারদের জ্ঞানের বিষয়; প্রকৃতির আলোচনা দ্বারা আমারদের জ্ঞান উজ্জ্বল হয়; যে পরিমাণে উজ্জ্বল হয়, সেই পরিমাণে আমরা মৃত্যুকে অতিক্রম করি, কেন না জ্ঞানেতেই আমারদের অবিনাশিত্ব। তাহার উপরে যখন আমরা সেই উজ্জ্বল জ্ঞানের অভ্যন্তরে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করি, তখন আমরা সাক্ষাৎ অমৃত লাভ করি। এইরূপে অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা আমরা অমৃত-লাভ করি। কেবল মাত্র অবিদ্যার উপাসনা করিলে আমারদের প্রবৃত্তি-সকল উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, কেবল মাত্র বিদ্যাতে রত হইলে আমারদের অহঙ্কার প্রবল হইয়া উঠে। প্রবৃত্তি সকল দুষ্ট অশ্বের ন্যায় আমারদিগকে সঙ্কটে ফেলিয়া দেয়, অহঙ্কার মূঢ় সারথীর ন্যায় আমারদিগকে গম্য পথ হইতে ক্রমশই দূরে ফেলিয়া দেয়। কিন্তু অবিদ্যা এবং বিদ্যা উভয়কেই যাঁহারা একযোগে জানেন অর্থাৎ অবিদ্যা বা প্রকৃতিকে যাঁহারা ঈশ্বরের শক্তিরূপে জানেন, এবং বুদ্ধিকে, যাঁহারা ঈশ্বরের আবির্ভাব বলিয়া জানেন, তাঁহারাই মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃত লাভ করেন। অর্থাৎ যাঁহাদের লক্ষ্য পরমাত্মা তাঁহারদের নিকট, বিদ্যা এবং অবিদ্যা, জ্ঞান এবং কার্য্য, আত্মা এবং বহির্জগৎ, উভয়ই অমৃতের সোপান। কিন্তু যাঁহারদের লক্ষ্য শুদ্ধ কেবল প্রকৃতি অথবা শুদ্ধ কেবল বিজ্ঞান, তাঁহারা অমৃত লাভে বঞ্চিত হন। পরব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্যই সেই স্পর্শমণি যদ্দ্বারা প্রকৃতি এবং জ্ঞান উভয়ই সুবর্ণে পরিণত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নিতে আহুত হইলেই বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়ই অমৃতের সোপান হইয়া উঠে। শুদ্ধ কেবল আত্ম-প্রভাবের উপর, শুদ্ধ কেবল বুদ্ধির উপর নির্ভর করিলে, অনেক চেষ্টায় অল্প কার্য্য হয়; শুদ্ধ কেবল দেব-প্রসাদের উপর নির্ভর করিলে, কার্য্য চলে না; পরন্তু দেব-প্রসাদ এবং আত্ম-প্রভাব উভয়ের সাহচর্য্যে অল্প চেষ্টায় অনেক কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে। যেমন রথে অনেক অশ্ব যোজিত হইলে প্রতি অশ্ব অল্প চেষ্টায় অনেক দূর অগ্রসর হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের শক্তির সহিত যোগ দিয়া চলিলে আমারদের বুদ্ধি অল্প চেষ্টায় অনেক দূর কৃতকার্য্য হইতে পারে। ঈশ্বরের সহিত যোগযুক্ত হইলে বুদ্ধির কত না ভারলাঘব হয়, অহংকার এবং অভিমান হইতে বিমুখ হইয়া বুদ্ধি কত না স্বচ্ছ ভাব ধারণ করে এবং তাহা যে পরিমাণে লঘুভার ও স্বচ্ছ হয় সেই পরিমাণে তাহা জ্ঞানোজ্জ্বল কর্ম্মক্ষম এবং অমৃতানন্দের সোপান হয়।

যোগী, ভক্ত ও সেবক।

প্রকৃত যোগ ভক্তি ব্যতীত কখন সম্পাদিত হইতে পারে না। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি না থাকিলে মনুষ্য তাঁহাতে কখনই যুক্ত হইতে পারে না। ঈশ্বরকে সর্ব্বদা নয়নে নয়নে রাখা, অনিমেষ নয়নে সর্ব্বদা তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শন করা, ঈশ্বরগত চিত্ত ও ঈশ্বরগত প্রাণ হওয়া, ঈশ্বরের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি ও প্রেম না থাকিলে কখনই হইতে পারে না। আবার প্রকৃত যোগী সেই ব্যক্তি যিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়-কার্য্যে মনোযোগী হইয়াও মুক্তিদাতা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হন না। যোগের প্রকৃত পরীক্ষা এই যে, বিষয় কার্য্য সম্পাদন সময়েও মন ঈশ্বর হইতে বিচলিত হইবেক না। অতএব ব্রাহ্মদিগকে যোগী, ভক্ত ও সেবক এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া যোগীকে প্রধানতঃ যোগ করিতে বলা, ভক্তকে প্রধানতঃ ভক্তি করিতে বলা এবং সেবককে প্রধানতঃ মনুষ্যের সেবা করিতে বলা সঙ্গত হয় না। ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গীন, তাহা আংশিক নহে।

ধর্ম্মের একটি অঙ্গের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিলে তাহার অন্য অঙ্গ পালনের প্রতি স্বভাবতঃ অপহেলা উপস্থিত হয়। কিন্তু ধর্ম্মের কোন অঙ্গকে অপহেলা করা উচিত নহে। সকলেই মস্তকের মণি-স্বরূপ। মনুষ্য যে সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্ম পালন করিতে পারেন না তাহা মনুষ্যেরই দোষ; ধর্ম্মের দোষ নহে! মনুষ্য অপূর্ণতা বশত সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্ম পালন করিতে সক্ষম না হউক কিন্তু ধর্ম্ম পূর্ণস্বরূপ। ধর্ম্মের পূর্ণ আদর্শ অনুসারে চলিত গেলে যদি আমাদিগের ত্রুটি হয় তাহা হইলে সে আমাদিগেরই ত্রুটি স্বীকার করা কর্ত্তব্য, ধর্ম্মের আদর্শকে নীচ করিয়া ফেলা উচিত হয় না। সামান্য নীতি বিষয়ে দেখ, যদি কোন নীতি-উপদেষ্টা নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে সংসার-কুশল, ন্যায়বান ও পরোপকারী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন এবং যে ব্যক্তির স্বভাবতঃ সাংসারিক পরিণামদর্শিতা আছে তাহাকে এইরূপ উপদেশ দেন যে, তুমি সাংসারিক পরিণামদর্শিতার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবে, ন্যায় ও পরোপকারের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবে না এবং যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ ন্যায়বান তাহাকে যদি উপদেশ দেন যে, তুমি ন্যায়পালনের প্রতি বিশেষ মনোযোগা হইবে, পরোপকারের প্রতি বিশেষ মনোযোগা হইবে না, এবং যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ দয়ালান ও পরোপকারী তাহাকে যদি উপদেশ দেন যে, তুমি পরোপকারের প্রতি বিশেষ মনোযোগা হইবে, ন্যায়াচরণের প্রতি বিশেষ মনোযোগা হইবে না, তাহা হইলে কি তিনি প্রকৃত সন্নীতি-সম্মত উপদেশ প্রদান করেন? ঐহিক অর্থ উপার্জ্জন জন্য চারিটী গুণ বিশেষ আবশ্যক; সাংসারিক পরিণামদর্শিতা, পরিশ্রম, বাক্য-নিষ্ঠতা, এবং মিতব্যয়িতা। যদ্যপি ঐহিক ধনপ্রার্থীদিগকে সাংসারিক পরিণামদর্শী,

পরিশ্রমী, বাক্যনিষ্ঠ এবং মিতব্যয়ী এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, এবং প্রত্যেক শ্রেণীর লোকদিগকে বলা যায় যে, তাহারা সেই শ্রেণীর গুণ রক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবে, অন্য শ্রেণীর গুণের প্রতি তত মনোযোগী হইবে না, তাহা হইলে কি তাহারা ঐহিক ধনোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়? ঐহিক অর্থ-সম্বন্ধে যদ্রূপ পরমার্থ সম্বন্ধে তদ্রূপ জানিবে। পরমার্থ লাভ জন্য যোগ, ভক্তি, প্রেম, সৎক্রিয়া সকলই আবশ্যক, ইহার মধ্যে একটীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিলে হইবে না। সকলের প্রতি সমান মনোযোগ প্রদান আবশ্যক। যে সকল ব্রাহ্মেরা পূর্ব্বোক্ত অন্যায় বিভাগ করেন তাঁহারা বোধ হয়, ভিন্ন ভিন্ন সাংসারিক বৃত্তি-উপযোগী গুণের সহিত পরমার্থ সাধন উপযোগী গুণের অস্পষ্ট সাদৃশ্য দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েন। তাঁহারা মনে করেন যে, যেমন সাংসারিক বৃত্তি-উপযোগী যাহার যে গুণ অধিক আছে তাহাকে সেই বৃত্তিতে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য; যে ব্যক্তি ক্রয় বিক্রয়ে পটু তাহাকে বাণিজ্যে নিযুক্ত করা উচিত, যে ব্যক্তি শারীরিক বলবান ও সাহসের কার্য্য সম্পাদন করিতে সর্ব্বদা সমুৎসুক তাহাকে সৈনিক বৃত্তিতে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য, যে ব্যক্তি শান্ত ধীরপ্রকৃতি তাহাকে ধর্ম্মোপদেষ্টার পদে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য; ধর্ম্ম-বিষয়েও সেইরূপ করা কর্ত্তব্য। যাহারা সর্ব্বদা যোগের প্রতি অনুরাগী তাহারা যোগী হইবে, যাহারা স্বভাবতঃ ভক্তির প্রতি অনুরাগী তাহারা ভক্ত হইবে, এবং যাহারা পরোপকারের প্রতি স্বভাবতঃ অনুরাগী তাহারা পরোপকারী হইবে। কিন্তু এ প্রকার বৃত্তি-নিয়োগ সংসার-সম্বন্ধে খাটে, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে খাটে না।

বিদ্যা।

৩৯৬ সংখ্যক পত্রিকার ৩৯ পৃষ্ঠার পর।

সঙ্গীতশিক্ষা মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক। অনেক অসভ্য জাতি চিত্র, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্যের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখে না, কিন্তু সঙ্গীত জানে না এমন জাতিই নাই। আহ্লাদ বা দুঃখে নানা স্বরে হৃদয়ের ভাব আপনিই মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

সঙ্গীতের সহিত কবিতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রথম প্রথম হয় ত অর্থহীন কতকগুলি যে সে শব্দ লইয়া গান হইত। পরে কোন দেবতার বা মহাবীরের স্তবসূচক কথা গীত হইত। ক্রমে ক্রমে তালমানের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দের উৎপত্তি হয়; এইরূপে চরণবদ্ধ কবিতা উৎপন্ন হয়। কিংবা হয়ত গান করিতে বা কথা কহিতে কহিতে দৈবাৎ তাহা শ্লোকরূপে পরিণত হইল। এই শ্লোকে কর্ণের তৃপ্তি অনুভব করিয়া তাহারই অনুকরণে কবিতা সৃষ্ট হইল। বাল্মীকির মুখ হইতে কবিতার প্রথম উৎপত্তির উপাখ্যানে বিবৃত আছে, করিব মুখ হইতে দৈবাৎ "পাদবদ্ধোঽক্ষর সমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ" শ্লোক নিঃসৃত হয়। দেবতার স্তুতিগানেই কবিতার উন্নতি হয়। এইরূপ দেখা যায় যে, দেবপূজায় প্রাচীন শিল্পের অনেক উন্নতি হয়। দেবমূর্ত্তি-নির্ম্মাণে ভাস্কর্য্য, দেবমন্দির-নির্ম্মাণে স্থাপত্য, ও দেবস্তুতি-গানে সঙ্গীত ও কবিতা ক্রমশঃ উন্নত হয়।

অভাবের সঙ্গে সঙ্গে যেমন শিল্প সৃষ্ট হয়, তেমনি অবকাশের মধ্যে বিজ্ঞান দর্শনাদি প্রচলিত হয়। এই জন্য পূর্ব্বকার যুদ্ধ বিগ্রহাদির কালে ঋষি-সম্প্রদায়ের হস্তে কোন গোলযোগের ভার ছিল না, রাক্ষস-হস্ত হইতে ক্ষত্রিয়-রাজারা তাঁহারদিগকে রক্ষা করিতেন; তাঁহারা কেবল দর্শন সাহিত্য নীতি শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিতেন।

কোন বিষয় জানার নামই বিজ্ঞান—এই সামান্য অর্থ হইতেই বিজ্ঞান বলিয়া এত বড় কথার উৎপত্তি হইয়াছে। জানিবার ইচ্ছা মনুষ্যের উন্নতির একটি কারণ। মনুষ্য যাহা প্রত্যহ দেখিতেছে তাহাতে তাহাদের কৌতূহল উদ্দীপিত হয় না। কিন্তু আমি গ্রামে বাস করি, আমি যদি নদীতীরের বালুকাময় ক্ষেত্র দেখি তবে আমার মনে হইবে এখানকার মৃত্তিকা এরূপ কেন? তখন আমি তাহার বিষয় অনুসন্ধান করিব। কিম্বা আমি যদি শীতপ্রধান দেশের তুষার দেখি, তবে আমার কৌতূহল হইবে, তখন দেখিব, যে শীতকালে জল জমিয়া তুষার হয়, গ্রীষ্মকালে তাহা পুনরায় গলিয়া যায়, তখন মনে আসিবে শীতপ্রভাবে জল সংকুচিত হয় ও উত্তাপে তাহা পুনরায় বিস্তৃত হয়, এইরূপ একটি বিজ্ঞানের সত্য আবিস্কার করিলাম। আমাদের কৌতূহল অনেক সময় অপরিচিত বস্তু হইতে পরিচিত বস্তুতে নীত হয়; যেমন আমি যদি দেখি যে স্ফটিকে সূর্য্য-কিরণ পড়িয়া নানাবর্ণ জন্মিয়াছে তখন আমার মনে হইবে যে, রৌদ্রের ত পীত লোহিতাদি বর্ণ নাই, আমার তখন রৌদ্রের দিকে মন আকৃষ্ট হইবে; ক্রমে সূর্য্যের বিষয় অনুসন্ধান করিব; এইরূপে অনেক বিজ্ঞান উন্নতি লাভ করিবে। বিজ্ঞানের মধ্যে চিকিৎসা বিদ্যাই প্রথম, কেন না ইহা প্রথম হইতে মনুষ্যের প্রয়োজনে লাগিয়াছিল।

বিজ্ঞান ও দর্শনে প্রভেদ কি? দর্শনও ত জানিবার ইচ্ছা হইতেই প্রসূত হইয়াছে। তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ লইয়া যাহা গ্রাহ্য হয় তাহাই বিজ্ঞান ও যাহা অনুভব করিয়া প্রমাণ করিতে হয় তাহাই দর্শন। আমরা বাহ্য প্রকৃতির বিষয় যত সহজে জানিতে পারি, আমাদের নিজের বস্তু আত্মা মন তত সহজে জানিতে পারি না। কেন না তাহা আমাদের অনুভব করিয়া লইতে হয়; দর্শন এই সকল লইয়া অনুমান করে এবং আপন আপন মতের উপর প্রামাণিক যুক্তি স্থাপন করে।

এই সকল শিল্প কবিতা বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি বিদ্যা লইয়া মনুষ্যের সভ্যতা সংগঠিত রহিয়াছে, এবং এই সকল বিদ্যা লইয়াই মনুষ্য পশুগণের অপেক্ষা আপনাকে উচ্চ বলিয়া গৌরব করে।

বৈদিক আর্য্যসমাজ।

যে বস্তুই দর্শন করি না কেন তাহা চীনদেশীয় দেবায়তনই হউক, গ্রীসের বিচিত্র দেবালয়ই হউক, ফ্রান্সের ধর্ম্মমন্দিরই হউক কিংবা অসভ্য আফ্রিকাবাসীদিগের বিশ্রীক দেবমূর্ত্তিই হউক; যে বিষয়ই শ্রবণ করি না কেন তাহা তাতারদেশীয় ঐন্দ্রজালিকদিগের বিকট চীৎকার ধ্বনিই হউক, গ্রীস দেশীয় মহাকবি পিণ্ডারের গীতাবলীই হউক, পালজিরার্ডের পবিত্র গীতমালাই হউক কিংবা আমেরিকা মহাদেশের আজ্‌টেক জাতির নরবলি দানকালীন ভীষণ উল্লাস-শব্দই হউক; যে বিষয়ই পাঠ করিনা কেন তাহা বৌদ্ধদিগের পবিত্র পুস্তকাবলীই হউক, হিব্রুজাতির ধর্ম্মপুস্তকই হউক, ঈশ্বরবাদীদিগের শাস্ত্রসমূহই হউক, নাস্তিকদিগের বেদাদিনিন্দাই হউক কিংবা মুসলমানদিগের কোরাণই হউক—যে কোন বিষয়ই হউক না কেন, যদি তাহার মনুষ্যের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে তবে তাহা আমাদিগের আদরের ধন। ভারতের বেদত্রয়ের সহিত যদি মানবজাতির কোন সম্পর্ক থাকে তাহা হইলে বেদ আমাদিগের যত্ন এবং আদরের সামগ্রী। অতএব বেদ এবং মনুষ্যের পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ তাহা নির্ণয় করা বিধেয়।

সমস্ত জগতের লোকের সহিত বেদের সম্বন্ধ যদিও না থাকে কিন্তু ভারতীয় লোকের সহিত বেদের সম্বন্ধ কেহই অস্বীকার ক- রিতে পারিবেন না। ভারতবর্ষীয় আর্য্য- গণের প্রাচীন বৃত্তান্ত, সুরীতি, নীতি, চরিত জ্ঞানের নিমিত্ত কৌতূহল চরিতার্থ করিতে হইলে বেদ একমাত্র অবলম্বন-স্থল। আর্য্য- গণ যৎকালে জ্ঞান, ধর্ম্ম এবং সভ্যতার উচ্চতম মঞ্চে বিহার করিতেছিলেন তৎ- কালে আর সর্ব্বত্র অজ্ঞানতিমিরাবৃত এবং অসভ্য ছিল। যখন সামবেদী উদ্গাতৃগণ বেদশাখা সকল গান করিতেন তখন গ্রীসী- য়েরা কিংবা ইংরাজদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা বন্যাবস্থায় বনে বনে বিচরণ করিত। ভারত বর্ষীয় আর্য্যগণ সভ্যতার আদিম শিক্ষক। ইহাঁদিগের পূর্ব্বতন আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্মপ্রণালী জ্ঞাত হইবার জন্য বিপুলশাখা- প্রশাখাযুক্ত বেদবৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। বৈদিক সময়ে আর্য্যদিগের সমাজ- বন্ধন, রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার এবং ধর্ম্মপ্রণালী কি রূপ ছিল তাহা নিরূপণ করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। প্রথমে বেদ- শব্দের অর্থ কি দেখা উচিত। জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতু হইতে বেদ শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। যাহা হইতে লৌকিক ও পারমার্থিক ধর্ম্মাধর্ম্ম- জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার নাম বেদ। "বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মোহ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ" বেদোক্ত বিষয় ধর্ম্ম এবং তদ্বিপরীতাচার অধর্ম্ম। আর "প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূ- পায়ো ন বুধ্যতে। এতং বিদন্তি বেদেন তস্মাৎ বেদস্য বেদতা" অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমান দ্বারা যে উপায় বোধগম্য হয় না তাহা বেদ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়, এই নিমিত্ত বেদের বেদত্ব সার্থক হইয়াছে। শঙ্ক- রাচার্য্য মাণ্ডুক্য উপনিষদ্‌ভাষ্যে লিখিয়াছেন "বেদশব্দেন তু সর্ব্বত্র শব্দরাশির্ব্বিবক্ষিতঃ" অর্থাৎ বেদ শব্দের অর্থ প্রামাণিক শব্দরাশি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট লৌকিক এবং পারমার্থিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্মের শাসনরূপ যে শাস্ত্র তাহাই বেদ শব্দের বাচ্য। পূর্ব্ব- কালে শিষ্যগণ গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া অভ্যাস করিত এই জন্য বেদের নাম শ্রুতি। তৎকালে লিপি-প্রণালী অপ্রচলিত ছিল। বেদ সকল প্রথম অবস্থায় শৃঙ্খলারহিত নানাবিধ মন্ত্রবিমিশ্রিত রাশিমাত্র ছিল, কেহ সহজে কোন একটী অংশ তন্মধ্য হইতে আকলন পূর্ব্বক পাঠ করিতে পারিতেন না। পরাশরসুত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বহু পরিশ্রম এবং আলোচনানন্তর তাহাদিগের প্রত্যেকের ছন্দোভেদ প্রয়োগ এবং কার্য্য অনুসারে তাহাদিগকে ঋক, যজুষ্, সাম এবং অথর্ব্ব এই চারিভাগে বিভক্ত করেন। এই নিমিত্তই তাঁহার নাম বেদব্যাস, নতুবা তিনি স্বয়ং বেদ রচনা করেন নাই। ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রের নাম ঋক, প্রশ্লিষ্টপঠিত গদ্য মন্ত্রের নাম যজুষ্ এবং গীতরূপ মন্ত্রের নাম সাম। বেদব্যাস এইরূপে চতুর্বেদ সংগ্রহ পূর্ব্বক বিভাগ করিয়া নিজশিষ্য পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পা- য়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্তকে অথর্ব্ববেদ উপদেশ দিলেন।

বেদের সংখ্যার বিষয়ে বিস্তর মতভেদ। মনুসংহিতার মতে তিন বেদ "তে এব হি ত্রয়ো বেদাস্তে এব হি ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।" অথর্ব্ব বেদের কোন উল্লেখ নাই। পুনশ্চ "অগ্নিবায়ুর- বিভ্যশ্চ ঋক্‌যজুঃসামলক্ষণং" অগ্নি, বায়ু এবং আদিত্য হইতে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদ ক্রমশঃ উদ্ভূত হইয়াছে। আবার "অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ। বেদত্রয়াৎ নিরদুহৎ ভূর্ভুবঃস্বরিতীতি চ॥" অর্থাৎ ঋগ্বেদ হইতে ভূঃ যজুর্ব্বেদ হইতে ভুবঃ এবং সামবেদ হইতে স্বঃ। অমর- সিংহের অভিধানমতে "স্ত্রিয়ামৃক্‌সামযজুষী

ইতি বেদাস্ত্রয়স্ত্রয়ী" বেদের নাম ত্রয়ী অর্থাৎ ঋক, যজুষ এবং সাম। পুরুষসূক্তেও অথর্ব্ব বেদের কথা নাই; যথা "তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়- তেতি। সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইতি" অর্থাৎ যজ- নীয় এবং সকলের হুয়মান সহস্রশীর্ষ পর- মেশ্বর হইতে ঋক্, যজু এবং সাম উৎপন্ন হইয়াছে। তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও তিন বেদের উল্লেখ আছে "যদ্বৈ যজ্ঞস্য সাম্না যজুষা ক্রিয়তে শিথিলং তৎ যদৃচা দৃঢ়মিতি" অর্থাৎ সাম এবং যজুষ্ দ্বারা যজ্ঞের যাহা যাহা শিথিল হয় তাহা ঋক্‌মন্ত্রের দ্বারা দৃঢ় করা যায়। কিন্তু মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা "দ্বে বিদ্যে বেদি- তব্যে ইতি হ স্ম বৈ যৎ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ, তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ, শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষম্। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ইতি" ব্রহ্মজ্ঞেরা বলেন দুই প্রকার বিদ্যা জ্ঞাত হওয়া উচিত; পরা এবং অপরা, সাধনভূত ধর্ম্মজ্ঞানের হেতু বলিয়া ষড়ঙ্গ সহিত কর্ম্মকাণ্ডের নাম অপরা বিদ্যা এবং পরম পুরুষার্থ স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের হেতু বলিয়া উপনিষদের নাম পরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যার মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ এবং জ্যোতিষ পরিগণিত। সামগ পণ্ডিতেরা সনৎকুমারের প্রতি নারদের যে বাক্য আমনন করেন, তন্মধ্যে চারি বেদের কথা আছে, যথা "ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণঞ্চেতি।" তাপনীয় উপনিষদেও চারি বেদের নাম কীর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায় "ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বণশ্চত্বারো বেদাঃ সাঙ্গাঃ সশাখাশ্চত্বারঃ পাদা ভবন্তীতি।" বিষ্ণুপুরাণেও চারি বেদের নামোল্লেখ আছে। এক্ষণে যে অথর্ব্ববেদ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা "অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ শ্রীমদথর্ব্ববেদসংহিতা।" অনেক স্থলে মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। "বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্। সএব পঞ্চমো বেদো যন্মহাভারতং বিদুঃ॥" "মহাভারত পঞ্চম বেদ, মহাভারত সহিত পঞ্চ বেদ উপদেশ দিয়াছিলেন।" কেহ কোন এক বেদের এক শাখা মাত্র অধ্যয়ন করেন, কেহ দুই বেদ অধ্যয়ন করেন, কেহ তিন বেদ পাঠ করেন, কেহ চারি বেদ পাঠ করেন এবং কেহ বা পঞ্চ বেদই অধ্যয়ন করেন। ইহাঁদিগকে পর্য্যায়ক্রমে শাখাধ্যায়ী দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্বেদী এবং পঞ্চবেদী কহে। ইতর ভাষায় দ্বিবেদীকে দোবে, ত্রিবেদীকে তেওয়ারী, চতু- র্বেদীকে চৌবে এবং পঞ্চবেদীকে পাঁড়ে বলে। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য স্মরণ করিয়াছেন "বেদান্ অধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথা- ক্রমং" অর্থাৎ তিন বেদ কিম্বা দুই বেদ কিম্বা এক বেদ অবশ্য অধ্যয়ন করিবে। যদি এক বেদ অধ্যয়ন করিতে হয় তবে পিতৃপিতামহ পরম্পরাপ্রাপ্ত বেদই অধ্যয়ন করা উচিত। অতএব মন্ত্রভেদানুসারে বেদ তিন, ঋক্, যজুষ্ এবং সাম। ছন্দোনিবদ্ধ স্তোত্ররূপ মন্ত্র ঋক্, প্রশ্লিষ্টপাঠ গদ্যে বিবৃত যজ্ঞানু- ষ্ঠানোপযোগী মন্ত্র যজুষ্ এবং গীতিরূপ মন্ত্র সাম। ঋক্‌মন্ত্র গীতিরূপে গীত ও ব্যবহৃত হইলেই তাহাকে সাম বলে। কিন্তু গ্রন্থা- নুসারে বিভাগ করিতে হইলে বেদ চারি, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ব্ববেদ। ঋক্ মন্ত্র সমস্ত যাহাতে নিবেশিত হইয়াছে তাহার নাম ঋগ্বেদ, যজুর্মন্ত্র সকল যাহাতে সংগৃহীত হইয়াছে তাহার নাম যজুর্বেদ, সামমন্ত্র সমূহ যাহাতে সম্বলিত হইয়াছে তাহার নাম সামবেদ, এবং মারণ উচ্চাটন-

ও বশীকরণ প্রভৃতি বিষয়ের মন্ত্র সকল যাহাতে নিহিত হইয়াছে তাহার নাম অথর্ব্ববেদ। এতন্মধ্যে ঋগ্বেদ সর্ব্বপ্রধান, যজুর্বেদে এবং সামবেদে ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে এবং অথর্ব্ববেদ পূর্ব্বোক্ত তিন বেদ হইতে পরে সঙ্কলিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ হইতে আর্য্যসমাজের অত্যন্ত প্রাচীন কালের ঐতিহাসিক, সামাজিক প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের নিরূপণ হইতে পারে এই নিমিত্ত ঋগ্বেদের প্রাধান্য।

এক্ষণে বেদের উৎপত্তি নির্ণয় করা যাইতেছে। পরাশর সংহিতার মতে "ন কশ্চিৎ বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।" অর্থাৎ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বেদের স্মরণকর্ত্তা মাত্র রচনকর্ত্তা নহেন। মনুসংহিতায় লিখিত আছে "সর্ব্বেষান্তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথকসংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥" অর্থাৎ পরমেশ্বর সকলের নাম, কর্ম্ম, এবং লৌকিক ব্যবস্থা পূর্ব্বকল্পে যেরূপ ছিল তদ্রূপ বেদের উপদেশ অনুসারে রচনা করিলেন। শ্রুতিতেও উক্ত আছে "ঋগ্বেদ এব অগ্নেরজায়ত যজুর্বেদো বায়োঃ সামবেদ আদিত্যাৎ" অর্থাৎ অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ উৎপন্ন হইয়াছে, বায়ু হইতে যজুর্বেদ, এবং আদিত্য হইতে সামবেদ। এস্থলে ঈশ্বরকেই বেদনির্ম্মাতা বলিতে হইবে, কারণ তিনি অগ্নি প্রভৃতিকে প্রেরণ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য, আর কেহ কেহ বলেন, বেদ পৌরুষেয় এবং অনিত্য।

বেদ অনিত্যই হউক আর নিত্যই হউক, পৌরুষেয়ই হউক আর অপৌরুষেয়ই হউক, লৌকিকই হউক আর অলৌকিকই হউক, সামান্যই হউক আর অসামান্যই হউক সে বিষয়ে আমরা কোন সিদ্ধান্ত করিতে চাহি না। বেদ যে চিরকাল হিন্দুসমাজে অভ্রান্ত এবং প্রামাণিকরূপে মান্য হইয়া আসিতেছে ইহাই নির্ণয় করা আমাদিগের আবশ্যক। কোন্ সময়ে বেদের উৎপত্তি হয় তাহা কেহই বিদিত নহেন, সুতরাং তদ্বিষয়ে বিস্তর মতভেদ হইবার বৈচিত্র্য কি?

কোন মহাত্মা নিজজিগীষাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া বেদমধ্যে স্বকপোলকল্পিত কিছু নিবেশিত করিতে না পারেন এবং বেদ সকল চিরকাল একভাবে অক্ষত এবং অপরিবর্ত্তিতরূপে থাকিতে পারে ইত্যাদি আবশ্যক অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত ষড়ঙ্গের রচনা হয়। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ এবং জ্যোতিষ ষড়ঙ্গ বলিয়া খ্যাত। এতদ্ভিন্ন পদ, ক্রম, জটা, ঘন প্রভৃতি কতকগুলি পাঠগ্রন্থ আছে, যদনুসারে বৈদিক পাঠের কোন ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না। এই সমস্ত যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

শিক্ষা। বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল ও সাম বিষয়ে উপদেশ যাহা হইতে পাওয়া যায় তাহার নাম শিক্ষা। শিক্ষাতে বর্ণস্বরাদির উচ্চারণ প্রকার সম্যকরূপে লিখিত আছে। মুনিসত্তম পাণিনির লেখনীবিনির্গত শিক্ষাগ্রন্থ বেদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্বরূপ। বর্ণ অকারাদি, স্বর ত্রিবিধ উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিৎ। উচ্চৈঃস্বর উদাত্ত, নীচৈঃস্বর অনুদাত্ত এবং এতদ্দ্বয়ের সমাহার স্বরিৎ; যথা "ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব" এইমন্ত্রে অন্ত্যোদাত্ত পাঠ করিলে তৎপুরুষ সমাস হয় এবং "ইন্দ্রের শত্রু বৃদ্ধি হও" এই অর্থ বোধ হয়, কিন্তু আদ্যোদাত্ত প্রয়োগ করিলে বহুব্রীহি সমাস হইবে এবং "ইন্দ্র হইয়াছেন শত্রু যাহাদের এরূপ তোমরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, অর্থাৎ ইন্দ্র তোমাদিগকে বিনাশ করিবেন" এই অর্থ উপলব্ধি হইবে। "আ যে তন্বন্তি রশ্মিভিস্তিরঃ সমুদ্রমোজসা মরুদ্ভিরগ্ন আগহি" এই মন্ত্র পাঠ কালে "আয়ে" উদাত্তস্বরে পাঠ করিতে হইবে। মাত্রা

হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত ভেদে উচ্চারণ কালের ত্রিবিধ নিয়ম, যথা এক মাত্র হ্রস্ব (হি), দ্বিমাত্র দীর্ঘ (হী) এবং ত্রিমাত্র প্লুত (গানে, রোদনে ইত্যাদি স্থলে বিহিত অতি দীর্ঘস্বর)। বল উচ্চারণ স্থান এবং প্রযত্ন। উচ্চারণস্থান অষ্ট প্রকার, প্রযত্ন অস্পৃষ্ট, ঈষৎ প্রভৃতি ভেদে বিবিধ। অনতিদ্রুত, অনতিবিলম্বিত, গীত্যাদিদোষরহিত এবং মাধুর্য্যগুণযুক্ত উচ্চারণ সাম্য। গীতস্বরে পঠিত, ঝটিকাবৎ শীঘ্র, মস্তক কম্পন পূর্ব্বক, যথা লিখিত তথা পঠিত, অতিমৃদুস্বরে এবং অর্থবোধ ব্যতীত পাঠ এই ষড়্বিধ অধম পাঠ। যাহা সুস্বর, যাহাতে সকল অক্ষর ব্যক্তরূপে উচ্চারিত হয়, যাহাতে যথাস্থানে পদচ্ছেদ আছে এবং যাহা লয়সমর্থ তাহা উত্তম পাঠ এবং মাধুর্য্যগুণযুক্ত। এই সমস্ত বিষয়ের উপদেশ শিক্ষা গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কল্প। আশ্বলায়ন, আপস্তম্ব, বৌধায়ন প্রভৃতি প্রণীত সূত্রের নাম কল্প। যাগপ্রয়োগ যাহাতে কল্পিত অর্থাৎ সমর্থিত হয় তাহাকে কল্প কহে। কোন্ কর্ম্ম কি রীতি অনুসারে, কোন্ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক এবং কাহার দ্বারা নিষ্পন্ন হইবেক তাহা কল্পসূত্রে নিরূপিত হইয়াছে। কল্প বেদের হস্ত স্বরূপ। মন্ত্রবিনিয়োগ দ্বারা যাগাদির উদ্দেশ কল্প সূত্রের কার্য্য।

ব্যাকরণ। প্রকৃতি প্রত্যয়াদির উপদেশ দ্বারা পদের স্বরূপ নির্ণয় এবং তদর্থনিশ্চয়ের নিমিত্ত ব্যাকরণ উপযোগি। পাণিন্যাদি মহর্ষিপ্রণীত ব্যাকরণ বেদের মুখস্বরূপ। ব্যাকরণ অধ্যয়নের প্রয়োজন বররুচি বার্ত্তিক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। পতঞ্জলি মহাভাষ্যে সেই সমস্ত স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা "ব্যাকরণজ্ঞ ব্যক্তি সম্যক্রূপে বেদের রক্ষা করিতে পারেন। সর্ব্বলিঙ্গ এবং সর্ব্ববিভক্তি সহিত বেদমন্ত্র নিগদিত হয় নাই, যজ্ঞকালে যে স্থানে যেরূপ আবশ্যক তথায় তদ্রূপ বিপরিণমিত করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে; বৈয়াকরণ ব্যতীত অন্য ব্যক্তি তাহা করিতে পারেন না। ব্যাকরণ ব্যতিরেকে অর্থোপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই, অতএব ব্যাকরণ অধ্যয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য।"

নিরুক্ত। বৈদিক সমূহ পদ অতি প্রাঞ্জল এবং বিস্পষ্ট ভাষায় নিরুক্ত গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নিরুক্তের ভাষা এতাদৃশ সহজ যে অর্থাববোধের নিমিত্ত পরাপেক্ষা থাকে না। যাস্ক, স্থৌলাষ্ঠীবি, ঔর্ণলাভ, শাকপূনি প্রভৃতি বিরচিত নিরুক্ত গ্রন্থ বেদের শ্রবণেন্দ্রিয়সম। অতএব বেদের অর্থবোধের নিমিত্ত নিরুক্ত গ্রন্থ অত্যন্ত উপযোগী।

ছন্দোগ্রন্থ। কোন্ ছন্দে কোন্ মন্ত্র পাঠ করিতে হয় তাহা ছন্দোগ্রন্থ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতী, জগতী প্রভৃতি নানাবিধ ছন্দ বেদে ব্যবহৃত হইয়াছে, অতএব এই সকলের সম্যক্ জ্ঞান জন্য ছন্দোগ্রন্থ আবশ্যক। পিঙ্গলাদিবিরচিত ছন্দোগ্রন্থ বেদের পদদ্বয়স্বরূপ।

জ্যোতিষ। যজ্ঞকালার্থসিদ্ধির নিমিত্ত জ্যোতিষ প্রয়োজনীয়। কোন্ কর্ম্ম কোন্ ক্ষণে আরম্ভ এবং কোন্ ক্ষণে শেষ করিতে হয় তাহা জ্যোতিষ গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট আছে। জ্যোতিষ বেদের চক্ষু স্বরূপ।

পদ। বেদমন্ত্রের কোন্ পদের মধ্যে কি কি অক্ষর আছে তাহাই পদগ্রন্থে লিখিত আছে। সন্ধিসূত্র-সকল গ্রাহ্য না করিয়া প্রত্যেক বৈদিক পদ যাহাতে পরস্পর অসংলগ্ন এবং বিভিন্ন রূপে নিবেশিত করা হইয়াছে তাহাকে পদপাঠ কহে। যথা ঋগ্বেদের ১।১৯।৭ মন্ত্র, সংগোমদিন্দ্র বাজবদস্মে পৃথুশ্রবো বৃহৎ। বিশ্বায়ুর্ধেহ্যক্ষিতং॥" পদপাঠ অনুসারে পঠিত হইলে এইরূপ

হয় যথা "সংগোমং ইন্দ্র বাজবৎ অস্মে পৃথু শ্রবঃ বৃহৎ। বিশ্বায়ুঃ ধেহি অক্ষিতং।"

ক্রম। কোন্ পদের পর কোন্ পদ উচ্চারন করিতে হইবে এবং কোন্ মন্ত্রের কোন্ পদ শেষ হইলে কোন্ মন্ত্রের কোন্ পদ উচ্চারিত হইবে তাহা ক্রম-গ্রন্থে নিরূপিত হইয়াছে। ক্রমপাঠ বহুবিধ; পদক্রম, বর্ণক্রম প্রভৃতি। যথা ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র "অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং" ক্রমানুসারে পঠিত হইলে "অগ্নিং ঈলে ঈলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য যজ্ঞস্য দেবং দেবং ঋত্বিজং" ইত্যাদি পদক্রম এবং "অগ্নি গ্নিমী মীলে লেপু পুরোরোহি" ইত্যাদি বর্ণক্রম।

জটা। জটাপাঠ ক্রমপাঠ অপেক্ষাও কৃত্রিম এবং আয়াসরচিত। যথা পূর্ব্বোদ্ধৃত ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র "অগ্নিং ঈলে অগ্নিং ঈলে ঈলে অগ্নিং পুরোহিতং যজ্ঞস্য পুরোহিতং যজ্ঞস্য যজ্ঞস্য পুরোহিতং ইত্যাদি।" প্রত্যেক পদদ্বয়ের তিন বার আবৃত্তি হইবেক এবং তৃতীয় আবৃত্তিকালে দ্বিতীয় পদটী প্রথমে ও প্রথম পদটী তৎপরে পাঠ করিতে হইবেক।

ঘন। পূর্ব্বোক্তসদৃশ আর এক প্রকার বৈদিক মন্ত্রের পাঠ আছে তাহাকে ঘনপাঠ বলে। এতদ্ভিন্ন অন্য নানা পাঠ-নিয়ম থাকিতে পারে।

ইত্যাদি কারণ সমূহ বশতঃ বেদের পাঠ ভেদ দূরে থাকুক, অক্ষর মাত্রেরও ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

THE CREDULOUS AGE.

(From The Friend of India.)

Man is a most credulous being. Who can doubt it? He has shown himself ready to believe the most marvellous, grotesque, and ridiculous stories. Many books, full of details, have been written to illustrate this peculiarity of the human mind, and great is the instruction, and we may add the amusement too, which these books have furnished. Often the stories are so absurd that they seem as if framed for the purpose of provoking laughter, and yet they only set forth that to which human beings have given implicit credence. As in every age there has been so much credulity, it is hard to say to what age precedence in this quality should be assigned. We are making a bold, many will think an audacious statement, when we say there never was more credulity in the world than at the present hour, in illustration of which we are prompted to go, not to the legends of some rude unlettered tribe, or to the fancies of the lowest and least instructed classes in civilized nations, but to the views gravely propounded by our scientists, as the outcome of their most profound research. Our risibility is not excited by these views as by stories which come readily to our recollection, but the longer we consider them, the more we are impressed with the enormous credulity requisite for their acceptance. When such men as Tyndall, Darwin, Huxley and Herbert Spencer leave their proper sphere of scientific investigation, within which they are worthy of all honour, and propound their views of God, of the universe, and of man, if they be the representatives of our age, we are inclined to think no age for credulity can take its place before ours.

Let us first consider the atomic theory, about which so much has been written of late, and the use made of it to answer some of the greatest questions which can come before the human mind. Before considering the use made of the theory let us try to show what it is.

According to this theory, atoms, or molecules, are the elements which form the substratum of all beings and things, and into which they are all resolvable. These atoms are uncreated and can never cease to exist. In the motes which dance in the sunbeam we have an illustration of them, but only an illustration. These motes are coarse things, compared with atoms. They are by far too fine to be perceived by the senses and can be conceived only by the mind. Strictly speaking they

are neither infinitely divisible nor infinitely numerous, but we can place no limit to their division, and no figures of ours can set forth their number. They are much more compressed in some things, such as metals, than in other things, such as the atmosphere or gases, and in the latter, if we may so speak, they have much more of liberty than in the former. Professor Tyndall tells us, "they collide, they recoil, they oscillate." They are amazingly active, never at rest, and only prevented from involving the universe in ruin by their mutual pressure and counteraction. This world with its innumerable objects, and all the worlds that exist, are their product. They permanently abide, while the forms to which they give rise are constantly changing,—growth, decay, and reproduction giving place to each other. For instance, the shape, the colour, and the smell of the flower, disappear, but the atoms, of which it is composed remain and in due time give a new birth to the flower. Great and admirable though the doings of the atoms be, we must not regard them as intelligent beings with a purpose to fulfil, and power to fulfil it, or to be in any way ordered or impelled by a superior Being. The teleological argument as it is called, the argument from design, is anthropomorphic and can obtain no countenance from the scientific mind. Atoms are incapable of entertaining any purpose, and yet with an order, a regularity, and an efficiency, which are beyond all praise, they work out marvellous results, which transcend not merely the achievements, but to a great extent the comprehension, of the strongest and most cultivated minds; thus atoms, we may suppose, have been working from eternity, and will go on working to eternity.

The Greek Philosopher Epicurus has the credit of having first propounded the Atomic Theory, and the Roman Poet Lucretius is its most able and ardent expounder. Unusual attention has been given of late to his poem De Rerum Natura. The warmest eulogy has been pronounced on it by most competent judges many of whom have no sympathy with the theory which the poet has so passionately embraced. For comprehensiveness of view, strength of intellect, closeness of reasoning, tenderness of sentiment, and force of diction, it has been declared one of the most wonderful compositions of the human mind. These grand peculiarities of the poem have not however been the reason of the special attention it has recently received. The reason has been the poet's apparent anticipation by intuition rather than by induction of facts, of some of the most advanced scientific doctrines of our day. With some, a still stronger reason has been the lever it has seemed to furnish for overturning the doctrines generally held about God, man, and providence.

We have not a word to say about the truth and value of the Atomic Theory in Chemistry, or its strictly scientific application to other subjects. It would be presumptuous for us to meddle with it in this aspect. When however the theory is brought into the sphere, which deeply concerns us all, we have a right to look at it, and to question the use to which it is put. If we had been simply told that created elements, called atoms are the substratum of all things, that God had from them produced all the phenomena of the world, that they remain amidst the ever-shifting scenes around us, that of themselves they are nothing and can do nothing, but are controlled and directed by God to the fulfilment of His purposes, whatever might be the truth or value of the theory in a scientific aspect it would have left untouched the doctrines to which Christians attach the highest value. The case is very different when the theory asserts views, which war with what we believe to be the most certain and precious truth.

Let us revert to our statement of the theory. We are told that the atoms are in constant motion, and are prevented from doing the direst mischief only by mutual pressure and counteraction. They have no one over them to keep them in order, they are endowed with no capacity to know how they ought to conduct themselves, they are left to countercheck each other the best way they may,—and they do this to perfection, so that the catastrophe, which would follow a minute's failure in this work of counteraction, is effectually warded off. Human beings are capable of knowing how they ought to act

towards each other, but it would seem very unsafe to leave a large city, composed of a heterogeneous and restless population, to no other control than the mutual counteraction of individuals. Yet these restless and at the same time senseless atoms need nothing more than this to keep them right. To government the very ants and bees are indebted for ability to effect those achievements which draw forth our admiration, but the atoms need nothing of the kind. Law is impressed on them, but they have no law-giver, or law-administrator. Is not this hard to believe?

This is not all, or nearly all. Every one who has eyes to see and a mind to think, is at one time delighted, at another time entranced, and not unfrequently awed, by the scenes within and without. How admirable are the adaptations of the various departments of nature to each other, and how fitted to promote the most important and beneficial ends! How great is the provision made to meet our sense of beauty, as well as to supply our wants! As we are looking on, and musing with admiration, the scientist places himself at our side, and says "Behold the promise and potency of all terrestrial life! Behold the admirable doings of the atoms! How little can you do with all your boasted intelligence. See what atoms can do without intelligence, purpose, or design!" We wish to treat our philosopher with all respect, but when called on by him to believe not only that the atoms keep themselves in order without a governor, but that they have produced, harmonized, and beautified this magnificent world, our faith is strained even to bursting. As if this were not enough, a still heavier burden is imposed, for we are told that atoms have given birth to mind, and form its essence. This is more than we can bear. A tax is laid on our credulity, which we are utterly unable to pay. Mr. Froude in his Essay on the Saint History drawn up by the Bollandist Fathers, gives the martyrology of a St. Kieran and thirty companions, who were decapitated by Cornish Pagans. "The trunk of Kieran rose from the ground, and selecting first his own head, and carrying it to a stream, and there carefully washing it, and afterwards performing the same sacred office for each of his companions, giving each body its own head, he dug graves for them and buried them, and last of all buried himself." Here a person, who once had life, when deprived of it, is represented as performing duties, which in their full extent the living could not discharge without a miracle. This ought not to be named beside what we are told the atoms have done. They have no life, they are incapable of it, they have no mind, and yet they have done and are doing immeasurably more than all human beings, from the beginning to this hour, have been able to accomplish.

Lucretius well deserves our deep interest and sympathy. He was evidently a man of most lofty spirit, He revolted against the religion of his day, against the gods his people adored, against their vile character and arbitrary proceedings, against the base fears and wicked and grotesque acts, to which their worship prompted. He saw on every side around him traces of law and order, and thought he had found a theory, which furnished a rationale of the world. Mr. Symonds says regarding him! "The very sources of his poetic strength were such as are usually supposed to depress the soul. His passion was for death, annihilation, godlessness. No other poet who ever lived in any age, on any shore, drew inspiration from founts more passionless and more impersonal." We cannot but consider him the victim of credulity, when he supposed he had by his atoms solved the riddle of the universe. What then are we to think of those, who in our day with the Bible in their hands, above all, with the teaching of Christ before them, would drag us back to the position of the heathen poet, and displace the Living, All-Wise, All-Powerful, All-Righteous and All-Living God to make way for the enthronement of atoms, as the formers and disposers of all beings and all things! In order to our acceptance of this doctrine we should require a capacity for believing the unbelievable beyond that shown by the most voracious devourer of marvels, of whom we ever read.

Registered No 52.

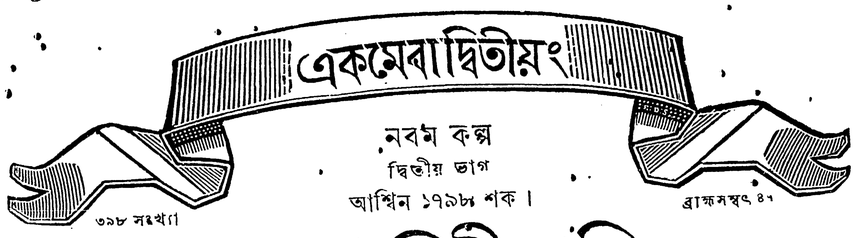

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞাননমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ।

৩ শ্রাবণ সোমবার ১৭৯৮ শক।

আমরা বাহ্য-বস্তু সকলের মধ্যগত হইয়াই অবস্থান করিতেছি। বাহ্য পদার্থ সকলই আমারদের শ্রবণ, আঘ্রাণ, দর্শন ও স্পর্শের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়-বৃত্তি, মনোবৃত্তি সকল অহর্নিশি বহির্বিষয়ের পশ্চাতেই ধাবিত হইতেছে। কিন্তু এই সমস্ত বিষয়-ব্যাপারের শ্রোতা, ঘ্রাতা, দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, মন্তা, বোদ্ধা ও কর্ত্তা কে, তাহা একবারও বিশেষরূপে আলোচনা করি না এবং আলোচনা করিয়া তদনুরূপ কার্য্য সাধনেও নিযুক্ত হই না। কোথায় আত্মা যন্ত্রী হইয়া, দেহ মনকে যন্ত্ররূপে চালনা করিবে, বিষয়-সকলকে আপনার আয়ত্ত করিবে, না বাহ্য বস্তু ও বহির্জগতই যেন যন্ত্রী হইয়া আমারদের দেহ মনকে যন্ত্র করিয়া, এই বিশাল কর্ম্ম-ক্ষেত্রে সঞ্চালন করিতেছে। বিষয়-ব্যাপার-সকল, আপন আপন চাকচিক্য বিস্তার করিয়া, সর্ব্বদাই আমারদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকলকে উত্তেজিত করিতেছ। বাহ্য শোভা-সৌন্দর্য্য সকল স্ব স্ব মোহিনী শক্তি প্রভাবে আমারদের মনোবৃত্তি সকলকে আকর্ষণ করিয়া—প্রতিক্ষণ হৃদয় মনকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিতেছে। আমরা তৃণের ন্যায় শক্তি-সামর্থ-হীন এবং কর্ত্তৃত্ব-বিহীন হইয়া প্রবৃত্তি-স্রোতে ভাসমান হইতেছি। পশুপক্ষিগণ যেমন পৃথিবীতে লোভভয়ে চালিত হয়, আমরা জ্ঞানধর্ম্ম-সমন্বিত স্বাধীন জীব হইয়াও তাহারদের ন্যায় প্রবৃত্তি-পরবশ হইয়াই ঘূর্ণিত হইতেছি। অঙ্গসৌষ্ঠবে, ইন্দ্রিয়-কৌশলে, বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রভাবে, অধিকার-উন্নতি-কল্পে, আমারদের শ্রেষ্ঠত্ব মহত্ত্ব থাকিলেও জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ-সম্বন্ধে আমরা তাহারদের ন্যায় এক ক্ষেত্রেই অবস্থান করিতেছি! আমরা না হয় কোটর-বিবর হেয়-জ্ঞান করিয়া প্রাসাদ অট্টালিকায় বাস করিতেছি, স্বভাবজাত রোম-পক্ষ-ত্বাজীর অসদ্ভাবে না হয় বস্ত্র অলঙ্কার পরিধান করিতেছি, অযত্নসম্ভূত তৃণ গুল্ম অথবা আমমাংসের পরিবর্ত্তে আমরা না হয় কৃষিজাত ফল শস্যাদি রন্ধন করিয়াই ভোজন করিতেছি, কিন্তু আত্ম-জ্ঞান-বিহীন হইয়া যতদিন আমরা প্রবৃত্তির অধীন থাকিব, উদর-পূরণ, ইন্দ্রিয়-সুখ-সাধনই যতদিন আমারদের জীবনের সার কার্য্য থাকিবে, ততদিন তাহার-

দের সহিত আবাস-আচ্ছাদন, পান-ভোজনের সৌসাদৃশ্য না থাকিলেও আমারদিগকে কার্য্যতঃ সেই অধঃশ্রেণীস্থ হইয়াই থাকিতে হইতেছে।

মনুষ্যের আত্ম-জ্ঞান থাকাতেই মনুষ্য পৃথিবীর ভূষণ। তাহার কর্ত্তৃত্ব থাকাতেই সে এই পৃথিবীর রাজা! তাহার কর্ত্তব্য-জ্ঞান থাকাতেই সে এই মর্ত্ত্যলোকবাসী হইয়াও দেবতাদিগের সংসর্গ-লাভের অধিকারী। আত্ম-স্বভাব, আত্ম-প্রকৃতি জানিতে সুপারগ বলিয়াই মনুষ্য অনন্ত-উন্নতি-পথের সবল-যাত্রী। এই উন্নত অধিকার করুণা-নিধান পরমেশ্বর পৃথিবীতে আর কাহাকেও প্রদান করেন নাই। মনুষ্যের আত্মাতেই তাঁহার এই করুণামৃত বর্ষিত হইয়াছে। এই দিব্য-অলঙ্কারে তিনি মানব-আত্মাকেই অলঙ্কৃত করিয়াছেন। জড় কি উদ্ভিদ্, পশু কি পক্ষী, কাহারও এমন পরিস্ফুট সমুজ্জ্বল আত্ম-জ্ঞান ও আত্ম-কর্ত্তৃত্ব নাই। জড় উদ্ভিদ্ একস্থানেই অবস্থান করিতেছে, জীবজন্তু প্রবৃত্তির দাস হইয়াই রহিয়াছে, মনুষ্যই আপনার স্বাধীন প্রকৃতিবলে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যথেচ্ছ গমনাগমন করিতে পারে। মনুষ্য আত্ম-জ্ঞান-প্রভাবে প্রবৃত্তি-প্রদর্শিত সহস্র কুটিল বর্ত্মের মধ্য হইতেও আপনার কল্যাণময় গন্তব্য পথ নির্ব্বাচন করিয়া অটলভাবে ব্রহ্মধামাভিমুখে গমন করিতে সমর্থ হয়।

আমরা তত্ত্বনির্ণয় বা সত্য-নির্দ্ধারণ-সময়ে এই সকল নিগূঢ় বাক্য সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করত মনুষ্য-জীবনের প্রাধান্য সংস্থাপন করিতে কেমন পাণ্ডিত্ব প্রকাশ করি! কিন্তু সংসারক্ষেত্রে, কার্য্যকালে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া—সকল তত্ত্বে জলাঞ্জলি দিয়া পশুর ন্যায় অন্ন পান আহরণে, ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগেই জীবন-কাল অতিবাহিত করিয়া থাকি। আমি কে? কে আমার স্রষ্টা পাতা বিধাতা? কেন এই পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি? পরেই বা কোথায় গমন করিব? এই সকল অবশ্য-পরিজ্ঞেয় আত্ম-তত্ত্ব আলোচনায় যত্নশীল হই না। নানাপ্রকার সুখদ অন্ন-পানে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, নানাবিধ ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিকর পদার্থ-ব্যূহের মধ্যগত হইয়াও, কেন এখানে চিরতৃপ্তি, চিরশান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না, একবারও ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই না। সংসারের নিকটে—বিষয়ের সন্নিধানে আমরা প্রতিদিনই প্রবঞ্চিত হইতেছি, অথচ আমারদের এমন জ্ঞানলাভ শিক্ষালাভ হয় না, যাহাতে আমরা সংসার-মরীচিকা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হই। পতঙ্গের ন্যায় অনল-দাহ হইতে আত্মরক্ষা করি।

ঈশ্বরের উদ্ভিদ্‌রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, আমরা বুদ্ধিবলে তাহারদের মধ্যে কত শ্রেণী নির্দ্দেশ করি, জন্তুজগতের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আকৃতি প্রকৃতি ভেদে তাহারদিগকে কত ভাগ বিভাগে বিভক্ত করত আমারদের সহিত তাহারদের সম্বন্ধ অবধারণ করি, কিন্তু আত্ম-সম্বন্ধে আমরা অন্ধ হইয়া রহিয়াছি। আত্ম-কর্ত্তব্য-নির্ণয়-বিষয়ে আমরা মূঢ়ের ন্যায় অবস্থান করিতেছি। পুত্রকন্যার নিকটে শ্রদ্ধাভক্তি প্রত্যাশা করি, অধীন আশ্রিত জনসন্নিধানে কৃতজ্ঞতা আকাঙ্ক্ষা করি, বন্ধুর নিকটে অকৃত্রিম প্রীতি-লাভের প্রার্থনা করি, শিষ্যসন্নিধানে যথাযোগ্য সম্মান-সমাদর পাইবার অভিলাষী হই, প্রজাদিগকে বশীভূত ও অনুগত হইবার ইচ্ছা করি, কিন্তু যিনি আমারদের পিতার পিতা, মাতার মাতা, যিনি আমারদের সর্ব্বাচ্ছাদক আশ্রয়দাতা, যিনি আমারদের হৃদয়বন্ধু, যিনি জ্ঞান-দাতা গুরু, যিনি বিশ্বরাজ্যের রাজা, তাঁহার সহিত

আমারদের কি কোন সম্বন্ধ নাই? তাঁহাকে কি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি করা—তাঁহার আশ্রিত আজ্ঞাকারী থাকা কি আমারদের কর্ত্তব্য নয়? সেই জ্ঞানদাতা গুরু, সেই সর্ব্বসুখদাতা ত্রিভুবনপতিকে কি কৃতজ্ঞতা-উপহার প্রদান করা আমারদের নিত্য কর্ম্ম নয়? আমরা স্বার্থ-সাধনের সময়েই বিজ্ঞ বিচক্ষণ দূরদর্শী পণ্ডিত হই, আত্ম-কর্ত্তব্য-সম্পাদন বিষয়েই অন্ধ হইয়া পড়ি! আমরা আত্ম-তত্ত্ব, আত্ম-প্রকৃতি অনুসন্ধানে পরাঙ্মুখ থাকি বলিয়াই আমারদের এই বিষমতর দুর্গতি। আমরা আত্ম-জ্ঞান উদ্দীপনে নিশ্চেষ্ট রহিয়াছি বলিয়াই দেবতুল্য অধিকার সত্ত্বেও আমারদের ঈদৃশ দুরবস্থা। প্রাণ হইতে শরীরকে পৃথক করিয়া শারীরিক সাংসারিক কার্য্য সাধন করা যেমন অসম্ভব, তেমনি পরমাত্মা হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এখানে ধর্ম্ম-সাধন, কর্ত্তব্য সম্পাদনও দুরাশা মাত্র।

ঈশ্বরের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, যদি সর্ব্বাগ্রে তাহা অবধারণ করিতে পারি, তাহা হইলে জগতের প্রতি আমার কি কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজ হইয়া পড়ে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় উদ্দেশ্য যদি নির্ণয় করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে তাঁহার অধীন আশ্রিত, সেবক উপাসকের যে কি জীবনের লক্ষ্য, কি যে তাহার নিত্য কর্ম্ম তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হয়। কি জন্যই যে এই সংসারে প্রেরিত হইয়াছি, পরেই বা কোথায় গমন করিব, যদি তাহা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা হইলেই আত্ম-শাসনে—আত্ম-সংযমে সমর্থ হইয়া প্রবৃত্তির প্রতিস্রোতে গমন করিতে ইচ্ছুক হই। যদি আত্মভাব আত্মপ্রকৃতি সমুজ্জ্বলরূপে অনুভব করিতে সুপারগ হই, তাহা হইলে সংসারের অধীনতায় আর তৃপ্তি লাভ হয় না। ইন্দ্রিয়ের দাসত্বে আর প্রবৃত্তি জন্মে না। তখন আপনাকে সংসারের প্রভু, রিপুকুলের রাজা বলিয়া জানিতে পারি। তখন আত্মার দেবদত্ত বল-কর্ত্তৃত্ব, প্রতাপ-প্রভুত্ব উপলব্ধি করিয়া স্বেচ্ছাচার হইতে নিবৃত্ত হই। তখন সমুদায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহার অধীন, তাঁহার অধীনে থাকিতেই ইচ্ছা হয়। সেই মঙ্গলময় মহান্-পুরুষের ইচ্ছাস্রোতঃ যে দিকে প্রবাহিত হইতেছে, সেই দিকেই আমারদের কার্য্যপ্রবাহ ধাবিত হয়। তাঁহার স্নেহ, তাঁহার প্রেম তাঁহার শুদ্ধ সত্য মঙ্গলভাবই আমারদের কার্য্য সাধনের ও আত্মোন্নতি সম্পাদনের একমাত্র আদর্শ হইয়া উঠে। তখন আমারদের চিন্তা, কার্য্য ও লক্ষ্য সকলই মঙ্গলময় সুধাময় ভাব ধারণ করে। তখন ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, মলিনতা, স্বার্থপরতা সকলই তিরোহিত হয়। তখন ধর্ম্মের জয়েই আমারদের আনন্দ, সত্যের জয়েই আমারদের সুখ, মঙ্গলের জয়েই আমারদের কল্যাণ, ঈশ্বরের জয়েই আমারদের জয় লাভ হয়।

হে সুধীর সজ্জন সকল! আমরা জীবনের লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারি না বলিয়াই, দেখ সংসার কি ভয়ানকরূপ ধারণ করিতেছে। এই শিক্ষা ও সাধন-ভূমি, আমারদের দোষেই অশিক্ষা অধোগতিরই আধার হইয়া পড়িতেছে। এই ধর্ম্মক্ষেত্র যেন অধর্ম্ম অত্যাচারের আকর—রাক্ষসভূমি হইয়া উঠিতেছে। আমরা আত্মতত্ত্ব আলোচনায় যত বিমুখ হইতেছি, স্রষ্টার উদ্দেশ্য অবধারণে—জীবনের কর্ত্তব্য-সাধনে যত ঔদাস্য প্রদর্শন করিতেছি, পৃথিবী ততই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। দেখ, সকলে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখ, এখন আস্তিকতার পরিবর্ত্তে নাস্তিকতা, ধর্ম্মসাধনের পরিবর্ত্তে স্বার্থসাধন, পরলোক দৃষ্টির পরিবর্ত্তে সংসারাসক্তি, ঈশ্বরোপাসনার পরিবর্ত্তে বিষয়-সেবা, ব্রহ্মানন্দের পরিবর্ত্তে এই ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে

নিত্য নূতন বিষয় আমোদ প্রমোদের ক্ষেত্র বিস্তৃত হইতেছে কি না? ইহাতে কি আর্য্য-ভূমি অন্তঃসার-শূন্য হইয়া যাইতেছে না? ইহাতে কি আমরা মনুষ্যত্ব-বিহীন হইয়া পড়িতেছি না? বিকৃতিই যাহারদের প্রকৃতি হইতে চলিল, তাহারদের সর্ব্বনাশের আর অপেক্ষা কি? ঈশ্বরের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্যই আমারদের এই অধোগতির সুনিশ্চিত কারণ। ধর্ম্মসাধনের জন্যই যে এই শরীর-মন-আত্মা, ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য-সাধনের নিমিত্তই যে এই সংসার, আমরা কয় জন তাহা স্মরণ রাখিয়া পৃথিবীতে নিত্য কর্ম্ম সমাধা করি? বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখ, আমারদের সন্তানসন্ততিগণ কি পরিমাণে অপরা বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে, বিদ্যালয়ে কতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, কর্ম্মক্ষেত্রে কিরূপ যশস্বী ও প্রতিপন্ন হইতেছে, প্রতিদিন দশবার তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করি, কিন্তু তাহারা ত্রিসন্ধ্যা ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণা, পূজার্চ্চনা করিতেছে কি না—বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহারা ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রসর হইতেছে কি না—শরীর মনের বলাধানের সঙ্গে সঙ্গে তাহারদের ধর্ম্মবল ধর্ম্মসাহস বর্দ্ধিত হইতেছে কি না, হয় তো একবারও তাহার অনুসন্ধান লই না। তাহারদিগকে অধ্যয়ন-নিপুণ দেখিলেই আনন্দ অনুভব করি, কিন্তু সেই পাঠ্য পুস্তকে অমৃত কি গরল নিহিত রহিয়াছে তাহার প্রতি আমারদের দৃষ্টি নাই। তাহারদের বিহার-ক্ষেত্র কেন যেরূপই হোক্ না, আমরা তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি না; কিন্তু প্রতি সপ্তাহে এক দিন, এক ঘণ্টার জন্য ধর্ম্মমন্দিরে—তীর্থভূমিতে, সাধুসঙ্গে মিলিত হইয়া ঈশ্বরতত্ত্ব যে, পর্য্যালোচনা করিবে, ইচ্ছা পূর্ব্বক আমরা কি তাহার জন্য আদেশ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকি?

আমারদের এই কর্ত্তব্য-বিমূঢ়তা জন্য দেখ, চতুর্দ্দিকে কি গরলময় ফল উৎপন্ন হইতেছে। ধর্ম্ম-বন্ধনই জন-সমাজের যথার্থ বন্ধন। ভারতে দেখ সে বন্ধন দিন দিন কেমন শিথিল হইয়া যাইতেছে। কৃতবিদ্য দলের মধ্যে দেশপ্রচলিত ধর্ম্মে প্রায় কাহারও আন্তরিক আস্থা ও অনুরাগ নাই। আবার জ্ঞান প্রেম, যোগ ভক্তি-প্রধান ব্রাহ্মধর্ম্ম, যাহা ভারতের সার সম্পত্তি—পৃথিবীর শিরোভূষণ, তাহার আশ্রয় গ্রহণেও লোকের আশানুরূপ আগ্রহ ও ঔৎসুক্য নাই। দেশের এই সকল অশুভ লক্ষণ সন্দর্শন করিলে কোন্ স্বদেশ-প্রেমীর হৃদয় না ব্যথিত হয়? কোন্ ঈশ্বরপরায়ণ সাধু না বিরলে ইহার জন্য অশ্রুপাত করেন, অতএব আর কাল ব্যয়ের আবশ্যক নাই, আইস, এখনই সকলে কৃত-অপরাধজন্য ঈশ্বরের সন্নিধানে ক্ষমা প্রার্থনা করি। অদ্য হইতেই আত্মতত্ত্ব আলোচনায় কৃতসঙ্কল্প হই। এই রাত্রি হইতেই জীবনের লক্ষ্যসাধনে দৃঢ়ব্রত হইবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হই। আমারদের যত্ন চেষ্টা থাকিলে আত্মার দুর্গতি—দেশের দুর্দ্দশা পরিহারে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব, কেন না সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

অধ্যাত্ম-বিদ্যা।

বুদ্ধি বা বিজ্ঞান বা স্বাধীন কর্ত্তা বা জীবাত্মা এক দিকে, মনপ্রাণসমন্বিত শরীর এবং জগৎ-সংসার অন্য দিকে। সংসার সাগর-স্বরূপ; শরীর-মন শুক্তিকা-স্বরূপ; সেই শুক্তিকার অভ্যন্তরে জীবাত্মারূপ মুক্তা স্থিতি করিতেছে। পরমাত্মার স্নেহ-দৃষ্টি প্রেম-দৃষ্টি করুণা-দৃষ্টি সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সেই সংসার-সাগর এবং সেই শুক্তিকার কবাট ভেদ

করিয়া তদুপরি নিপতিত রহিয়াছে। তিনি দেখিতেছেন, কতক্ষণে জীবাত্মা অবিদ্যা-অন্ধকারের মধ্য হইতে প্রভারূপে সমুত্থান করে, কতক্ষণে মুক্তা স্বীয় কবাট উদ্ঘাটন করিয়া সূর্য্যকিরণে অনুরঞ্জিত হয়। দেখিতেছেন বলিয়া নহে—ইচ্ছার সঙ্গে দেখিতেছেন। আত্মা জয়যুক্ত হউক্ ইহা তাঁহার ইচ্ছা, কেন না জীবাত্মার প্রতি তাঁহার স্নেহ প্রেম করুণা ধ্রুব তারার ন্যায় অটল রহিয়াছে। শুদ্ধ যে কেবল ইচ্ছা তাহা নহে, তাঁহার ইচ্ছাই তাঁহার শক্তি—সেই শক্তি যাহার বলে সমস্ত জগৎ ভ্রাম্যমান হইতেছে। পরমাত্মা আমারদের প্রতি যে ভাবে দৃষ্টি করিতেছেন, আমরা সেই ভাবের ভাবুক হইলে বিজ্ঞানময় কোষ হইতে আনন্দময় কোষে সমুত্থান করি। আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ; আপনি আপনাকে অবলোকন করিতে পারে জ্ঞানের এমনি একটি অসাধারণ ক্ষমতা আছে। আপনাকে স্থির ভাবে অবলোকন করিতে হইলে আপনা হইতে উচ্চে উঠিতে হয়, পরমাত্মার ভাবের ভাবুক হইতে হয়। পরমাত্মার আনন্দরূপ অভয়শিখরে অবস্থিতি করিয়া, তাঁহার প্রেম-রঞ্জনে চক্ষুকে রঞ্জিত করিয়া, অধঃস্থ সংসার-ক্ষেত্রে আপনাকে আমরা যে অবস্থাতেই নিপতিত দেখি না কেন—সম্পদে পরিবৃতই দেখি, বিপদে আক্রান্তই দেখি, বদ্ধই দেখি, আর মুক্তই দেখি, সুস্থই দেখি, আর রুগ্নই দেখি, কোন অবস্থাতেই আমরা ভগ্নোদ্যম হই না। কেন না ইহা আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, শুক্তিকার মধ্যে সেই যে মুক্তা রহিয়াছে, শরীর মনের মধ্যে সেই যে জীবাত্মা রহিয়াছে, ঈশ্বর-প্রসাদে তাহা কোন অবস্থাতেই নিরুদ্যম হইবার নহে; আপাততঃ তাহা শোকভারে প্রপীড়িত পাপতাপে কলুষিত হইয়া বিভ্রান্ত চিত্তে বিচরণ করিতেছে ইহা যদিও সত্য হয় তথাপি তাহাতে এমনি একটি মৃতসঞ্জীবনী শক্তি আছে যে, তাহা আপনার পথ আপনিই করিয়া লইবে; কিছুতেই নিরস্ত হইবে না। যখন বীজ মৃত্তিকার গর্ভে নিহিত আছে, এবং উপরে যখন দেবতা সদয়, তখন যথাসময়ে অঙ্কুর মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিবে ইহাতে আর সংশয় কি? বীজ ত মৃৎপিণ্ডের ন্যায় নির্জ্জীব নহে, তাহার মধ্যে জীবন জাগিতেছে; আত্মার মধ্যে শুধু জীবন নয় অবিনাশী জীবন জাগিতেছে, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি জাগিতেছে; সে অগ্নি কি বল করিবে না? চিরকালই কি তাহা প্রসুপ্ত থাকিবে? কখনই না। এ প্রকার আনন্দ এ প্রকার অভয় এ প্রকার আশা আমারদের মনে কোথা হইতে আইসে? ইহার উত্তর ব্রাহ্মধর্ম্ম এইরূপ দিতেছেন

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে তয়োরেকঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যোভিচাকশীতি। সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো ঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যং ঈশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ।

স্বদেশানুরাগ।

পৃথিবীর সকল মনুষ্য ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বর সকল মনুষ্যের সাধারণ পিতা, অতএব তাহারা পরস্পর ভ্রাতা স্বরূপ। কোন পারস্য কবি বলিয়াছেন "সকল মনুষ্য এক শরীর, সেই শরীরের কোন একটী অঙ্গ ব্যথিত হইলে সমস্ত শরীর দ্বারা তাহা অনুভূত হয়।" কোন সম্বাদপত্রে কোন দূরস্থ দেশের লোকের প্রতি অত্যাচারের কথা পাঠ করিলে মন ক্রোধাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তাহার কারণ এই যে, সকল মনুষ্যের মধ্যে পরস্পর একটি স্বাভাবিক সহানুভূতি আছে। এমন দেখা গিয়াছে যে, যে জাতি অন্য সকল জা-

তিকে অত্যন্ত ঘৃণা করে এবং সেই ঘৃণা-সূচক রীতি নীতির অনুসরণ করে, সেই জাতীয় লোকের সঙ্গে অন্য জাতীয় লোকের প্রগাঢ় প্রণয়ের উৎপত্তি হয়। কোন কোন ইংরাজ ভদ্র লোক যখন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া বিলাতে গমন করেন তখন তাঁহার এতদ্দেশীয় প্রগাঢ় পৌত্তলিক বন্ধুকে অশ্রুপাত করিতে দৃষ্ট হইয়াছে।

মনুষ্যের যেমন অন্য সকল মনুষ্যকে সাধারণতঃ প্রীতি করিবার একটি প্রবৃত্তি আছে তেমনি স্বদেশকে ও আপনার জাতিকে বিশেষরূপে প্রীতি করিবার প্রবৃত্তি আছে। আপনার দেশ মরুভূমি হইলেও তাহাকে লোকে প্রীতি করে; আপনার জাতি অতি নিকৃষ্ট হইলেও লোকে তাহাকে আন্তরিক ভাল বাসে। প্রশান্ত মহাসমুদ্রে ও ভারত সমুদ্রে এমন সকল দ্বীপ আছে যেখানে চির বসন্ত বিরাজ করিতেছে বলিলেও বলা যাইতে পারে। কিন্তু সে সকল দ্বীপে গমন করিলেও মন স্বদেশকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হয়। চানকে একটি হাইলেণ্ডার সৈন্যদল ছিল। তাহারা একবার যুদ্ধার্থে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অন্য দেশে যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিল। যখন তাহারা চানক পরিত্যাগ করে তখন সৈন্যদলের বাদ্যকর অবিবেচনা-ক্রমে হাইলেণ্ড সুরে বাদ্য বাজাইয়াছিল। সেই সুরে বাদ্য বাজাইবামাত্র সর্ব্বদা কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন অদ্রিপুঞ্জ দ্বারা পরিবৃত ও ভীষণ জলপ্রপাত দ্বারা নিনাদিত তাহাদিগের নিরুর্ব্বরা স্বদেশ তাহাদিগের মনে পড়িল। মনুষ্যের মনে যে সকল মনোহর ভাব স্বদেশের সহিত জড়িত থাকে সে সমস্ত তাহাদিগের হৃদয়ে সেই সময়ে একেবারে জাগরূক হইয়া উঠিল। অমনি তাহারা সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল যে "আমরা অন্য দেশে যাইব না, স্বদেশে প্রতিগমন করিব।" তৎপরে তাহাদিগের অধিনায়কেরা অনেক কষ্টে গবর্ণমেণ্টের আদেশ পালন করিতে তাহাদিগকে লওয়াইল। সেই অবধি ভারতবর্ষে হাইলেণ্ডার সৈন্যদলে হাইলেণ্ডীয় সুরে বাদ্য বাজানো একেবারে রহিত হইয়াছে।

স্বদেশানুরাগ না থাকিলে স্বদেশের হিত সাধন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আনন্দের বিষয় এই যে এক্ষণে আমাদিগের দেশীয় লোকের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ ক্রমশঃ উদ্দীপ্ত হইতে দেখা যাইতেছে। এই স্বদেশানুরাগ যতই বৃদ্ধি হইবে ততই তাহাদিগের দ্বারা স্বদেশের উপকার সাধন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। ভারতের উদ্ধার কেবল এই স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধির প্রতি নির্ভর করিতেছে। এই স্বদেশানুরাগ দ্বারা ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে যতই ঐক্যসূত্রে বদ্ধ করা যাইবে ততই ভারতের উন্নতি সাধন হইবে। কিন্তু ভারতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি নানা প্রকার ধর্ম্মাবলম্বী লোক বসতি করে। ধর্ম্মের সমতা না থাকিলে মনুষ্যের মধ্যে প্রগাঢ় ঐক্যের সঞ্চার হয় না। ধর্ম্ম দূরে থাকুক, এমন কি একটি জাতিসাধারণ ভাষার অভাবে ঐ প্রকার ঐক্যের সঞ্চার হওয়া সুকঠিন। জাতীয় ঐক্য একটি জাতি-সাধারণ ভাষার প্রতি নির্ভর করে। এক প্রকার ভাব একটি জাতি-সাধারণ ভাষা দ্বারা সেই জাতীয় সকল লোকের মনে প্রবিষ্ট না হইলে জাতীয় ঐক্য সম্পাদিত হইতে পারে না, অতএব ভারতবর্ষস্থ সকল লোকের মধ্যে এরূপ ঐক্য সঞ্চারিত হওয়া সুকঠিন, যে হেতু তাহাদিগের মধ্যে নানা প্রকার ভাষা প্রচলিত আছে। এস্থলে প্রত্যেক ভাষাব্যবহারকারী লোকের কর্ত্তব্য যে প্রধানতঃ আপনার জাতির উন্নতির প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়া অন্য জাতির উন্নতির প্রতি সামান্যতঃ মনোযোগ প্রদান করেন। যদি এক জন প্রকৃত মানবহিতৈষী ব্যক্তি আপনার জাতির প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়া অন্য জাতির প্রতি সামান্যতঃ মনোযোগ প্রদান করেন তাহা হইলেও তিনি শেষোক্ত জাতির উন্নতি সাধনের প্রতি নিতান্ত অল্প মনোযোগ প্রদান করিবেন এমন হইতে পারে না। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, রাজনিয়ম বিষয়ক আন্দোলনে ভারতবর্ষস্থ সকল ব্যক্তির মধ্যেই ঐক্য হইতে পারে, কিন্তু সকল বিষয়ের উন্নতি সাধনে প্রগাঢ় ঐক্য সম্পাদন জন্য ধর্ম্ম ও ভাষার সমতা নিতান্ত আবশ্যক। বঙ্গদেশীয় হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ও বঙ্গভাষাব্যবহারকারী লোকদিগের মধ্যে কি কি উপায়ে উল্লিখিত ঐক্য সম্পাদিত হইতে পারে তাহা অবধারণ করিয়া অবলম্বন করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।

প্রথমে যখন ইংরাজী শিক্ষা এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হয় তখন ইংরাজীতে কৃত্যবিদ্য ব্যক্তিরা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুআচার ব্যবহারের প্রতি বিলক্ষণ বিদ্বেষ করিতেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুআচার ব্যবহার সকলই অপকৃষ্ট নহে, ইহা এক্ষণকার ইংরাজীতে কৃত্যবিদ্য লোকেরা ক্রমে অনুভব করিতেছেন। এক্ষণে ভারতের প্রাচীন মহিমা এবং হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুআচার ব্যবহারের প্রশংসাসূচক বক্তৃতা হইলে তাহারা উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। এক্ষণকার লোকে প্রতীতি করিতে সমর্থ হইয়াছে যে, হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরবিষয়েও এমত সফল ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় যাহা অন্য কোন জাতির ধর্ম্মপুস্তকে পাওয়া যায় না, এবং এমন সকল সুরীতি হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে যাহা অন্য কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত নাই। লোকের মনে স্বদেশানুরাগ ক্রমে বিলক্ষণ রূপে সঞ্চারিত হইতেছে। দেশীয় ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের প্রতি পূর্ব্বকার বিদ্বেষ ভাব ক্রমে তিরোহিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের কারণ আমরা নিম্নে নির্দ্দেশ করিতেছি।

প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইল, শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উৎসাহে ও যত্নে "ন্যাশন্যাল পেপর" অর্থাৎ "স্বজাতীয় সম্বাদপত্র" প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ সম্বাদপত্রকে তিনিই উক্ত নাম প্রদান করেন। ঐ আখ্যা প্রদান অল্প কার্য্যকর হয় নাই। তৎপরে প্রায় দশ বৎসর হইল "স্বজাতীয় ভাব ও স্বদেশানুরাগসঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব" নামক একটি প্রস্তাব ইংরাজীতে প্রকাশিত হয়। তাহাতে হিন্দু ব্যায়াম, হিন্দু সঙ্গীত, হিন্দু চিকিৎসা বিদ্যা এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন, যত পারা যায় বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিয়া আমাদিগের কথোপকথনের ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পাদন, বাঙ্গালা ভাষায় পরস্পর পত্রলেখা এবং বাঙ্গালির সভাতে বাঙ্গালায় বক্তৃতা করা; সুরাপানাদি বিদেশীয় অনিষ্টকর প্রথা এতদ্দেশে যাহাতে প্রচলিত না হয় তাহার উপায় অবলম্বন করা, হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া সমাজসংস্কার কার্য্য সম্পাদন করা, স্বদেশীয় সুপ্রথা সকল রক্ষা করা, নমস্কার প্রণামাদি স্বদেশীয় শিষ্টাচার পালন করা, বিদেশীয় রীতিতে পরিচ্ছদ পরিধান ও আহার কার্য্য সম্পাদন পরিত্যাগ করা, দেশীয় ভাষায় নাটকাদি অভিনয় করা ইত্যাদি বিবিধ বিষয় আলোচিত হয়। ঐ প্রস্তাবটি সমুদায় আমরা এই পত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম। উক্ত পুস্তিকায় উল্লিখিত বিষয় সকল প্রস্তাবিত হইয়াছিল মাত্র। প্রস্তাবলেখকের প্রস্তাব সকল কখনই কার্য্যে পরিণত হইত না যদ্যপি হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভাসংস্থাপক মহাশয় উহা অবলম্বন করিয়া হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা সংস্থাপন

না করিতেন। উক্ত পুস্তিকা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেও কোন উপলক্ষে সমস্ত হিন্দুবর্গকে মধ্যে মধ্যে একত্রিত করিবার এবং তদ্দ্বারা তাহাদিগের মধ্যে সদ্ভাব ও ঐক্য সঞ্চার করিবার ভাব হিন্দুমেলা-সংস্থাপকের মনে উদিত হইয়াছিল। জাতীয় সভায় অভিব্যক্ত বক্তৃতা সকলের দ্বারা বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতা দ্বারা বিস্তর উপকার সাধিত হইয়াছে। হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা সংস্থাপন জন্য তৎসংস্থাপক মহাশয় কতদূর প্রশংসাযোগ্য তাহা বলা যায় না। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা বিরচিত স্বদেশানুরাগোদ্দীপক সঙ্গীত আমাদিগের দেশের লোকের মনে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপন কার্য্যে অল্প সহকারিতা করে নাই।

"এক্ষণে বিদ্বান লোকদিগের মনে স্বদেশানুরাগের ক্রমশঃ উদ্দীপন দেখিয়া হৃদয় পুলকে পূর্ণ হইতেছে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না আমাদিগের জাতীয় উন্নতি সম্পূর্ণরূপে জাতীয় আকার ধারণ করে সে পর্য্যন্ত আমাদিগের সুস্থির হইবার কোন কারণ নাই। যে যে বিষয়ে ঐ উন্নতি সম্পূর্ণরূপে জাতীয় আকার এখনও ধারণ করে নাই তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে। আমাদিগের রাজা বিদেশীয়; বিদেশীয় রাজার রাজত্ব কালে জাতীয় ভাব যে সম্পূর্ণরূপে সুসঙ্গত আকার ধারণ করিবে ইহা নিতান্ত কঠিন, কিন্তু ঐ আকার ধারণ কার্য্য যত দূর সম্পাদিত করিতে পারা যায় তাহা করা কর্ত্তব্য।

কোন কোন স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি দেশীয় রীতিতে আহার না করিয়া ইংরাজী রীতিতে আহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা ইংরাজি খাদ্য ব্যবহার করেন যেন আমাদিগের জাতির কোন উত্তম খাদ্য নাই। তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে, যে দেশের যে খাদ্য উপযুক্ত সেই দেশের লোকেরা এক প্রকার অন্ধ সংস্কার দ্বারা তাহা ব্যবহার করিয়া থাকে। সেই খাদ্যই সেই দেশের উপযুক্ত, স্বাস্থ্যকর এবং আয়ুর হিতকারী। ইংরাজি আহার বাঙ্গালীর শরীরের মধ্যে অস্বাভাবিক উত্তাপের সঞ্চার করিয়া তাহাকে রুগ্ন ও অল্পায়ু করে। আমাদিগের দেশে উদ্ভিদপ্রধান আহারই অধিকতর উপকারী; মাংস-প্রধান আহার তত উপকারী নহে। ইংরাজদিগের আহার মাংস-প্রধান। আমাদিগের খাদ্যের মধ্যে যথেষ্ট পুষ্টিকর ও বলকর দ্রব্য আছে তাহা ব্যবহার করিলে শরীরের পুষ্টি ও বলাধান বিলক্ষণরূপে হইতে পারে। অন্য জাতির আহার অনুকরণ করিয়া তাহাদিগের নিকটে হীনতা স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ইংরাজদিগের অনুকরণে আমাদিগের দেশের অনেকে যে সুরাপান-রীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহার ন্যায় অনিষ্টকর রীতি আর দ্বিতীয় নাই। যখন শীত দেশ ইংলণ্ডে অনেকে সুরাপান একেবারে পরিত্যাগ করিতেছে তখন তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা আমাদিগের কতই না কর্ত্তব্য।

যেমন অন্যান্য জাতির একটি নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ আছে তেমনি বাঙ্গালি জাতিরও একটি নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ থাকা কর্ত্তব্য। একটি আমোদের সভায় উপস্থিত হইলে দেখিতে পাওয়া যায়; কেহ ধুতি চাদর, কেহ উষ্ণীষ চাপকান, কেহ মোগলাই পরিচ্ছদ, কেহ ইংরাজী পরিচ্ছদ, কেহ বা ইহুদি পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন। এইরূপ হওয়া কখন উচিত হয় না। আমাদিগের এক্ষণে অনেক পরিমাণে দুই প্রকার পরিচ্ছদ দাঁড়াইয়াছে; ধুতি প্রভৃতি বাটীর পরিচ্ছদ আর উষ্ণীষ চাপকান প্রভৃতি ধাহিরে যাইবার পরিচ্ছদ। ইহাতেই আমাদিগের সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। এক্ষণে অন্য জাতির পরিচ্ছদ অনুকরণ করিবার

আবশ্যকতা নাই। প্রত্যেক রাজপরিবর্ত্তনে আহার ও পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করা অন্তঃসারহীনতার চিহ্ন। অদ্য যদি চীনেরা আমাদিগের দেশের রাজা হয় কল্যই কি মূষিকমাংস ভক্ষণ করা ও পশ্চাদ্দেশে আপাদ-লম্বমান দীর্ঘ বেণী রাখা হইবে? অনুকরণের বেগ সম্বরণ করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত, কিন্তু সেই পরিচ্ছদের হিন্দুপ্রকৃতি রক্ষা করিয়া তাহার পরিবর্ত্তন সাধন করা কর্ত্তব্য। ঐ পরিচ্ছদ অনেক পরিমাণে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অথবা বোম্বাই প্রদেশের হিন্দুস্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদের ন্যায় হওয়া উচিত। প্রাচীন বাঙ্গালা কবিদিগের গ্রন্থ পাঠে প্রতীতি হইতেছে যে, তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ অনেকটা ঐরূপ ছিল।

আমাদিগের দেশের অনেক স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি সামান্য পত্র ইংরাজীতে লিখেন এবং বাঙ্গালীর সভাতে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করেন। কোন্ ইংরাজ ফ্রেন্চ অথবা জরমেন ভাষাতে পত্র লিখেন? কোন্ ইংরাজ স্বদেশস্থ লোকের সভাতে ফ্রেন্চ অথবা জরমেন ভাষায় বক্তৃতা করিয়া থাকেন? যে সকল যুবকেরা ইংরাজী বিদ্যালয়ে ইংরাজি ভাষা পাঠ করিতেছে তাহারা ঐ ভাষা অভ্যাস করিবার জন্য ইংরাজীতে পত্র লিখিতে অথবা, ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতে পারে, কিন্তু প্রবীন লোকে এরূপ করিয়া থাকেন ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এমন কি, আমরা সামান্য কথোপকথনে বার আনা ইংরাজী ও চারি আনা বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, কোন কোন ইংরাজী শব্দ ব্যবহার না করিলে চলে না, তাহা আমাদিগের ভাষার অঙ্গস্বরূপ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যে ভাব একটি বাঙ্গালা শব্দ দ্বারা অনায়াসে প্রকাশ করা যাইতে পারে তাহার পরিবর্ত্তে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিয়া আত্মভাষার প্রতি বিদ্রোহাচরণ করা উচিত নহে*! পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা অসম্পন্ন ছিল, এই জন্য তাহার অনেক গুলি শব্দ পারসী হইতে লওয়া হইয়াছে, আর কতকগুলি ইংরাজী ভাষা হইতেও লওয়া হইয়াছে। ঐ সকল শব্দ ভাষার অঙ্গ-স্বরূপ হইয়া গিয়াছে। যে সকল ভাব তাহাদের দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহা অন্য কোন শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হওয়া কঠিন; কিন্তু এক্ষণে যখন বাঙ্গালা ভাষা একটি ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে তখন প্রকৃত স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি, যে ভাব বাঙ্গালা শব্দ দ্বারা অনায়াসে ব্যক্ত করা যাইতে পারে সে ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য কখন ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিবেন না। আমরা ইংরাজের রাজ্যে বাস করিতেছি অতএব গবর্ণমেণ্টকে আবেদন করিতে হইলে ইংরাজীতে তাহা করা কর্ত্তব্য এবং তাঁহাদিগকে দেশের অবস্থা বিদিত করিবার জন্য ইংরাজীতে সম্বাদ পত্রও প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সকল বিষয়ে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করিয়া আমরা মাতৃভাষার কেন অবমাননা করিয়া থাকি? প্রকৃত স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি এরূপ কখনই করিবেন না।

সাহিত্য সম্বন্ধীয় উন্নতি বিষয়ে আমাদিগের জাতীয় ভাব এখনও সুসঙ্গত আকার ধারণ করে নাই। দুই একটি নূতন ভাবের গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ সাহিত্য-বিভাগে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত

* "Ours is a noble language, a beautiful language. I can tolerate a Germanism for family sake; but he, who uses a Latin or a French phrase where a pure English word does as well, ought to be hung, drawn and quartered for high treason against his mother tongue." Southey.

হইয়া থাকে তাহা ইংরাজী অনুকরণে পরি- পূর্ণ। কবে আমাদিগের মধ্যে প্রকৃত বাঙ্গালী সাহিত্যের অভ্যুদয় হইয়া আমাদিগের স্বদে- শের মুখ উজ্জ্বল করিবে ?

শিল্পবিষয়েও আমাদিগের জাতীয় ভাব এখনও সুসঙ্গত আকার ধারণ করে নাই। যাঁহারা আজ কালের সম্বাদ পত্র মনো- যোগ পূর্ব্বক পাঠ করেন, তাঁহারা জ্ঞাত আছেন যে, ইংরাজেরা এদেশের লোক দ্বারা সম্পাদিত ইংরাজী ধরণের শিল্পকার্য্য অপেক্ষা প্রকৃত এতদ্দেশীয় শিল্পকার্য্য দেখিয়া অধিকতর প্রীতি লাভ করেন। অতএব ইংরাজদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ইংরাজী শিল্পের অনুকরণ করা নিষ্ফল।

আমাদিগের সঙ্গীতের হিন্দুপ্রকৃতি রক্ষা করিয়া তাহার উন্নতি সাধন করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের সঙ্গীতের হিন্দুপ্রকৃতি রক্ষা করিয়া তাহার উন্নতি সাধনের চেষ্টা জন্য আমরা একটি বিখ্যাত ব্যক্তির নিকটে বিশেষ উপকৃত আছি। তাঁহার নাম এখানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই ; তিনি কে, আমাদি গের প্রায় সকল পাঠক অবগত আছেন।

চিকিৎসা বিষয়ে আমাদিগের জাতীয় ভাব এখনও সুসঙ্গত আকার ধারণ করে নাই। মধ্যে এমন আশঙ্কা হইয়াছিল যে, আমাদিগের দেশে ডাক্তারী চিকিৎসার প্রভাবে বৈদ্যের চিকিৎসা বা একেবারে লোপ পায়, কিন্তু এক্ষণে কতকগুলি বিখ্যাত বৈদ্যের ব্যবসায়োন্নতি দেখিয়া সে আশঙ্কা দূরীকৃত হইয়াছে কিন্তু তথাপি বৈদ্যের চিকিৎসা যেরূপ আদৃত হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা এখনও হয় নাই। যে দেশের যে ঔষধ উপযুক্ত তাহা নৈসর্গিক বিধানানুসারে সেই দেশেই জন্মিয়া থাকে। ভারতবর্ষের জন্য ঔষধ বিলাত হইতে আনিতে হয় ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমাদিগের পুরাতন চিকিৎসা শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে দেখা যাইতেছে সম্বাদ পত্রে এক্ষণে আন্দোলন হইতেছে।

আমাদিগের দেশে অনেক স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি স্বদেশীয় ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা অবজ্ঞেয় পদার্থ নহে। যদি তাহাতে তাঁহাদিগের কোন আপত্তি- জনক বিষয় থাকে তাহা সংশোধিত ও পরি- মার্জ্জিত করিয়া লইতে পারেন। আমাদিগের শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান কিঞ্চিৎ সংশোধিত আকারে আমরা গ্রহণ করিতে পারি এবং তদনুযায়ী আমাদিগের বর্ত্তমান ঈশ্বরোপাসনা ও ক্রিয়ানুষ্ঠান পদ্ধতিও কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে পারি। ঋগ্বেদের সময়ে আর্য্যধর্ম্মের ন্যায় আমাদিগের এক্ষণ- কার আর্য্যধর্ম্ম নহে, মধ্যে মধ্যে আর্য্যধর্ম্মের এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে। আমা- দিগের দেশে সহস্র পরিমাণে জ্ঞান ও সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ হউক, তথাপি আমা- দিগের শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মোপাসনা এরূপ উচ্চ যে তাহাকে তাহা কখন ছাড়িয়া যাইতে সক্ষম হইবে না।

যে পর্য্যন্ত না আমাদিগের জাতীয় উ- ন্নতি, আহার, পরিচ্ছদ, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, চিকিৎসা ও ধর্ম্ম বিষয়ে সুসঙ্গত আকার ধারণ করে, সে পর্য্যন্ত আমাদিগের জাতীয় ভাব সুগঠন প্রাপ্ত হইয়াছে এমন কখন বলা যাইতে পারে না। তাহাকে এইরূপ সুগঠন প্রদান করা সকল প্রকৃত স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য।

সাংখ্য দর্শন।

বাহ্য বা স্থূল ভূতের স্বভাব।

"চতুষ্টয়ে চ পরমাণবঃ পৃথিব্যাদয়ঃ খরস্নেহোষ্ণেয়ণ- স্বভাবাঃ।" (বুদ্ধদেব)

বস্তুর অনাগমাপায়ী ধর্ম্ম 'স্বভাব' নামে ব্যবহৃত হয়। যে ধর্ম্ম ত্রৈকালিক অর্থাৎ

ত্রিকালবৃত্তি, তাহার পরিভাষা 'অনাগমা- পায়ী ধর্ম্ম' 'স্বভাব' 'অযুতসিদ্ধ ও সাংসিদ্ধিক গুণ'।

পৃথিবী, জল, তেজঃ, ও বায়ু, এই চারি প্রকারভূত যথাক্রমে খর, স্নেহ, উষ্ণ ও ঈয়ণ স্বভাবান্বিত। পৃথিবী ধাতুর স্বভাব খর অর্থাৎ কঠিন। জল ধাতুর স্বভাব স্নিগ্ধতা। তেজো ধাতুর স্বভাব উষ্ণতা। বায়ু ধাতুর স্বভাব ঈয়ণ অর্থাৎ চলন।

যাবৎ কাঠিন্যের প্রতি পৃথিবী, যাবৎ আর্দ্রীভাব বা ক্লিন্ন ভাবের প্রতি জল, তদ্বি- পরীত (শুষ্কভাব) ও যাবৎ পাকভাবের প্রতি তেজঃ, আর সমস্ত ক্রিয়াভাবের প্রতি বায়ু প্রধানতম কারণ। এতদ্ভিন্ন, 'বিকরণ' যোগ্যতা নামক আর একটি ধর্ম্ম আছে (যদ্দ্বারা সমুদায় বস্তু বিকৃত হয়,) সে ধর্ম্মটি ভূত চতুষ্টয়সাধারণ, অর্থাৎ প্রত্যেক ভূত- নিষ্ঠ। এই ধর্ম্মটি থাকাতে ভূত সকল নিজে পরিণত হয়, এবং অন্যকেও পরিণামিত করে। এই ধর্ম্মের বলে পৃথিবী ধাতু নিজের কাঠিন্য (কারণ বিশেষ উপস্থিত থাকিলে) তেজঃ ধাতুতেও সংক্রামিত করিতে পারে। জগতে যে কিছু সংযোগ-বিযোগ-ক্রিয়া বর্ত্তমান আছে, তত্তাবৎ উক্ত ধর্ম্মের মহিমা। সাংহত্য দশাপ্রাপ্ত ৩, ৪, জাতীয় বিকৃত পরমাণুতে (অর্থাৎ কাষ্ঠ লোষ্ট শিলাদিভাবাপন্ন) বিজাতীয় তেজঃ অর্থাৎ অগ্নি সংযোগ করিলে যে তাহার সেই সংঘাতভাব বিনষ্ট হয়, বিকৃতিভাব দূর হয়, বিশ্লিষ্ট হইয়া প্রত্যেক জাতীয় পরমাণু স্বতন্ত্রভাব ধারণ করে (ইহারই নাম ধ্বংস,) তাহাও কথিত ধর্ম্মের মহিমা।

পারিণামিক গুণ।

বস্তু ব্যবহারের কতকগুলি কাল্পনিক ভাব আছে, তাহাও গুণ নামে অভিহিত হয়। যথা 'সংখ্যা ও পৃথক ভাব' প্রভৃতি। এ গুলি পরিণামজাত নহে। উহা কেবল ব্যবহারের নিমিত্তই পরিকল্পিত। এ নিমিত্ত সে সকলকে ত্যাগ করিয়া পরিণামজাত গুণকে পারিণামিক গুণ বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

পারিণামিক গুণ দ্বিবিধ। সাংসিদ্ধিক ও নৈমিত্তিক। যাহা স্বতঃসিদ্ধ, আশ্রয় থাকিলে থাকে—না থাকিলে থাকে না, যাহা অযুতসিদ্ধ (পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,) তাহাই সাংসিদ্ধিক। যথা, অগ্নির উষ্ণতা ও জলের দ্রবত্ব।

যাহা যাহা আগমাপায়ী অর্থাৎ নিমিত্ত বশতঃ উৎপন্ন হয়, ধ্বংস হয়, তাহা নৈমিত্তিক, যথা, জলের কাঠিন্য (করকা,) বায়ুর শৈত্য উক্ত দ্বিবিধ গুণ যে যে ভূতের নির্দ্ধারিত আছে। তাহা এই,—

পৃথিবীভূতে (১) রূপ (পাকজ) রস গন্ধ স্পর্শ (পাকজ)

জল ভূতে ঐ ... ঐ ... ০ ঐ . ০—

তেজো ভূতে ঐ ... ০ ০ ঐ (সাংসিদ্ধিক- উষ্ণ)

বায়ু ভূতে ০ ০ ০ ঐ

পৃথিবী " সংযোগ (নৈমিত্তিক) বিভাগ (ঐ) (২) গুরুত্ব

জল " ঐ ঐ ঐ

তেজ " ঐ ... ... ঐ ০

বায়ু " ঐ ... ... ঐ ০

পৃথিবী " (৩) দ্রবত্ব (উভয়বিধ) (৪) স্নেহ (৫) সংস্কার (উভয়বিধ)

জল " ঐ ... ঐ ঐ ঐ

তেজ " ঐ ... ০ ঐ

বায়ু " ০ ... ০ ঐ

এতদ্ভিন্ন আকাশ ভূতের গুণাগুণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

যে কএকটির পূর্ব্বে ১, ২ প্রভৃতি সংখ্যা নিবেশ করা হইয়াছে, সেই কএকটি ধর্ম্মের বিষয় আরও কিছু বক্তব্য আছে।

প্রথম সংখ্যার রূপ। সংস্কৃতশাস্ত্রে রূপ বিষয়ে এইরূপ বিচারণা দৃষ্ট হয়—

আমরা যে শ্বেত, পীত, লোহিত; ইত্যাদি পদোল্লেখিত বস্তুধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করি- তেছি, সে সমস্তের প্রতীতি ইহা অমুকরূপ

ইত্যাকারে প্রতীতি হয় না। 'ইহা অমুক বর্ণ' এইরূপেই ভান হয়। যখন বর্ণ পদোল্লেখে উহার ভান হয়, তৎসঙ্গে রূপশব্দের উল্লেখ হয় না, তখন, শ্বেত পীত লোহিতাদি সেই সেই বস্তু ধর্ম্মের প্রকৃত নাম 'বর্ণ'! বস্তু বা ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গীন নেত্রগ্রাহ্য গুণের সমাবেশ বিশেষকেই রূপ বলিয়া ব্যবহার করা উচিত।

বর্ণ অনেকবিধ হইলেও মূল বর্ণ তিনটির অতিরিক্ত নহে, ন্যূনও নহে। শ্বেত (১) লোহিত (২) ও কৃষ্ণ (৩)। এই মূল বর্ণের নামান্তর অমিশ্র বর্ণ। এতদ্ভিন্ন যাহা উহাদের সম্মেলন বশত জন্মে, তাহা মিশ্রবর্ণ বলিয়া বিখ্যাত। মিশ্রবর্ণ বহুল প্রকার।

মূল বর্ণ যে তিনটির ন্যূন নহে, অতিরিক্তও নহে; এই সিদ্ধান্তের বীজ এই যে, বর্ণ গুণ যখন ভৌতিক, আকাশ ভূতের ও বায়ু ভূতের যখন কোন বর্ণ (রঙ্) নাই, কেবল পৃথিব্যাদি তিন ভূতেরই বর্ণসত্তা প্রমাণ হয়, তখন মূল বর্ণও তৎসংখ্যার সমান অর্থাৎ তিন।

কোন ভূত হইতে কোন বর্ণ (রঙ্) লব্ধ হয় তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, পৃথিবী হইতে কৃষ্ণ, জল হইতে শ্বেত এবং অগ্নি হইতে লোহিত। যথা,—

"যদগ্নেরোহিতং রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎকৃষ্ণং তদন্নস্য—" (উপনিষৎ)

(ইহার অর্থ সুগম এবং উপরের লিখিত বাক্যই বাক্যার্থ।) ঐ মূল বর্ণ ত্রয়ের বিশেষ বিশেষ যোগে বিশেষ বিশেষ বর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা চিত্রবিদ্যাবিশারদদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে। ফল, প্রকৃত প্রস্তাবে অনুপযোগি বিধায় সে সকল ব্যাপার ব্যক্ত করায় ক্ষান্ত থাকা গেল।

ক্রমশঃ

বৈদিক আর্য্যসমাজ।

বেদশাস্ত্রের উৎপত্তি, বিভাগ এবং প্রামাণ্য বিষয়ে পূর্ব্বে যৎসামান্য লিখিত হইয়াছে। অতএব তত্তৎবিষয়ে শতপথব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য উপনিষৎ, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, ভাগবত পুরাণ, হরিবংশ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ সকল হইতে মতসংকলন পূর্ব্বক সেই সমস্ত মত সমালোচনা করা যাইতেছে। তৎপরে মীমাংসাদর্শন, বেদান্তদর্শন, সাংখ্যদর্শন, ন্যায়দর্শন, বৈশেষিকদর্শন, প্রভৃতি হইতে বেদবিষয়ক যুক্তি সমূহ সঙ্কলন করা যাইবেক। শেষে বেদের মন্ত্রসংহিতা হইতেই উপরি উক্ত বিষয় সকলের কি আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা বিন্যস্ত হইবেক। এই প্রকারে বেদের প্রামাণ্যাদি সুস্থির করিয়া বৈদিক আর্য্যসমাজের বিবরণ যতদূর জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা নিবোশত হইবে।

প্রথমে শতপথব্রাহ্মণ। ইহা যজুর্ব্বেদীয় এবং বিবিধ ঐতিহাসিক বিবরণে পরিপূর্ণ। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য ইহার বক্তা। ইহা কাণ্ড, অধ্যায় ও কাণ্ডিকা অনুসারে বিভক্ত হইয়াছে।

"সোয়ং পুরুষঃ প্রজাপতিরকাময়ত ভূয়ান্ স্যাম্ প্রজায়েয় ইতি। সোশ্রাম্যৎ স তপোতপ্যত। স শ্রান্ততপানো ব্রহ্ম এব প্রথমমসৃজত ত্রয়ীমেব বিদ্যাং। সা এব অস্যৈ প্রতিষ্ঠাভবৎ। তস্মাৎ আহর্ব্রহ্ম অস্য সর্ব্বস্য প্রতিষ্ঠা।" ৬।১।১।৪

সেই সর্ব্বপ্রসিদ্ধ পুরুষ প্রজাপতি কামনা করিলেন আমি প্রজা সৃষ্টি করিব। তিনি কঠোর তপস্যা করিলেন, এবং ত্রয়ীবিদ্যা অর্থাৎ ঋক্‌বেদ যজুর্ব্বেদ এবং সামবেদ-স্বরূপ ব্রহ্ম সৃজন করিলেন। এই ত্রয়ীবিদ্যাই তাঁহার প্রতিষ্ঠাস্থান হইল, অতএব 'ব্রহ্মই সকলের প্রতিষ্ঠা' এইবাক্য সার্থক হইয়াছে।

পুনশ্চ "মনো বৈ সমুদ্রঃ। মনসোবৈ সমুদ্রাৎ

বাচাভ্যা দেবাস্ত্রয়ীং বিদ্যাং নিরখনন্। মনঃ বৈ সমুদ্রঃ। বাক্ তীক্ষ্ণাগ্রিঃ। ত্রয়ীবিদ্যা নির্বপণং।" ৫।২।৫২।

মনোরূপ সমুদ্র হইতে বাক্‌রূপ অভ্রি (খনন যন্ত্রবিশেষ) দ্বারা দেবগণ তিন বেদ খনন করিয়াছিলেন। ইহাই বেদত্রয়ের আগমবৃত্তান্ত।

অপরঞ্চ "প্রজাপতির্বৈ ইদমগ্রে আসীৎ একএব। সোঽকাময়ত স্যাম্ প্রজায়েয় ইতি। সোশ্রাম্যৎ স তপোতপ্যত। তস্মাৎ শ্রান্তাৎ তপানাৎ ত্রয়ো লোকা অসৃজ্যন্ত পৃথিব্যন্তরীক্ষং দ্যৌঃ। স ইমান্ ত্রীন্ লোকান্ অভিততাপ তেভ্যস্তপ্তেভ্যঃ ত্রীণি জ্যোতিংষি অজায়ন্ত অগ্নির্যোয়ং পবতে সূর্য্যঃ। স ইমানি ত্রীণি জ্যোতিংষি অভিততাপ। তেভ্যস্তপ্তেভ্যস্ত্রয়ো বেদা অজায়ন্ত অগ্নেঃ ঋগ্বেদঃ বায়োর্যজুর্বেদঃ সূর্য্যাৎ সামবেদঃ। স ইমান্ ত্রীন্ বেদানভিততাপ তেভ্যস্তপ্তেভ্যস্ত্রীণি শুক্রাণি অজায়ন্ত ভূরিতি ঋগ্বেদাৎ ভূবরিতি যজুর্বেদাৎ স্বরিতি সামবেদাৎ।" ১০।৫।৮।১।

সর্ব্বপ্রথমে কেবলমাত্র এক প্রজাপতি ছিলেন। তিনি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যাতে শ্রান্ত হইলে তাঁহা হইতে পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং স্বর্গ উৎপন্ন হইল। পুনর্ব্বার তিনি এই তিন লোক অভিতপ্ত করিলেন এবং পৃথিবী হইতে অগ্নি, অন্তরীক্ষ হইতে পবন ও স্বর্গ হইতে সূর্য্য উদ্ভূত হইল। আবার এই তিন জ্যোতি অভিতপ্ত করিলেন এবং অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্বেদ এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ নিঃসৃত হইল। তৎপরে বেদত্রয় অভিতপ্ত হইলে ঋগ্বেদ হইতে ভুর্, যজুর্বেদ হইতে ভুবর্, সামবেদ হইতে স্বর্, এই তিন ব্যাহৃতি নির্গত হইল।

অপিচ। "স যথা আর্দ্রেধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথক্ ধূমা বিনিশ্চরন্তি এবং বৈ অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যৎ ঋগ্বেদঃ যজুর্বেদঃ সামবেদঃ অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণি অনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি অস্যৈব এতানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি।" ১৪।৫।৪

যদ্রূপ এক আর্দ্রকাষ্ঠপ্রজ্বলিত অগ্নি হইতে বিবিধ প্রকার ধূম নির্গত হয় তদ্রূপ ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষৎ, বিদ্যা, শ্লোক, সূত্র, ভাষ্য প্রভৃতি সমস্তই এক পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ।

পুনশ্চ "ত্রয়োবেদা এতেএব। বাগেব ঋগ্বেদঃ মনো যজুর্বেদঃ প্রাণঃ সামবেদঃ।" ১০।৬৫।৫।

ঋগ্বেদ প্রজাপতির বাক্‌স্বরূপ, যজুর্বেদ মনঃস্বরূপ এবং সামবেদ প্রাণস্বরূপ।

পুনশ্চ। "অথ সর্ব্বাণি ভূতানি পর্য্যৈক্ষৎ। স ত্রয্যামেব বিদ্যায়াং সর্ব্বাণ্যপশ্যৎ। অত্র হি সর্ব্বেষাং ছন্দসাং আত্মা সর্ব্বেষাং স্তোমানাং সর্ব্বেষাং প্রাণানাং সর্ব্বেষাং দেবানাং। এতৎ বৈ অস্তি। এতৎ হ্যমৃতং। যৎ অমৃতং তৎ হ্যস্তি। এতৎ উ তৎ যৎ মর্ত্যং। স ঐক্ষত প্রজাপতিঃ ত্রয্যামেব বিদ্যায়াং সর্ব্বাণি ভূতানি। হন্ত ত্রয়ীমেব বিদ্যাং আত্মানং অভিসংস্করবৈ ইতি"। ১০।৪।২।২১।

অনন্তর প্রজাপতি বেদত্রয়ে সমস্ত ভূতগণকে দেখিলেন। বেদত্রয়েই সমস্ত ছন্দঃ, সমস্ত স্তোম, সমস্ত প্রাণ, এবং দেবগণের স্থিতি। বেদই নিত্য চিরস্থায়ী এবং সর্ব্বপদার্থের আকর। শতপথ ব্রাহ্মণে এই পর্য্যন্ত বেদের উৎপত্তি সংখ্যা এবং প্রামাণ্য নির্দ্দেশ।

অতঃপর স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠের প্রশংসা সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তিত আছে। আমরা তাহার সারাংশ সংক্ষিপ্ত করিয়া দিলাম। "স্বাধ্যায় ব্রহ্মযজ্ঞ। এই ব্রহ্মযজ্ঞে বাক্ জুহুস্বরূপ, মন উপাভৃৎ স্বরূপ, চক্ষু ধ্রুবা-স্বরূপ, বুদ্ধি স্রুবা-স্বরূপ, সত্যজ্ঞান অবভৃথ স্নানস্বরূপ এবং স্বর্লোক চরম ফল স্বরূপ। বিবিধধনপূর্ণা বসুন্ধরা দান করিলে দাতার মানসক্ষেত্রে যাদৃশ হর্ষ উদ্ভূত হয়, বেদপাঠ করিলে অমর লোক জয় হেতু বেদজ্ঞ ব্যক্তির মানস-দর্পণে, তাদৃশ ত্রিগুণ হর্ষ প্রতিবিম্বিত হয়। ঋগ্বেদ ক্ষীরের আহুতি-স্বরূপ, সুতরাং যিনি ঋগ্বেদ পাঠ করেন

তিনি ক্ষীরাহুতি দ্বারা দেবসমাজ সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করিয়া দেবগণের সকাশ হইতে পুণ্যসম্পদ, দীর্ঘ জীবন এবং বিবিধ শুভ লাভ করেন। যজুর্বেদ ঘৃতের আহুতিস্বরূপ এবং সামবেদ সোমরসের আহুতিস্বরূপ। অতএব যজুর্বেদ এবং সামবেদ পাঠ করিলে দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্ব কামনা সিদ্ধি করেন। যিনি বেদপাঠ করেন তিনি সর্ব্ব কামনা লাভ করেন, সুখে নিদ্রা যান এবং আত্মার পরম চিকিৎসক হয়েন। তাঁহার ইন্দ্রিয়সংযম, একাগ্রতা, প্রজ্ঞাবৃদ্ধি হয়, এবং যশ ও লোকদিগকে উপদেশ দিবার ক্ষমতা জন্মে। তিনি পূজ্য দানার্হ অজেয় এবং অবধ্য হয়েন। তিনি অমৃততত্ত্ব লাভ করেন এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদবীতে অধিরূঢ় হয়েন।" ১১।৫।৬।১।

দ্বিতীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। ইহা কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় এবং বিবিধ উপদেশ পূর্ণ।

"প্রজাপতিঃ সোমং রাজানং অসৃজত। তমনু ত্রয়োবেদা অসৃজ্যন্ত। ২।৩।১০।১।

প্রজাপতি সোমকে সৃষ্টি করিয়া তৎপরে বেদত্রয় সৃষ্টি করিলেন।

পুনশ্চ "বাগক্ষরং প্রথমজা ঋতস্য বেদানাং মাতা অমৃতস্য নাভিঃ।" ২।৮।৫।

বাক্ অর্থাৎ বাণী অনুষ্ঠানের প্রথমোৎপন্না বেদমাতা এবং অমৃতত্বের আকর।

অপরঞ্চ। "ঋগ্ভ্যোজাতং সর্ব্বশো মূর্ত্তিমাহুঃ সর্ব্বা-গতি র্যাজুষী হৈব শশ্বৎ। সর্ব্বং তেজঃ সামরূপ্যং হি শাশ্বৎ।" ৬।১২।৯।১।

ঋগ্বেদ হইতে সর্ব্বরূপ, যজুর্ব্বেদ হইতে সর্ব্বগতি এবং সামবেদ হইতে সর্ব্বতেজ সমুদ্ভূত হইয়াছে।

অপিচ অন্য এক স্থলে লিখিত আছে যে "ইন্দ্র ভরদ্বাজ নামক ঋষিকে বেদত্রয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রদান করিয়াছিলেন।" উপাখ্যানটী দীর্ঘ বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই।

তৃতীয় ছান্দোগ্য উপনিষৎ। ইহা সামবেদীয়। যথা—

"প্রজাপতির্লোকান্ অভ্যতাপৎ। তেষাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহৎ অগ্নিং পৃথিব্যাঃ বায়ুমন্তরীক্ষাৎ আদিত্যং দিবঃ। স এতাস্তিস্রো দেবতা অভ্যতাপৎ। তাসাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহৎ অগ্নেঃ ঋচঃ বায়োর্যজুংষী সাম আদিত্যাৎ।"

প্রজাপতি লোকত্রয় অভিতপ্ত করিয়া পৃথিবী হইতে অগ্নি, অন্তরীক্ষ হইতে বায়ু এবং দ্যুলোক হইতে আদিত্য উৎপন্ন করিলেন। পশ্চাৎ অভিতাপ দ্বারা অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং আদিত্য হইতে সামবেদ নিঃসৃত করিলেন।

অতঃপর পুরাণ হইতে মত সংকলন করা যাইতেছে। কি প্রকারে এক মূল বেদ হইতে পুরাণ সমূহ পল্লবিত এবং বিস্তৃত হইয়াছে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমে বিষ্ণুপুরাণ। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ এবং উপনিষৎ হইতে যেরূপ বেদের উৎপত্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হওয়া গেল, বক্ষ্যমাণ পুরাণাদি হইতে লব্ধ উৎপত্তি প্রভৃতি তাহার সম্পূর্ণ বিসদৃশ। যথা ১।৫।৪৮।

"গায়ত্রঞ্চ ঋচশ্চৈব ত্রিবৃহৎ স্তোমং রথন্তরং।
অগ্নিষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানাং নির্ম্মমে প্রথমাৎ মুখাৎ॥
যজুংষি ত্রৈষ্টুভং ছন্দঃ স্তোমং পঞ্চদশং তথা।
বৃহৎসাম তথোক্থঞ্চ দক্ষিণাৎ অসৃজৎ মুখাৎ॥
সামানি জগতীচ্ছন্দঃ স্তোমং সপ্তদশং তথা।
বৈরূপমতিরাত্রঞ্চ পশ্চিমাৎ অসৃজৎ মুখাৎ॥
একবিংশমথর্ব্বাণমাপ্তোর্যামানমেব চ।
অনুষ্টুপং সবৈরাজং উত্তরাৎ অসৃজৎ মুখাৎ॥"

"অনন্তর ব্রহ্মা প্রথম মুখ হইতে গায়ত্রী ছন্দঃ, ঋগ্বেদ, ত্রিবৃহৎ স্তোম অর্থাৎ স্তোত্রসাধন ঋক সমুদায়, রথন্তর নামে সামবেদ ও অগ্নিষ্টোম যাগ এই সমুদায় উৎপাদন করিলেন। পরে তাঁহার দক্ষিণ মুখ হইতে যজুর্ব্বেদ, ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ পঞ্চদশ স্তোম নামক সামবেদের গান, বৃহৎ সাম এবং উক্থ অর্থাৎ সোমযাগ এই সমস্ত উদ্ভূত হইল।

সামবেদ, জগতীচ্ছন্দঃ, সপ্তদশ স্তোম নামে সামবেদের গান, বৈরূপ নামক সামগান ও অতিরাত্র যাগ ব্রহ্মার পশ্চিম মুখ হইতে নির্গত হইল। একবিংশ স্তোম, অথর্ববেদ, আপ্তোর্য্যাম যাগ, অনুষ্টুপ্ ছন্দ, ও বৈরাজ সাম ব্রহ্মার উত্তর মুখ হইতে উৎপন্ন হইল।"

পুনশ্চ "নামরূপং চ ভূতানাং কৃত্যানি চ প্রবর্ত্তনাং।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাং চকার সঃ॥
ঋষীণাং নামধেয়ানি যথা বেদশ্রুতানি বৈ।
যথানিযোগযোগ্যানি সর্ব্বেষামপি সোঽকরোৎ॥ ১।৫।৫৮।

ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে বেদের উপদেশ অনুসারে ভূতবর্গ দেবগণ এবং ঋষিগণের নাম, রূপ, কর্ম্ম এবং ব্যবস্থা স্থির করিলেন।

দ্বিতীয় ভাগবত পুরাণ। যথা ৩।১২।৩৭।

"ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যান্ বেদান্ পূর্ব্বাদিভির্মুখৈঃ।
শাস্ত্রমিজ্যাং স্তুতিস্তোমং প্রায়শ্চিত্তং ব্যধাৎ ক্রমাৎ॥"

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ ব্রহ্মার পূর্ব্বাদি মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল। এবং শাস্ত্র, যাগ, স্তুতি, স্তোম ও প্রায়শ্চিত্ত উৎপন্ন হইয়াছিল।

তৃতীয় মার্কণ্ডেয় পুরাণ। যথা ১০২।১১।

"তস্মাদণ্ডাৎ বিভিন্নাৎ তু ব্রহ্মণোব্যক্তজন্মনঃ।
ঋচো বভূবুঃ প্রথমং প্রথমাৎ বদনাৎ মুনে॥
যজুংষি দক্ষিণাৎ বক্ত্রাৎ ইত্যাদি।
পশ্চিমং যদ্বিভোর্বক্ত্রং ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
আবির্ভূতানি সামানি ততশ্ছন্দাংসি তান্যথ॥
আথর্ব্বণং অশেষঞ্চ তদভিচারিকশান্তিকং।
উত্তরাৎ প্রকটীভূতং বদনাৎ তস্য বেধসঃ॥"

সেই অণ্ড ভেদ করিয়া অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্ব মুখ হইতে ঋগ্বেদ, দক্ষিণ মুখ হইতে যজুর্ব্বেদ, পশ্চিম মুখ হইতে সামবেদ এবং উত্তর মুখ হইতে অভিচারিক শান্তিক প্রভৃতি কর্ম্মে বিনিযুক্ত অশেষ অথর্ব বেদ উৎপন্ন হইল। অণ্ডভেদ করিয়া ব্রহ্মার আবির্ভাব মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন বায়ুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ এবং মৎস্যপুরাণের মতে সকলের আদিতে পুরাণ সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তৎপরে বেদসৃষ্টি হইয়াছিল। যথা বায়ুপুরাণে লিখিত আছে।

"প্রথমং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতং।
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যঃ বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতাঃ॥"

সর্ব্বশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ পুরাণসমূহ ব্রহ্মা প্রথমে স্মরণ করিয়াছিলেন এবং তদনন্তর তাঁহার মুখচতুষ্টয় হইতে বেদচতুষ্টয় বিনিঃসৃত হইয়াছিল।

এইপর্য্যন্ত পুরাণ সকলে বেদের উৎপত্তিনির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রদর্শিত হইল, কিন্তু তন্মধ্যে একটীও যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। আমাদিগের সিদ্ধান্ত পরে প্রদর্শিত হইবেক। যাহা হউক, বেদবিভাগ বিষয়ে পুরাণের মত একবার সমালোচনা করা উচিত। যদ্যপি পুরাণ সমূহে ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ হইতে বেদচতুষ্টয়ের উৎপত্তি উক্ত হইয়াছে তথাপি তাহাদিগের কোন কোন অংশে মতান্তরও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা বিষ্ণুপুরাণে ৩।৩।৪।

"বেদদ্রুমস্য মৈত্রেয় শাখাভেদৈঃ সহস্রশঃ।
ন শক্যো বিস্তরো বক্তুং সংক্ষেপেণ শৃণুষ্ব তং॥
দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণুর্ব্যাসরূপী মহামুনে।
বেদমেকং সবহুধা কুরুতে জগতো হিতঃ॥
বীর্য্যং তেজোবলং চাল্পং মনুষ্যাণাং অবেক্ষ্য বৈ।
হিতায় সর্ব্বভূতানাং বেদভেদান্ করোতি সঃ॥
যয়া স কুরুতে তন্না বেদমেকং পৃথক্ প্রভুঃ।
বেদব্যাসাভিধানা তু সা মূর্ত্তির্মধুবিদ্বিষঃ॥
অষ্টাবিংশতিকৃত্বো বৈ বেদা ব্যস্তা মহর্ষিভিঃ।
বৈবস্বতেন্তরে তস্মিন্ দ্বাপরেষু পুনঃ পুনঃ॥"

'হে মৈত্রেয়, বহুবিধশাখাযুক্ত বেদশাস্ত্রের বিস্তার বর্ণনা অসম্ভব, অতএব সংক্ষেপে শ্রবণ কর। দ্বাপর যুগে ভূমণ্ডলহিতকারী বিষ্ণু ব্যাসরূপ ধারণ পূর্ব্বক এক বেদকে বহুপ্রকারে

বিভক্ত করিলেন। বিভাগ করিবার হেতু এই যে মনুষ্যের বল, বীর্য্য ও তেজ প্রভৃতির বিষম হ্রাস হইয়াছিল। যে দেহ ধারণ করিয়া বেদব্যাস বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন তাহা তন্নামে অভিহিত মধুসূদন বিষ্ণুর মূর্ত্তি। এই বৈবস্বত মন্বন্তরের দ্বাপর যুগে মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক বেদ অষ্টাবিংশতিবার বিভক্ত হইয়াছিল। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তাঁহাদিগের অষ্টাবিংশতিতম।

বেদকে যাঁহারা বিভাগ করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই ব্যাস নামে অভিহিত। যিনি ব্যস্ত অর্থাৎ বিভক্ত করেন তাঁহার নাম ব্যাস, নতুবা ব্যাসনামে কোন বিশেষ ব্যক্তি ছিল না। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন এই নিমিত্তই তাঁহার নাম বেদব্যাস হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণের মতে বেদব্যাস নারায়ণের অবতার, কারণ নারায়ণ ব্যতীত অন্য কোন্ ব্যক্তি মহাভারত রচনা করিতে সমর্থ হয়েন।

বায়ুপুরাণে ও দ্বাপরযুগে বেদ বিভাগের কথা বিবৃত হইয়াছে। ভাগবত পুরাণেরও সেই মত। কিন্তু ভাগবত পুরাণের নবম অধ্যায়ে মতান্তর দৃষ্ট হয়। যথা

"একএব পুরাবেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবোনারায়ণো নান্যঃ একোগ্নির্ব্বর্ণ এব চ॥
পুরূরবস এবাসীৎ ত্রয়ী ত্রেতামুখে নৃপ।"

পূর্ব্বকালে এক বেদ, এক ওঁঙ্কার, এক-মাত্র দেব নারায়ণ এক (লৌকিক) অগ্নি এবং একমাত্র (হংস নামে) জাতি ছিল। ত্রেতা যুগের প্রথমে পুরূরবা নামে নৃপতি কর্ত্তৃক বেদ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল।

এই বিবরণ অলীক হইলেও ইহার গর্ভে কিঞ্চিৎ মাত্র সত্য নিহিত আছে। অথর্ব্ব বেদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং পূর্ব্বে যে বেদ-ত্রয় ভিন্ন বেদান্তর ছিল না, অথর্ববেদ পরে সংগৃহীত হইয়াছে তাহা এক প্রকার সপ্রমাণই হইল।

বেদের প্রামাণিকতা বিষয়ে পুরাণাদি হইতে কি পরিমাণ জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা বলা বাহুল্য। পুরাণের সর্ব্বত্রই প্রায় বেদ-শাস্ত্রের স্তুতি এবং প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন স্থলে পুরাণ অপেক্ষা বেদ লঘুতর এরূপ কথাও আছে। ইহা বিচিত্র নহে যেহেতু বেদাধ্যায়ীদিগের মধ্যেও পরস্পর মনোমালিন্য কখন কখন স্ফুট দৃষ্ট হয়। শুক্ল যজুর্ব্বেদীরা কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদী-দিগকে চরকাদ্ধর্যু নামে নামিত করিয়া বিবিধ প্রকারে নিন্দাবাদ করিয়াছেন। অথর্ববেদীরা বলেন,

"বহ্বৃচো হন্তি বৈ রাষ্ট্রং অধ্বর্যুর্নাশয়েৎ সুতান্।
ছন্দোগো ধনং নাশয়েৎ তস্মাৎ আথর্বণো গুরুঃ॥"
অথর্বপরিশিষ্ট

বহ্বৃচ নামক ঋগ্বেদীয়, পুরোহিত রাজ্য নাশ করেন, অধ্বর্যু নামক যজুর্ব্বেদীয় পুরো-হিত সন্তান বিনাশ করেন এবং ছন্দোগ নামে সামবেদীয় পুরোহিত ধন নাশ করেন, অতএব অথর্ববেদীয় পুরোহিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ঋষিরা বলিয়াছেন বেদ প্রজাপতি কর্ত্তৃক উৎপাদিত, পুরাণ দেখিলেন যে তাহা সম্যক্ সংলগ্ন হইল না, যে হেতু বেদের সংখ্যা চতুষ্টয়, কিন্তু প্রজাপতি একমাত্র। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিলেন যে বেদচতুষ্টয় প্রজাপতির মুখচতুষ্টয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এক দিক্ বাঁচাইতে গিয়া আর দিকে বাঁধিল, মুখচতুষ্টয় কোথা হইতে আসিবেক। অত-এব অগত্যা কল্পনা করিতে হইল যে প্রজা-পতির চারি মুখ। যেখানে কোন বস্তু প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই সে স্থলে প্রমাণ কল্পনা করিলেন। ইহাকে কল্প্য প্রমাণ এই সংজ্ঞা প্রদান করিলেন। উৎপন্ন পার্থিব পদার্থের বর্ণ দৃষ্ট হয়। বেদ প্রজা-

পতির মুখ হইতে উৎপন্ন এবং পৃথিবী সম্বন্ধীয়। সুতরাং বেদের বর্ণ স্থির করিতে উদ্যত হইলেন। অনেক কষ্ট কল্পনার পর নির্ণয় করিলেন যে ঋগ্বেদের জবাকুসুমবর্ণ, যজুর্ব্বেদের কাঞ্চনবর্ণ এবং অথর্ব্ববেদের কজ্জলবর্ণ। অনেকে বলিয়া থাকেন, পুরাণ বেদের অংশ, কিন্তু তাঁহারা পুরাণ শব্দের যে কি অর্থ তাহা জানিতেন না। বেদের সংহিতা এবং ব্রাহ্মণভাগে অনেক রাজা এবং অপরাপর ব্যক্তিবর্গের নাম ও আখ্যা-য়িকা দেখিতে পাওয়া যায়—ইহাকেই পুরাণ বলে। তদ্ভিন্ন বৈদিক সময়ে স্বতন্ত্র পুরাণ ছিল না। বেদপ্রমাণার্থে আমরা পুরাণের মত স্বীকার করিতে অক্ষম, পুরাণ ঐতিহাসিক সামাজিক প্রভৃতি বিষয়ে কথঞ্চিৎ প্রমাণ হইতে পারে। অতঃপর মহাভারত ও হরিবংশ হইতে মত সমালোচনা করা যাই-তেছে। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে লিখিত আছে যে, বিষ্ণু হইতে সরস্বতী ও বেদ উৎ-পন্ন হইয়াছে।

"সরস্বতীঞ্চ বেদাংশ্চ মনসা সসৃজেঽচ্যুতঃ।"

শান্তিপর্ব্বের এক স্থলে সরস্বতীকে বেদ-মাতা বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

"বেদানাং মাতরং পশ্য মৎস্থাং দেবীং সরস্বতীং।"

বনপর্ব্বের একস্থলে গায়ত্রীকে বেদমাতা বলা হইয়াছে।

পুনর্ব্বার শান্তিপর্ব্বের অন্য একস্থলে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা বেদকর্ত্তা, বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হই-য়াছেন। যথা—

"অনাদিনিধনা বেদা বাক্ উৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥
ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু সৃষ্টয়ঃ।
নানারূপঞ্চ ভূতানাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রবর্ত্তনাং।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নিমিমীতে স ঈশ্বরঃ॥"

বেদবাক্যের আদিও নাই, বিনাশও নাই। উহা ব্রহ্মার উচ্চরিত। উহা হইতেই সকল প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে, ঋষিগণের নাম উৎপন্ন হইয়াছে এবং সমুদয় সৃষ্টি সম্পাদিত হইয়াছে। ভূতগণের বিবিধ রূপ এবং কর্ম্ম সকলের প্রবর্ত্তনা বেদশব্দানুসারে নির্ম্মিত হইয়াছে।

আদিপর্ব্বে বেদের লঘুতরত্ব স্পষ্ট প্রতী-য়মান হয়। যথা—

"একতশ্চতুরো বেদান্ ভারতং চৈতদেকতঃ।
পুরা কিল সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমেত্য তুলয়া ধৃতং॥
চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যঃ বেদেভ্যো হ্যধিকং যদা।
তদাপ্রভৃতি লোকে ঽস্মিন্ মহাভারতমুচ্যতে॥"

পূর্ব্বকালে সকল পণ্ডিতেরা মিলিত হইয়া তুলাদণ্ড দ্বারা এক দিকে মহাভারত এবং অপর দিকে ষড়ঙ্গ সহিত বেদচতুষ্টয় স্থাপন পূর্ব্বক পরিমাণ করিয়াছিলেন। যখন মহা-ভারত গুরুতর পরিমিত হইল সেই কাল অবধি ইহার নাম মহাভারত হইয়াছে।

এরূপ নিজ প্রশংসা স্তুতিবাদমাত্র বাস্ত-বিক নহে, সুতরাং বেদগৌরব হানি হইল না।

হরিবংশ। ইহার প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা হইতে বেদ সৃষ্টি হইয়াছে।

"ঋচোযজুংষি সামানি নির্ম্মমে যজ্ঞসিদ্ধয়ে।
সাধ্যাশ্চ তৈরযজন্ দেবান্ ইত্যেবমনুশুশ্রুমঃ॥"

যজ্ঞ নিষ্পাদনের নিমিত্ত ঋক্, যজুস্ এবং সাম নির্ম্মাণ করিলেন এবং সাধ্যেরা তদ্দ্বারা দেবযজন করিতে সাগিলেন।

পুনশ্চ গায়ত্রীকে বেদমাতা বলা হই-য়াছে। যথা—

"ততোঽসৃজৎ বৈ ত্রিপাদাং গায়ত্রীং বেদমাতরং।
অকরোৎ চৈব চতুরো বেদান্ গায়ত্রীসম্ভবান্॥"

জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা ত্রিপাদযুক্ত বেদমাতা গায়ত্রী রচনা করিলেন এবং গায়ত্রী হইতে বেদচতুষ্টয় উৎপন্ন হইল।

এক্ষণে পুরাণ পরিত্যাগ করিয়া দর্শন-কারেরা বেদশাস্ত্রের নিত্যতা, প্রামাণিকতা প্রভৃতি বিষয়ে কি মত প্রকাশ করিয়াছেন

তাহাই সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

বিজনে বিরলে বসিয়া চিন্তার ফল দর্শনশাস্ত্র। বাহ্য জগতের সহিত সম্বন্ধ যত হ্রাস হইবেক, মনের আভ্যন্তরিক বেগ ততই প্রবল হইতে থাকিবেক এবং অন্তর্জগতের বিচিত্র ভাব সকল ক্রমে ক্রমে অন্তরিন্দ্রিয়ের গোচর হইবেক। এইরূপে দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। ভারতভূমিতেও তাহাই ঘটিয়াছিল। ঋষিগণ বাহ্য পদার্থসমূহ লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন না, অতি অল্প পরিশ্রম করিলেই তাঁহাদিগের জীবন যাপন হইত, সুতরাং তাঁহারা মানসিক চিন্তার অনুশীলন করিতেন এবং সেই অনুশীলনের ফল ভারতের প্রধান ষড়্‌দর্শন। এতদ্ভিন্ন আর অনেক দর্শন প্রচলিত আছে। মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ নামক গ্রন্থে প্রায় সকল দর্শনেরই সার সংকলিত হইয়াছে। আমরা এ প্রস্তাবে কেবল সাংখ্য, মীমাংসা, বেদান্ত, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন আলোচনা করিব। প্রথমে সাংখ্যদর্শনের মত প্রদর্শন করা যাইতেছে। মহর্ষি কপিল এই দর্শনের আদি শিক্ষক। তাহার মতে ঈশ্বর নাই, প্রকৃতি স্বয়ং কার্য্য করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির কার্য্যের সাক্ষীস্বরূপ একজন দর্শক আছেন, তিনি নিজে কোন কার্য্য করিতে অসমর্থ। সাংখ্যকার তাঁহাকে পুরুষ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ দ্বারা জগৎ সৃষ্টি হয়। যদিও সাংখ্যকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং কার্য্যকারিত্ব স্বীকার করেন না কিন্তু বেদের প্রামাণ্য বিষয়ে তাঁহার সন্দেহের লেশমাত্র নাই। তিনি বলেন বেদ পৌরুষেয়ও নহে অপৌরুষেয়ও নহে। যাহা দেখিলে বোধ হয় যে বুদ্ধি পূর্ব্বক উহা কৃত হইয়াছে তাহা পৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষনির্ম্মিত। বেদ পৌরুষেয় হইতে পারে না যে হেতু তৎকর্ত্তা পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি সেই পুরুষ মুক্ত হয়েন তবে তাঁহার কোন বিষয়ে ইচ্ছা হইতে পারে না, কারণ, ইচ্ছার অধীন হইলে আর তাঁহাকে মুক্ত বলা যাইতে পারে না। আর যদি তিনি বদ্ধ হয়েন তবে তাঁহার ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ, সুতরাং তিনি বেদকর্ত্তা হইবার অযোগ্য। অতএব বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর বেদ রচনা করিতে পারেন না; কারণ, তিনি বীতরাগ এবং ইচ্ছার অধীন নহেন। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার সকাশ হইতে অদৃষ্ট বশতঃ নিঃশ্বাসের ন্যায় বেদ সকল স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছে। নিজ শক্তির প্রকাশ দ্বারা বেদই স্বয়ং বেদের প্রমাণ, প্রমাণান্তরের অপেক্ষা নাই। বেদ নিত্যও হইতে পারে না. যেহেতু ইহা পুরুষ হইতে উচ্চরিত এবং কার্য্য বলিয়া পরিগণিত। যাহা কার্য্য তাহা নিত্য হইতে পারে না। পুরুষ হইতে উচ্চরিত হইলেই পৌরুষেয় হইল না কিন্তু বুদ্ধি পূর্ব্বক উচ্চরিত হইলেই পৌরুষেয় বলা যাইতে পারে। সুষুপ্তিকালীন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পৌরুষেয় বলিয়া ব্যবহার হয় না, কারণ তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক নহে। অতএব স্থির হইল যে, বেদ পৌরুষেয়ও নহে, অপৌরুষেয় অর্থাৎ নৈত্যও নহে। এবিধায় বেদ কোথা হইতে হইল? সাংখ্যকার বলেন বেদ অনাদি, বীজাঙ্কুরবৎ। যেরূপ বীজ হইতে অঙ্কুর কি অঙ্কুর হইতে বীজ; অঙ্কুর বীজের কারণ, কি বীজ অঙ্কুরের কারণ তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব তদ্রূপ বেদের আদি নির্ণয় করা অসম্ভব। সাংখ্যকার কেবল বেদের নিত্যানিত্যতাই অস্বীকার করেন কিন্তু প্রামাণ্য বিষয়ে কোন সংশয় করেন না। তিনি বেদকে মূল ভিত্তি স্বরূপ অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার দর্শন প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু যদি বেদ অগ্রাহ্য করিতেন তাহা হইলে ভারতসমাজের সর্বত্রই "বেদনিন্দক নাস্তিক" বলিয়া তাঁহাকে তাড়না এবং অবজ্ঞা সহ্য করিতে হইত, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

দুর্গোৎসব।

কি সভ্য, কি অসভ্য, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই উৎসবের মধুর নামে উন্মত্ত। ইহা আমাদিগের প্রকৃতির একটী অনুকূল সৃষ্টি। সকল দেশে সকল কালে এবং সকল জাতিতেই ইহার আধিপত্য আছে। দুর্ভিক্ষ, প্লাবন ও বিদ্রোহ আসিয়া সমস্ত ছারখার করিতেছে কিন্তু উৎসব বিলুপ্ত হইবার নয়। ফলত যে খানে মনুষ্যের নামগন্ধ সেই খানেই উৎসব।

দুর্গোৎসব হিন্দুজাতির একটী মহোৎসব। ইহার সহিত ইতিহাস, দর্শন, সমাজ ও সময়ের বিশেষ সংশ্রব দৃষ্ট হয়। এই উৎসবের নামমাত্রে স্মরণ হয় যেন, রাজা সুরথ বিপক্ষের হস্তে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া, একাকী ভগ্নমনে বনপ্রবেশ করিয়াছেন, এক জন ধর্ম্মদর্শী মহর্ষি তাঁহাকে বৈরাগ্যের উপদেশ দিতেছেন এবং দুর্গা দেবীর আরাধনায় উৎসাহিত করিতেছেন। আবার স্মরণ হয়, যেন অযোধ্যাধিপতি রাম ভার্য্যার জন্য অতিমাত্র কাতর, মহাবল কপি-বল-সাহায্যে লঙ্কাসমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার জয়শ্রী লাভের জন্য ব্রহ্মা বেদমন্ত্রে দুর্গা দেবীর বোধনসাধন করিতেছেন। এই প্রাচীন কালের ঘটনা মনকে অধিকার করে বলিয়া ইহা মহোৎসব।

দ্বিতীয়টি দর্শন। হিন্দু দার্শনিকদিগের মধ্যে অনেকে বিজ্ঞানময়ী শক্তিকে সৃষ্টির মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সৃষ্টি, পালন ও সংহার এই শক্তিরই আয়ত্ত। পৌরাণিকেরা সম্ভবত এই বিজ্ঞানময়ী শক্তিকে দুর্গামূর্ত্তিরূপে কল্পনা করিয়া থাকিবেন। এইজন্য দুর্গা দেবী আদ্যাশক্তি নামে অভিহিত হন। এই অদ্যাশক্তির পূজাকালে মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পাঠ ও হোম করা হইয়া থাকে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী বা সপ্তশতী সূক্ষ্মরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, উহা রূপকচ্ছলে প্রকৃতি বা বিজ্ঞানময়ী শক্তিরই স্তুতিবাদ করিতেছে এবং হোমের যেরূপ প্রক্রিয়া তাহা পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, পুরুষ ও প্রকৃতির যোগে যে সৃষ্টি হয় উহা তাহাই গূঢ় ভাবে প্রদর্শন করিতেছে। ইহা দ্বারা দুর্গা দেবী যে মূল শক্তিরই মূর্ত্তি তাহা সহজেই অনুমিত হয়। এই দুর্গা দেবীর অপর নাম মহামায়া। মায়া বলিলে তাহার সহিত দয়া স্নেহ প্রভৃতি মঙ্গল ভাবের সম্বন্ধ হৃদ্বোধ হইয়াথাকে। পৌরাণিকেরা যেরূপে দুর্গা দেবীর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে সম্পূর্ণ সোপকরণ যুদ্ধের একটী আদর্শ পাওয়া যায়। মহামায়া অমঙ্গল বা অসুরের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন। মহামায়া পার্থিব যুদ্ধোপকরণ বিদ্যা ও ধন লইয়া সিংহবিক্রমে অমঙ্গলকে পরাস্ত করিতেছেন। তাঁহার এক দিকে গণাধীশ্বর, অপর দিকে সেনাপতি। দুর্গোৎসবের নামে এই দার্শনিক ব্যাপারটী মনে উদিত হয় এই জন্য ইহা মহোৎসব।

তৃতীয় সমাজ। এই উৎসবে সমাজের বহুতর আযোজন। লোকে সংবৎসর কাল মিতাচারে অবস্থানুরূপ ধন সংগ্রহ করিয়াছে, এখন তাহা ব্যয় করিবার সময় উপস্থিত। হিন্দুজাতি স্বার্থপর নয়, কেবল স্ত্রীপুত্র ইহাদের সর্ব্বস্ব নয়। ইহারা লৌকিকতা রক্ষা করা বিলক্ষণ বুঝে। স্বসম্বন্ধী স্বগন্ধী কে কোথায় আছে এই সময়ে তাহার তত্ত্ব লওয়া হয়। ফলত এ সময়ে হিন্দুসমাজ একটী নূতন জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

বিদেশী কর্ম্মস্থান হইতে বিদায় লইয়াছে, বহু দিবসের পর গুরুজনের শ্রীচরণ দর্শন করিবে; পত্নী উৎসুকমনে পথের পানে চাহিয়া আছে,তাহকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিবে; শিশুগুলি চটুল নেত্রে প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিবে, এবং বন্ধুবান্ধব বহু দিন যাবৎ দূরে আছেন,তাহাদিগকে পাইয়া সুখী হইবে; এই জন্যই দুর্গোৎসব মহোৎসব।

চতুর্থ সময়। এখন শরৎকাল; আকাশ নীলীরাগে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে, মেঘ নির্জ্জল ও শ্বেতবর্ণ, উহা সমুদ্রে ফেনপুঞ্জের ন্যায় অনন্ত আকাশের বক্ষে বিচরণ করিতেছে; চন্দ্রমণ্ডল নির্ম্মল, জ্যোৎস্নাজাল রজতধারার ন্যায় নিপতিত হইয়া ধরাতল অভিসিক্ত করিতেছে; বৃক্ষে নানাবর্ণের পুষ্প, নদী সকল স্বচ্ছ, পথ কর্দ্দমশূন্য, সমস্ত প্রকৃতিই যেন উৎসবকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত; শস্য পারিপক্ব হইতেছে, তদ্দৃষ্টে সকলেই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট; দুর্গোৎসব এই শরতের উৎসব এই জন্যই ইহা মহোৎসব।

এই উৎসব কোন্ সময়ে হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত হয় যদিও তাহা নির্ণয় করা সহজ নয়, কিন্তু এই উৎসবের সহিত যে যুদ্ধসংশ্রব আছে তাহা বিলক্ষণ অনুমান হয়। প্রবাদ এইরূপ, রাম ও রাবণের যুদ্ধের সময় এই উৎসবের প্রথম অবতারণা হয়। এই সিদ্ধান্ত কতদূর সপ্রমাণ তাহা বলা যায় না, কিন্তু যুদ্ধকালে যে দুর্গা দেবীর আরাধনা হইত তাহা সুস্পষ্টই বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন আরও দেখা যায়, পূর্ব্ব কালে জিগীষু রাজগণ বিজয়া দশমীর দিন যুদ্ধযাত্রা করিতেন। বিশেষ প্রতিবন্ধক থাকিলে ঐ দিনে যুদ্ধোপকরণ অস্ত্র শস্ত্র প্রেরিত হইত *।

* স্বয়মশক্তৌ খড়্গাদি যাত্রা কর্ত্তব্যা।

দুর্গোসৎব কেবল বঙ্গদেশের নয়, ইহা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথায় এই উৎসব দশাহ নামে প্রসিদ্ধ। এই উৎসব থাকাতে এতদ্দেশীয় শিল্প নানারূপ শিল্পের উদ্ভাবন করিতেছে, বাণিজ্য সজীব রহিয়াছে, নৃত্যগীত বিলুপ্ত হয় নাই, কবিত্ব অপ্রতিহত স্রোতে চলিতেছে, দয়া নির্ব্বাণ হয় নাই, প্রীতি স্নেহ নূতন বলে আবির্ভূত হইয়া থাকে, এবং শত্রুতা বিদূরিত ও সদ্ভাবও বদ্ধমূল হয়। ফলত এই উৎসবের উপকারিতা যথেষ্ট। ইহা দ্বারা কনিষ্ঠাধিকারীদিগের ধর্ম্মভাবও রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু এই উৎসবের যে রূপ গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতা যদি তাহা মূর্ত্তিবিশেষের প্রতি নিয়োজিত না হইয়া অনন্ত ঈশ্বরে প্রযুক্ত হইত তাহা হইলে ইহার শোভা কতই না বৃদ্ধি পাইত! যাহা হউক, এই উৎসবে হিন্দুসমাজে যতটুকু উপকার তাহা কিছুতেই অস্বীকার করি না; গুরুজনকে প্রণিপাত, স্নেহের পাত্রকে আশীর্ব্বাদ এবং প্রীতিভাজনকে আলিঙ্গন এই সমস্ত সুরীতি অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু এই উৎসব প্রসঙ্গে যে ভয়ানক পাপাচার সকল প্রশ্রয় পায়, মদ্য যে অতিমাত্র হৃদ্য হইয়া উঠে আমরা হৃদয়ের সহিত তাহা ঘৃণা করিয়া থাকি।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক মঙ্গলবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়োবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ন তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা ৭ সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

উল্লিখিত উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানপ্রচার উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মসংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তক অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

শ্রী জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

সম্বৎ ১৯৩৩। কলিগতাব্দ ৪৯৭৭। ১ আশ্বিন শনিবার।

Registered No 52.

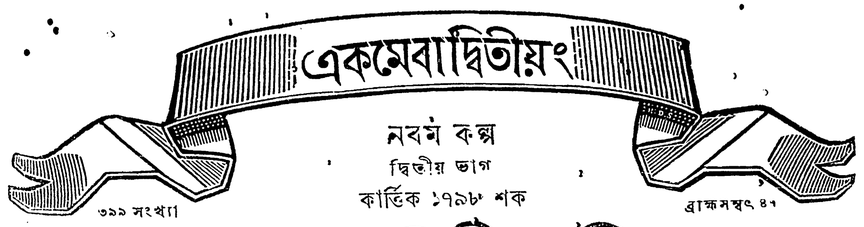

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞাননন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

জন্মতিথি দিবসে প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! তোমার কৃপায় অদ্য এক পঞ্চাশৎ বৎসরে পদ নিক্ষেপ করিলাম। অষ্টাদশ সহস্র দুই শত পঞ্চাশ বার সূর্য্যের আহ্নিক গতি দেখিলাম; অষ্টাদশ সহস্র দুই শত পঞ্চাশ দিন মর্ত্ত্য লোকে যাপন করিলাম। নাথ! আমার অতীত জীবনে কত সময় বৃথা ক্ষেপণ করিয়াছি স্মরণ করিলে মন বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হয়। সময় কি অমূল্য পদার্থ! আমরা সময় থাকিতে তাহার মর্য্যাদা অনুভব করি না। এখন ক্ষমতার ক্রমে হ্রাস হইতেছে; এখন বৃথা-অতিবাহিত সময়ের জন্য অনুতাপ উপস্থিত হইতেছে; কিন্তু এখন অনুতাপ করিলে বা কি হইবে? মানবজন্মের ন্যায় এমন উত্তম ক্ষেত্র নাই, তাহা উত্তমরূপে কর্ষণ করিতে পারিলে সুবর্ণ ফলিতে পারে, কিন্তু এমন দুর্ল্লভ জন্ম অবহেলা করিলাম। নাথ! ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে, এত বয়স হইল তথাপি প্রবৃত্তিদিগকে সম্যক্ রূপে বশীভূত করিতে পারিলাম না; তোমার সহিত অখণ্ড সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে পারিলাম না; প্রকৃতরূপে তোমার সহচর অনুচর হইতে পারিলাম না। ইচ্ছা যে তোমার সহবাস-সুধা সর্ব্বদা উপভোগ করি, কিন্তু মোহ আসিয়া আত্মাকে নিম্নগামী করে। নাথ! এত দিন পৃথিবীতে থাকিয়া জানিলাম যে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা এবং সেই উপদেশানুসারে কার্য্য করা এই দুই কি ভিন্ন পদার্থ! এত দিন পৃথিবীতে থাকিয়া জানিলাম যে বিখ্যাত ধর্ম্মোপদেষ্টা অপেক্ষা খ্যাতিশূন্য সাধারণের অজ্ঞাত কোন কোন উপদিষ্ট ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা খ্যাতি-রব কখন শুনিতে পায়েন নাই, কিন্তু তাঁহারা তোমার সুপরিচিত ব্যক্তি। নাথ! বেলা অবসান হইতেছে; জীবন-সূর্য্য অস্তমিত হইবার উপক্রম হইতেছে; আমার মোহনিদ্রা ভঙ্গ কর। গর্ভস্থ বালকের মস্তক যেমন ভূমির দিকে প্রবণ হয় তেমনি আমার চিন্তা পরলোকের দিকে প্রবণ কর। পঞ্চাশৎ বৎসর নিদ্রায় যাপন করিলাম; এখন জীবনের অবশিষ্ট এই পাঁচটা দিন যাহাতে ভালরূপে অতিবাহন করিতে পারি এমৎ সুমতি প্রদান কর। নাথ! তুমিই সত্য-স্বরূপ আর সকলই মিথ্যা। তোমার সত্য-স্বরূপ অনুভব করিবার ক্ষমতা আমাকে প্রদান কর। তুমি যে আমার আত্মার আত্মা, তোমা হইতেই আমার আমিত্ব,

এই সত্য উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করাও তাহা হইলেই আমার মোহান্ধকার বিনষ্ট হইবে, তাহা হইলেই আমি তোমাতে তন্ময় হইব, তাহা হইলেই আমি প্রকৃত মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইব। "মোহময় সংসার মাঝে,মোহে অন্ধ সবে মোরা, মুক্তিদাতা! দেখাও হে অমৃতের সোপান।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বৈদিক আর্য্যসমাজ।

দর্শন শাস্ত্র সকল হইতে বেদ শাস্ত্রের প্রামাণ্য বিষয়ে মত এবং তদ্বিষয়ক যুক্তি সকল আকলন করিতে আরম্ভ করিয়া সাংখ্য দর্শনের মত পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে মীমাংসাদর্শনের মত প্রদর্শন করা যাইতেছে।

মীমাংসাদর্শন জৈমিনিপ্রণীত এবং দ্বাদশাধ্যায়ে সংবিভক্ত। ইহাতে বেদের মীমাংসা আছে বলিয়া ইহাকে মীমাংসাদর্শন কহে। জৈমিনিদর্শন ইহার অপর নাম। ইহা শ্রুতি এবং স্মৃতির বিরোধভঞ্জক মধ্যস্থ-স্বরূপ, ধর্ম্মদর্শনের আদর্শস্বরূপ এবং দুর্গম নিগম-মার্গে সুখ-সঞ্চলনের বাষ্পীয় রথস্বরূপ! বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ নিশ্চয় এবং বিরোধভঞ্জনের নিমিত্ত মীমাংসা দর্শন অতীব উপযোগি। এই দর্শনে অনেক অধিকরণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক একটী বিষয়ের এক একটী সিদ্ধান্তকে অধিকরণ কহে। মীমাংসাদর্শনানুযায়ীদিগকে মীমাংসক বলে।

মীমাংসকেরা শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া বেদের নিত্যত্ব প্রমাণ করেন। সুতরাং শব্দের নিত্যানিত্যত্ব বিচার সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক। শব্দ এবং অর্থ উৎপত্তি হইলে পর তাহাদিগের মধ্যে অমুক শব্দে অমুক অর্থ বোধ হয় এইরূপ সংকেতাত্মক সম্বন্ধ (অর্থাৎ বোধ্য বোধক ভাব) কল্পিত হইয়া থাকে। সেই লোককল্পিত সম্বন্ধজ্ঞানের উপরই শব্দের ব্যবহার নির্ভর করে। অতএব শব্দ এবং অর্থের সম্বন্ধ কল্পিত বলিয়া যেরূপ শুক্তিকাদিতে রজতাদির প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভ্রান্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ শব্দে সত্যব্যভিচার সম্ভব হইতে পারে। তাহা হইলে বেদবাক্য সকল কল্পিত সংকেতাত্মক শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ হেতু অপ্রমাণ এবং নিরর্থক হইয়া পড়ে। এই আপত্তি খণ্ডন করিবার নিমিত্ত মীমাংসাকার বক্ষ্যমাণ সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন—

"ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্য অর্থেন সহ সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশঃ অব্যতিরেকশ্চ অর্থে অনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্য।" ১।১।৫।

শব্দস্য নিত্যবেদঘটকপদস্য অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকাম ইত্যাদেরর্থেন সম্বন্ধঃ ঔৎপত্তিকঃ স্বাভাবিকো নিত্য ইতি যাবৎ। অতস্তস্য ধর্ম্মস্য ইতি শেষঃ। জ্ঞানমত্র করণে ল্যুট্ জ্ঞপ্তের্যথার্থজ্ঞানস্য করণং উপদেশঃ অর্থপ্রতিপাদনং। অব্যতিরেকঃ অব্যভিচারী দৃশ্যতে। অনুপলব্ধে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈরজ্ঞাতে অর্থে তৎবিধিঘটিতবাক্যং ধর্ম্মে প্রমাণং বাদরায়ণাচার্য্যস্য সম্মতমিতি ভাষ্যং।

শব্দ এবং অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ অর্থাৎ বোধ্যবোধকভাব স্বাভাবিক ও নিত্য, অতএব বেদবাক্য-সমূহ ধর্ম্মজ্ঞান বিষয়ে এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-নিরপেক্ষ অজ্ঞাত বিষয়ে অভ্রান্ত উপদেশ প্রদান করে। সুতরাং বেদ প্রমাণ এবং নিত্য।

নৈয়ায়িকেরা বলেন, শব্দ নিত্য হইতে পারে না এবং তদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদান করেন। যথা—

(১) "কর্ম্ম এককে তত্র দর্শনাৎ।" শব্দ প্রযত্ন করিলেই উৎপন্ন হয়, সুতরাং শব্দ প্রযত্নসাপেক্ষ এবং কর্ম্ম। অতএব শব্দ নিত্য হইতে পারে না, যেহেতু যাহা নিত্য হয় তাহা সর্ব্বকালে বিদ্যমান থাকে এবং প্রযত্ন দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে না।

(২) "অস্থানাৎ।" শব্দ ক্ষণস্থায়ী, এক-ক্ষণে উৎপন্ন হয় এবং পরক্ষণে বিনষ্ট হয়, সুতরাং শব্দ নিত্য হইতে পারে না।

(৩) "করোতিশব্দাৎ।" 'শব্দং করোতি' শব্দ করে এইরূপ ব্যবহার হয় বলিয়া শব্দ নিত্য হইতে পারে না, কারণ ইহা কৃত।

(৪) "সন্ত্বান্তরে যৌগপদ্যাৎ।" এককালেই নিকটস্থ এবং দূরস্থ বহু ব্যক্তির কর্ণগোচর হইয়া থাকে,সুতরাং শব্দ এক ও নিত্য কি রূপে হইবে।

(৫) "প্রকৃতিবিকৃত্যোশ্চ।" যে পদার্থ পরিবর্ত্তনশীল তাহা নিত্য হইতে পারে না। শব্দেরও প্রকৃতিবিকৃতিভাব দৃষ্ট হয়; যথা দধি অত্র এবং দধ্যত্র। সুতরাং শব্দ নিত্য নহে।

(৬) "বৃদ্ধিশ্চকর্ত্তৃভূম্নাস্য।" শব্দকর্ত্তার সংখ্যাভেদে শব্দের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। দশ ব্যক্তি যদি এককালীন গোশব্দ উচ্চারণ করেন তবে দশটী গোশব্দ উৎপন্ন হইল। সুতরাং মীমাংসকদিগের নিত্যত্ব স্বীকার নিষ্ফল।

মীমাংসকেরা এই সমূহ আপত্তির বক্ষ্যমাণ প্রকারে উত্তর দেন। যথা—

(১) "সতঃ পরমদর্শনং বিষয়ানাগমাৎ।" শব্দ নিত্য হইলেও যে সর্ব্বকালে উপলব্ধ হয় না তাহার হেতু এই যে সর্ব্বসময়ে উচ্চারণকারী ব্যক্তির সহিত শব্দের সন্নিকর্ষ থাকে না। গকার এই শব্দ শ্রবণ করিলেই আমাদিগের এইরূপ বুদ্ধি হয় যে সর্ব্বদা আমরা যে গকার শ্রবণ করিয়া থাকি ইহাও সেই গকার, তদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র নহে।

(২) "প্রয়োগস্য পরমং।" 'শব্দং করোতি' এই বাক্যের অর্থ শব্দ নির্ম্মাণ নহে কিন্তু শব্দ উচ্চারণমাত্র।

(৩) "আদিত্যবৎ যৌগপদ্যং।" যেরূপ এক সূর্য্য নিকটস্থ এবং দূরস্থ সকল লোকেরই দৃশ্য হইতেছে, তদ্রূপ এক শব্দ বহু ব্যক্তির শ্রব্য হইতে পারে।

(৪) "বর্ণান্তরমবিকারঃ।" বর্ণান্তরকে বিকার বলা উচিত নহে, যেহেতু ইকার স্থানে যকার হইলে বর্ণান্তর প্রয়োগ হইল, ইকারের কোন বিকার হইল না।

(৫) "নাদবৃদ্ধিঃ পরা।" দশ ব্যক্তি এক গোশব্দ উচ্চারণ করিলে দশটী গোশব্দ আবির্ভূত হইল বটে, কিন্তু তাহা কেবল নাদ অর্থাৎ গোলমাল বৃদ্ধিমাত্র, শব্দবৃদ্ধি নহে। এক গোশব্দ একই রহিল, তবে দশবার উচ্চরিত হইল বলিয়া গোলমাল অধিক হইল। অতএব কোন প্রকারেই শব্দের একত্ব এবং নিত্যত্ব হানি হইতে পারে না। সুতরাং শব্দের নিত্যত্ব সুস্থির রহিল।

অতঃপর মীমাংসাকার শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণের নিমিত্ত নিম্নলিখিত যুক্তি নিবেশিত করিয়াছেন।

(১) "নিত্যস্তু স্যাৎ দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ।" যেহেতু শব্দ উচ্চরিত হইলেই অন্য ব্যক্তি ঐ শব্দের অর্থগ্রহ করিতে পারেন, অতএব অবশ্য শব্দ নিত্য হইবেক। যদি শব্দ নিত্য না হইত তাহা হইলে কেহই শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিত না, কারণ শব্দ উচ্চারণ মাত্র বিনষ্ট হইবে। এবম্বিধায় উচ্চারণ অবধি অর্থবোধ পর্য্যন্ত শব্দে স্থিতি মানিতেই হইবে নচেৎ বিষম দোষ ঘটে। এই রূপ শব্দের স্থিতি মানিলেই শব্দের নিত্যত্ব স্বতঃ প্রমাণ হইল।

(২) "সর্ব্বত্র যৌগপদ্যাৎ।" ভিন্ন ভিন্ন পুরুষেরা এককালে এক শব্দের সমভাবে এবং অভ্রান্তরূপে প্রত্যভিজ্ঞা করিতে পারেন যেহেতু শব্দ নিত্য এবং একস্বরূপ।

(৩) "সংখ্যাভাবাৎ।" শব্দের সংখ্যা বৃদ্ধি নাই। একটী গোশব্দের বারংবার উচ্চারণ করিলে ঐ পুনঃ পুনঃ উচ্চরিত

শব্দ গুলি সংখ্যাবচ্ছেদে পরস্পর বিভিন্ন নহে।

(৪) "অনপেক্ষত্বাৎ।" শব্দের বিনাশ অনুমান করিবার কোন কারণ বা অবলম্বন নাই সুতরাং শব্দ অনিত্য কেন হইবে।

(৫) "লিঙ্গদর্শনাৎচ।" বেদসংহিতাতেও শব্দের নিত্যত্ব পরিস্ফুট রহিয়াছে, যথা 'বাচা বিরূপ নিত্যয়া' ঋগ্বেদ ৮মং ৬৪সূ ৬ঋক্। সুতরাং শব্দ নিত্য। ইত্যাদি বহুবিধ যুক্তি দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণ করিয়া মীমাংসকেরা বেদের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করেন। বেদ শব্দরাশিমাত্র, শব্দ নিত্য এবং প্রমাণ, অতএব বেদ নিত্য এবং প্রমাণ।

প্রকারান্তরে বেদের অনিত্যতা এবং অপ্রামাণিকতা আপত্তি করা হইয়াছে। অচেতন বস্তুতে চেতন বস্তুর উচিত রক্ষণ শ্রবণ প্রভৃতি অর্থ বন্ধন অত্যন্ত অযুক্ত এবং বেদেও তাহার অসদ্ভাব নাই; যথা হে ওষধে তুমি ইহাঁকে রক্ষা কর, হে পাষাণ-সকল তোমরা শ্রবণ কর, হে ক্ষুর তুমি ইহাঁর কোন অনিষ্ট করিও না ইত্যাদি (তৈত্তিরীয় সংহিতা ১।২১।) বেদে অনিত্যসংযোগ আছে, যথা কীকট নামে দেশ, নৈচাশাখ নামে নগর, গন্ধার নামে দেশ, প্রমগন্ধ রাজা, নগ্নজিৎ নৃপতি, প্রবহণের পুত্র ববর, এবং কঠ, কলাপ প্রভৃতি ঋষি অথবা মন্ত্র সম্বন্ধীয় পুরুষ। অতএব প্রমগন্ধাদির পূর্ব্বে বেদের অস্তিত্ব ছিল না, সুতরাং বেদ অনিত্য। এই আপত্তির উত্তর এই যে কঠ কলাপ প্রভৃতির নাম বেদে উল্লিখিত আছে সত্য কিন্তু তাঁহারা বেদকর্ত্তা নহেন, ব্যাখ্যাতা মাত্র। প্রবচনের নিমিত্ত তাঁহাদিগের নাম উক্ত হইয়াছে। আর ববরাদি যে সকল ব্যক্তির নাম আছে তদ্দ্বারা কোন মনুষ্য বিবক্ষিত হয় নাই, কিন্তু তৎসমুদায় শব্দসামান্য মাত্র। ববর অর্থাৎ ববরধ্বনিযুক্ত বায়ু, প্রবহণ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বহনশীল ইত্যাদি। অতএব বেদের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইল না, বেদ নিত্য এবং প্রমাণ।

জৈমিনি দর্শনের সারসংগ্রহস্বরূপ মাধবাচার্য্যের ন্যায়মালাবিস্তর গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত মত অতি স্ফুট রূপে বিন্যস্ত আছে, বাহুল্য ভয়ে আমরা তাহা প্রকটন করিতে পারিলাম না। মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে জৈমিনি দর্শন প্রস্তাবে বেদ যে অপৌরুষেয় এ বিষয়ে অনেক অনুমান-প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক, কারণ ঐ সকল অনুমান-প্রণালী সংস্কৃত ভাষাতেই রমণীয়, বঙ্গভাষাতে তাহার চমৎকারিত্বের লেশমাত্র নাই, বরং প্রকৃত প্রবন্ধের রসভঙ্গ হইবারই সম্ভাবনা, অতএব তাহা উদ্ধৃত হইল না।

মহর্ষি পতঞ্জলি মহাভাষ্য গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে বেদের অর্থ নিত্য, বর্ণবিন্যাস এবং বর্ণের আনুপূর্ব্বী নিত্য নহে। প্রতিকল্পে মহর্ষিরা এই অর্থানুসারে বর্ণবিন্যাস করিয়া বেদশাখা রচনা করেন, এই নিমিত্তই বেদ শাখার কাঠক, কালাপক, মৌদক, পৈপ্পলাদক প্রভৃতি নাম হইয়া থাকে।

মীমাংসা দর্শনের মত সমালোচনা করিয়া এক্ষণে বেদান্ত-দর্শনের মত সমালোচনা করা যাইতেছে। নাস্তিকত্রাস পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য মহর্ষি বেদব্যাসের কৃত বেদান্ত-সূত্রকে অবলম্বন করিয়া, এই অদ্বৈত মত সংস্থাপন করিয়াছেন, এ নিমিত্ত এই দর্শনকে বেদান্ত-দর্শন ও অদ্বৈত-দর্শনও বলে। শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হওয়াতে ইহাকে শাঙ্কর-দর্শনও কহে। মহর্ষি বেদব্যাস এরূপ অস্ফুট ভাষায় বেদান্তসূত্র রচনা করিয়াছেন যে, তাহার তাৎপর্য্য কোন ক্রমেই অনায়াসে বোধগম্য হয় না। শঙ্করাচার্য্য ইহার উপর

শারীরভাষ্য লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থদ্বয় অবলম্বন পূর্ব্বক আমরা বেদশাস্ত্রের উৎপত্তি ও প্রামাণ্য বিষয়ে সার সংকলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বেদান্ত-দর্শনে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সমুদায় জগৎই মিথ্যা, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মুক্ত হয়, ইত্যাদি বিষয় সকল শ্রুতি স্মৃতি ও যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। বেদবিষয়ে বেদান্ত-দর্শনের মত মীমাংসা-দর্শনের, মত হইতে ভিন্ন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয় মাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের উপযুক্ত স্থির করিয়া, দর্শনকার দেবগণের মোক্ষেচ্ছা এবং বিগ্রহ-ধারণ-শক্তি প্রতিপাদন করিয়াছেন। যদ্যপি দেবগণ শরীরযুক্ত হইলেন তাহা হইলে বহুসংখ্যক যজ্ঞে এককালে তাঁহাদিগের গমন অসম্ভব হইবেক, যে হেতু এক ইন্দ্র ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞে এককালে সশরীরে গমন করিতে পারেন না। এ আপত্তির দুই প্রকার উত্তর হইতে পারে; যথা, প্রথমতঃ, দেবগণ ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ করিতে পারেন এবং সশরীরে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞে উপস্থিত হইতে পারেন। উত্তর নৈষধচরিতে যখন ইন্দ্র নলরাজাকে বর প্রদান করেন, তিনি বলিয়াছিলেন 'হে নল যদি তুমি যজ্ঞ কর তাহা হইলে আমি সশরীরে সে যজ্ঞস্থলে গমন পূর্ব্বক তোমার প্রদত্ত আহুতি গ্রহণ করিয়া, নাস্তিকদিগের দর্প চূর্ণ করিব'। দ্বিতীয়তঃ, যে হেতু দেবগণের উদ্দেশে যাগ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে তখন অনেক ব্যক্তি এককালে এক দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া আহুতি দিতে পারেন তাহাতে কোন দোষ ঘটিতে পারে না। এক জন ব্রাহ্মণকে এককালে বহুসংখ্যক ব্যক্তি প্রণাম করিতে পারেন। অতএব দেবগণের শরীর ধারণ বিষয়ে কোন আপত্তি ঘটিতে পারে না। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বিতীয় সূত্রে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই বাক্য দ্বারা সমস্ত জগতের ব্রহ্মা হইতে উৎপত্তি নির্ণীত হইয়াছে এবং তৃতীয় পাদের ২৮ সূত্রে "অতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং" এই উক্তি দ্বারা বৈদিক শব্দ হইতে দেবগণ উৎপন্ন হইয়াছেন পরিস্ফুট হইল। আবার রুদ্র, আদিত্য, ইন্দ্র, মরুৎ প্রভৃতি দেবতার নাম বেদে দৃষ্ট হয়। কোন বিষয়ের উৎপত্তি না হইলে কি তাহার নাম হইতে পারে? দেবদত্তের পুত্র না জন্মিলে কি তাহার নাম যজ্ঞদত্ত হইতে পারে? সুতরাং দেবগণ উৎপত্তিযুক্ত এবং অনিত্য, তৎসংযোগে বেদও অনিত্য এবং অপ্রমাণ হউক। এবিষয়ে দর্শনকার এবংবিধ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে আকৃতি (Species) এবং ব্যক্তি (Individual) দুইটী বিভিন্ন পদার্থ। ব্যক্তি অনিত্য, যথা গবাদি এবং আকৃতি নিত্য, যথা গোজাতি। বেদজাতি নিত্য কিন্তু ইন্দ্র আদিত্যাদি দেবগণ ব্যক্তিমাত্র এবং অনিত্য। বেদে আকৃতির কথা উক্ত হইয়াছে, ব্যক্তির কথা নাই। সুতরাং কোন বিরোধ হইবার সম্ভাবনা নাই।

ব্রহ্মা হইতে বেদের উৎপত্তি, বেদ ব্রহ্মকার্য্য। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই সূত্রে ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন "মহৎ ঋগ্বেদাদিশাস্ত্রের প্রদীপের ন্যায় সর্ব্বার্থভাসকতা শক্তি দৃষ্ট হয়। ইহা বিবিধ বিদ্যা দ্বারা বর্দ্ধিত এবং সর্ব্বজ্ঞকল্প। ঈদৃশ শাস্ত্রের সর্ব্বজ্ঞগুণবিশিষ্ট সর্ব্ববিৎ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য প্রণেতা কি সম্ভবে? সুতরাং বেদশাস্ত্র ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।"

মীমাংসা-দর্শনের মত হইতে বেদান্ত দর্শনের মত এই পর্য্যন্ত বিভিন্ন যে, মীমাংসা-দর্শনে ব্রহ্ম হইতে বেদের উৎপত্তির বিষয়ে

কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু বেদান্তদর্শনের উহাই প্রধান প্রতিপাদ্য। মীমাংসা বলে, শব্দ নিত্য বলিয়া শব্দরাশি বেদ নিত্য; কিন্তু বেদান্ত বলে, ব্রহ্মোৎপন্ন বলিয়া বেদ নিত্য এবং প্রমাণ। সায়ণাচার্য্যের মতে বেদের নিত্যত্ব কেবলমাত্র এককল্পস্থায়ি চিরকাল নহে।

বেদান্তের মত নিষ্কর্ষ হইল। এক্ষণে ন্যায়দর্শনের মত নিষ্কর্ষ করিতে হইবেক। যে মহর্ষি এই দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহার নাম অক্ষপাদ ও গোতম, এজন্য ইহাকে অক্ষপাদ ও গোতমদর্শন বলে। ইহাতে ন্যায় ও তর্কপদার্থের বিশেষ নির্দেশ আছে এনিমিত্ত ইহার নাম ন্যায়শাস্ত্র এবং তর্কশাস্ত্র। ন্যায়শাস্ত্র ব্যতীত কোন শাস্ত্রেরই সম্যক্ তাৎপর্য্যগ্রহ হয় না, সুতরাং ন্যায়শাস্ত্রের সকলশাস্ত্রেই উপযোগিতা আছে। সুরাচার্য্য বৃহস্পতি বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি তর্কশাস্ত্রানুসারে তাৎপর্য্যার্থের অনুসন্ধান করে,সেই ব্যক্তিই শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া ধর্ম্মনির্ণয়ে সমর্থ হয়।" পক্ষিলস্বামী কহিয়াছেন "এই ন্যায়বিদ্যাই সকল বিদ্যার প্রদীপস্বরূপ, যাবতীয় কর্ম্মের উপায় এবং নিখিল ধর্ম্মের আশ্রয়।" গোতমপ্রণীত দর্শনে পঞ্চ অধ্যায় আছে; প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটী আহ্নিক এবং প্রত্যেক আহ্নিকে অনেক গুলি প্রকরণ আছে। ন্যায়দর্শনের মতে জীবাত্মাতিরিক্ত একজন পরমেশ্বর আছেন। তাঁহার ভোগসাধন শরীর, সুখ, দুঃখ ও দ্বেষাদি কিছুই নাই, কেবল নিত্য জ্ঞান, ইচ্ছা ও যত্নাদি কএকটী গুণ আছে। তিনি অসাধারণ-শক্তি-সম্পন্ন ও সমস্ত জগতের কর্ত্তা। এতদ্বিষয়ে প্রমাণ বেদাদিশাস্ত্র এবং অনুমান।

নৈয়ায়িকেরা শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, সুতরাং মীমাংসকদিগের ন্যায় বেদের প্রামাণ্য গ্রাহ্য করিতে পারেন না। যে সমস্ত যুক্তি দ্বারা তাঁহারা শব্দ অনিত্য বলিয়া প্রমাণ করেন তাহাদিগের কতকগুলি ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। গোতমসূত্র এবং তদুপরি বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্যের ন্যায়সূত্র-বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক আমরা দুই একটী কথা বলিব। বেদবিষয়ে গোতম এই প্রকারে তর্ক আরম্ভ করিয়াছেন—

"তদপ্রামাণ্যম্ অনৃতব্যাঘাতপুনরুক্তদোষেভ্যঃ।"

বেদ অনিত্য ও অপ্রমাণ, যেহেতু ইহাতে অনৃত, ব্যাঘাত এবং পুনরুক্তি দোষ দৃষ্ট হয়। বৃত্তিকার লিখিতেছেন "অদৃষ্টার্থক শব্দ বেদ অপ্রমাণ, কারণ ইহাতে দোষত্রয় লক্ষিত হয়। প্রথম অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা কথন, যথা—

পুত্রেষ্টি যাগাদিতে অনেক সময় ফলের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না, তদ্ধেতু বেদবাক্যের অযথার্থ কথন। দ্বিতীয়, ব্যাঘাত অর্থাৎ পূর্ব্বাপর বিরোধ, যথা উদিত কালে হোম করিবে না এবং অনুদিত কালে হোম করিবে না। তৃতীয়, পুনরুক্তি দোষ অর্থাৎ এক কথার বারংবার কথন। অতএব বেদ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।"

গোতম সূত্রত্রয়ে উক্ত দোষত্রয়ের নিরাকরণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, কর্ম্মকর্ত্তার অযথাবিধি কর্ম্মকরণ প্রভৃতি বৈগুণ্য প্রযুক্ত যাগফলের অনুপপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, অনুদিত কালে হোম করিব অথবা উদিত কালে হোম করিব এইরূপ স্বীকার করিয়া, যে ব্যক্তি তদ্বিপরীত কার্য্য করে অর্থাৎ উদিত কালে হোম করে অথবা অনুদিত কালে হোম করে তাহার পক্ষে উক্ত নিষেধ, সাধারণের পক্ষে নহে। তৃতীয়তঃ, পুনরুক্তি দোষ নহে বরং গুণবিশেষ, কারণ অনেক বিষয় দুই তিন বার না বলিলে শ্রোতৃবর্গ তাহার তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে

পারেন না; তজ্জন্য পুনরুক্তি স্থলবিশেষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং বেদের প্রামাণ্য কোন প্রকারেই ব্যাহত হইল না।

এইরূপ দোষত্রয় প্রত্যাদেশ করিয়া গোতম স্বমত প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

মন্ত্রায়ুর্ব্বেদবৎ চ তৎপ্রামাণ্যং আপ্তপ্রামাণ্যাৎ"

বৃত্তিকার ব্যাখ্যা করিতেছেন,

আপ্তস্য বেদকর্ত্তুঃ প্রামাণ্যাৎ যথার্থোপদেশকত্বাৎ বেদস্য তদুক্তত্বমর্থাৎলব্ধং। তেন হেতুনা বেদস্য প্রামাণ্যমনুমেয়ং। তত্র দৃষ্টান্তমাহ। মন্ত্রো বিষাদিনাশকঃ। আয়ুর্ব্বেদভাগশ্চ বেদস্থ এব। তত্র সংবাদেন প্রামাণ্যগ্রহাৎ তদদৃষ্টান্তেন বেদত্বাবচ্ছেদেন প্রামাণ্যমনুমেয়া।"

যেরূপ প্রণেতার উপদেশ যথার্থ বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ প্রমাণ তদ্রূপ বেদকর্ত্তা যথার্থবাদী বলিয়া বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে। বাৎস্যায়ন ভট্টাচার্য্য তাঁহার বৃত্তিতে এই সূত্রের অতিসরল ভাষায় পরিস্ফুট অর্থ করিয়াছেন। উপসংহারস্থলে তিনি বলিয়াছেন,

"মন্বন্তরযুগান্তরেষু চ অতীতানাগতেষু সম্প্রদায়াভ্যাসপ্রযোগাবিচ্ছেদো বেদানাং নিত্যত্বং। আপ্তপ্রামাণ্যাৎ চ প্রামাণ্যং। লৌকিকেষু শব্দেষু চৈতৎ সমানং।"

অর্থাৎ অতীত এবং ভবিষ্যৎ মন্বন্তর ও যুগান্তর সময়ে বেদের সম্প্রদায়, অভ্যাস এবং প্রয়োগ অবিচ্ছিন্ন থাকে এজন্য বেদ নিত্য। আর যথার্থবাদী প্রণেতার যথার্থ উপদেশ এই হেতু বেদের প্রামাণ্য। লৌকিক বাক্যেও এই নিয়ম।

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নৈয়ায়িকেরা বহুকাল প্রচলিত আছে এজন্য বেদের নিত্যত্ব এবং বেদকর্ত্তা যথার্থবাদী এজন্য বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন বেদোক্ত বিষয়ের সত্যতা আছে বলিয়া যে বেদের নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে এরূপ কি নিয়ম আছে; ঘট কুম্ভকার কর্ত্তৃক কৃত এই বাক্যার্থের যাথার্থ্য আছে বলিয়া যেমন ঐ বাক্যের অভ্রান্তপুরুষোক্ততা আছে, তদ্রূপ বেদ অভ্রান্তপুরুষ-প্রণীত এইমাত্র, নতুবা বেদ যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত নহে এমন নহে। যদি অর্থের যাথার্থ্য থাকিলেই বাক্য নিত্য হয় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ঘট কুম্ভকারকৃত এই আধুনিক বাক্যও নিত্য হইয়া উঠে। যদিও এরূপ অভ্রান্ত পুরুষ দৃষ্ট হয় না কিন্তু যে, তাদৃশ অভ্রান্ত পুরুষ নাই একথাও বলা যাইতে পারে না, যেহেতু সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বমঙ্গলনিদান দয়াময় জগৎকারণ ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বসাধারণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া বেদ রচনা করিয়াছেন। সুতরাং ন্যায়দর্শনের মতে বেদ ঈশ্বরের প্রণীত বলিয়া প্রমাণ।

পরিশেষে বৈশেষিক দর্শনের মত সমালোচনা করিয়া দর্শনকারদিগের বেদবিষয়ক মত ও যুক্তির উপসংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই দর্শনপ্রণেতা মহর্ষির নাম কণাদ ও উলূক, এজন্য এই দর্শনকে কাণাদদর্শন ও ঔলূক্যদর্শন কহে। অন্যান্য দর্শনের অনভিমত বিশেষ নামক একটী পদার্থ স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট আছে এনিমিত্ত ইহার নাম বৈশেষিক দর্শন হইয়াছে। আকাশ, পরমাণু, প্রভৃতি এক একটী নিত্য দ্রব্যে এক একটী বিশেষ পদার্থ আছে। যদি বিশেষ পদার্থ না থাকিত তবে কখনই পরমাণুসমূহের পরস্পর বিভিন্নরূপতার নিশ্চয় করা যাইত না। পরমাণুর অবয়ব নাই, সুতরাং এক পরমাণু অন্য পরমাণু হইতে বিভিন্ন তাহা নিশ্চয় করিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু বিশেষ পদার্থ স্বীকার করিলে কোন দোষ ঘটে না। এই পরমাণুতে যে বিশেষ আছে তাহা অন্য পরমাণুতে নাই এই বলিয়া ঐই পরমাণু, অন্য পরমাণু হইতে বিভিন্ন। এই

বিশেষ পদার্থ নিত্য। বৈশেষিক দর্শনের মতে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির নাম মুক্তি। যে দুঃখনিবৃত্তি হইলে কোন কালেই আর দুঃখ না জন্মে তাহাকে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি কহে। এই মুক্তি আত্মসাক্ষাৎকারস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে জন্মে না। বৈশেষিক দর্শন দশ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অধ্যায় আবার দুই আহ্নিকে বিভক্ত। এই দর্শনের মতে

"যতোভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ"

যাহা হইতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় তাহাই ধর্ম্ম। বেদই ধর্ম্মের প্রমাণ। এক্ষণে আপত্তি এই যে বেদের প্রামাণ্য কোথায় যে, তদ্দ্বারা ধর্ম্ম সপ্রমাণ হইবেক। বেদ যে নির্দ্দোষ এবং নিত্য তাহা কে বলিতে পারে, অদ্যাপি সন্দেহের বিষয়। বেদ যদি পুরুষপ্রণীত হয় তাহা হইলে ভ্রম প্রমাদ বিরোধ এবং অপটুত্ব দোষ আসিয়া পড়ে, যেহেতু উক্ত দোষচতুষ্টয়রহিত পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং বেদ অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। দর্শনকার ইহার উত্তর দিতেছেন,

"তদ্বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্"

সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া বেদ প্রমাণ। তৎপরে বেদের প্রামাণ্যসিদ্ধি করিবার নিমিত্ত আর একটী সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

"বুদ্ধিপূর্ব্বা বাক্যকৃতির্ব্বেদে"

ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

বাক্যকৃতিঃ বাক্যরচনা সা বুদ্ধিপূর্ব্বা বক্তৃযথার্থজ্ঞানপূর্ব্বা। নদীতীরে পঞ্চফলানি সন্তীত্যস্মদাদি বাক্যরচনাবৎ। স্বর্গকামো যজেত ইত্যাদৌ ইষ্টসাধনতায়াং কার্য্যতায়া বা অস্মদাদি বুদ্ধ্যগোচরত্বাৎ। তেন স্বতন্ত্রপুরুষপূর্ব্বকত্বং বেদে সিধ্যতি।"

অর্থাৎ বেদবক্তার যথার্থ জ্ঞান পূর্ব্বক বাক্য রচনা দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্গকামনা করিয়া যাগ করিবে ইত্যাদি ইষ্ট উপদেশ অস্মৎসদৃশ ব্যক্তিদিগের বুদ্ধির আগোচর সুতরাং স্বতন্ত্র সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বেদ রচনা করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অজ্ঞানাদি দোষবিশিষ্ট মনুষ্যেরা বেদ রচনা করিতে অসমর্থ, যেহেতু বেদের বহুসংখ্যক শাখা দেখিতে পাওয়া যায় এবং বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। এত শাখাবিশিষ্ট বেদ দুর্ব্বল মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রণীত হইতে পারে না, আর অনেক বুদ্ধিমান উপযুক্ত ব্যক্তি বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া থাকেন। যথার্থবাদী উপযুক্ত পুরুষের বাক্য না হইলে কি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা গ্রাহ্য করেন? অতএব বেদ ঈশ্বরপ্রণীত এবং প্রমাণ।

তর্কসংগ্রহ নামে আর একখানি ক্ষুদ্র বৈশেষিক গ্রন্থ আছে। ইহার মতে বাক্য দুই প্রকার, লৌকিক ও বৈদিক। যাহা লোকসাধারণে ব্যবহৃত হয় তাহাকে লৌকিক এবং যাহা কেবল বেদে ব্যবহৃত হয় তাহাকে বৈদিক বাক্য কহে। বৈদিক বাক্য ঈশ্বরের উক্ত সুতরাং যথার্থ ও প্রমাণ। লৌকিক বাক্যের মধ্যে যথার্থজ্ঞানী ও যথার্থবাদীদিগের বাক্য যথার্থ ও প্রমাণ, অবশিষ্ট অপ্রমাণ, অতএব ইহার মতে বেদ ঈশ্বরের উক্তি।

উদয়নাচার্য্যের কুসুমাঞ্জলি আর একখানি গ্রন্থ। ইহার দ্বিতীয় স্তবকে লিখিত আছে যে, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলেই স্বর্গে গমন করা যায়। তদ্বিষয়ে উপদেশ বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদ নিত্য ও নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণ, বেদ মহাজনগৃহীত বলিয়া প্রমাণ। এবংবিধায় 'ঈশ্বর আছেন' মানিবার কোন প্রয়োজন নাই এরূপ আপত্তি করিলে, তাহার উত্তর এই যে, যখন যথার্থজ্ঞান বাহ্য কারণের পরতন্ত্র, যখন সৃষ্টি ও প্রলয় ঘটিতেছে এবং যখন ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য পুরুষে বিশ্বাস হইতে পারে না, তখন ঈশ্বরপ্রণীত ভিন্ন

অন্য কোন প্রকারে বেদের উৎপত্তি গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। সুতরাং বৈশেষিক মতে বেদ ঈশ্বরপ্রণীত এবং মহাজনগৃহীত বলিয়া প্রমাণ ও অবলম্বনীয়।

পাতঞ্জল-দর্শনে যোগের বিষয় বিশেষরূপ নির্দ্দিষ্ট থাকায় ইহাকে যোগ-শাস্ত্র বলে। ইহার মতে বেদবোধিত যজ্ঞাদি বৈধ কর্ম্ম এবং বেদনিষিদ্ধ ব্রহ্মহত্যাদি অবৈধ কর্ম্ম। ইহা বেদকে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করে। ইহার প্রকৃত বিষয় নহে বলিয়া বেদ বিষয়ক কোন মত বা যুক্তির উল্লেখ হইতে দৃষ্ট হয় না।

বেদের প্রামাণ্য ও উৎপত্তির বিষয়ে বিবিধ শাস্ত্র হইতে বিবিধ মত সমালোচনা করা গেল। প্রকৃত প্রস্তাবের ইহা একটী অবান্তর শাখামাত্র। কিন্তু আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য যে বেদ চিরকাল হিন্দুসমাজে অভ্রান্ত ও প্রামাণিকরূপে মান্য হইয়া আসিতেছে ইহা প্রতিপাদন করা; তাহা সিদ্ধ হইল।

ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি।

ত্রিশ বৎসর হইল, হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুআচার ব্যবহার ও হিন্দুগ্রন্থের প্রতি কৃতবিদ্য লোকের বিদ্বেষ ভাব ছিল। তাঁহাদিগের চক্ষে এ দেশের ধর্ম্ম, রীতি নীতি ও গ্রন্থ সকল অতি হীন বলিয়া বোধ হইত। তাঁহাদিগের আর্য্য পিতৃপুরুষেরা যাহা কিছু করিয়া গিয়াছেন তাহা সকলই মন্দ, তাঁহারা এরূপ বোধ করিতেন, কিন্তু এক্ষণে ক্ষিয়ৎ পরিমাণে স্রোত ফিরিয়াছে, এরূপ প্রতীতি হইতেছে। এক্ষণে হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুআচার ব্যবহার ও হিন্দু গ্রন্থের প্রশংসাসূচক বক্তৃতা হইলে লোকে অত্যন্ত উৎসাহ ও সন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে এইরূপ পরিবর্ত্তন চলিতেছে বিদেশীয়েরা পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছেন। ইংরাজী ১৮৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডন মহা নগরে প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের যে মহাসভা হয়, তাহাতে ভট্ট মোক্ষমূলর সভাপতি-স্বরূপে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন "A people that can feel no pride in the past, in its history and literature, loses the main stay of its national character. When Germany was in the very depth of its political degradation, it turned to its ancient literature and drew hope for the future from the study of the past. Something of the same kind is now passing in India * " "যে জাতি তাহাদিগের প্রাচীন মহিমা, পুরাবৃত্ত ও প্রাচীন সাহিত্য লইয়া গৌরব করে না সে জাতি তাহাদিগের জাতীয় প্রতিষ্ঠার একটি প্রধান সেতু হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। জর্ম্মেনি দেশ যখন, রাজ্য-সম্বন্ধে অবনতির গভীরতম প্রদেশে অবস্থিত ছিল তখন তাহা তাহার প্রাচীন সাহিত্যের মুখের দিকে চাহিয়াছিল এবং পুরাকাল আলোচনা করিয়া ভাবী কাল সম্বন্ধে আশান্বিত হইতে পারিয়াছিল। এক্ষণে ভারতবর্ষে কতকটা এইরূপ হইতেছে।"

যদি কোন দেশ অতীত মহিমা লইয়া গৌরব করিতে পারে তাহা ভারতবর্ষ। যে দেশ রামায়ণ ও মহাভারতকে জন্ম দিয়াছে সে দেশ কি সাহিত্য বিষয়ে গৌরব করিতে পারে না? রামায়ণের ন্যায় প্রাঞ্জল মধুর উচ্চভাব ও উচ্চবর্ণনাবিশিষ্ট হিতোপদেশ পরিপূর্ণ বীররসপ্রধান কাব্য পৃথিবীতে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। বাল্মীকি আপনার গ্রন্থ সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎবাণী উক্ত করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহ সার্থক হইবে। "যাবৎ

* Chips from a German Workshop Vol IV. p-349.

স্থাস্যন্তি গিরয়ো সরিতশ্চ মহীতলে। তাবৎ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।" "যাবৎ গিরি ও নদী পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিবে তাবৎ রামায়ণ-কথা লোকে প্রচারিত থাকিবে"। ভারতবর্ষে বাল্মীকি ত অত্যন্ত আদর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; ইওরোপ খণ্ডেও এক্ষণে তাঁহার আদর ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। মহাভারত নর্ম্মদা তীরস্থ কবীর বটের ন্যায় বিশাল। উক্ত বট বৃক্ষের শাখা সকল মৃত্তিকাতে পুনরায় মূল স্থাপন করিয়া যেমন প্রত্যেকে এক একটি বৃক্ষে পরিণত হইয়া কুঞ্জের অভ্যন্তরে কুঞ্জ বিনির্ম্মাণ করিয়াছে সেইরূপ মহাভারতে গল্পের ভিতর গল্প দৃষ্ট হয়। যেমন বহুকুঞ্জনিকুঞ্জকারী উল্লিখিত বট দ্রুমের সেই সকল কুঞ্জনিকুঞ্জে ভ্রমণ করিলে শরীর শীতল হয় তেমনি অমৃতসমান মহাভারতের গল্পের ভিতর গল্প পাঠ করিলে প্রাণ মন শীতল হয়। এই সকল বিশাল গ্রন্থের প্রণেতাদিগের সহিত অন্য জাতির গ্রন্থকর্ত্তাদিগের তুলনা করিলে তাহাদিগকে ক্ষুদ্র বামনস্বরূপ জ্ঞান হয়। যে ভারতবর্ষ বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্যকে জন্ম দিয়াছে তাহা কি জ্যোতিষ শাস্ত্রে নৈপুণ্যবিষয়ে গৌরব করিতে পারে না? আর্য্যভট্ট বলিয়া গিয়াছেন "চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি" "পৃথিবী সচল কিন্তু স্থিরের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে"। বিবেচনা করিয়া দেখ, কোপর্নিকসের কত দিন পূর্ব্বে আর্য্যভট্ট এইকথা বলিয়া গিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন "আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী যৎতয়া প্রক্ষিপ্যতে তৎতয়া ধার্য্যতে।" "পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি আছে; যাহা তাহা হইতে উপরে নিক্ষিপ্ত হয় তাহা পুনরায় সে ধারণ করে।" ইহাতে বোধ হইতেছে যে, ভাস্করাচার্য্য মাধ্যাকর্ষণের বিষয়ও অবগত ছিলেন। দশগুণোত্তর প্রণালী যাহা সকল গণিত শাস্ত্রের মূল, তাহা ইওরোপীয়েরা বলেন, আরবদিগের নিকট হইতে তাঁহারা শিক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু আরবেরা তাহাদিগের গ্রন্থে বলে, যে তাহারা উহা "হোকমা অল্‌হিন্দু" অর্থাৎ ভারতবর্ষের জ্ঞানীদিগের নিকট শিক্ষা করিয়াছে। যে ভারতবর্ষে কপিল, কণাদ, গৌতম, ব্যাস প্রভৃতিকে জন্ম দিয়াছে সে ভারতবর্ষ দর্শন বিষয়ে ব্যুৎপত্তিজন্য কি গৌরব করিতে পারে না? গ্রীক-দর্শন ভারতবর্ষের দর্শনের প্রতিবিম্বমাত্র এবং জর্মন-দর্শন প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্বমাত্র। পিথ্যাগোর‍্যাস, পিরো, ওনেসিক্রিটস্ প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকেরা যে ভারতবর্ষ অবধি ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেকে মনে করেন যে ভারতবর্ষীয়দিগের পুরাণ ও কর্ম্মকাণ্ড অতি হেয় পদার্থ, কিন্তু লণ্ডন নগরস্থ প্রুশিয়ার ভূতপূর্ব্ব রাজদূত বিখ্যাত সিবালিয়র বুন্সেন মহোদয় ভারতবর্ষীয়দিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "The deepest thoughts can be dug out from their ritual and mythology" "তাঁহাদিগের কর্ম্মকাণ্ড ও পুরাণরূপ খণি হইতে গভীরতম তত্ত্ব সকল উদ্ধৃত হইতেপারেঃ।" চিকিৎসাবিদ্যা ইওরোপীয়েরা আরবদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছে, কিন্তু আরবেরা ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতে তাহা শিক্ষা করিয়াছিল ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত যায়; এমন কি, হরীতকী ত্রিফলা প্রভৃতি ভৈষজ্য দ্রব্যের নাম পর্য্যন্ত আরবি গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জলচিকিৎসার বিষয় প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা যে একেবারে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিলেন না তাহা- ঋগ্বেদের এক মন্ত্র হইতে জানা যাইতেছে। "অপ্স্বন্তরমৃতং অপ্সু-ভেষজং আপোমানো প্রশস্তয়ে" "জলেই অমৃত, জলেই ঔষধ, জলই আমাদিগের পক্ষে প্রশস্ত।" তাঁহারা হমিওপ্যাথি অর্থাৎ সমে-সম-বিধায়ক চিকিৎসাপ্রণালী কিয়ৎ পরিমাণে অবগত ছিলেন তাহারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। "বিষস্য বিষমৌষধং" এই বাক্য তাহার প্রমাণ প্রদান করিতেছে। আমরা এই বাক্যটি একটি ইংরাজি হমিওপেথী গ্রন্থে উদ্ধৃত হইতে দেখিয়াছি।

* Chips from a German Workshop vol iii p-482. Letter of Bunsen to Max Muller.

প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা যে কেবল বিদ্বান ছিলেন এমৎ নহে তাঁহারা পরম সাহসিক যোদ্ধা ও নাবিক ছিলেন। যুদ্ধে তাঁহাদিগের অসামান্য সাহস বিষয়ে সংস্কৃত গ্রন্থ ব্যতীত গ্রীক প্রভৃতি ভিন্ন দেশীয়দিগের গ্রন্থ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা অনেক দেশও জয় করিয়াছিলেন। রঘুবংশে উল্লেখ আছে যে, রঘু রাজা পারস্য দেশ জয় করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য তুরস্ক (তুর্কেস্তান), ব্যাহ্লীক, (বাল্‌খ) ভুখ্‌খারা (বোখারা) প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিলেন। এক সময়ে ভারতবর্ষের অর্ণবপোত সকল নানা দেশে গমন করিত। এ বিষয়ে আমরা এই প্রস্তাবে কিঞ্চিৎ বিশেষ রূপে বলিতে অভিলাষ করি। সুমাত্রা, জাবা, বালী, সকোট্রা (সুখতর) প্রভৃতি উপদ্বীপ হিন্দু-উপনিবেশ। বালীতে এখনও সহমরণাদি সামাজিক প্রথা, রামায়ণ মহাভারতাদি কাব্য, এমন কি সংস্কৃত ছন্দ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। এক্ষণে যেমন ইংলণ্ডের লোকেরা সকল দেশে ধর্ম্ম ও সভ্যতা বিস্তার করিতেছেন তেমনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের সময় ভারতবর্ষের লোকেরা সমস্ত এশিয়া খণ্ডে, এমন কি, ইওরোপ ও আমেরিকা পর্য্যন্ত অধিকতর সফল-প্রযত্নতার সহিত ধর্ম্ম ও সভ্যতা প্রচার করিয়াছিলেন। সিংহলের মহাবংশ নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে বঙ্গরাজকুমার বিজয় সিংহ পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়াতে পঞ্চশত সহচর সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন। অর্ণবপোত জলে মগ্ন হওয়াতে তাঁহারা সিংহল-উপকূলে সমুদ্রতরঙ্গ দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তথাকার আদিম নিবাসীদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া তথায় রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। বিজয়ের বংশাবলী ঐ উপদ্বীপের ইংরাজাধিকার পর্য্যন্ত তথায় রাজত্ব করিয়াছিল। তাঁহার বংশীয় উপাধি "সিংহ" হইতে ঐ দ্বীপের বর্ত্তমান নাম সমুদ্ভূত হইয়াছে। তিনি যখন সমুদ্র-তরঙ্গ দ্বারা সিংহলের উপকূলে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন তখন উপকূলের তাম্রবর্ণ বালুকার উপর তাঁহার হস্ত স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া, সেই অবধি ঐ দ্বীপের অন্যতর নাম "তাম্রপাণি" হইল। এই "তাম্রপাণি" শব্দ হইতে রোমকদিগের "ট্যাপ্রোবেন্" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। সিংহলের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর সর ইমর্সণ টেনেণ্ট তাঁহার প্রণীত সিংহল-বিবরণে ঐ উপদ্বীপের বাঙ্গালীবিজেতাদিগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ফাহিয়ান নামক চীন দেশীয় পর্য্যটক তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে তাম্রলিপ্ত অর্থাৎ তমলুক একটি বন্দর ও হিন্দু বিশেষতঃ বাঙ্গালী নাবিকদিগের অর্ণব পোতারোহণের একটি প্রধান স্থান ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা যে কেবল এশিয়া খণ্ডের সকল স্থানে গমনাগমন করিতেন এমন নহে, তাঁহারা এফ্রিকা, ইওরোপ এমন কি আমেরিকা পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতেন তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাপ্তেন স্পীক্, যিনি নীল নদীর উৎপত্তিস্থান আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তিনি তাঁহার ভ্রমণের প্রাত্যহিক বিবরণে লিখিয়াছেন যে পদ্মপুরাণে উল্লিখিত কালী নদী, যাহার সহিত এশিয়াটিক রিসার্চ্চ গ্রন্থে কর্ণেল উই-

লফোর্ড সাহেব নীল নদীর একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহার উৎপত্তির স্থানের যেরূপ বিবরণ উল্লিখিত পুরাণে আছে তাহার সহিত নীল নদীর উৎপত্তি স্থানের বিলক্ষণ একতা আছে। প্রাচীন মিসর দেশের ধর্ম্মের সহিত ভারতবর্ষের পৌরাণিক ধর্ম্মের যেরূপ ঐক্য তাহাতে প্রতীতি হইতেছে যে, মিসর দেশে হিন্দুজাতির গমনাগমন ছিল। উল্লিখিত ঐক্য এরূপ নিকটতর যে নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময় যে সকল সিপাহী এতদ্দেশ হইতে মিসরে প্রেরিত হইয়াছিল তাহারা তথাকার প্রাচীন মন্দিরের দেবদেবী সকল আপনাদিগের দেশের দেবদেবী মনে করিয়া তাহাদিগকে পূজা করিয়াছিল। নোনস নামক মিসরদেশজাত গ্রীক কবি বলিয়াছেন যে, খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে হিন্দুপোত সকল মিসরে ও অন্যান্য দেশে বাণিজ্যার্থ গমন করিত। এখনও গুর্জ্জর প্রদেশের হিন্দুবণিকেরা এফ্রিকার পূর্ব্বভাগে সংস্থিত জাঞ্জিবার প্রভৃতি নগরে বাণিজ্যার্থ গমন করিয়া থাকে। রোমক প্রাকৃতিকইতিবৃত্তবেত্তা প্লিনি বলেন যে, খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভের ষাইট বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি হিন্দুনাবিকের জাহাজ জলমগ্ন হওয়াতে তাহারা জর্ম্মেনীর উপকূলে আসিয়া উঠে। তাহারা তথা হইতে সেই দেশের এক জন রাজা কর্ত্তৃক গল অর্থাৎ ফ্রান্সের মিটেলস নামক রোমান শাসন কর্ত্তার নিকট প্রেরিত হয়। তিনি তথা হইতে তাহাদিগকে রোম মহানগরে প্রেরণ করেন। ইহা অতি আশ্চর্য্য কথা। এই সকল পরম উদ্যমশীল সাহসিক হিন্দুনাবিক জর্মেন সাগরে কি প্রকারে উপনীত হইয়াছিল? তাহারা কি উত্তমাশা অন্তরীপ এবং আটলাণ্টিক মহাসাগর দিয়া অথবা ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসমুদ্র ও উত্তর মহাসমুদ্র দিয়া তথায় উপনীত হইয়াছিল? যাহা হউক, ইহারা কলম্বস অথবা বাসকোডিগামাকে জিতিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমাণ করিয়াছেন যে, এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম নরওয়ে দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে, এক সময়ে ইউরোপে রুদ্রের উপাসনা প্রচলিত ছিল। রটলেণ্ড, রটারডেম, র‍্যাটিস্বন প্রভৃতি নগরের নাম তাহার প্রমাণস্বরূপ। স্কটলেণ্ডের হাইলেণ্ড প্রদেশ যখন অসভ্য অবস্থায় অবস্থাপিত ছিল তখন তথায় ব্যালট্যান্ নামক এক ক্রিয়া প্রচলিত ছিল। যাহারা ঐ ক্রিয়া করিত তাহারা একটি অগ্নিকুণ্ড করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নির উপর নবনীত ও গোধূম প্রভৃতি শস্য নিক্ষেপ পূর্ব্বক "আমাকে অশ্ব দেও, আমাকে ধন দেও" ইত্যাদি প্রার্থনা করিত। এই ক্রিয়া অবিকল ঋগ্বেদোক্ত হোম। ইহাতে প্রতীতি হইতেছে যে, ঋগ্বেদের ধর্ম্ম তথায় এক সময়ে প্রচলিত ছিল। প্রায় দুই বৎসর হইল ম্যাক্‌মিলন্স ম্যাগ্যাজীন নামক ইংলণ্ডের সাময়িক পত্রিকায় "শিরুদেশের আর্য্যগণ" এই শিরস্ক একটী প্রস্তাব প্রকাশিত হয়; সেই প্রস্তাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা এমেরিকার অন্তর্বর্ত্তী পিরু দেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি অনরেবল্ পীবেল্‌স নামক ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স দেশের এক জন অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মধ্য আমেরিকায় ভ্রমণ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, অতি প্রাচীন কালে তথায় ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের গমনাগমন ছিল। সম্প্রতি একটী চীন গ্রন্থে দৃষ্ট হইয়াছে যে, কতকগুলি বৌদ্ধ প্রচারক আমেরিকায় গমন করিয়াছিল।

যখন আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষকে স্মরণ করি তখন মনশ্চক্ষে দেখিতে পাই যে, ভারত পার্থিব সকল পদার্থ অপেক্ষা মূল্যবান স্বাধীনতাসুখ উপভোগ করিতেছেন, তাঁহার বক্ষ স্ফীত

মহান্ জনপদ সকল ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাঁহার অর্ণবপোত সকল ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমন করিতেছে, সেই সকল দেশ হইতে রাজদূত এখানকার চক্রবর্ত্তী রাজাদিগের নিকট উপঢৌকনসমেত আসিতেছে, তথাকার জ্ঞানপিপাসু লোকেরা সেই জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য এখানকার জ্ঞানী লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে আগমন করিতেছেন, পর্য্যটকেরা ভারতে আসিয়া প্রত্যাগমনকালে ভারতবর্ষীয়দিগের জ্ঞান, সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মপরায়ণতার কথা স্বদেশে প্রচার করিতেছে, ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের মহিমা পৃথিবীর সকল স্থানে কীর্ত্তিত হইতেছে এবং ব্রাহ্মণদিগের প্রতিষ্ঠা সর্ব্বত্র উদ্ঘোষিত হইতেছে। হে ভারতমাতা! তুমি এক সময়ে পৃথিবীস্থ সকল জাতির পরম পূজনীয়া ও সর্ব্বাদৃতা ছিলে, তুমি এক সময়ে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আধার, ধর্ম্ম ও সভ্যতার আকর ছিলে, এক সময়ে পৃথিবীস্থ সকল জাতিরা জ্ঞানালোক লাভ জন্য তোমার মুখের পানে চাহিয়া দেখিত, এক সময়ে তোমার অর্ণবপোত সকল পৃথিবীর দূরস্থ প্রদেশ সকলে গমনাগমন করিত, এক সময়ে তোমার অক্ষৌহিণী সকল দুস্তর পর্ব্বত ও অরণ্য অতিক্রম করিয়া তুরস্ক ও তাতার, ব্যাহ্লীক ও পারস্য জয় করিয়াছিল, কিন্তু স্থানেশ্বরের যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার মহিমাসূর্য্য একেবারে অস্তমিত হইয়াছে, তুমি এক্ষণে দীন হীন মলিন বেশে বিজাতীয়দিগের পদসেবা করিতেছ। মা! তুমি কি চিরকাল এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ থাকিবে? তোমার দুরবস্থার কি কখন মোচন হইবে না? মন বলিয়া দিতেছে যে, এক সময়ে তোমার সন্তানদিগের বীরভাব অবশ্য জাগ্রত হইবে, এক সময় তোমার দুরবস্থার অবশ্য মোচন হইবে।

"বীরযোনি এই ভূমি, বীরের জননী,
অধীনতা আনিল রজনী;
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির?
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি।"

হে পাঠকবর্গ! ভারতবর্ষের প্রাচীন মহিমা আলোচনা করিতে বিলক্ষন সুখ আছে বটে, কিন্তু কোন্ কালে আমরা ঘৃত ভক্ষণ করিয়াছি, এক্ষণে সর্ব্বদা হস্ত আঘ্রাণ করিলে কি হইবে? এক্ষণে কাজ চাই। আপনাদিগের মধ্যে যদি কেহ কোন জাহাজে নাবিকের কার্য্যের এপ্রেন্টিস্ হইতে পারেন তবে জানিলাম কিছু কাজ হইল। যদি আপনাদিগের মধ্যে কেহ লণ্ডনে গিয়া তথায় বাণিজ্যের কুটি সংস্থাপন করিতে পারেন তবে জানিলাম কিছু কাজ হইল। যদি আপনাদিগের মধ্যে কেহ ফরাশ অথবা রুশসৈন্যে সেনানায়কপদে আপনাকে অধিষ্ঠিত করিতে পারেন তবে জানিলাম কিছু কাজ হইল। যদি আপনাদিগের মধ্যে কেহ ভারতবর্ষের ঘোর বিজন প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া চার অথবা তুলার চাস করিতে পারেন তাহা হইলে জানিলাম কিছু কাজ হইল। কেবল সভা আর বক্তৃতা করিলে কি হইবে? ইংরাজ সওদাগরেরা স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষে এক টুপি ও এক বেত্রদণ্ড মাত্র লইয়া আইসে এবং এখানে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করে, আর আমরা ভারতের ঔরসজাত সন্তান হইয়া তাহাদিগের কার্য্য দর্শন পূর্ব্বক কেবল স্তম্ভিতভাবে বসিয়া থাকি? কি দুঃখের বিষয়! আমরা কি কেবল আফিসে ইংরাজ-প্রভুর পদাঘাত সহ্য করিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি*? সর্ব্বাপেক্ষা

* আমাদিগের দেশের কৃতবিদ্য লোকের দুইটি শীক বণিকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। ইহাঁরা রুশ সাম্রাজ্যের রাজধানী সেণ্টপিটর্‌সবুর্গে বাণিজ্যার্থে অবস্থিতি করিয়া তথায় প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া-

আপনাদিগের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপিত হওয়া কর্ত্তব্য। ঐক্যই সকল উন্নতির মূল। এক্ষণে আপনারা ছিন্নভিন্ন হীনবল আছেন, ঐক্যেতে বল প্রাপ্ত হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আমরা ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা আপনাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্তাব সমাপন করিতেছি—

"সাম্ গচ্ছধ্বং সাম্ বদধ্বং সাম্ বঃ মনাংসি জানতাম্।
সমানি বঃ আকূতি সমানা হৃদয়ানি বা।
সমানম্ অস্তু বঃ মনঃ যথা বঃ সুসহ অসতি॥"

"একত্রে আগমন কর, একত্রে কথা কহ; তোমাদিগের চিত্ত সমান হউক। তোমাদিগের চেষ্টা এক হউক; তোমাদিগের হৃদয় এক হউক, তোমাদিগের মন এক হউক; তাহা হইলে মঙ্গল তোমাদিগের সহগামী হইবে।"

স্বদেশীয় ভাষানুশীলন।

জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির প্রতি জাতীয় উন্নতি বিলক্ষণ নির্ভর করে। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন আবার জাতীয় ভাষার অনুশীলন ব্যতীত কখনই সম্পাদিত হইতে পারে না। স্বদেশীয় ভাষানুশীলন সম্বন্ধে আমরা অনেক দিন হইল এই পত্রিকায় উল্লিখিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। তখন আমাদিগের লেখা দ্বারা কিঞ্চিৎ উপকারও সাধিত হইয়াছিল। বাঙ্গলা ভাষার প্রতি যাঁহাদিগের অনাদর ছিল, ঐ প্রস্তাব প্রকাশ করিবার পর তাহার প্রতি তাঁহাদিগের অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে দেখা গিয়াছিল। বঙ্গভাষার বর্ত্তমান উন্নতি অনেক পরিমাণে সেই অনুরাগ বর্দ্ধনের ফল। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যের যে প্রকার উন্নতি আমরা প্রত্যাশা করি তাহা এখনও হইয়া উঠে নাই। এখনও কেবল বাঙ্গালীর পাঠের নিমিত্ত ইংরাজীতে প্রবন্ধ লেখা বিশেষতঃ কেবল বাঙ্গালীর সভাতে ইংরাজীতে বক্তৃতা করার প্রতি লোকের বিলক্ষণ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। এখনও আমরা দেখিতেছি যে, আমাদিগের সেই পূর্ব্বকার কথা অনেক পরিমাণে খাটে, অতএব আমরা স্বদেশস্থ লোকের পুনঃস্মরণার্থ আমাদিগের পূর্ব্বের কথা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। কাব্যকার সম্বন্ধে আমরা ইহাতে যাহা বলিয়াছি বক্তা সম্বন্ধেও তাহা খাটে।

"যদবধি কোন দেশে বিদেশীয় ভাষার চালনা প্রবল থাকে সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ কাব্যকার উদিত হয়েন না, আর সেই দেশে জাতীয় ভাষার অনুশীলন যত বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই প্রসিদ্ধ কাব্যকার সকল উদিত হইতে থাকেন। দেশীয় ভাষার অনুশীলন প্রবল হইলে প্রসিদ্ধ কাব্যকার সেই দেশে এই দুই কারণ বশত উদিত হয়। প্রথম কারণ মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের ন্যায়; মাতৃদুগ্ধ যেরূপ বালকের তৃপ্তিজনক ও তদ্দ্বারা তাহার যেরূপ বলাধান হয়, পশুদুগ্ধে সেরূপ হয় না, তেমনি মাতৃভাষার প্রেমার্দ্র আশ্রয়ে মনের ভাব সকল অনায়াসে তৃপ্তির সহিত যেমন ব্যক্ত হইতে পারে, তেমন অন্য কোন ভাষার আশ্রয়ে হইতে পারে না। বিদেশীয় ভাষাতে কোন ব্যক্তি অত্যন্ত পারগ হউক না কেন, তথাপি জাতীয় ভাষাতে তদ্রূপ পারগতা উপার্জ্জন করা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসসাধ্য, সেই পারগতা থাকিলে আত্মভাষাতে কাব্যরচনা পরভাষাতে কাব্যরচনা অপেক্ষা অনেক সহজ বোধ হয় তাহার সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় কারণ, কোন দেশে বিদেশীয় ভাষার চালনা অত্যন্ত প্রবল হইলে, যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি অনেক ব্যয় স্বীকার করিয়া অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত যত্নের সহিত সেই ভাষার আলোচনা করেন, কেবল তাঁহারাই অনেক পরিমাণে সেই ভাষার, নিগূঢ় প্রকৃতি ও তাহার প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক প্রয়োগ কোন্ বিশেষ অর্থবোধক ও কোন্ স্থলে ব্যবহারযোগ্য তাহা অবগত হইয়া সেই ভাষাতে প্রস্তাব রচনায় পটু হইতে পারেন, আর অবশিষ্ট লোক সেই ভাষানুশীলনে তত ব্যয় স্বীকার ও তত যত্ন ও মনোযোগ প্রদান করিতে পারে না, সুতরাং সেই ভাষাতে তাহাদিগের সেরূপ অভিজ্ঞতা জন্মে না। অতএব দৃষ্ট হইতেছে যে, যে দেশে বিদেশীয় ভাষার অনুশীলন প্রবল, সেই দেশে সেই বিদেশীয় ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন লোক অল্পসংখ্যক ও তাহাতে অল্পব্যুৎপন্ন লোক বহুসংখ্যক, অল্পসংখ্যক লোক অপেক্ষা বহুসংখ্যক লোকের মধ্যে সংখ্যানুসারে স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি থাকিবার অধিক সম্ভাবনা, কিন্তু উক্ত বিদেশীয় ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি-অভাবে ও স্বদেশীয় ভাষার অসম্পূর্ণ অবস্থা হেতু তাঁহাদিগের সেই শক্তি স্ফূর্ত্তি পায় না। এই দুই কারণ বশত ইহা কখন দৃষ্ট হয় নাই, যে, যে ভাষা আমরা কখন্ শিক্ষা করিয়াছি তাহা আমাদিগের স্মরণ হয় না, যাহা শিখিবার জন্য তাহার ব্যাকরণ, অভ্যাস করিবার আবশ্যক হয় নাই, সেই আত্মভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষাতে কেহ কখন কোন সমীচীন কাব্য লিখিতে সমর্থ হইয়াছেন। দেখ, রোমানেরা পৃথিবীর অনেক অনেক দেশ জয় করিয়াছিল, কিন্তু ইটালী দেশ, যাহার প্রচলিত ভাষা তখন রোমান অর্থাৎ লাটিন ভাষা ছিল, সেই দেশের লোক ব্যতীত অন্য দেশের লোক ঐ ভাষাতে প্রসিদ্ধ কাব্যকাররূপে বিখ্যাত হইতে পারেন নাই। বর্জ্জিল ও অবিড, হোরেস ও সিসিরো, লুক্রিষস্ ও কেটলস্ সকলেই ইটালীদেশজাত। যে পর্য্যন্ত ইউরোপখণ্ডস্থ ইটালী, ফ্রান্স ও স্পেন নামক দেশ সকলে লাটিন ভাষার অনুশীলন অত্যন্ত প্রবল ছিল সে পর্য্যন্ত ঐ সকল দেশে কোন বিখ্যাত কাব্যকার উদিত হয়েন নাই, তৎপরে যখন ঐ সকল দেশের মধ্যে প্রত্যেক দেশে তদ্দেশীয় প্রচলিত ভাষার অনুশীলন প্রবল হইয়া উঠিল তখন দান্তে ও ট্যাসো, কর্ণিল ও রেসীন কেলডিরোঁ ও লোপডিবেগা ইত্যাদি চিত্তের উন্নতিকর ও বিনোদকর কবিশ্রেষ্ঠ সকল উদিত হইতে লাগিলেন। যদবধি ইংলণ্ড দেশে নরমেন ফ্রেঞ্চ ভাষা কিম্বা জরমেনি দেশে ফেঞ্চ ভাষার অনুশীলন প্রবল ছিল তদবধি কোন সুপ্রসিদ্ধ কাব্যকার ঐ সকল দেশে উদিত হয়েন নাই, তৎপরে ঐ দেশদ্বয়ে প্রচলিত ভাষার আলোচনা যখন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন প্রকাণ্ড মানসিক বীর্য্যবান শেক্সপিয়র ও মিল্টন, গেটী ও শিলর, ক্লপষ্টক ও ফ্রিলিগ্রাথ আপনাদিগের নিজ নিজ প্রকাশিত কাব্য দ্বারা মর্ত্ত্যলোককে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। এশিয়া খণ্ডে দেখ, যদবধি পারস্য দেশে আরবী ভাষার অলোচনার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল, তদবধি কোন প্রসিদ্ধ কাব্যকার তথায় উদিত হয়েন নাই, তৎপরে যখন দেশীয় ভাষার অনুশীলন বৃদ্ধি হইতে লাগিল তখন ফরদোসি দ্বারা ইরানের প্রাচীন রাজাদিগের বৃত্তান্ত-পূরিত বীররসপ্রধান প্রধান প্রধান কাব্য মধ্যে পরিগণিত সাহনামা নামক মহাকাব্য বিরচিত হইল, তখন সাদি তাঁহার মধুররসস্ফীত সরলপ্রবন্ধ উপদেশগ্রন্থের সহিত উদিত হইলেন, তখন হাফেজ চিত্তপ্রমোদকর পরম রমণীয় পরমার্থরসপূর্ণ গাথাবলী প্রচার করিলেন ও জেলালউদ্দীন রুমি বিবিধ প্রসঙ্গগর্ভ মসনবী নামক পরমোৎকৃষ্ট আশ্চর্য্য কাব্য প্রকাশ করিলেন। দৃষ্ট হইতেছে যে, কোন দেশে পরকীয় ভাষার অনুশীলনের

ছিলেন। তথায় তাঁহাদিগের মৃত্যু হইলে রুশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের বিপুল সম্পত্তির কোন উত্তরাধিকারী আছে কি না এখানকার ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

প্রবলতার সময়ে যে কিছু হৃদয়স্ফূর্ত্ত প্রকৃত কবিতা প্রচারিত হয়, তাহা বিদেশীয় ভাষায় না হইয়া দেশীয় অসম্পূর্ণ অসংস্কৃত প্রচলিত ভাষাতেই হইয়া থাকে। যখন ফ্রান্স ও জরমেনি দেশে লাটিন ভাষার অনুশীলন অত্যন্ত প্রবল ছিল তখন অমৃতোপম হৃদয়স্ফূর্ত্ত কবিতা পুরকীয় ভাষার দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ সহৃদয়তাশূন্য কবিদিগের মানসক্ষেত্রে 'পরিত্যাগ পূর্ব্বক ট্রুবাডর ও সিনিসিঙ্গর নামক দরিদ্র পরিব্রাজক গায়কদিগের হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া সারল্যসুধাসিক্ত বাক্য দ্বারা প্রকৃতির অকপট পুত্র ইতর লোকদিগের মনোমোহন করিয়াছিলেন। আমাদিগের এই বঙ্গভূমিতে এক্ষণকার ইংরাজীতে কৃতবিদ্য যুবকদিগের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজী ভাষাতে প্রসিদ্ধ কাব্যকাররূপে গণ্য হইবার অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের ভ্রান্তির আর সীমা নাই। তাঁহারা যাহা কখন হয় নাই, যাহা হইবার নহে, তাহা সাধন করিতে যত্নবান হইয়াছেন। বিপুলকীর্ত্তিমান মহারাজ ফ্রেডরিকের দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগের স্মরণ করা উচিত। ঐ যশস্বী ভূপতি বাল্যকালাবধি ফ্রেঞ্চ ভাষা অধ্যয়ন করিয়া ঐ ভাষাতে অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ফ্রান্স দেশীয় লোকদিগের সহিত বাক্যালাপে দিবাভাগের অনেক সময় ক্ষেপণ করিতেন, নিজে ঐ ভাষায় ক্ষমতাসূচক অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তথাচ তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থে ঐ ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ প্রয়োগ ধৃত করিয়া সূক্ষ্মকাব্যবিবেকশক্তিসম্পন্ন পারীস নগরের পৌরজনেরা হাস্য করিত। তাঁহা দ্বারা নিজ সভায় আহত বল্টেয়র নামক ফ্রান্স দেশীয় মহাপণ্ডিতের নিকট যখন তিনি আপনার রচিত প্রস্তাব সকল সংশোধন জন্য প্রেরণ করিতেন তখন বল্টেয়ার কহিতেন, "রাজা কতকগুলিন মলিন বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।" ঐ সকল যুবকেরা যদ্যপি এই কথা বলেন যে, বাঙ্গলা ভাষা অতি অসম্পন্ন হীন ভাষা, তাহাতে গ্রন্থরচনা করা দুঃসাধ্য, কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, সিসিরোর সময়ের লাটিন ভাষার ন্যায় কিম্বা লেসিঙ্গের সময়ের জরমেন ভাষার ন্যায় কি আমাদিগের বাঙ্গলা ভাষা অসম্পন্ন? আপনাদিগের নিজ নিজ দেশীয় ভাষা উন্নত করিয়া ঐ দুই মহাত্মা কি পর্য্যন্ত না যশস্বী হইয়াছেন? যদ্যপি আমাদিগের আত্মভাষার উন্নতি সাধনে আমরা যত্নবান হই তবে ঐরূপ যশস্বী আমরাও হইতে পারি। আহা! বাঙ্গলা ভাষার দুরবস্থা দেখিয়া তাহার প্রতি উল্লিখিত যুবকদিগের হৃদয়ে কি কিছুমাত্র কারুণ্য সঞ্চার হয় না? তাঁহারা কেমন হৃদয় ধারণ করেন তাঁহারাই জানেন*।"

ঐ সকল কথা কাব্যকারসম্বন্ধে যেমন খাটে বক্তাসম্বন্ধে তেমনি খাটে। আমাদিগের মধ্যে এক্ষণে কতকগুলি ইংরাজী সদ্বক্তা উদিত হইয়াছেন, যাঁহারা অতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র, কিন্তু তাঁহাদিগকে আমরা অনুরোধ করিতেছি যে, ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিবার রীতি তাঁহারা পরিত্যাগ করুন। তাঁহারা যদি বাঙ্গলা ভাষায় বক্তৃতা না করেন তাহা হইলে বাঙ্গলা ভাষা কি প্রকারে আরো সুসম্পন্ন হইবে এবং কি প্রকারে বাঙ্গলা বক্তৃতার বা উন্নতি সাধন হইবে? তাঁহারা যাহা বলেন তদ্দ্বারা অধিকাংশ লোকের উপকার হয় না, যেহেতু অধিকাংশ লোক ইংরাজী বুঝে না। আমাদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট কবি ও উপন্যাসরচয়িতা উদিত হইতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ধর্ম্মবিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ে তেমন বক্তা উদিত হইতেছেন না।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৭ কার্ত্তিক রবিবার প্রাতে বেলা ৭॥ ঘণ্টার সময় মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক মঙ্গলবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়োবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা ৭ সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

উল্লিখিত উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানপ্রচার উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মসংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তক অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

শ্রী জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ, ১৭৭৮ শক।

Registered- No 52:

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবমং কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
অগ্রহায়ণ ১৭৯৮ শক

৪০০ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৭

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞাননন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

মোহ।

এক দিক হইতে দেখিতে গেলে, জগতের কোন পদার্থই অনুরাগের উপযুক্ত নহে, যেহেতু জগতের সকল পদার্থই অনিত্য ও অসার। পার্থিব ধন কাহারও সঙ্গে যায় না। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা সকল চাকচিক্যযুক্ত বালুকারাশি মাত্র। যৌবন অনুরাগের উপযুক্ত বিষয় নহে, যেহেতু যৌবন অস্থায়ী। যিনি বৃদ্ধ মনুষ্যের কদাকার লোল চর্ম্ম, গলিত কপোল-কণ্ঠ, দুর্নিবার কফ-কাশ, হস্তপদশিরঃকম্প এবং ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তি চিন্তাশীল চিত্তে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার যৌবনজনিত মত্ততা অন্তর্হিত হয়। সৌন্দর্য্য অনুরাগের উপযুক্ত বিষয় নহে, যেহেতু তাহা ঘৃণিত মাংস চর্ম্ম রক্তের কার্য্য মাত্র। খ্যাতি প্রতিপত্তি অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ, যেহেতু মৃত্যুর পর আমরা খ্যাতি-রব আর শুনিতে আসিব না। স্ত্রীপুত্র পরিবার আমাদিগের অনুরাগের উপযুক্ত বিষয় নহে। কি ধূলিসমষ্টি আমরা ভাল বাসি যখন আমরা মনুষ্যকে ভাল বাসি?

নীরস জ্ঞানের চক্ষে দেখিতে গেলে, পার্থিব কোন পদার্থই অনুরাগের বিষয় নহে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, ঈশ্বর আমাদিগের হৃদয়ে পার্থিব পদার্থের প্রতি অনুরাগ গাঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন এবং সেই অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে সুখ সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার স্পষ্ট আদেশ অনুভূত হইতেছে যে, আমরা পার্থিব পদার্থের প্রতি অনুরাগ করিব এবং তজ্জনিত সুখ সম্ভোগ করিব। স্নেহ, প্রীতি, মমতা প্রভৃতি কোমল বৃত্তি সকল তিনি মঙ্গলাভিপ্রায়েই আমাদিগের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। পার্থিব পদার্থের প্রতি অনুরাগ করিলে কোন দোষ নাই, কিন্তু সেই অনুরাগ যখন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে বাধা প্রদান করে তখনই তাহা দোষাবহ হইয়া উঠে এবং মোহ নামে খ্যাত হয়। যখন ধর্ম্ম ও বিষয় এই দুয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় তখন যদি আমরা ধর্ম্মের অনুরোধে বিষয় পরিত্যাগ না করি তখন তাহা মোহের কার্য্য হয়। যখন আমোদের প্রতি অনুরাগ কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি ব্যাঘাত প্রদান করে তখন তাহাকে মোহ বলা যায়। তখন সে আমোদকে নির্দ্দোষ আমোদ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। ঈশ্বর আমাদিগের মনে যশঃস্পৃহা

মঙ্গলাভিপ্রায়েই মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। বিহিত উপায় দ্বারা সেই যশঃস্পৃহা চরিতার্থ করিলে তাহা দোষাবহ হয় না। কিন্তু যখন আমরা সেই যশঃস্পৃহাকে বিগর্হিত উপায় দ্বারা চরিতার্থ করিতে যাই তখনই তাহা মোহের কার্য্য হইয়া উঠে। ঈশ্বর আমাদিগের মনে অর্থস্পৃহা মঙ্গলাভিপ্রায়ে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। ন্যায়ত সেই স্পৃহা চরিতার্থ করাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু অন্যায়ত চরিতার্থ করিতে গেলেই তাহা মোহের কার্য্য বলিয়া খ্যাত হয়। এক এক জন ব্যক্তি এরূপ মোহান্ধ যে, যে স্থানে সে অনেক দিন অবধি আছে কর্ত্তব্যানুরোধে সেই স্থান কিয়দ্দিবসের জন্য পরিত্যাগ করিতে হইলেও তাহা মহা বিপদ জ্ঞান করে। কিন্তু সে বিবেচনা করে না যে, এক সময়ে তাহাকে এই মর্ত্ত্যধাম একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবেক। কোন কোন ব্যক্তি এরূপ মোহাসক্ত যে, কর্ত্তব্যানুরোধে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ পরিত্যাগ করিতে হইলে তাহাদিগের পক্ষে বিপদ উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহারা বিবেচনা করে না যে, তাহাকে এক সময়ে সমস্ত পার্থিব ধন একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। কেহ কেহ পুত্র-দারার প্রতি এরূপ মোহান্ধরূপে আসক্ত যে, তাহাদিগের অন্যায় প্রার্থনা পূরণ করিতে সঙ্কুচিত হয় না। কিন্তু তাহারা বিবেচনা করে না যে, তদ্দ্বারা তাহারা সেই প্রিয়তমা ভার্য্যার অথবা প্রিয়তম পুত্রের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের পথে কণ্টক স্থাপন করিতেছে। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে মোহকে ব্যাঘাত প্রদান করিতে দেওয়া কোন মতেই উচিত হয় না। যে ব্যক্তি মোহকে জয় করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত মনুষ্য।

যদি আমরা প্রকৃত শান্তির অভিলাষী হই তাহা হইলে মোহকে পরিত্যাগ করা আমাদের কর্ত্তব্য। যে চিত্তের চাঞ্চল্য ঈশ্বরকে দেখিতে দেয় না তাহা মোহ দ্বারা উৎপাদিত হয়।

মোহের অর্থ মত্ততা। যেমন লোকে মাদক দ্রব্য সেবন পূর্ব্বক মত্ত হইলে, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না তেমনি আমরা সাংসারিক মোহে মত্ত হইয়া, আমাদিগের প্রকৃত মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত করি না। আমরা সাংসারিক মোহে অন্ধ হইয়া, ঈশ্বর ও কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া থাকি। তাহাকেই প্রকৃত জ্ঞান বলা যায় যাহা সংসার ও ধর্ম্ম উভয়ের সামঞ্জস্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়। কেবল সংসার ও ধর্ম্মের উভয়ের সামঞ্জস্যকারী বিমল তত্ত্বজ্ঞান আমাদিগকে প্রকৃত শান্তি প্রদান করিয়া অমৃতত্বের উপযুক্ত করে; অন্য প্রকার জ্ঞান এরূপ করিতে সক্ষম হয় না। আপ্তকাম ঋষিরা এই জ্ঞানের আশ্রয়ে সত্যের পরম নিধান পরমেশ্বরকে লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

সাংখ্যদর্শন।

আত্মা।

মহর্ষি কপিল, পদার্থ-নির্ণয়ের মূল পত্তনকালে "কোনো পদার্থ প্রকৃতি [কারণ], কোনো পদার্থ বিকৃতি [কার্য্য], কোনো পদার্থ উভয়াত্মক [প্রকৃতিও বটে বিকৃতিও বটে] এবং কোনো পদার্থ অনুভয়রূপ অর্থাৎ প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে অবিকারী জ্ঞ-স্বরূপ" এইরূপ শ্রেণী বিভাগ করত কিয়দ্দূরে গিয়া প্রকৃতিকে অব্যক্ত, বিকৃতিকে ব্যক্ত, উভয়াত্মক পদার্থকে ব্যক্তাব্যক্ত এবং অনুভয়রূপ পদার্থকে 'জ্ঞ' সংজ্ঞা প্রদান করিয়া, পশ্চাৎ তাহাদের সংখ্যা, লক্ষণ ও পরীক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি বর্ণন করিয়াছেন। সে সমস্তই বলা হইয়াছে, কেবল অনুভয় অর্থাৎ জ্ঞ-স্বরূপ পদার্থ বলিতে অবশিষ্ট আছে। এই অনুভয়-রূপী পদার্থ জ্ঞ, পুরুষ ও আত্মা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে বিখ্যাত। এই আত্মা চর্ম্ম-চক্ষুর, অবিষয়, হস্ত-পদের অগ্রাহ্য ও মনের অগোচর বলিয়া চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিবিধ সম্প্রদায়ের নিকট বিবিধ রূপ প্রকাশ পাইতেছে। তন্মধ্যে সাংখ্য সম্প্রদায়ের সম্মত আত্মা কি ভাবে ও কি রূপে, তাহাই প্রকট করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

কপিল বলেন, "অস্তিহ্যাত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ" আত্মার নাস্তিত্ব-সাধক প্রমাণ নাই বলিয়া মনুষ্য আত্ম-নাস্তিক হইতে পারে না। "আমি আছি" "আমার অমুক" এই আত্মানুভাবক জ্ঞান প্রাণিমাত্রেই আছে। যাহার আত্মা আছে তাহারই ঐ জ্ঞান আছে, যাহার ঐ জ্ঞান আছে তাহারই আত্মা আছে। কোন জীবন্ত বা আত্মশালী ব্যক্তি 'আত্মা নাই' বলিয়া মস্তকোত্তোলন করিতে পারেন না, করেনও না। অতএব "আত্মা আছে" এ কথা বলা বাহুল্য এবং ইহা যে নির্ণেয় বা উপদেশ্য নহে, ইহা বলাও বাহুল্য।

তবে নির্ণেয় বা উপদেশ্য কি? যদি সকলকারই আত্মজ্ঞান থাকিল—তবে আর তাঁহার বক্তব্য কি? উপদেশ্য কি? মন্তব্যই বা কি?

"বিশেষানবধারণাত্তদ্বিশেষাববোধনমেব শাস্ত্রকৃত্যম্" আত্মা আছে সত্য বটে এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানও সকলকারই আছে সত্য, কিন্তু তাহার বিশেষাবধারণ নাই। ইন্দ্রিয় সকল বহির্মুখ-বৃত্তি বাহ্যাসক্ত-স্বভাব হওয়াতে সকলে তদ্বিষয়ে বঞ্চিত আছেন। অত্যন্ত সংযোগবলে লৌহ ও অগ্নি যেমন একীভূত হইয়া যায়, মনুষ্যও সেইরূপ ভ্রম বশত অতি সান্নিধ্য অনাত্ম পদার্থের সহিত একীভূত হইয়া 'আমি আমি' করিয়া ঘূর্ণমান হইতেছে। কখন অতি দূরস্থ অতি বহিঃস্থ মাংসপিণ্ডে আত্মাধ্যাস বা আত্মসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া 'আমার পুত্র' 'আমার কলত্র' বলিয়া ব্যাকুল;—কখন বা দেহস্থ ইন্দ্রিয়ের সহিত একাত্মভাবে অভিভূত হইয়া এই 'আমি অন্ধ' 'আমি বধির' বলিয়া দুঃখী;—কখন বা এই অন্নবিকার স্থূল দেহের উপর আত্মত্ব রক্ষা করিয়া 'আমি কৃশ' 'আমি স্থূল' 'আমি গেলাম' 'আমি মরিলাম' বলিয়া চীৎকার;—কখন বা ধনরত্নের উপর আত্মসম্বন্ধ বন্ধন করিয়া কাতর। যদি প্রকৃত আমি পরিচিত থাকিত, স্থির থাকিত,—তাহা হইলে কদাচ জীবের এত দুর্গতি হইত না। কেনই বা হইবে? বিবেচনা করিয়া দেখ, যদ্যপি কোন ইন্দ্রিয়কে 'আমি' বলিয়া স্থির থাকে, তাহা হইলে শরীরের দোষাদোষে 'আমি' লিপ্ত হইবে কেন?—অতএব 'আমি' জ্ঞানের অবলম্বন বা আশ্রয় অথবা উত্থান-স্থান যে আত্মা, তাহার কোন বিশেষ বিজ্ঞান নাই। যদি তাহা থাকিত—তাহা হইলে একটা অনুগত 'আমি' ব্যবহার থাকিত। যখন তাহা নাই' তখন মনুষ্য আপন আত্মাকে বিশেষ করিয়া জানে না। আমরা এই দণ্ডে যাহাকে 'আমি' বলিতেছি, হয় ত তিলার্দ্ধ পরে আবার তাহাকেই 'আমার' বলিব। অতএব মনুষ্যের আত্মবিজ্ঞান থাকিলেও তাহার বিশেষাবধারণ নাই। বিশেষাবধারণ না থাকাতে মনুষ্য কৃতার্থ হইতে পারে না। সেই কৃতার্থতা উৎপাদনের জন্য, আগন্তুক সুখ দুঃখ নিবারণের জন্য, করুণাধার মহর্ষিদিগের আত্মনির্ণয়ে প্রবৃত্তি।

আত্ম-বিবিদিষা উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব

কালের লোকেরা আপনা আপনি সিদ্ধান্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। যাঁহারা আত্মবিৎ বলিয়া খ্যাত ছিলেন, ধ্যাননিমীলিত নেত্রে দীর্ঘকালব্যাপী আত্মাভ্যাস করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। সেই সমস্ত যোগী ও ঋষি অন্বেষণ করিয়া তাঁহাদের নিকট উপনীত হইতেন। গুরুকুলে বাস, ব্রহ্মচর্য্য, প্রবল বিবিদিষা ও গুরুর উপদেশ-কৌশলে তাঁহারা আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিতেন। এক সময়ে এক আত্ম-জিজ্ঞাসু রাজা এক ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি নানা কৌশলে নানা প্রকার উপদেশ দিয়া পরিশেষে এই কথা বলিলেন,—

"ত্বংকিমেতচ্ছিরঃ কিন্তু শিরস্তব তথোদরম্।
কিমু পাদাদিকং ত্বং বৈ তবৈতদ্ধি মহীপতে!॥"

এই মস্তক কি তুমি? না তোমার মস্তক?—এই উদর কি তুমি? না তোমার উদর?—এই হস্ত, পাদ প্রভৃতি প্রত্যেক অবয়ব গুলি কি তুমি?—না এ সকল তোমার?—ঋষি এইরূপ জিজ্ঞাসার পর বলিলেন,—

"সমস্তাবয়বেভ্যস্ত্বং পৃথক্‌ভূয় ব্যবস্থিতঃ।
কোঽহমিত্যত্র নিপুণোভূত্বা চিন্তয় পার্থিব!॥"

দৃশ্যমান অবয়ব গুলি তুমি নহ—তুমি কেন উহাতে আত্ম-সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া ক্লেশ পাও; উহার কিছুই তুমি নহ। তুমি ও সকল হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তুমি কে? নিপুণ হইয়া চিন্তা কর—যোগ আশ্রয় কর—ইন্দ্রিয়ের বহির্গমন রোধ কর—বুদ্ধিকে অভ্যন্তরে অতি-অভ্যন্তরে নিবিষ্ট কর—দেখিতে পাইবে 'তুমি কে'। "গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে" অযোগী পুরুষের নিকট, অব্রহ্মচারী পুরুষের নিকট ও অবিবেকী পুরুষের নিকট ইনি প্রকাশ হন না। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" শাস্ত্র বা বাক্‌বৈদগ্ধ্য ইহাকে লাভ করিতে পারে না। "শরীর পরিকর্ত্তনৈঃ" শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া তন্মধ্যে অন্বেষণ করিলেও সর্ব্ব প্রকার বাহ্য উপায়ে ইহাঁকে পাওয়া যায় না, ইনি সর্ব্বপ্রকার বাহ্য উপায়ে দুর্লভ্য। আত্মবিৎ পণ্ডিতদিগের উক্তি এই যে, "দেহাদি ব্যতিরিক্তোঽসৌ—" [কপিল] হস্ত পদাদি অবয়ব সংঘটিত স্থূল দেহ, পঞ্চধা প্রাণ, একাদশ ইন্দ্রিয়, এমন কি মন বুদ্ধি অহঙ্কার হইতেও তিনি এক অতিরিক্ত বস্তু। এই অতিরিক্ত পদার্থের স্ফূর্ত্তি ভান, বা সাক্ষাৎকার হওয়ার উপায় ধ্যান। আর ধ্যানের উপআলম্বন আপ্তবাক্য [বিশ্বস্ত পুরুষের বাক্য বা সত্য বাক্য বেদবাক্য,] অনুকূল তর্ক বা বিচার তাহার বিঘ্ননিবারক। "ইদংতদিতি নির্দ্দেষ্টুং গুরুণাপি ন শক্যতে।" মনে করিবেন না যে, গুরু কাষ্ঠ লোষ্ট্রের ন্যায় 'এই আত্মা দেখ' বলিয়া অঙ্গুলি দিয়া দেখান। তবে কি না আত্মবিৎ গুরুর উপদেশ উপলক্ষ করিয়া, অনুকূল তর্ক দ্বারা তাহাকে দ্রষ্টীকৃত করিয়া, ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয়ান্তর হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া ধ্যাননিষ্ঠ হইতে পারিলেই উহার দর্শন পাওয়া যায়।

কপিল বলিলেন "দেহাদি-ব্যতিরিক্তোঽসৌ"—অর্থ এই যে, স্থূল শরীর, পঞ্চ প্রাণ, ইন্দ্রিয়শক্তি এবং মন, বুদ্ধি, ইহার কিছুই আত্মা নহে, আত্মা ইহাদের জীবন, ইহাদের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই বাক্যের কতক দূর অসংশয়িত বটে অর্থাৎ স্থূল শরীর, প্রাণ বায়ু, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, এ সকল আত্মা নহে ইহা ঠিক্ বটে কিন্তু মন যে আত্মা না, এই স্থানটিতে সংশয় আছে। 'মন-আত্মা' বাদী এক দল তার্কিক আছেন তাঁহারাই ঐ সংশয়ের বীজ। এজন্য যে রূপে মন আত্মা নহে, মন ও আত্মা, দুইটি ভিন্ন পদার্থ, তাহা প্রদর্শন করা উচিত হইতেছে। তাহাতে 'মন-আত্মা' বাদিগণের অভিপ্রায় এই,—

জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন প্রভৃতি যে কিছু চেতন-গুণ সে সমস্ত এবং সঙ্কল্প, বিকল্প ও, ব্যবধারণা প্রভৃতি যে কিছু চেতন-কার্য্য সে সমস্ত সমনস্ক পদার্থেই দৃষ্ট হয়, অন্যত্র হয় না। ইন্দ্রিয় সকল নির্ব্যাপার হইলেও প্রাণন-কার্য্য [শ্বাসোচ্ছ্বাস] স্থগিত হইলেও মনন-কার্য্য নিবৃত্ত হয় না। ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ার অসম্পৃক্ত দশায়ও মন স্বপ্ন, স্মৃতি ও অনুধ্যানাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু মন যদি প্রসুপ্ত হয়, বিলীন হয় বা ধ্বস্ত হয়, তবে কেহই কিছু করিতে পারে না; সমস্ত ব্যাপারই আশ্রয়রহিত হয়। যখন একমাত্র মনের প্রভাবেই জীব সব্যাপার—একমাত্র মনের অভাবেই নির্ব্যাপার, তখন মনই আত্মা এবং তাহা মস্তিষ্ক বা মস্তকঘৃতের শক্তিবিশেষ। আলোক পদার্থ যেমন আপনার সত্তাস্ফূর্ত্তি বজায় রাখিয়া অন্যের সত্তাস্ফূর্ত্তি উপলব্ধি করায়, মনও তেমনি আপনার সত্তা-স্ফূর্ত্তি স্থির রাখিয়া ইন্দ্রিয়াসক্ত বাহ্য পদার্থের সত্তা-সত্ত্ব, রূপ গুণ, কার্য্যাকার্য্য নির্দ্ধারণ করে। অনেকশক্তিমৎ মন বিশেষ বিশেষ শক্তি বা গুণের উপলক্ষ্যে বিশেষ বিশেষ আখ্যা প্রাপ্ত হন; —যথা মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, আত্মা ও অন্তঃকরণ প্রভৃতি। সংকল্পবিকল্পাত্মক শক্তি লইয়া মন, আর কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব শক্তি এবং আপনার সত্তাস্ফূর্ত্তি অটল রাখিবার শক্তি লইয়া আত্মা। অতএব মন ভিন্ন স্বতন্ত্র কর্ত্তা-ভোক্তা, চেতয়িতা আত্মা নাই। যাহার মস্তক আছে, মস্তিষ্ক আছে, তাহারই মন আছে ও আত্মা আছে। যাহার মস্তক নাই, মস্তিষ্ক নাই, তাহার মনও নাই আত্মাও নাই। বৃক্ষ-লতাদির মস্তক নাই, মস্তিষ্ক নাই, সুতরাং তাঁহাদের মন নাই, আত্মাও নাই। মনের গোলোক [আশ্রয়স্থান, যাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া কার্য্য করিবে] ও উপাদানের তারতম্য থাকাতে সকলের মন বা আত্মা সমান নহে। পশুপক্ষ্যাদির মানস-গোলোক ও উপাদান [যে যে পদার্থে মনের পূর্ণতা জন্মে] অপূর্ণ, এ জন্য উহাদের মন বা আত্মা অপূর্ণ বা নিকৃষ্ট। কীটপতঙ্গাদির তদপেক্ষা অপূর্ণ, সুতরাং তাহাদের আত্মাও তদনুরূপ! এই রূপ এমন সকল প্রাণি আছে যে, তাহাদের কোন জীবনী শক্তি মাত্র আছে, অন্য কিছু নাই, সুতরাং তাহাদের মন বা আত্মা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" এতদ্ভিন্ন আরও এক মত আছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, মন আত্মা নহে, মন জড় পদার্থ; জড় পদার্থ স্বয়ংপ্রেরিত হইতে পারে না, বিজ্ঞান নামক জগৎব্যাপী এক পদার্থ আছে তাহাই আত্মা এবং সেই পদার্থ মন প্রভৃতি তাবৎ ইন্দ্রিয়ের পরিচালক; তদ্দ্বারাই সমস্ত চেতন কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সে পদার্থ ভৌতিক অর্থাৎ সংহত ভূতজন্মা শক্তিবিশেষ *।

এইরূপে পুরাতন দার্শনিকেরা আত্মা-সম্বন্ধে বিবিধ মতের কথা উত্থাপন করিয়া তাহা অবৈদিক বলিয়া পরিত্যাগ এবং সাধ্যমত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন †।

* "অন্যোন্তরাত্মা মনোময়ঃ"—ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যা দেখ। "মনসি সুপ্তে প্রাণাদেরভাবাৎ—"অহং সঙ্কল্পবান্ অহং বিকল্পবান্ ইত্যাদ্যনুভবাচ্চমন এবাত্মা" "ইন্দ্রিয়াভাবেঽপি স্বপ্নস্মৃত্যোশ্চ দর্শনাৎ" ইত্যাদি নানা স্থানীয় মনআত্মবাদীর মতের উল্লেখ আছে এবং সেই সকলের ব্যাখ্যা-বাক্য দেখিলে লিখিত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইবে।

† এ জগতে চারি জাতি পরমাণু আর এক প্রকার পরিচালক পদার্থ আছে। তাহার দ্বারাই জগৎযন্ত্র চলিতেছে। সেই পরিচালক পদার্থ স্বতন্ত্র নহে, তাহা ঐ চারি প্রকার ভূতনিষ্ঠ। ভূত সকলের সংযোগ ও পরিণাম বা বিকারবিশেষে বিশেষ বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। সে পদার্থ কখন মেঘের জ্যোতিঃ, বিদ্যুৎ, বজ্রের আকার ধারণ করিতেছে। সেই পদার্থই তাপ, উষ্ম, বেগ ও বলরূপে প্রকাশ পাইতেছে। সেই পদার্থের বলই বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বতাদি স্থাবর জীবের

কারণ, পরমতের ভ্রমত্ব প্রদর্শন ব্যতিরেকে আপনার মত দৃঢ় স্থাপিত হইতে পারে না। মহর্ষি কপিলও আপনার চিদাত্মবাদ রক্ষা করিবার নিমিত্ত ঐ সকল মতের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। আমরা সে সকল যথাসাধ্য বর্ণন করিয়া পশ্চাৎ কপিলসম্মত আত্মার কথা বলিব।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

সুরাপান।

হিন্দুশাস্ত্রকারেরা সুরাপানের মহা অনিষ্টকর ফল প্রতীতি করিয়া উহা মহা পাতকের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। মুসলমান শাস্ত্রেও ঐরূপ নিষেধ-বাক্য আছে। এই জন্য এই দেশ যখন হিন্দু ও মুসলমান রাজাদিগের অধীনে ছিল তখন ইহাতে পানদোষ তত প্রবল হইতে পারে নাই। কিন্তু এক্ষণে ইংরাজদিগের রাজত্ব সময়ে ঐ দোষ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিতেছে। বিশেষতঃ তাঁহারা যে ঘৃণিত আবকারী নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন তাহাতে মদ্যপায়ীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে! মফস্বলের যে সকল দূরস্থ গ্রামে মদ্যবিপণী আদবেই ছিল না সেখানে ঐ নিয়মের আশীর্ব্বাদে তাহা সংস্থাপিত হইতেছে। কি উচ্চ শ্রেণী কি নিম্ন শ্রেণী সকল প্রকার লোকের মধ্যে পানদোষ ক্রমশঃ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিতেছে। বিশেষতঃ ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা ইংরাজদিগের অনুকরণে এই দোষে অধিকতর বিলিপ্ত হইতেছেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, সর্ব্বপ্রথমে কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে পানদোষ যেমন প্রবল ছিল এক্ষণকার কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে তাহা তত প্রবল নাই। কিন্তু তাঁহারা যখন সংসারে প্রবেশ করেন তখন তাঁহাদিগের পানবিরতি আর থাকে না! বিশেষতঃ উকীল ও ডাক্তারশ্রেণীর মধ্যে এই দোষ অধিকতর দৃষ্ট হইয়া থাকে। মহানগরের দেখাদেখি উপনগরের লোক সকল এই দোষে ক্রমে বিলক্ষণরূপে লিপ্ত হইতেছে। পাপের তরঙ্গ মহানগর হইতে উপনগর সকলে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। গত চল্লিশ বৎসরের ভিতর কত ধনী, মানী ও বিদ্যান সুরারূপ পানীয় অগ্নি সেবনে অকাল-মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছেন তাহা গণনা করা দুষ্কর। তাঁহারা অদ্যাপি জীবিত থাকিলে তাঁহাদের দ্বারা দেশের কত উপকার সাধিত হইত তাহা বলা যায় না।

আমরা পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা একবার আমাদিগের সঙ্গে একটী গৃহের অভ্যন্তরে আগমন করুন। দেখিবেন, তথায় একটী ভদ্র ব্যক্তি অদ্য অপরিমিত মদ্যপান করিয়া অন্তিম শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। চক্ষু মুদ্রিত, মুখ আরক্ত বর্ণ, তাহা হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে এবং ঘন গভীর নিশ্বাস পড়িতেছে। অনেক প্রক্রিয়ায় চৈতন্য সাধন হইল না, চিকিৎসক জীবনের আশা নাই বলিয়া বিদায় লইয়াছেন। পরিবার সকল ক্রন্দন করিতেছে। মুমূর্ষু ব্যক্তি জীবন থাকিতে পরিবার প্রতিপালনে বড় মনোযোগী ছিলেন না। এক্ষণে তাঁহার লোকান্তর গমনে তাহারা অসীম দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইল। অপরিমিত সুরাপানের ফল কি ভয়ঙ্কর!

আমরা উপরে একটী চূড়ান্ত দৃষ্টান্তের চিত্র প্রদর্শন করিলাম। সাধারণতঃ অপরিমিত পানের অনিষ্টে চরিত্র চিত্রিত করিতে গেলেও তাহা উল্লিখিত চিত্র অপেক্ষা যে অল্প ভয়ানক হইবে তাহা নহে। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, পানদোষ স্নায়ুর দুর্ব্বলতা, হস্তপদকম্প, চিত্তবিভ্রম, যকৃতের রোগ, এইরূপ নানা প্রকার ভয়ঙ্কর পীড়া উৎপাদন করে। বিশেষতঃ এই সকল রোগের মধ্যে যে সকল রোগ মস্তিষ্কের বিকারজনিত তাহা পানদোষ দ্বারা অধিকতর উৎপাদিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা এই কথা বলেন যে, মদ্যপান করিবামাত্র মদ্যের অন্তর্গত সুরাসার পদার্থ রক্তের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ বিমিশ্রিত হইয়া শরীরের সকল স্থানে পরিচালিত হয় কিন্তু শরীরের অন্যান্য অংশ মল মূত্র, ঘর্ম্ম দ্বারা যেমন ঐ বিষম অনিষ্টকর পদার্থকে দূরীভূত করিতে সক্ষম হয় কোমল মস্তিষ্ক রাশি সেরূপ সক্ষম হয় না। সুতরাং মদ্যপান দ্বারা মস্তিষ্কের পীড়া যেমন উৎপাদিত হয়, এমন অন্য পীড়া নহে। ইহা বলা বাহুল্য যে মস্তিষ্কের পীড়া হইলে শরীর ও মন বিষম যন্ত্রণার আধার হইয়া উঠে। অপরিমিত মদ্যপানে যে কেবল শরীর ও মনের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করে এমত নহে, তাহা মনুষ্যকে নানা প্রকার পাপে লিপ্ত করিয়া তাহার আধ্যাত্মিক সর্ব্বনাশ সম্পাদন করে। ইহুদিদিগের গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শয়তান কোন ব্যক্তিকে নরহত্যায় প্রবৃত্ত করিতে সম্যক চেষ্টাবান হইয়াছিল, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইল না। তৎপরে তাহাকে পরদারাভিগমনে লিপ্ত করিতে চেষ্টা করে কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইল না, পরে মদ্যপানে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইলে তাহাতে কৃতকার্য্য হয়। উল্লিখিত ব্যক্তি মদ্যপান করিয়া পরদারাভিগমন ও নরহত্যা এই দুই দুষ্কর্ম্ম অনায়াসে সম্পাদন করিল।

সুরা এইরূপে মনুষ্যের শরীর মন, ধর্ম্ম সকলেরই ভয়ঙ্কর অনিষ্ট সাধন করে। মদ্য

স্থিতি হেতু, অর্থাৎ জীবন। সেই পদার্থই জঙ্গম পদার্থের গতিসাধক অর্থাৎ আত্মা। সেই পদার্থই শরীরের চেতয়িতা, সেই পদার্থের বলেই জঙ্গম জীবের জঙ্গমত্ব। সেই পদার্থ যখন জঙ্গম শরীর ত্যাগ করে, মেঘ হইতে ইরম্মদের ন্যায়, বিদ্যুতের ন্যায় বা বজ্রের ন্যায় নিষ্ক্রান্ত হয়, তখন আর জঙ্গমের জঙ্গমত্ব থাকে না, জ্ঞান থাকে না, বুদ্ধি থাকে না, ইন্দ্রিয়ক্রিয়া থাকে না, উষ্ণতা থাকে না, তাপ থাকে না, বল থাকে না, বীর্য্য থাকে না, কিছুই থাকে না, পচিয়া যায়। পচিয়া যায় কি—না, আপন আপন জাতীয় পরামাণুর সহিত সংযুক্ত হইতে থাকে। মরণকালে জীবন্ত শরীরের তাপ বা উষ্ণতা বল বা কার্য্যশক্তি, সমস্ত একত্রিত হইয়া একটা অপূর্ব্ব পদার্থের আকার ধারণ করে এবং তাহা ইরম্মদের ন্যায় ঝটিতি উৎক্রান্ত হয়। ইহার নাম মরণ এবং ইহারই নাম আত্মার গমন। কোন মতে এই রূপ নির্গমনের পর তাহার ঊর্দ্ধগতি হয়, কোন মতে তাহা বিদ্যুতের ন্যায় অন্য পদার্থে মিসিয়া যায়। এই মত সংসারমোচকদিগের। পূর্ব্বমত মাধ্যমিকদিগের। মাধ্যমিকেরা বলেন, তাদৃশ বৈদ্যুতিক বা বিজ্ঞান পদার্থের বিনাশ নাই কিন্তু তাহার স্থায়িত্ব প্রবাহের তুল্যরূপী। প্রবাহের প্রত্যেক অবয়বের বিনাশ বা পরিণাম থাকিলেও একটির পর আর একটি তৎপরে আর একটি অনুস্যূত বা সংলগ্ন হইয়াই থাকে। বিজ্ঞানাত্মারও স্থায়িত্ব সেইরূপ। সংশয়মোচকেরা বলেন কিছুই না। যে সংযোগ বশতঃ তাদৃশ চেতনশক্তি জন্মিয়াছিল এবং যে সংযোগ বশত পরে অর্থাৎ মৃত্যুকালে সমস্ত পরিচালক পদার্থ একত্রিত হইয়া মেঘ হইতে ইরম্মদের ন্যায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল, সে পদার্থ চিরকাল থাকিবে কেন? কিছুক্ষণ পরেই তাহা আবার নিবিয়া যায়। এই সম্প্রদায় যখন বিদ্যমান ছিল, তখন তাহাদের মধ্যে এক অদ্ভুত ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কোন ব্যক্তি অচিকিৎস্য রোগে কষ্ট পাইতেছে কিম্বা কাহারও পিতামাতা অনিবার্য্য জরাদোষে আক্রান্ত হইয়াছে, কোন উপায়ে তাহার ক্লেশ দূর হইবে না, এমত স্থলে তাহাদিগকে বল পূর্ব্বক মারিয়া ফেলিত। তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে সংশয় অর্থাৎ দুঃখ হইতে মুক্ত করা হইল। ইহাদের মত এই যে "যথা ঘটভঙ্গে জলস্য মোক্ষস্তথা দেহভঙ্গে আত্মনঃ সংসারনাশঃ" [বাচস্পতি] ঘট ভাঙ্গিয়া দিলে যেমন তৎস্থ জলের মোক্ষ হইল সেইরূপ দেহভঙ্গ অর্থাৎ দেহের সহিত চৈতন্য সংযোগের ধ্বংস হইলেই সংসারত্যাগ হইল। আর কিছুই থাকিল না। এই সকল মর্ম্মে "বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়" "যথা কিণ্বাদ্যানাং মদ্যবীজানাং প্রত্যেকমবর্ত্তমানানাপি সমুদায়শক্ত্যা মদশক্তি র্দৃশ্যতে" "তচ্চ সংহতভূতধর্ম্মঃ" ইত্যাদি নানা প্রকার বাক্য কপিল ব্যাস প্রভৃতি ঋষি এবং বাচস্পতি আচার্য্যেরা সংগ্রহ করিয়াছেন তত্তাবৎ দৃষ্ট কর।

যখন গ্লাসের ভিতর থাকে তখন পদ্মরাগ মণির আভা ধারণ করিয়া মনকে মোহিত করে কিন্তু পশ্চাতে বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিয়া জ্বালাতে অস্থির করিয়া তুলে। যেমন সুন্দরী দস্যুস্ত্রী আপনার সৌন্দর্য্য দ্বারা পথিকের মনকে মোহিত করিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া গিয়া তাহার গলদেশে ছুরিকা প্রয়োগ করে তেমনি সুরা স্বীয় মোহিনী শক্তি দ্বারা মনুষ্যকে পানদোষে লিপ্ত করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করে।

অপরিমিত সুরাপানের ফল উপরে প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে বিজ্ঞ ইংরাজেরা পরিমিত সুরাপানকেও শরীরের হিতসাধন জন্য অনাবশ্যক বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুবিজ্ঞ ডাক্তার রিচার্ডসন বলেন। "A very strong impression would be made upon the public mind if, after some long period in which the boilers of steam engines have been fed with a mixture of spirit and water, it was suddenly discovered that the engines would work quite as well with the water, without the spirit, and that the millions of pounds that had been devoted to the production of the spirit had all been so much unnecessary waste. But the argument goes very much beyond this in the case of 'the millions of engines called men', if it can be shown that there is hurtful as well as wasteful expenditure, and that in a very large proportion of instances the engines would have worked even better without the costly addition of the spirit. In these days of the scientific applications of the doctrines of economy it certainly must remain a matter of some surprise to thougtful men that, in a land of advanced cultivation and intelligence, so many millions of good money are continuously applied to the production of a commodity which, in the existing habits of society, may reasonably be held to be pernicious alike to the pockets, to the health, and to the morals of the community."*

"যদ্যপি অনেক দিন বাষ্পীয় যন্ত্র সকল জল ও সুরাসারমিশ্রিত পদার্থে চালান হইলে তৎপরে হঠাৎ ইহা আবিষ্কৃত হয় যে সুরাসার ব্যতীত কেবল জলে যন্ত্রের কার্য্য উত্তমরূপে চলিতে পারে এবং কোটি কোটি টাকা যাহা সুরাসার উৎপাদনে ব্যয়িত হয় তাহা অনাবশ্যকরূপে ব্যয়িত হয়, তখন সাধারণে চমকিত হইয়া উঠেন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই যুক্তি বাষ্পীয় যন্ত্র অপেক্ষা মানবশরীররূপ যন্ত্রসম্বন্ধে আরও খাটে। ইহা দেখান যাইতে পারে যে, ঐ যন্ত্র সম্বন্ধে এ বিষয়ে উভয় অনাবশ্যক ও অনিষ্টকর ব্যয় হইয়া থাকে এবং অধিক সংখ্যক স্থলে ঐ যন্ত্র ব্যয়সাধ্য সুরাসারের সহযোগ ব্যতিরেকে আরও উত্তম রূপে কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। বর্ত্তমান কালে যখন চতুর্দ্দিকে পরিমিত ব্যয়ের নিয়ম সকলের বৈজ্ঞানিক নিয়োগ হইতেছে তখন ইহা চিন্তাশীল লোকের পক্ষে কিয়ৎ পরিমাণে আশ্চর্য্যজনক সন্দেহ নাই—যে যে, দেশে উন্নত শিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তা এতদ্রূপ বিরাজমান, সে দেশে এত কোটি কোটি মুদ্রা এমন এক দ্রব্য উৎপাদনে ক্রমাগত ব্যয়িত হইতেছে যাহা লোকসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে সমাজস্থ লোকের মুদ্রাধার, স্বাস্থ্য এবং নীতিসম্বন্ধে সমানরূপে অনিষ্টজনক বলিয়া যথার্থ গণ্য করা যাইতে পারে।"

সুবিজ্ঞ ডাক্তার রিচার্ডসন উপরে উদ্ধৃত স্থলে অপরিমিত পানের অনিষ্টকারিতা ও অপরিমিত পানের অনাবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের মতে পরিমিত

* Edinburgh Review, July, 1875: Article "Physiological Influence of Alcohol."

সুরাপান কেবল যে অনাবশ্যক তাহা নহে তাহা অনিষ্টকর। পরিমিত সুরাপানের প্রধান দোষ এই যে, অধিকতর পানের লালসা উৎপাদন করিয়া, লোককে অপরিমিত পানে প্রবৃত্ত করে। বর্ষাকালে পদ্মা নদীর আবর্ত্ত যেমন কর্ণধারের অজ্ঞাতসারে নৌকাকে তাহার ভয়ঙ্কর গর্ভের দিকে আকর্ষণ করে, তেমনি পরিমিত সুরাপান লোকের অজ্ঞাতসারে তাহাদিগকে ক্রমে অপরিমিত পানের দিকে লইয়া যায়। শীতকালে পতঙ্গ প্রথমে মনে করে যে, সে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিতি করিয়া, কেবল দীপের সুখদ উত্তাপটী সেবন করিবে, কিন্তু পশ্চাতে দীপশিখার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, তাহার উপর পতিত হইয়া পুড়িয়া মরে, সেইরূপ সাংসারিক উদ্বেগ ও বিষাদরূপ শীতের সময়ে মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি এইরূপ মনে করে যে, সে কেবল মদ্যপানজনিত আনন্দটুকু উপভোগ করিবে, তৎসেবন দ্বারা আপনার কোন অনিষ্ট সাধিত হইতে দিবে না। কিন্তু পরিশেষে ক্রমে ক্রমে অপরিমিত সেবনের মোহ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, ধন প্রাণে বিনষ্ট হয়। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা পিতা পিতৃব্য ও স্নেহাস্পদ বন্ধু প্রভৃতি অতি আত্মীয় ব্যক্তিকে পানদোষ দ্বারা স্বচক্ষে বিনষ্ট হইতে দেখিয়াছেন তাঁহারাও অসঙ্কুচিত ভাবে ঐ দোষে বিলিপ্ত হইতেছেন। লোকের চক্ষু থাকিতেও দেখে না, বুদ্ধি থাকিতেও তাহা চালনা করে না।

পরিমিত সুরাপান কেবল অপরিমিত সুরাপানে প্রবৃত্ত করে বলিয়া, যে তাহা দোষাবহ এমত নহে, তাহার দৃষ্টান্ত অতি মন্দ। কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার পরিমিতপায়ী বন্ধুকে বলিয়াছিলেন "তুমি মদ্যপান করিয়াথাক, কিন্তু অমুক (পরিমিতমদ্যপায়ীর জ্যেষ্ঠ পুত্র) যেন টের না পায়।" পিতা কিম্বা শিক্ষক যদি পরিমিতরূপে মদ্যপান করেন পুত্র কিম্বা ছাত্র তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, মদ্যপান বিষয়ে তাঁহাদিগের কেবল মাত্র দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া অপরিমিত পানে শীঘ্র প্রবৃত্ত হয়। অতএব পিতা ও শিক্ষকের এই বিষয়ে কত সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য তাহা বলা যায় না।

অবশেষে আমাদিগের পাঠকবর্গের প্রতি আমাদিগের বক্তব্য এই যে, যদ্যপি তাঁহারা "সুস্থ শরীরে সুস্থ মন*" প্রার্থনা করেন, যদ্যপি তাঁহারা পৃথিবীতে কিছু দিন বাঁচিতে চাহেন, তবে মদ্যপান এবং মদ্যপানে অনুরোধকারী বন্ধুর সহবাস হইতে তাঁহারা যেন দূরে থাকেন, তাঁহারা যেন আমাদিগের শাস্ত্রের "মদ্যমপেয়মদেয়মগ্রাহ্যং †" এই উপদেশের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুগামী হইয়া চলেন।

অধুনা আমাদের দেশে বিদ্যা ফলবতী হয় না কেন ‡।

অধুনা বঙ্গ-সমাজের ভাব এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে; তদুপলক্ষে আনন্দ করি, বা, আক্ষেপ করি, সাধুবাদ প্রদান করি বা ধিক্কার প্রদান করি, হাস্য করি বা ক্রন্দন করি, ইহা স্থির করিয়া উঠা যায় না। আমারদের মনের যে এইরূপ দ্বৈধভাব, ইহার একটা নিরাকরণ আবশ্যক। কেন না দ্বৈধভাবকে প্রশ্রয় দিলে তাহার ফল কেবল কার্য্যের হানি—আর কিছুই নহে। যদি কার্য্য চাও তবে দ্বৈধকে যত শীঘ্র হয় মন হইতে বিদায় কর। আনন্দের বিষয়ই বা কি এবং আক্ষেপের বিষয়ই বা কি তাহা নির্ণয় কর, তাহা হইলে কার্য্যকালে কর্ত্তব্য স্থির

* "Mens sana in corpore sano."
† "Touch not, taste not, handle not"—Temperance Pledge.
‡ বঙ্গভাষাসমালোচনী সভায় পঠিত।

করিতে পারিবে। বঙ্গসমাজে এক্ষণে বিদ্যা লইয়া বহুতর আন্দোলন হইতেছে। বিদ্যা উপলক্ষে অনেকে আনন্দ এবং আক্ষেপ দুইই এক সঙ্গে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন "আজিকার দিনে বিদ্যার বড়ই উন্নতি হইতেছে" আবার পরক্ষণেই বলেন "আবার তাও বলি, বিদ্যার উন্নতিতে তেমন ফল দর্শিতেছে না!" ইহার প্রতি বক্তব্য এই যে, প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্যার উন্নতি হইতেছে ইহা যদি সত্য হয়, তবে তাহা হইতে যে ফল উৎপন্ন হইবে না ইহার অর্থ নাই। যদি স্থির-চিত্তে ভাবিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দুইটি আক্ষেপের বিষয় আমরা দেখিতে পাই; এক এই যে, বিদ্যা শিক্ষা যেমন হওয়া উচিত তেমন হইতেছে না—বিশুদ্ধরূপে হইতেছে না; আর এক এই যে, বিদ্যাকে কেমন করিয়া কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা আমরা জানিও না শিখিও না। আমরা শুক পক্ষীর ন্যায় পরের ভাষা বলিতে শিখি; যাত্রার সঙের ন্যায় পরের পরিচ্ছদ পরিধান করিতে শিখি; এবং বালকদিগের ন্যায় পরের লিপিতে দাগা বুলাইতে শিখি; ইহাতেই আমরা মনে করি যে, আমারদের বিদ্যা বুদ্ধির আর ইয়ত্তা নাই। ইহাতে আমরা আক্ষেপ না করিয়া কি করিব!

মানিলাম যে বিদ্যা যত দূর শিখিবার তাহা তুমি শিখিয়াছ; কি সত্য কি অসত্য, ইহার যত দূর জানিবার তাহা জানিয়াছ; কিন্তু সে বিদ্যার কার্য্য কি হইতেছে? মনে করিতেছ যে, তোমার কুসংস্কার বিনাশ পাইয়াছে; কিন্তু কই! যখন দেখিতেছি যে, পাশ্চাত্য বশীকরণ শক্তি তোমার বিদ্যা বুদ্ধি সমস্তই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, তখন কেমন করিয়া বলিব যে, পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণে তুমি শক্তির উপাসনা কর না। শক্তির উপাসনা কাহাকে বলে? ইতর ভাষায় একটি প্রবাদ আছে "যে দিকে' পড়ে জল সেই দিকে ধর ছাতি" ইহাকেই শক্তির উপাসনা বলে। ইংরাজেরা শক্ত লোক, তাহারদের প্রলোভন শক্ত প্রলোভন, তাহারদের বাহুবল শক্ত বাহুবল, অতএব ইংরাজি আচার ব্যবহার রীতি সকলই মস্তকে করিয়া পূজা করিতে হইবে; ইহাকেই শক্তির উপাসনা বলে। যদি আমরা যন্ত্র-বিদ্যা শিখিলাম তবে দেশ কাল অবস্থা বিবেচনা করিয়া যে, কোন প্রকার সুচারু যন্ত্র নির্ম্মাণ করিব, তাহা আমারদের কর্ত্তৃক হইবে না। যাহা চক্ষে দেখিব, তাহারি উপরে দাগা বুলাইব, ইহাতেই আমরা ধনুর্ধর। পঠদ্দশায় দাগা বুলানো আবশ্যক ইহা যথার্থ কথা, কিন্তু চিরকালই কি আমরা পঠদ্দশায় কালক্ষেপ করিব? যদি আমরা পুরাবৃত্ত শিখিলাম, তবে দেশ কালপাত্র বিবেচনা করিয়া যে, দেশের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইব, অর্থাৎ আমারদের নিজের দেশের পূর্ব্বাপর অবস্থা এবং লোকের ভাব গতি বিবেচনা করিয়া যে, দেশহিতার্থে কোন সদুপায় অবলম্বন করিব, তাহা আমারদের দ্বারা হইবে না! তবে, ইংলণ্ডদেশে যে যে প্রকার উপায় অবলম্বিত হইতেছে তাহার উপরে যদি দাগা বুলাইতে বল, তাহাতে আমরা আছি। ইংলণ্ডে পার্লিয়ামেণ্ট আছে; ইহা দেখিয়া বরং আমরা কতকগুলি কাষ্ঠ-পুত্তলিকার পার্লিয়ামেণ্ট সংস্থাপন করিব, তথাপি আমারদের অস্থিতে মজ্জাতে বাহুতে মনেতে অজেয় শক্তির সঞ্চার করিতে পারে এমন এক উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম যাহা আমারদের আপনাদের দেশেতেই আছে, যাহাতে করিয়া আমরা জীবন্ত মনুষ্য হইতে পারি, "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই অজেয় মন্ত্রের বলে যাহাতে আমরা এক অদ্বিতীয় ঐক্য-বন্ধনে বলী হইতে পারি,

প্রাণ থাকিতে সে দিকে আমরা যাইব না! পুত্তলিকার ন্যায় নৃত্য করিতে বল, সঙ্‌সাজিতে বল, গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় চলিতে বল, শুক পক্ষীর ন্যায় কথা কহিতে বল, তোমার কথাগুলিকে মস্তকের উপরে স্থান দিব; কিন্তু যদি স্বাধীনরূপে বুদ্ধি চালনা করিতে বল, যদি আপনার দেশের পূর্ব্বাপরের সহিত যোগ রাখিয়া চলিতে বল, যদি দেশ কাল পাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক বিদ্যাকে কার্য্যে প্রয়োগ করিতে বল, এক কথায় এই যে, যদি জীবন্ত মনুষ্য হইতে বল, তবেই সর্ব্বনাশ! বিদ্যা শিক্ষার ফল কি এই! বিদ্যা উপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমারদের দেশের মুখ কোথায় উজ্জ্বল হইবে, না তাহা ক্রমশই দীন হীন এবং শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া শুনিয়া কি আমরা স্থির হইয়া থাকিতে পারি? আমারদের দেশের বিজ্ঞ লোকেরা কি স্থির হইয়া আছেন? ইহা কখন বিশ্বাসযোগ্য নহে। বল দেখি, কত শত মহদ্ব্যক্তি সময়ের কুটিল গতি দেখিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতেছেন? হৃদয়ের অশ্রু হৃদয়ে সঞ্চিত হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে, তথাপি নয়ন-দ্বার দিয়া বাহির হইবার পথ পাইতেছে না,। মরুভূমিতে যে দেবতার বর্ষণ হয় না, সে ভাল, কেন না সহস্র বর্ষণ হইলেও সেখানে কোন ফল জন্মিবে না। আমারদের দেশের হৃদয় সকল যখন এত কঠিন কর্কশ এবং নীরস হইয়াছে যে, তাহাদিগকে পাষাণ বলিলেও হয়, কাষ্ঠ বলিলেও হয়, মরুভূমি বলিলেও হয়, সে স্থানে সহৃদয় ব্যক্তিরা যে অশ্রু সম্বরণ করিবেন, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উপদেশ সম্বরণ করিবেন, হিতৈষী ব্যক্তিরা শুভানুষ্ঠান সম্বরণ করিবেন, ইহার একটিও বিচিত্র নহে। নিষ্ফল আড়ম্বরে যাঁহারদের প্রবৃত্তি তাঁহারাই চীৎকার ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ ফাটাইয়া দেন। ভিক্ষুকেরা দ্বারে দ্বারে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়। সে ক্রন্দনের অর্থ এই যে, ভিক্ষা দেও ত চুপ করিব, না দেও ত কাঁদিব। "যাচিয়া মান এবং কাঁদিয়া সোহাগ" ইহাতে কোন ফল নাই। কিন্তু ভিক্ষার ক্রন্দন স্বতন্ত্র এবং আক্ষেপের ক্রন্দন স্বতন্ত্র। দেশের দুর্গতি দেখিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি নির্জ্জনে ক্রন্দন না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন? এই সকল ব্যক্তির প্রতিই আমার বিশেষ লক্ষ্য, কেননা তাঁহারা ব্যথার ব্যথী, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি আমার কথায় কর্ণপাত করুন বা না করুন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না।

এক্ষণে যদি কোন ব্যক্তির বিদ্যা-শিক্ষা সাঙ্গ হইল, অমনি এক দিক্ হইতে ওকালতি, এক দিক্ হইতে দাক্তারি এবং এক দিক্ হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং এই তিন ব্যবসায় তিন দিক্ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করে। যাঁহারদের যৎকিঞ্চিৎ পাথেয়-সংস্থান আছে তাঁহারা ওকালতির মৃগতৃষ্ণিকার দিকে ধাবিত হন, এবং সেই পাথেয় যত শেষাবস্থার নিকটবর্ত্তী হয়, ততই পণ্ডিতি বা মাষ্টারি পদ তাঁহাদিগকে আকাঙ্ক্ষা করিতে থাকে। যাঁহারা নিতান্তই নিঃসম্বল তাঁহারা হয় দাক্তারি নয় ইঞ্জিনিয়ারিং এই দুয়ের একটি বৃত্তি অবলম্বন করেন। যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি তাঁহারা অবিরল-নিপতিত সংবাদ-পত্র-ধারায় স্নাত গাহন করত রাজনীতিজ্ঞ-মণ্ডলীর মধ্যে গণ্য হইতে ইচ্ছা করেন। পরন্তু দেশের হিত-সাধনের জন্য বিদ্যাশিক্ষা করেন এমন এক জন ব্যক্তিও এক্ষণে দুর্লভ। পূর্ব্বে যিনি যাহা শিক্ষা করিতেন, সমস্তই দেশের উপকারার্থে সন্ন্যস্ত করিতেন, এক্ষণে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। এক্ষণে এত ত রাজনীতিজ্ঞ মহাত্মা বর্ত্তমান আছেন, রামমোহন রায়ের

মত কার্য্যে অগ্রসর হউন দেখি কেমন তাঁহাদের সাধ্য! কার্য্যের মত কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে সকলে পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিবেন, পরে এইরূপ স্থির করিবেন যে, যেহেতু অধিকাংশ সভ্যের মতে ইহা অনাবশ্যক অতএব ইহা এইখানেই অন্ত হউক্! তবে যদি অদৃষ্ট-ক্রমে কোন গবর্ণর পরলোকে কিংবা ইংলণ্ডে প্রস্থান করেন, তখন মহাসমারোহ, মহা বক্তৃতা, মহা করতালি ইত্যাদি মহদ্ব্যাপার সকলের আর ইয়ত্তা থাকে না, এবং কিয়দ্দিন পরেই স্বাক্ষর পুস্তকরূপ টানা জাল সহরে নগরে পল্লীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া বড় ছোট মধ্যবিৎ অগণ্য শীকারে জীবিতমান হইয়া উঠে। যাঁহারা শেষোক্ত প্রকার কার্য্যকেই কার্য্য এবং দেশের বাস্তবিক কোন হিত-সাধনকে অকার্য্য মনে করেন, তাঁহারদের বুদ্ধির দোষ কি গুরুতর! অবস্থার দোষে অনেকে ভালকে অবলম্বন করিতে পারেন না, মন্দকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না—এ একরূপ; এবং বুদ্ধির দোষে অনেকে ভালকে মন্দ মনে করেন, মন্দকে ভাল মনে করেন—এ একরূপ; এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, অবস্থার দোষে তত নয় যত বুদ্ধির দোষে আমারদের বিদ্যাসাধ্য তাবৎই পণ্ড হইয়া যাইতেছে। বুদ্ধির দোষ কতরূপ হইতে পারে তাহা বুঝিতে হইলে বুদ্ধির অবয়বগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। বুদ্ধির প্রধান অবয়ব দুইটি, এক বিশুদ্ধরূপে সত্য জানা; আর এক, বিশেষ বিশেষ কার্য্যেতে সেই সত্য প্রয়োগ করা। জ্ঞান শিক্ষা যেমন আবশ্যক জ্ঞানের প্রয়োগ শিক্ষাও তেমনি আবশ্যক। যদি রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে চাও, তাহা হইলে কেবল জ্ঞান শিক্ষা করিলেই সার্থকাম হইতে পার, কিন্তু যদি ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে চাও তাহা হইলে জ্ঞান-শিক্ষা এবং জ্ঞানের প্রয়োগ শিক্ষা দুয়েতে যত্ন বিভাগ করিতে হইবে।

ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে যে আমারদের দেশে জ্ঞান-শিক্ষা যেমন বিশুদ্ধ রূপে হওয়া উচিত তেমন হয় না; কিন্তু আরো আক্ষেপের বিষয় এই যে, জ্ঞানের প্রয়োগ-শিক্ষা মূলেই হয় না। আপাতত মনে হইতে পারে যে সরল-রেখা-পথে জ্ঞানের উন্নতি হইয়া থাকে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে এ সিদ্ধান্তটি উল্টিয়া যায়। ঘূর্ণাবায়ু যেমন ধূলিরাশি হরণ করত গগনমার্গে চক্রায়মান হইয়া উত্থান করে, সেইরূপ জ্ঞান পরীক্ষা আহরণ পূর্ব্বক উন্নতি-মার্গে উত্থান করে। ঘূর্ণাচক্রের সহিত জ্ঞানের গতি-সাদৃশ্য এইরূপ, যথা, প্রথমে জ্ঞান, পরে জ্ঞানের প্রয়োগ, পরে উচ্চতর জ্ঞান, পরে তাহার প্রয়োগ, পরে তদপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান, এই পদ্ধতি অনুসারে জ্ঞানের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী কিরূপ? বিদ্যার একটা কোন বিশেষ বিভাগ ধরা যাউক্, মনে কর পুরাবৃত্ত; অত্রস্থ বিদ্যালয়ে পুরাবৃত্তের বিশুদ্ধ সত্য মূলেই শিক্ষিত হয় না। একেবারেই ইংলণ্ডের পুরাবৃত্ত, অথবা যা আরো মন্দ, বিকৃত ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত ছাত্রদিগকে গিলাইয়া দেওয়া হয়। সার্ব্বলৌকিক মানবপ্রকৃতিতে যে একটি স্বাধীনতার ভাব বদ্ধমূল আছে, তাহা কেমন করিয়া অল্পে অল্পে উন্মেষিত হয়, তাহার বাধা বিঘ্ন কি কি, তাহার সহায় কি কি, ইত্যাদি ভাবের কতক গুলি সত্য আছে যাহা কোন বিশেষ জাতিতে বদ্ধ নাই, পরন্তু যাহা মনুষ্যজাতি মাত্রেই খাটে, পুরাবৃত্তঘটিত সেই যে সকল বিশুদ্ধ সত্য তাহা আড়ালে রাখিয়া, ইংলণ্ডের পুরাবৃত্তের প্রতিই যত ঝোঁক দেওয়া হয়!

এবং তাহার আনুসঙ্গিকরূপে ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে ফল কি হয়? না ইংলণ্ডের পুরাবৃত্তই পুরাবৃত্ত আর সকল জাতির পুরাবৃত্ত অকর্ম্মণ্য এইটি আমারদের ধ্রুব জ্ঞান হয়। সাধারণ মানবজাতির পুরাবৃত্তের স্থলে ইংলণ্ডীয় পুরাবৃত্তকে অভিষেক করা কি ভয়ানক স্পর্দ্ধার কার্য্য! মানবপ্রকৃতির মহত্ত্ব কেবল ইংলণ্ডেরই সম্পত্তি এরূপ মনে করা, এবং, দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা এরূপ মনে করা উভয়ই সমান! অত্যুক্তির যে কতদূর দৌড় হইতে পারে উভয়েই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। এই প্রকার এক-দিক্‌দর্শী বিদ্যা-শিক্ষা যে পর্য্যন্ত না আমারদের দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইবে, এবং তাহার পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ সত্য-সকলের শিক্ষা প্রদান প্রচলিত হইবে, সে পর্য্যন্ত আমারদের বিদ্যা মূর্খতার দুর্গ-স্বরূপ হইয়া, বিস্ফোটক যেমন অস্বাস্থ্যকর ক্লেদে স্ফীত এবং উত্তপ্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ অহংকারে স্ফীত এবং উত্তপ্ত হইয়া কষ্টেরই কারণ হইবে। অতএব সর্ব্বাগ্রে বিশুদ্ধরূপে বিদ্যা-শিক্ষা করা আবশ্যক; পশ্চাতে তাহাকে কার্য্যে প্রয়োগ করা আবশ্যক। প্রয়োগ-শিক্ষার পদ্ধতি স্বতন্ত্র। বিশুদ্ধ সত্য ধ্রুব —তাহার নড় চড় নাই, তাহা না হিন্দু না মুসলমান না ইংরাজ না ফরাসীস্; কিন্তু এক যে সেই বিশুদ্ধ সত্য তাহা ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রয়োজিত হইতে পারে; প্রয়োগবিষয়ে প্রতি ব্যক্তি এবং প্রতি জাতির স্বাধীনতা রহিয়াছে। কোন বিদ্যার প্রয়োগশিক্ষার সময়ে সেই স্বাধীনতাকে স্মরণ রাখা উচিত। কোন ভাষার ব্যাকরণ শিক্ষা করিতে হইলে পুস্তকে যেমনটি লেখা আছে তেমনটি শিক্ষা করিলেই হইতে পারে, কিন্তু সেই ভাষাটির প্রয়োগ-শিক্ষা করিতে হইলে 'যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং' করিলে চলিবে না। আপনি স্বাধীন ভাবে যে পর্য্যন্ত না ভাষা-প্রয়োগ করিতে শিখিবে সে পর্য্যন্ত শিক্ষা অসম্পন্ন থাকিবে। স্বাধীন ভাবে প্রয়োগ করা কেবল মাত্র শিক্ষিত বিদ্যার কার্য্য নহে, তাহাতে বুদ্ধিচালনা আবশ্যক। সুতরাং যদি বিদ্যা শিখিয়াও আমরা তাহা কার্য্যে প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হই তবে, তাহাতে আমারদের বুদ্ধির দোষ সপ্রমাণ হইবে। পুরাবৃত্তের মূল-সত্য সকল আমরা শিখি নাই, এবং তাহা স্বাধীন ভাবে জাতিবিশেষের উপরে বা অবস্থাবিশেষের উপরে প্রয়োগ করিতেও শিখি নাই; কি শিখিয়াছি? না অমুক শকে অমুক ঘটনা হইয়াছিল, অমুক ব্যক্তি বড়ই বীর ছিলেন, অমুক ব্যক্তি অমুক যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন ইত্যাদি! এ-সকল বিষয় জানাতে আমারদের যে কি পুরুষার্থ হয় তাহা ভাবিয়া পাওয়া সুকঠিন। এক ত পুরাবৃত্ত-বিষয়ক সার্ব্বলৌকিক সত্য সকল আমরা জানি না। তাহাতে আবার যাহা কিছু আমরা জানি তাহা স্বাধীন ভাবে প্রয়োগ করিতে পারি না। প্রত্যুত 'যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং' এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকি। আমারদের দেশকে এখন পরাধীন দেখিতেছি বলিয়া মনে করি যে, পরাধীনতাই বুঝি আমারদের দেশের অলঙ্কার-স্বরূপ। ইংলণ্ডের প্রাদুর্ভাব আমরা চক্ষে দেখিতেছি; এ জন্য আমরা ইংলণ্ডীয় জাতিকেই মানবজাতির আদর্শ-রূপে গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু যাহা চক্ষে দেখিব তাহাকেই সার জ্ঞান করিব, এরূপ যদি সংকল্প করা যায়, তবে আর বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন কি? এক জন কৃষকও ত তাহাই করিয়া থাকে। সে চক্ষে দেখে সূর্য্য পূর্ব্ব দিক্ হইতে পশ্চিম দিকে গমন

করে, তাহাই তাহার নিকটে বেদবাক্য। যদি পুরাবৃত্ত-বিষয়ে যথার্থই আমারদের জ্ঞান থাকিত, এবং তাহার প্রয়োগ-বিষয়ে যথার্থই কুশল হইতাম তাহা হইলে স্বাধীন ভাবে আমারদের ভাবগতি বুঝিতে চেষ্টা করিতাম, এবং তাহাতে অনেক ফল লাভ করিতাম। ইউরোপের যেমন সকল দেশেই স্বাধীনতার ভাব কোন না কোন সময়ে পরিস্ফুট হইয়াছে, রোমে হইয়াছে, গ্রীসে হইয়াছে, ফ্রান্সে হইয়াছে, ইস্পেনে হইয়াছে, পোর্টুগালে হইয়াছে, তেমনই তাহা ইংলণ্ডে হইয়াছে; এবং সকল দেশেই যেমন যথা-সময়ে স্বাধীনতা ম্লান ভাব ধারণ করিয়াছে কালে ইংলণ্ডেও তাহা সেইরূপ ম্লান ভাব ধারণ করিবে, ইহা কিছু অসম্ভব নহে। এখন সূর্য্য পশ্চিম দিকের মুখ উজ্জ্বল করিতেছে বলিয়া, আর যে তাহা পূর্ব্ব দিকে উদিত হইবে না—এ কথা কখন বিশ্বাসযোগ্য নহে। আমারদের দেশে স্বাধীনতা এককালে কিরূপে বীজভাব হইতে বৃক্ষভাবে পরিণত হইয়াছিল এবং পুনরায় তাহা কিরূপে বীজভাবে পরিণত হইল, এবং ভবিষ্যতেই বা তাহা কিরূপে বৃক্ষভাব ধারণ করিবে এবিষয় স্বাধীন ভাবে আমরা আলোচনা করি না। করি কি? না ইংলণ্ডের স্তুতিবাদ, ইংলণ্ডের জয়ঘোষণা, শক্তের আনুগর্ত্য! আর কি? না অশক্তের প্রতি পীড়ন, অশক্তের উপরে প্রভুত্ব, অশক্তের সদ্‌গুণ-সকলেরও প্রতিবাদ! ইহারই নাম বিদ্যানুশীলন!! যদি কোন বিদ্যা আমরা বিশুদ্ধরূপে শিক্ষা করি, তবে তাহাকে আমরা স্বাধীনরূপে কার্য্যে প্রয়োগ করিবার অধিকারী হই। যদি নৌকা-নির্ম্মাণ-বিদ্যায় বিশুদ্ধরূপে পারদর্শী হই, তবে সমুদ্রে-গমনার্থে একরূপ নৌকা নির্ম্মাণ করি, নদীভ্রমণার্থে অন্য একরূপ নৌকা নির্ম্মাণ করি। যদি পুরাবৃত্ত-বিদ্যায় বিশুদ্ধরূপে পারদর্শী হই, তবে ইংলণ্ডের উন্নতি সাধনের জন্য কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক, এবং স্বদেশের উন্নতির জন্যই বা কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক, ইহার ভেদ আমরা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি। ইংলণ্ডের সভ্যতাও আমারদের স্কন্ধে চাপাইতে যাই না এবং আমারদের সভ্যতাও ইংলণ্ডের স্কন্ধে চাপাইতে যাই না। যদি যথার্থরূপে পুরাবৃত্ত শিক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে সকল জাতির পুরাবৃত্ত নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিয়া, সকলের মধ্য হইতে মূল সত্যগুলি অগ্রে সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য, পশ্চাতে তাহা ভিন্ন ভিন্ন জাতির উপরে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া কোন এক বিশেষ জাতিকে যদি একাধিপত্য দেওয়া যায় তাহা হইলে বিদ্যার নিতান্তই অবমাননা করা হয়; যেহেতু বিদ্যা ইংরাজিও নহে বাঙ্গালিও নহে, বিদ্যা পক্ষপাত-শূন্য এবং বিশুদ্ধ। বিদ্যার শুভ্র গাত্রে যদি কোন কলঙ্ক-চিহ্ন দেখিতে পাও তবে নিশ্চয় জানিও, যে কোন শত্রুপক্ষ তোমার চক্ষুতে ধূলি-মুষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে, তাই বিশুদ্ধ বস্তুতেও মালিন্য অবলোকন করিতেছে। ইংলণ্ডে ওক গাছের যেমন সম্মান, আমারদের দেশে বট অশ্বত্থের তেমনি সম্মান; জর্ম্মন্ দেশে রাইন নদীর যেমন সম্মান, আমারদের দেশে গঙ্গা নদীর তেমনি সম্মান; এই প্রকার সমতার প্রতি দৃষ্টি করিলে সমুদায় মানবপ্রকৃতি যে, এক ছাঁচে গঠিত তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। তবে কেন আমরা বট অশ্বত্থ ছাড়িয়া ওক গাছের শরণাপন্ন হইব? গঙ্গা নদী ছাড়িয়া রাইণ নদীর শরণাপন্ন হইব? মহাভারত রামায়ণ ছাড়িয়া মিল্‌টন্ হোমরের শরণাপন্ন হইব, বেদ বেদান্ত ছাড়িয়া ইহুদীয় শাস্ত্রের শরণাপন্ন হইব? এবং আমারদের দেশের জ্ঞান-গর্ভ অমূল্য ভাষার

সুমধুর আস্বাদ বিস্মৃত হইয়া পরের উচ্ছিষ্টকে মহাপ্রসাদ জ্ঞান করিব? পুরাবৃত্তের মূলসত্য গুলি দেশ কাল পাত্র বিশেষে কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয় তাহা না জানাতেই আধুনিক নব্য সম্প্রদায়ের যত কুবুদ্ধি ঘটে। পুরাবৃত্ত-বিষয়ে যাহা বলা হইল সকল বিষয়ে ঐরূপ। ইংরাজি প্রণালীতে কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা করা উচিত, অনেকের মনে এইরূপ একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছে। কৃষি-বিদ্যা-ঘটিত মূল-সত্য-সকল শিক্ষা করাতে অনেক ফল আছে ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু আমারদের দেশে এতকাল কৃষিকার্য্য চলিয়া আসিতেছে, অথচ আমারদের দেশের চাসারা কৃষিকার্য্য কিছুই বুঝে না, ইংরাজেরা সকল বুঝে, ইহা কখনই বিশ্বাস-যোগ্য নহে। যাঁহারা আমারদের দেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারদের উচিত যে, আমারদের দেশের ভূমির অবস্থা কিরূপ তাহা বিশেষরূপে জানেন এবং আমারদের দেশের কৃষকেরা কিরূপ প্রণালীতে কার্য্য করে তাহা তন্ন তন্ন করিয়া শিখেন তাহা হইলেই স্বাধীন-ভাবে কৃষিবিদ্যার মূলসত্য-সকল কার্য্যে প্রয়োগ করিবার অধিকার জন্মিবে। যদি কোনস্থলে শিক্ষিত বিদ্যার সহিত পরীক্ষার সহিত ঐক্য না হয় তবে সেই স্থলে শিক্ষিত বিদ্যার প্রতিবাদ করিতে হইবে ইহাতে ভয় করিলে চলিবে না। কিন্তু এরূপ করিবার অধিকারী কে? যিনি প্রভূত শ্রম স্বীকার করিয়া পরীক্ষিতব্য বিষয় স্বচক্ষে প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিয়াছেন এবং ধৈর্য্যসহকারে প্রচলিত কৃষি-প্রণালী আদ্যোপান্ত শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কেহ নহে। যিনি ইংলণ্ডের কৃষি-বিদ্যা, অথবা ইংলণ্ডের চিকিৎসা-বিদ্যা, অথবা ইংলণ্ডের বেশ ভূষা বা রীতি নীতি, অবিকৃত ভাবে এদেশের স্কন্ধে চাপাইতে যান তাঁহারা এক কিম্ভূত দৃশ্য! হংস কাষ্ঠ-বিড়ালীর ন্যায় চলিতে অভ্যাস করিতেছে, সৌরভপূর্ণ পদ্মফুল আপনার কায়াকে ক্ষুদ্র করিয়া কাষ্ঠ-গোলাপের বেশ ধারণ করিতেছে; হিমালয় আল্‌পের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইতেছে, আমাদের দেশের উদার মন এবং দোধূয়মান পরিচ্ছদ সকল, কুটিল মন এবং খর্ব্বাকৃতি পরিধেয় বস্ত্রের অনুকরণ করিতেছে, এ যেমন এক অদ্ভুত দৃশ্য, উহাও সেইরূপ!

শুভ্রবসনা বিদ্যাকে পাঁচরঙা বস্ত্র পরাইলে, তাহা কি কখন মানায়, অবিদ্যাকেই তাহা সাজে। যাহা আড়ম্বর এবং চাকচিক্যে ভুলে না, যাহার দূরদৃষ্টি কৃত্রিম সভ্যতার মায়াপ্রাচীরে প্রতিহত হয় না, তাহাই বিদ্যা; যাহার ভিতরে অসার বাহিরে আড়ম্বর, যাহার নৈসর্গিক শোভা কিছুই নাই অলঙ্কারই সর্ব্বস্ব; যাহা আপাত-রম্য কিন্তু পরিণামে বিষ-তুল্য, তাহাই অবিদ্যা। এই অবিদ্যাকে বিদ্যা মনে করা, বুদ্ধির একটি প্রধানতম দোষ। যাঁহারা অবিদ্যাকে বিদ্যা মনে করেন, তাঁহারা চাপল্য এবং কুটিলতাকে মনুষ্যের একটা মহৎগুণ বলিয়া মনে করেন। বিদ্যাকে আমরা মস্তিষ্কের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখি; অবিদ্যার কথা শুনিয়া চলি; এ অবস্থায় বিদ্যা হইতে যে, কোন ফলই ফলে না তাহাতে আর বিচিত্র কি? যেমনটি দেখিব তেমনটি করিব এই ভাবটি অবিদ্যার লক্ষণ; পরন্তু যাহা উচিত তাহাই করিব এই ভাবটি বিদ্যার লক্ষণ। মনে কর, জাহাজ তৈয়ারি করা দেখিলাম এবং যেমনটি দেখিলাম তেমনটি শিখিলাম। জাহাজের এরূপ গঠন হওয়া উচিত, এরূপ গঠন হওয়া উচিত নহে, ইহা এই অংশে বিজ্ঞানসঙ্গত, এই অংশে বিজ্ঞানসঙ্গত নহে, ইহাতে এই গুণ, ইহাতে এই দোষ, এ সকল কিছুই জানিলাম

না, যেমনটি দেখিলাম তেমনটি শিখিলাম; ইহাতে ফল এই হয় যে, আমি সেইরূপ জাহাজ তৈয়ারি করিতে পারিব, কিন্তু দেশ কাল অবস্থা-ভেদে যদি অন্যরূপ জাহাজ প্রস্তুত করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলেই আমি অন্ধকার দেখিব। জাহাজ তৈয়ারি-বিষয়ে যথা-দৃষ্ট অনুকরণ করিতে শিখিলে, তাহাতে কতকটা ফল দর্শিতে পারে, কিন্তু সে ফল বিদ্যার চক্ষে অতীব অকিঞ্চিৎকর। বিদ্যা এই চাহেন যে, তুমি যন্ত্র-বিদ্যার সত্য-সকল শিক্ষা কর, এবং নিজের বুদ্ধি চালনা করিয়া সেই সত্য কার্য্যেতে প্রয়োগ কর; যেরূপ গঠন বিজ্ঞান-সঙ্গত এবং দেশকাল অবস্থার উপযুক্ত বিবেচনা কর তোমার জাহাজকে তুমি সেই প্রকার গঠন প্রদান কর; আপনার বুদ্ধিকে স্বাধীন ভাবে পরিচালনা কর। প্রথম প্রথম তোমার কার্য্য অপরিপক্ব হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের স্বাধীন প্রয়োগ অভ্যাস দ্বারা ক্রমে যত তোমার বুদ্ধি খুলিবে, ততই তোমার কার্য্য উৎকর্ষ লাভ করিবে; স্বাধীন বুদ্ধি চালনাই উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়। লেখা শিখিবার সময় প্রথমে কিছুকাল দাগা বুলানো আবশ্যক, সন্তরণ শিখিবার সময় প্রথমে কলশ অবলম্বন করিয়া চলা আবশ্যক, হাঁটিতে শিখিবার সময় প্রথমে ধাত্রীর হস্ত ধারণ করিয়া চলা আবশ্যক, ইহা ঠিক কথা; কিন্তু কবে স্বাধীন ভাবে লিখিতে পারিব, কবে স্বাধীন ভাবে সন্তরণ দিতে পারিব, কবে স্বাধীন ভাবে হাঁটিতে পারিব এ কামনাটি আমারদের মন হইতে যেন তিলার্দ্ধ অন্তর না হয়। অনেক বিষয় এমন আছে যাহাতে আমারদের স্বাধীনতা খাটে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিশুদ্ধ বিদ্যা ধ্রুব ও অটল; তাহা আমারদের স্বাধীনতার আয়ত্তের মধ্যে নহে। কিন্তু সেই যে বিশুদ্ধ বিদ্যা তাহাকে মস্তিষ্কের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না, পরন্তু তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন দেশকালপাত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে। এই যে প্রয়োগ-ব্যাপার ইহাতে যিনি যে পরিমাণে স্বাধীন বুদ্ধি চালনা করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে কৃতকার্য্য হইবেন। যখন আমরা লিখিতে শিখি তখন আমরা আমারদের নিজের ছাঁদে লিখি, যখন সন্তরণ দিতে শিখি তখন নিজের ধরণে সন্তরণ দিই, যখন চলিতে শিখি তখন নিজের রকমে চলি। কিন্তু আমারদের দেশে বিদ্যা-শিক্ষার ফল অবিকল ইহার বিপরীত দেখিতে পাওয়া যায়, যথা, মিল্‌টন্ যেরূপে লিখিয়াছিল আমারদের সেইরূপ লিখিতে হইবে, মিউস্‌কে যেমন করিয়া সম্বোধন করা হইয়া থাকে, সরস্বতীকে সেইরূপ করিয়া সম্বোধন করিতে হইবে; আমরা যে আপনার ছাঁদে লিখিব, আপনার চক্ষে দেখিব, দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া চলিব, এটুকু স্বাধীনতাও আমারদের থাকিয়া কাজ নাই! যাহা দেখিব তাহা শিখিব, ইহাই আমারদের শিরোভূষণ!! বিদ্যাশিক্ষার এই কি ফল? আমারদের দেশের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকেরা অন্যান্য দেশের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদিগের ন্যায় চলিয়াছেন; এক্ষণকার নব্য ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকেরা ক্রাইষ্ট্ কিরূপে চলিয়াছিলেন, মহম্মদ কিরূপে চলিয়াছিলেন, চৈতন্য কিরূপে চলিয়াছিলেন এই সকল অন্বেষণ করিয়া বেড়ান, এবং তদনুসারে চলিতে বলিতে অভ্যাস করেন। পুরাবৃত্ত পাঠ কর-দেখিবে, ক্রাইষ্ট্ বা মহম্মদ বা অন্য কোন ধর্ম্ম-সংস্কারক অন্য কাহারো আঁচল ধরিয়া চলেন নাই, ইহা দেখিয়া শুনিয়াও তুমি কি মনে কর যে, কোন্ দেশে, কোন্ কালে, কোন্ অবস্থায়, কে কিরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন, সেইরূপ কার্য্য তুমি এই দেশে এই কালে এই অবস্থায় অনুকরণ

করিয়া বাস্তবিক কোন স্থায়ী ফল লাভ করিতে পারিবে? কি বুদ্ধির ভুল!

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে অগত্যা উপনীত হইতে হইতেছে যে, সর্ব্বজাতি-সাধারণ বিদ্যার যে একটি বিশুদ্ধ অংশ আছে তাহার মর্ম্ম আমরা কিছু মাত্র বুঝিতে পারি নাই, এবং আমারদের যেরূপ দেশ, যেরূপ কাল, যেরূপ অবস্থা, তাহাতেই বা কিরূপে বিদ্যাপ্রয়োগ করিতে হয় তাহাও আমরা শিখি নাই; শিখিবার মধ্যে কেবল আমরা দাগা বুলাইতে শিখিয়াছি। আমারদের স্বদেশীয় পূর্ব্বতন একটি সামান্য কবিরও মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি না, অথচ বিদেশীয় মহাকবিদিগের মর্ম্ম গ্রহণে যৎপরোনাস্তি পটু হইয়াছি এবং তাঁহারদের লিপিতে দাগা বুলাইয়া না-এদিক না-ওদিক এইরূপ নূতন নূতন অদ্‌ভুত সঙের সৃজন-কার্য্যে অসামান্য নিপুণ, হইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, বিশুদ্ধ বিদ্যা এবং তাহার স্বাধীন প্রয়োগ, এ দুই বিষয়ের শিক্ষাতে আমরা যত দিন বঞ্চিত থাকিব, ততদিন আমারদের বিদ্যা ফলবতী হইবে না।

বাহুল্য অনেক বলিয়াছি, এক্ষণে সকল বক্তব্য এক দুই কথায় বলিয়া অদ্যকার মত বিদায় গ্রহণ করি। বিদ্যা মনুষ্য-জাতি মাত্রেরই সম্পত্তি; বিদ্যাকে যদি বিশুদ্ধ চক্ষে দেখ তবে দেখিবে যে, ইংরাজি পরিচ্ছদে তাহার শোভা বৃদ্ধি হয় না এবং বাঙ্গালি পরিচ্ছদেও তাহার শোভা ম্লান হয় না; উদার অমায়িক এবং বিশুদ্ধ বিদ্যাকে বাঙ্গালির হিত সাধনার্থে প্রয়োগ করিতে হইলে বাঙ্গালি রকমে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যদি যন্ত্র-বিদ্যা শিখ তবে একদিকে যেমন যন্ত্রবিদ্যার মূলবর্ত্তী বিশুদ্ধ সত্য সকল শিক্ষা করিবে, এবং বড় বড় ইওরোপীয় যন্ত্র সকলের মর্ম্ম অভিসন্ধি কৌশল প্রভৃতি জ্ঞানে আয়ত্ত করিবে, অন্য দিকে স্বদেশে যে সকল যন্ত্র প্রচলিত রহিয়াছে স্বাধীন ভাবে বুদ্ধি চালনা করিয়া সে সকলের উন্নতি সাধনার্থে যত্নবান্ হইবে এবং যদি কোন নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার প্রয়োজন হয় তবে তাহা দেশ কাল পাত্রের উপযোগী করিয়া স্বাধীনভাবে নির্ম্মাণ করিবে। যদি পুরাবৃত্ত শিখ, তবে পুরাবৃত্ত মন্থন করিয়া সর্ব্ব-জাতীয় মূল-সত্য সকল আহরণ কর এবং তাহা স্বদেশের হিত সাধনার্থে প্রয়োগ কর। সকল বিদ্যা সম্বন্ধেই ঐরূপ জানিবে। এক কথায় এই যে বিদ্যার মূল-সত্য সকল প্রথমে উত্তমরূপে আয়ত্ত করিবে; সেই মূল-সত্য গুলিকে দেশ কাল পাত্র অবস্থার সহিত জড়িত না করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞাননেত্রে পর্য্যবেক্ষণ করিবে; কিন্তু যখন তাহারদিগকে কার্য্যে প্রয়োগ করিবে, তখন এই বিশেষ দেশে, এই বিশেষ কালে, এই বিশেষ অবস্থায়, এই বিশেষ জাতিতে, কিরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে তাহা সবিশেষ বুদ্ধি চালনা করিয়া স্থির করিবে। যাঁহারদের বিদ্যা শিক্ষা সাঙ্গ হইয়াছে তাঁহারদিগকে আমি বিনীত ভাবে বলি যে, স্বাধীনভাবে বুদ্ধি চালনা করিয়া সেই বিদ্যাকে স্বদেশের হিতসাধন কার্য্যে প্রয়োগ কর, আপনার বুদ্ধি অনুসারে, এবং আপনার দেশের প্রকৃত পদ্ধতি অনুসারে বিদ্যাকে কার্য্যে প্রয়োগ কর। তিনটি বিষয়ে সাবধান,—শুক পক্ষী হইও না, দাগা বুলানো সার করিও না, সঙ্ সাজিও না; আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই।

ঈশ্বরের উদ্ধারিণী শক্তি।

অনেক দিন হইল, আমরা আমাদিগের কোন প্রিয় বন্ধুর ধর্ম্মোন্নতির অত্যন্ত প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদিগের সে আশা

বিফল হয়। তিনি পরে অলীক আমোদে আসক্ত হয়েন এবং ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া এক্ষণে ঘোর দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছেন; কিন্তু এই ঘোর দুরবস্থার সময় ঈশ্বর তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি সম্প্রতি এই বিষয়ে আমাদিগকে একটি অতীব কৌতূহল-জনক শিক্ষাপ্রদ পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন।

"আমি কয়েক বার আপনার উদ্দেশে পত্র লিখিয়া রাখিয়া পাঠাইতে সাহস করি নাই। অদ্য আপনকার পত্র হস্তগত হওয়াতে আমি যে কি পর্য্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল হইয়াছি বলিতে পারি না। অধ্যাত্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে পরস্পর কথোপকথন করিয়া সুখী হওয়া যায় এখানে এমন লোক প্রায় নাই। ইহা যে কিরূপ পরিতাপের বিষয় তাহা আপনি অনুভব করিতে পারিবেন না। আমার আধ্যাত্মিক পতনের সময় আমি যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি আজন্ম পুস্তক পাঠ করিয়া তাহা করি নাই। ঈশ্বরের যে সমস্ত বিভূতি মনুষ্যদিগের গোচর আছে, করুণাই তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ বলিয়া সকলের জানা আছে। তাঁহার করুণার কথা সকলের মুখেই পাইবেন। তাঁহারা মনে করেন, ঈশ্বরের করুণার যথার্থ ভাব তাঁহারা অবগত আছেন, যেহেতু প্রতি নিয়ত তাঁহারা তৎবিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি বলি, ঈশ্বরের করুণার বিশেষ ভাব তাঁহারা জানেন না অথবা যৎকিঞ্চিৎই জানেন। যাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক পতন কখন ঘটে নাই সুতরাং যাঁহাদিগের উদ্ধার হয় নাই আমি তাঁহাদিগেরই প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই কথা বলিতেছি। আমার আত্মার দুরবস্থার সময় আমি ঈশ্বরের হস্ত কত বার দেখিয়াছি, আমাকে পাপপাশ হইতে উন্মোচনের জন্য তাঁহার অবিরত যত্ন ও অশেষবিধ কৌশল আমি জীবন্ত ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমাকে তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য পরিত্যাগ করেন নাই। আমি যখন অলীক আমোদে মত্ত হইতে বসিয়াছি, এমন সময় তিনি আমাকে কত বার দেখা দিয়াছেন ও সেই অলীক আমোদের আমোদত্ব হরণ করিয়া লইয়াছেন। আমাকে উৎফুল্ল না দেখিয়া আমার সঙ্গিগণ আমাকে কত ব্যঙ্গ করিয়াছে। ঈশ্বরের করুণাপূর্ণ কৌশল অন্যে কি প্রকারে বুঝিবে? আবার দেখুন, এইরূপ যখন আমার মন সৎপথের সম্মুখীন হইল, তাঁহার নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধন জন্য ঈশ্বর অচিরাৎ আমার যাহা কিছু বিষয় বিভব হরণ করিয়া লইলেন। আমি একেবারে অসম্ভাবিত রূপে আমার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা (আমি ইহাকে শুভ দশা বলি) প্রাপ্ত হইয়া, অপরাজিত চিত্তে দরিদ্রতার সহিত প্রায় দুই বৎসর কাল যুদ্ধ করিতেছি ও আত্মার বল সঞ্চয় করিতেছি। আমার এ অবস্থা না ঘটিলে হয়ত আমার আত্মা দুর্ব্বলই থাকিয়া যাইত। পূর্ব্বে আমি অতি কঠোরস্বভাব ছিলাম। সুখের বা দুঃখের কোন সময়ে আমার চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইয়াছিল আমার স্মরণ হয় না। আমি মনে মনে অতি গর্ব্বিত ছিলাম। সম্পদ হইতে পতন যেন আমার সম্বন্ধে একেবারে অসম্ভব জ্ঞান করিতাম। অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রলোভনের সম্মুখীন হইতাম। কিন্তু আমার সে গর্ব্ব দর্পহারী ঈশ্বর চূর্ণ করিয়াছেন। দীর্ঘ কাল অলীক আমোদ সম্ভোগ করিয়া আমার আত্মা তেজোহীন মলিন হইয়াছে, তাহা অগ্নি দ্বারা পরিশোধিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তজ্জন্য ঈশ্বর আমাকে এই রূপ দারিদ্র্যের জ্বলন্ত চুল্লীতে নিক্ষেপ করিয়াছেন। আমার এই সাংসারিক দুরবস্থার সময় ঈশ্বর আমার সহিত যে কত ভাবে কত কার্য্য করিতেছেন তাহা অনেকের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ হইলেও পত্রের অবয়ব বৃদ্ধির আশঙ্কায় তদুল্লেখে বিরত হইলাম। অভাবুকেরা হয়ত আমার এই সমস্ত উক্তিকে কুসংস্কারমূলক বলিয়া ঘৃণা করিবেক, কিন্তু আমি বলিতেছি মনের প্রধান ধর্ম্ম যে বিশ্বাস তাহা উহাদিগের মনে উপযুক্ত রূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। এই অবসরে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। আবাল্য আপনার উপদেশেই আমার আত্মার অবয়ব রচিত হইয়াছে। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে আমার উদ্ধারের আশা ছিল না। আপনকার সৌম্য ঋষিমূর্ত্তি আমাকে পাপ-সংসর্দেও দেখা দিয়া সর্ব্বদা লজ্জিত করিয়াছে। আমি এইরূপে কবিতা রচনা করিয়া পাঠাইতেছি না, আমি সরল সত্য লিখিলাম।"

নূতন পুস্তক।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

১। ভৈষজ্যরত্নাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিনোদলাল সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

ভৈষজ্যরত্নাবলী দ্বিতীয় খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। বিনোদ বাবু যে প্রকার অবিচলিত উৎসাহ সহকারে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদি প্রকাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহাতে যে শীঘ্রই চিকিৎসকসমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

প্রথম খণ্ডে জ্বরাধিকার হইতে আমবাতাধিকার অবধি প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় খণ্ডে শূলাধিকার হইতে পুরুষত্বহানি রোগের চিকিৎসা পর্য্যন্ত বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বিবিধ উদ্ধৃত পাঠ হইতে বহুতর ঔষধব্যবস্থা সন্নিবেশিত হওয়াতে গ্রন্থখানি বৈদ্য চিকিৎসকমণ্ডলীমধ্যে বিশেষরূপে সমাদৃত হইবেক। ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ অতীব সরল এবং মুদ্রাঙ্কন কার্য্য অতি সুন্দর হইয়াছে।

২। জানকী বিলাপম্। শ্রী দামোদর চক্রবর্ত্তী বিরচিত, রায় যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৷৶০

৩। অবসরসরোজিনী কাব্য। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত। আলবার্ট যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

৪। কমলকলিকা কাব্য। শ্রী দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ আনা।

৫। জয়দেবচরিত। শ্রী রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। জি, পি রায় এণ্ড কোম্পানীর যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা।

৬। পাণিনী। শ্রী রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানীর যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা।

৭। কর্ণাটকুমার দৃশ্য কাব্য। নূতন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা।

৮। ভারতীয়ম্। বীর কাব্য। প্রথম সর্গ। শ্রী পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত। সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা।

৯। বাঙ্গালার ইতিহাস। শ্রী ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। বিডিন্ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা।

১০। যুবরাজ এল্‌বার্ট এডওয়ার্ড। অদ্বৈত যন্ত্রে মুদ্রিত।

১১। মৎস্য পুরাণ। প্রথম সংখ্যা, মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত। শ্রী নীলকান্ত গোস্বামী কর্ত্তৃক পরিশোধিত ও অনুঘাদিত। শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়ের যত্নে ও ব্যয়ে প্রকাশিত। বিতরিতব্য। বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২। প্রথম প্রয়াস। শ্রী হরীন্দ্রভূষণ, চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৩। হোমিওপেথিক। সচিত্র-পুস্তকাবলী। প্রথমাবধি ষষ্ঠ সংখ্যা পর্য্যন্ত। শ্রী বসন্তকুমার দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য প্রতি সংখ্যা ছয় আনা। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে মুদ্রিত।

"ANNEXATION VERSUS EQUITY."

'A letter on the disposal of the Surplus of the Prince of Wales' Entertainment Fund at the meeting of the subscribers held at the British Indian Association Rooms on July 19, 1876.

By Pandit Pran Nath Saraswati M. A. B. L. Calcutta: 1876. Printed at the Valmiki Press.

কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু

কর্ম্মাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
(পাতুরেঘাটা)

শ্রীযুক্ত নীলমনি চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র

শ্রীযুক্ত রাজারাম মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারি সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ অগ্রহায়ণ রবিবার প্রাতে বেলা ৭॥ ঘণ্টার সময় মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা বর্ত্তমান মাস মধ্যে অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। অগ্রিম মূল্য অগ্রে প্রদান না করিলে সমাজের ক্ষতি করা হয়।

যাঁহাদিগের নিকট পত্রিকার মূল্য দ্বাদশ মাস অনাদায় আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান মাসের মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন। নতুবা সমাজ তাঁহাদিগের নিকট মাশুল দিয়া পত্রিকা প্রেরণে অসমর্থ হইবেন।

বিশেষ কারণ বশত যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিনা মূল্যে প্রেরিত হইয়া থাকে; গচ্ছিত মাশুল ফুরাইলেই পুনরায় অগ্রিম মাশুল না পাওয়া পর্য্যন্ত সেই সকল পত্রিকা স্থগিত থাকিবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে নানারূপ নূতন বাঙ্গালা অক্ষর ক্রয় করা হইয়াছে। এস্থানে যাঁহারা পুস্তকাদি মুদ্রিত করাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে নিয়মিত সময়ের মধ্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবে। সমাজের সহকারি সম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে মূল্যাদির নিয়ম জানিতে পারিবেন।

আয় ব্যয়।

আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ১৭৯৮ শক,

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১৯১২।৴৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৩৮৯৸/১০
সমষ্টি	২৩০২ ৶১৫
ব্যয়	১৫০১ ৸১৫
স্থিত	৮০৭ ।৶০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৫৮৫ ৸৶১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৪৩৫ ।/০
পুস্তকালয়	৫৯ ॥৴১৫
যন্ত্রালয়	৭৭৮ ॥ ১০
গচ্ছিত	৫২ ৸৴১০
সমষ্টি	১৯১২ ।৴৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৩৬৪ /৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩৯২ (৫
পুস্তকালয়	৯৬ ॥০
যন্ত্রালয়	৩৩২ ॥৴১০
গচ্ছিত ...	৩১৬ ॥ ১৫
সমষ্টি	১৫০১, ৸১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫০
" দীননাথ অধ্যেতা ...	৩০১
" গৌরচাঁদ চট্টোপাধ্যায় ...	৫
" নীলমণি চট্টোপাধ্যায় ...	২
মৃত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	২৮
শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০
" জানকীনাথ ঘোষাল ...	১০
" শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	৪
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন ...	১
" যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ...	১০
" মহানন্দ মুখোপাধ্যায় ...	১
" গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫০
" লক্ষ্মীনারায়ণ বসু ...	১০
মৃত নীলমাধব মিত্রের বনিতা ...	৫
শ্রীযুক্ত রমণীমোহন রায় চৌধুরি ...	২৫
" তারকনাথ দত্ত ...	১০
" আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়	১
" দ্বারকানাথ রায় ...	৩।/০
	৫৪৬ ।/০

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২
" নবীনচন্দ্র পাল ...	৫
" দুর্গাবর মিত্র ...	১
" শিবচন্দ্র দেব ...	৫
	১৩
দানাধারে প্রাপ্ত ...	১৪ ৴১৫
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয় ...	১২ ।৶১৫
	৫৮৫৸৶১০

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯৩৩। কলিগতাব্দ ৪৯৭৮। ১ অগ্রহায়ণ বুধবার।

Registered No 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
পৌষ ১৭৯৮ শক

৪০১ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৭

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদের ব্যাখ্যান।

ন তং বিদাথ যইমা জজানান্যৎ যুষ্মাকমন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যাচাসুতৃপউক্থশাসশ্চরন্তি * ॥

হে নরাঃ 'তং' 'ন' 'বিদাথ' জানীথ 'যঃ' 'ইমা' ইমানি ভূতানি 'জজান' উৎপাদিতবান্?

হে মনুষ্যেরা! তাঁহাকে তোমরা জানিলে না, যিনি এই বিশ্বভুবন উৎপন্ন করিয়াছেন। যাঁর ইচ্ছাতে সূর্য্য প্রকাশিত হইয়া আলোক দিতেছে, যাঁর ইচ্ছাতে নিশাকালে চন্দ্র সুধা বর্ষণ করিয়া ওষধি বনস্পতিকে পালন করিতেছে, যাঁর ইচ্ছাতে নিদাঘ কালের পর গ্রীষ্ম-প্রশমনার্থে মেঘ বায়ু সহকারে বারিধারা বর্ষণ করিতেছে। যাঁর ইচ্ছাতে নদী-সকল তুষারাবৃত শ্বেত পর্ব্বত হইতে স্যন্দমান হইয়া পৃথিবীকে উর্ব্বরা করিতেছে, যাঁর ইচ্ছাতে উদ্যান কাননে পুষ্প ফল প্রসূত হইয়া তৃপ্তিকর মধুময় রস গন্ধ দান করিতেছে, যাঁর ইচ্ছাতে শস্যবতী বসুমতী, অগণন প্রজাপুঞ্জ নিয়ত পালন করিতেছে, যাঁর ইচ্ছাতে মাতৃস্তনে দুগ্ধের সঙ্গে হৃদয়ে স্নেহ আবির্ভূত হইয়া শিশুজীবন রক্ষা করিতেছে, যাঁর ইচ্ছাতে জ্ঞান-ধর্ম্ম পাইয়া পশু হইতে উৎকৃষ্ট মনুষ্য জন্ম লাভ হইয়াছে, যাঁর ইচ্ছাতে দ্যুলোক ভূলোক, নিমেষ মুহূর্ত্ত, ঋতু সংবৎসর অক্ষোভে নিয়ত চলিতেছে, তাঁহাকে তোমরা জানিলে না। তিনি তোমারদের অন্তরে রহিয়াছেন।

সঃ 'যুষ্মাকং অন্তরং' অন্যৎ সর্ব্বস্মাৎ অতিরিক্তং 'বভূব' ভবতি বিদ্যতে।

তিনি সকলের অতিরিক্ত হইয়া তোমারদের অন্তরে রহিয়াছেন। তিনি তোমারদের প্রত্যেকের শরীরের মধ্যে আত্মার অভ্যন্তরে স্থিতি করিতেছেন। এমন যে অন্তরতর অন্তরতম ঈশ্বর, তাঁহাকে তোমরা জানিলে না, তাঁহাকে কেমন করিয়াই বা জানিবে? অজ্ঞানরূপ নীহারে আবৃত হইয়া, বৃথা জল্পনাতে প্রাবৃত হইয়া, ইন্দ্রিয়-সুখে মোহিত হইয়া যাগ যজ্ঞ, বাহ্য আড়ম্বরে সময় অতিবাহিত করিয়া যখন পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিতেছ, তখন তাঁহারে কি প্রকারে জানিবে? যদি তোমরা পরব্রহ্মকে জানিতে চাও তবে জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জ্জন কর, সত্য কথা সত্য ব্যবহারে রত হও, ইন্দ্রিয়-সুখকে ধর্ম্মের অনুগত কর, স্বর্গ-কামনা পরিত্যাগ করিয়া মুক্তির জন্য প্রার্থী হও। পূর্ব্বকার বৃদ্ধ ঋষিদিগের এই

* ঋগ্বেদ ১ ম ৬ অ ৮৩ সূ।

উপদেশ। এখনকার বৃদ্ধেরাও বলেন যে "ধিক্ ধিক্ জীবন ব্রহ্ম না জানো। হৃদয় দেশমে সো না উপাসো, পাস্ দূর কর্ মানো॥"

সিন্দূরপটী সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ।

আকাশে থাকিয়া আকাশের অন্তরে থাকিয়া যিনি আকাশে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, আকাশ যাঁহাকে জানে না, আকাশ যাঁহার শরীর—অন্ধকারে থাকিয়া অন্ধকারের অন্তরে থাকিয়া যিনি অন্ধকারে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, অন্ধকার যাঁহারে জানে না, অন্ধকার যাঁহার শরীর,—আলোকে থাকিয়া আলোকের অন্তরে থাকিয়া যিনি আলোককে নিয়মিত করিতেছেন, আলোক যাঁহাকে জানে না, আলোক যাঁহার শরীর—তিনি তোমারদের প্রত্যেকের অন্তরে আত্মাতে রহিয়াছেন। যিনি তেজে থাকিয়া তেজের অন্তরে থাকিয়া তেজকে নিয়মিত করিতেছেন, তেজ যাঁহাকে জানে না, তেজ যাঁহার শরীর—তিনি তোমারদের প্রত্যেকের অন্তরে আত্মাতে রহিয়াছেন। যিনি আদিত্যে থাকিয়া আদিত্যের অন্তরে থাকিয়া আদিত্যকে নিয়মিত করিতেছেন, আদিত্য যাঁহাকে জানে না, আদিত্য যাঁহার শরীর—তিনি তোমারদের প্রত্যেকের অন্তরে আত্মাতে রহিয়াছেন। যিনি চন্দ্র-তারকে থাকিয়া চন্দ্র-তারকের অন্তরে থাকিয়া চন্দ্র-তারককে নিয়মিত করিতেছেন, চন্দ্র-তারক যাঁহাকে জানে না, চন্দ্র-তারক যাঁহার শরীর—তিনি তোমারদের প্রত্যেকের অন্তরে আত্মাতে রহিয়াছেন। যিনি বায়ুতে থাকিয়া বায়ুর অন্তরে থাকিয়া বায়ুকে নিয়মিত করিতেছেন, বায়ু যাঁহাকে জানে না, বায়ু যাঁহার শরীর—তিনি তোমারদের প্রত্যেকের অন্তরে আত্মাতে রহিয়াছেন। যিনি জলেতে থাকিয়া জলের অন্তরে থাকিয়া জলকে নিয়মিত করিতেছেন, জল যাঁহাকে জানে না, জল যাঁহার শরীর—তিনি তোমারদের প্রত্যেকের অন্তরে আত্মাতে রহিয়াছেন। এই অন্তর্যামী অমৃত পুরুষ সকলের আত্মাতে সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, বহিরে হস্ত দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করা যায় না, কিন্তু অন্তরে আত্মার দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারি। অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা এই ব্রহ্ম-সংস্পর্শে বিষয়েতে অনাসক্ত যোগীরা অত্যন্ত সুখ লাভ করেন। তিনি অরূপ; তিনি শ্বেত নহেন, তিনি পীত নহেন; তিনি অনীল অলোহিত,—সেই বর্ণহীনের রূপ কদাপি চর্ম্মচক্ষুর গোচর নহে, কিন্তু জ্ঞান-চক্ষুর সম্মুখে তিনি আনন্দ-রূপে অমৃত-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তাঁহার সেই সত্য-রূপ প্রেম-রূপ যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি দেখিয়াছেন, তিনি তাঁহার প্রেমে নিয়তই মগ্ন রহিয়াছেন। সেই প্রেম-স্বরূপের সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই। সে সৌন্দর্য্যের হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই। সেই সৌন্দর্য্যের ছায়া প্রভাকর, সুধাকর; সেই সৌন্দর্য্যের ছায়া প্রস্ফুটিত পুষ্প-কানন; সেই সৌন্দর্য্যের ছায়া সরোবরের শতদল পদ্ম; সেই সৌন্দর্য্যের ছায়া এখানকার রূপ-যৌবন-লাবণ্য। সেই সৌন্দর্য্যে যিনি প্রেম স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার প্রেম কখনই শুষ্ক হয় না। তাঁহার রস নাই; জলের ন্যায়, ফলের ন্যায়, মধুর ন্যায়, তাঁহার রস নাই—কিন্তু "রসো বৈ সঃ" তিনি অমৃত রস। সে রস যে আস্বাদন করিয়াছে, তাহার তৃপ্তির অন্ত নাই। তাঁর গন্ধ নাই কিন্তু তাঁহার সহবাসে প্রাতঃকালের পুষ্প-সকল গন্ধ লাভ করিয়া গন্ধ দান করিতেছে। তিনি অশব্দ, কিন্তু তিনি নর-নারীর আত্মাতে থাকিয়া নিঃশব্দে সকলের শুভ বুদ্ধিতে ধর্ম্মোপদেশ

দিতেছেন;—সত্য বল, ধর্ম্মাচরণ কর, ধর্ম্মের পর নাই, ধর্ম্ম সকলের মধু-স্বরূপ, অন্যায় পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করিও না, পরদ্রব্যে লোভ করিও না, পরশ্রীতে কাতর হইও না, পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্ষমা করিও, ব্যভিচার-দোষে লিপ্ত হইও না, মদ্যপান করিয়া উন্মত্ত হইও না, শান্ত হইয়া জ্ঞান অর্জন কর, সহিষ্ণু হইয়া কার্য্য-যোগ বহন কর, পরিমিত রূপে আহার বিহার সম্পন্ন কর, পতিব্রতা সতী হইয়া সংসারধর্ম্ম পালন কর, প্রহৃষ্ট চিত্তে গৃহ-কার্য্য সম্পাদন কর, বিবাদ-কলহ প্রলাপবাক্য পরিত্যাগ কর, সদাচারা সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া গৃহের শ্রী হও, গুরু জনকে ভক্তি কর, দীনদরিদ্রে দয়া কর, অপরিমিত ব্যয় করিও না, কৃপণতা অভ্যাস করিও না, ধর্ম্ম অর্থ পরিত্যাগ করিও না, ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতেও কাতর হইও না। এই প্রকার নিঃশব্দে তিনি প্রত্যেকের অন্তরে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন। যিনি এই সকল উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া সংসারে ধর্ম্ম সাধন করেন, তিনি ছিন্নশিরা হইলেও স্বীয় আত্মাতে প্রাণের প্রাণকে লইয়া অমৃত ধামে উপস্থিত হন। এই পরমাত্মাকে প্রকৃষ্ট বচন দ্বারা জানা যায় না, মেধা দ্বারা অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা জানা যায় না, তিনি যাঁহাকে জানান, সেই তাঁহাকে জানে এবং তাঁহার অনুরাগী হইয়া তাঁহার যশ সর্ব্বত্র প্রচার করিতে থাকে। কাহাকে তিনি জানান? যে তাঁহার প্রার্থী হয়, তাহাকে তিনি জানান এবং তাহার নিকটে আপনার অনন্ত স্বরূপ প্রকাশ করেন। এই যে চিরন্তন পরব্রহ্ম, যাঁহার পূর্ব্বকারণ নাই, বিশ্বসংসার যাঁহার কার্য্য, সেই শান্তস্বরূপকে শান্ত হইয়া উপাসনা কর, সেই শান্তস্বরূপকে শান্ত হইয়া উপাসনা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

উপদেশ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৫ অগ্রহায়ণ ১৭৯৮ শক।

ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি গৃহস্থ হইবেন, তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন, এবং যে কোন কর্ম্ম করিবেন তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন। ধর্ম্মসাধনসম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই যে প্রথম উপদেশ ইহা অতীব সারগর্ভ। ব্রহ্মেতে যাঁহার নিষ্ঠা তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ; সাধকের প্রথম সাধন ব্রহ্মনিষ্ঠা, দ্বিতীয় সাধন গার্হস্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যাঁহার নাম নাই, ধাম নাই, রূপ নাই, যিনি সকল সত্যের মূল সত্য, সকল মঙ্গলের মূলাধার, সকল সৌন্দর্য্যের মূল আকর, তাঁহাতে মনের একাগ্রতা হউক্, নিষ্ঠা হউক্, ভক্তি হউক্, এবং এই নামরূপময় সংসারের তাবৎ কার্য্যে তাঁহার মহিমা প্রকাশিত হউক্, এই দুইটি সংকল্প যাঁহার মনে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই আপনার হৃদয়াভ্যন্তরে ধর্ম্মের মূলপত্তন করিয়াছেন, তিনিই সাধক নামের যোগ্য হইয়াছেন। গৃহ অতি পবিত্রস্থান, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি অতি পবিত্র বস্তু, ভ্রাতা-ভগিনীর প্রতি প্রেম অতি পবিত্র বস্তু, পতিপত্নীর প্রেম অতি পবিত্র বস্তু, পুত্রকন্যার প্রতি স্নেহমমতা অতি পবিত্র বস্তু; গৃহের মধ্যে যদি একটু কোথাও বিবাদ-বিসম্বাদ ঈর্ষা-বিদ্বেষ প্রবেশ করে তবে তাহা অসহ্য হইয়া উঠে। কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে কালো দাগ লাগিলে তাহাতে তত ক্ষতি বোধ হয় না, প্রত্যুত শুভ্র বস্ত্রে এক বিন্দু কালি লাগিলে তাহা চক্ষুর পীড়াজনক হয়। গৃহ এমনি পবিত্র বস্তু যে, কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি দরিদ্র, গৃহেতে এক বিন্দু কলঙ্ক স্পর্শ না করে, এ চেষ্টা সকলেরই সমান দেখিতে

পাওয়া যায়। কিন্তু এমন পবিত্র যে গৃহ, তাহাও দ্বেষ হিংসা মাৎসর্য্য এবং অপবিত্রতার আলয় হইয়াছে, চন্দন বৃক্ষ বিষ বৃক্ষ হইয়াছে, এমন কত শত দেখিতে পাওয়া যায়! যত্ন-ব্যতিরেকে সুরম্য উদ্যানও কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠে, অতএব যত্ন-ব্যতিরেকে গৃহও যে অশান্তির আলয় হইয়া উঠিবে, ইহাতে কিছুই বিচিত্র নাই। গৃহ যদি দুর্ভাগ্যক্রমে অপবিত্রতা ও অশান্তির আলয় হইয়া উঠে, তবে সাধু ব্যক্তির আর সেখানে ভদ্রতা নাই, অতএব গৃহের যাহাতে পবিত্রতা, সদ্ভাব, শান্তি প্রেম ভক্তি স্নেহ, রক্ষিত হয়, এবং বর্দ্ধিত হয়, তাহার জন্য প্রাণপণে যত্ন করা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির প্রথম কর্ত্তব্য পরব্রহ্মকে গৃহমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা; এই কার্য্য যদি বিধি-মতে অনুষ্ঠিত হয়, তবে পবিত্র প্রেমে গৃহের মুখ উজ্জ্বল হইবেই হইবে, ইহাতে আর সংশয় মাত্র নাই। উত্তম ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে, তাহা হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইবেই হইবে, অতএব গৃহের ন্যায় এমন পবিত্র ক্ষেত্রে যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ ফলিত না হইবে তবে আর কোথায় হইবে? এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম এই উপদেশ দিতেছেন যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি গৃহস্থ হইবেন। গৃহেতে পরব্রহ্মের পবিত্র প্রেমের ছায়া স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারা যায়, এ জন্য গীত হইয়াছে "এক ভানু অমৃত কিরণে উজলে যেমতি সকল ভুবন, তোমার প্রেম হইয়ে শতধা বিরচয়ে সতীর প্রেম জননী-হৃদয়ে করে বসতি।" অতএব গৃহেতে পরব্রহ্মকে আনয়ন কর, পবিত্রতা এবং কল্যাণের ক্ষেত্র যে গৃহ, তাহাতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের মঙ্গল বীজ বপন কর, তাহা হইলে যথাকালে প্রচুর পরিমাণে ফল লাভ করিবে তাহাতে আর সংশয় নাই। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি গৃহস্থ হইবেন আর কি হইবেন, না তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন। ভগবদ্গীতাতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে,

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপয়ান্তি তে॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মেতে যাঁহারদের চিত্ত সমর্পিত হইয়াছে, যাঁহারা তদ্গতপ্রাণ, যাঁহারা পরস্পরকে ব্রহ্মের প্রতি প্রবোধিত করেন, যাঁহারা ব্রহ্মের কথা সর্ব্বদা কহেন, তাঁহাতেই সন্তোষ লাভ করেন, তাঁহাতেই আমোদ পান, এমন যে তাঁহারা, যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বদা যুক্ত এবং যাঁহারা তাঁহাকে প্রীতি পূর্ব্বক ভজনা করেন তাঁহাদিগকে তিনি সেই বুদ্ধি-যোগ প্রদান করেন যদ্দ্বারা তাঁহারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মজ্ঞান আমারদের সকলেরই হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে, আমারদের মনের চাঞ্চল্য বশত প্রথমে আমরা তৎপ্রতি বুদ্ধিকে স্থির করিতে পারি না। প্রীতির সহিত এবং ভক্তির সহিত পরব্রহ্মকে ভজনা করিলে মন প্রশান্ত হয়, এবং বুদ্ধি স্থির হয়; এবং সেই একনিষ্ঠ স্থির বুদ্ধিতে পরব্রহ্ম ধ্রুব তত্ত্বরূপে প্রকাশমান হন। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ তত্ত্বজ্ঞানীর কার্য্য কিরূপ, ইহা সর্ব্ব-শেষে উক্ত হইয়াছে,—তিনি যে কোন কর্ম্ম করিবেন তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন। সাংসারিক ব্যক্তিরা যে কোন সৎকর্ম্ম করেন তাহাতে আপনাকেই প্রতিবিম্বিত দেখিতে চান এবং আপনার নামকে প্রতিধ্বনিত শুনিতে চান। কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আপনার কৃত কার্য্যেতে আপনার প্রিয়তম পরমাত্মাকেই দেখিতে পান, এবং তাঁহার নামকেই শুনিতে পান; কেননা আপনা অপেক্ষা তিনি পরমাত্মাকে প্রিয় বলিয়া জানেন। পরব্রহ্মেতে যখন আমরা

আমারদের সকল কার্য্য সমর্পণ করিতে পারিব তখনই আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত পথে দণ্ডায়মান হইব। হে পরমাত্মন্! যাহাতে তোমার সেই অমৃতময় পথ অবলম্বন করিতে পারি তুমি আমারদের আত্মাতে সেইরূপ বলবীর্য্য প্রদান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সাংখ্য-দর্শন।

আত্মা।

(পূর্ব্ব পত্রিকার অনুবৃত্তি)

যাঁহারা মনকে আত্মা বলেন, পূর্ব্ব পত্রিকার প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাঁহাদের মতের ভ্রমত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক কপিলসম্মত স্বতন্ত্র ও চিৎস্বরূপ আত্মার কথা বলাই বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

মনকে আত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা ও সেই সিদ্ধান্তে বিশ্বাস রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা মোক্ষকামী জীবের পক্ষে দূষণীয়, ইহাই পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মত। তাঁহারা এ বিষয়ের নিমিত্ত ধ্যান-যোগ, সমাধি-বল, ধারণা-নিয়োগ ও প্রজ্ঞা-পরিচালন প্রভৃতি বহু আলোচনা করিয়া, পরিশেষে "নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ চিৎস্বরূপ চিদেকরস স্বতন্ত্র আত্মা নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মন্তব্য এই যে, মন বা বিজ্ঞান হইতে আত্মার স্বতন্ত্রতা মননশীল জ্ঞানী মনুষ্যের অনুভবসিদ্ধ। সেই বিদ্বদনুভব অস্মদাদির হৃদয়ারূঢ় করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত পদবী প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা,—

মন যখন স্থিরভাবে আপনাকে দর্শন করে, তখন সে উপলব্ধি করে 'আমি আত্মা নহি, আমি আত্মার অধীন, আত্মার জ্ঞান-সাধন প্রধান উপকরণ মাত্র'—আত্মা অকর্ত্তা ও অবিক্রিয়। সংশয়, নিশ্চয়, বিপর্য্যয়, সন্ধান, নির্ব্বাচন, এ সকল আত্মার সাহায্যে আমিই করি, আত্মা ইহার কিছুই করেন না।' এইরূপে মন যখন, যখন ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয় দ্বারা নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হয়, স্বীয় পরিগৃহীত বস্তু নির্বাচনে দণ্ডায়মান হয়, তখন তখনই মন আত্মা হইতে পৃথক্ হয়। আত্মাকে পৃথক্ না করিয়া মন আপনাকে নির্বাচন করিতে কখনই পারে না। এইরূপ যখন মন আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করে, তখন সে নিজে আত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। আপনি স্বতন্ত্র না হইয়া কদাচ তাহা নির্ণয় করিতে পারে না। অপিচ মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য কর দেখিবে যে, জ্ঞান-ব্যবহার কি রূপে চলিতেছে। 'আমার মন' ব্যতীত 'আমি মন' এ কথা কেহ কখন বলে না এবং কাহারও কখন ঐরূপ জ্ঞানের উদয় হয় না। এইরূপ সাহজিক জ্ঞানের ব্যবহার-পরম্পরার প্রতি লক্ষ্য করিলে আত্মার সহিত দ্রষ্টৃ দৃশ্য সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার সম্বন্ধ প্রকাশ পায় না। আত্মা দ্রষ্টা এবং মন তাঁহার দৃশ্য। আত্মার সহিত মনের যদি বাস্তবিক এইরূপ সম্বন্ধ না হয়, তবে আজন্ম জীব 'আমার মন' এইরূপ ভাবে নিমগ্ন থাকে, 'আমি মন' না ভাবিবার কারণ কি? আরও এক বিবেচনা এই যে, দেহের প্রত্যেক পদার্থের সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকাতে, 'আমার' এই সাকাঙ্ক্ষ আত্ম-প্রত্যয়ের সম্বন্ধ পূরণের নিমিত্ত অনেক গুলি বিশেষণ বা সম্বন্ধপূরক বস্তু নিকটে থাকাতে, কখন বা 'আমার মন' কখন বা 'আমার জ্ঞান' 'আমার বুদ্ধি' 'আমার হস্ত' 'আমার পদ' ইত্যাকার সমন্বিত জ্ঞান বা বিশিষ্ট জ্ঞান ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু যখন 'আমি' জ্ঞান উত্থিত হয় তখন তাহার সঙ্গে কোন প্রকার সম্বন্ধ আকাঙ্ক্ষা থাকে না, এই জন্য 'আমি' এই আত্ম-সত্তা-বোধক জ্ঞানের কোন প্রকার বিশেষণ বা

সম্বন্ধ-পূরক বস্তু অপেক্ষা করে না। অতএব 'আমি' স্বয়ং স্বতন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ ও নিঃসঙ্গ চিৎস্বরূপ।

আত্মা চৈতন্যরূপী, মন জড়রূপী। চৈতন্যের স্বভাব প্রকাশ, জড়ের স্বভাব অপ্রকাশ। মন যে জড় ও অপ্রকাশ-স্বভাব, তাহাও অনুভবসিদ্ধ। মন যদি আত্মার ন্যায় প্রকাশ-স্বভাব হইত, তাহা হইলে কদাচ সুপ্তি, মূর্চ্ছা, মুগ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইত না। যাহা যাহার স্বভাব, তাহার আত্যন্তিক উচ্ছেদ ঘটনা কখনই হয় না। স্বভাবের কি আত্যন্তিক উচ্ছেদ হয়? অগ্নি উষ্ণস্বভাব, অগ্নি আছে অথচ উষ্ণতা নাই এরূপ কি কখন হয? অতএব সুপ্তি মূর্চ্ছাদি বিবিধ অপ্রকাশ অবস্থার সার্থক্য অনুসারে আত্মার প্রকাশত্ব ও মনের জড়ত্ব নির্ণীত হয়।

আপত্তি করিতে পার যে আত্মার প্রকাশ-স্বভাব থাকিতেও উক্ত প্রকার অপ্রকাশ অবস্থা ঘটিতে পারে না? মনের প্রকাশস্বভাব থাকাতেও যে ফল, আত্মার প্রকাশস্বভাব থাকাতেও সেই ফল; সুপ্তি মূর্চ্ছাদি অপ্রকাশ অবস্থা দেখিয়া যদি মনের অপ্রকাশ-স্বভাবতা নিশ্চিত হয়—তবে আত্মারও তাহা না হয় কেন?

উত্তর এই যে, আত্মার প্রকাশ-স্বভাব তিরোহিত হয় না। সকল অবস্থাতেই আত্মার প্রকাশ থাকে। তবে কি না মনের সহিত সংযোগ অবস্থায় আত্মার প্রকাশ দ্বৈগুণ্য, আর অসংযোগ অবস্থায় স্বাভাবিক। দিবাতে গৃহ-ভিত্তিতে যে আলোক থাকে, স্বচ্ছ-কাচ দ্বারা বাহিরের আলোক ধরিয়া যদি তাহাতে নিক্ষেপ করা যায় তবে তাহা প্রবলপ্রকাশ হয়, কেননা তাহা দ্বিগুণ প্রকাশ। এই দ্বিগুণ প্রকাশের তুলনা নাই। এইরূপ, সচেতন অবস্থায় যে আত্ম-প্রকাশ, তাহাও দ্বৈগুণ্য। আত্মার প্রকাশে স্বচ্ছ অন্তঃকরণ প্রোজ্জ্বলিত থাকে, সুতরাং সে প্রকাশ দ্বিগুণিত প্রকাশ। আমরা সুদীর্ঘ কাল এই দ্বিগুণিত প্রকাশ ভোগ করিতেছি, সুতরাং যদি কখন উহার একতরের অভিভব হয় তখন আমরা মনে করি যেন আমাদের জ্ঞান বা প্রকাশ নাই। যাহারা লক্ষ উপভোগ করে তাহাদের নিকট কি একের উপভোগ ভোগ বলিয়াই গণ্য হয়, কখনই না। অতএব সুষুপ্তি বা মূর্চ্ছাদিকালে আত্মার যাহা স্বাভাবিক প্রকাশ তাহা থাকে, মনের দ্বিগুণিত প্রকাশই থাকে না। কারণ, মন তখন অভিভূত অবস্থায় থাকে? সুষুপ্তি অবস্থায়ও যে আত্মার সত্তাস্ফূর্ত্তি থাকে, তাহার প্রমাণ অনুভব। সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি বা মূর্চ্ছাভঙ্গ ব্যক্তি পরক্ষণেই অনুভব করে "আমি অজ্ঞান হইয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই, এই অনুভবের একদেশে আছে যে "আমি" "ছিলাম" এই অংশই তাৎকালিক আত্মসত্তার অনুমাপক। তৎকালে যদি কোন প্রকার সত্তাস্ফূর্ত্তি না থাকিত তাহা হইলে কদাচ জীবের ওরূপ স্মরণাত্মক জ্ঞান হইত না। অতএব আত্মার প্রকাশ সার্ব্বকালিক এবং মনের প্রকাশ ক্ষণভঙ্গুর। এই তারতম্য ঘটনা দ্বারাও নির্ণীত হয় যে, আত্মা ও মন দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ*, মন যদি আত্মা হইতে পৃথক্ বস্তু হইল, তবে দুইটি পূর্ব্বকার "মন আত্মার সত্তা স্ফূর্ত্তি বজায় রাখিয়া অন্যকেও প্রকাশ করে, একমাত্র মনের বলেই জীব সব্যাপার ও নির্ব্বাপার হয়, মনই আত্মা,

* "প্রপঞ্চমরণাদ্যভাবশ্চ" "মরণসুষুপ্ত্যাদ্যভাবশ্চ দেহস্য স্বাভাবিকচৈতন্যে স্যাৎ। মরণসুষুপ্ত্যাদিকং হি দেহস্যাচৈতনতা, সাচ স্বাভাবিকচৈতন্যে সতি নোপপদ্যতে স্বভাবস্য যাবদ্দ্রব্যভাবিত্বাৎ। "আত্মনস্তু চৈতন্যস্বভাবত্বে ন সুপ্তিমূর্ছাদিব্যবস্থাব্যাঘাতঃ।" ইত্যাদি কপিল, বিজ্ঞানভিক্ষু ও বাচস্পতি প্রভৃতি আচার্য্যদিগের মত অবলম্বন করিয়া এই প্রস্তাব সঙ্কলিত হইল।

মন ভিন্ন অন্য কোন আত্মা নাই" কথা অগ্রাহ্য ও অপ্রামাণিক বিবেচনা কর।

পূর্ব্বে আর একটি হেতুবাদের উল্লেখ আছে তাহা চৈতন্য-ঘটিত। সেই চৈতন্য-সম্বন্ধে নাস্তিকদিগের মত এই যে 'চৈতন্যং, সংহত-ভূতধর্ম্মঃ' চৈতন্য পদার্থ আর কিছুই না, উহা দেহাকারে পরিণত ভূতরাশির ধর্ম্মমাত্র। যে সকল ভূত সংযোগ-বিশেষ দ্বারা অন্তঃকরণ বা মনরূপে পরিণত হইয়াছে, চৈতন্য সেই ভৌতিক অন্তঃকরণের গুণবিশেষ।" এই অংশ নিরাকৃত হইলে কপিলের চিদাত্মবাদ আপনা আপনি সুসিদ্ধ হয়।

কপিল বলেন "ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ" দেহ ভৌতিক হইলেও চৈতন্য তাহার স্বভাব বা ধর্ম্ম নহে। চৈতন্য স্বতন্ত্র বস্তু। যখন প্রত্যেক ভূত ও নিরাত্মক ভৌতিক পদার্থ পরীক্ষা করিলে তাহার কোনটি হইতে চৈতন্য পদার্থ উদ্ধার করা যায় না তখন চৈতন্য ভূতের বা ভৌতিক পদার্থের সাংসিদ্ধিক ধর্ম্ম নহে। উহা স্বতন্ত্র বস্তু। যদি বল চৈতন্য ভূতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম না হয় না হউক, নৈমিত্তিক বা আগন্তুক ধর্ম্ম হইবার বাধা কি? গুড়, তণ্ডুল ও মধু প্রভৃতি মদ্যবীজ-পদার্থের প্রত্যেক দ্রব্যে মাদকতা শক্তি না থাকিলেও প্রক্রিয়া-বিশেষে সংহত হইলে তাহা হইতে যেমন অপূর্ব্ব মাদকতা শক্তি প্রকাশ পায়, সেইরূপ, ভূত-নিচয়ের প্রত্যেকে চৈতন্য না থাকিলেও সংযোগ ও প্রক্রিয়া-বিশেষের বলে তাহা হইতে অপূর্ব্ব চৈতন্য সমুদ্ভব হয়।" একথা বলা যায় না। যেহেতু যাহা প্রত্যেকে না থাকে, তাহা সমুদায়েও থাকে না। দৃষ্টান্তটিও অনুমানের উপযোগী হয় নাই। মদ্যবীজের প্রত্যেক দ্রব্য পরীক্ষা করিলে জানা যায় যে, সেই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্যে অতি সূক্ষ্মরূপে মাদকতা শক্তি আছে। সেই কারণে তাহা সংঘাত হইলে মাদকতা শক্তিও সংহত হয়। যখন প্রত্যেক দ্রব্যে লুক্কায়িত ছিল, তখন তাহা সূক্ষ্মভাবেই ছিল, সুতরাং বোধগম্য হইত না। পরে যখন প্রত্যেক দ্রব্যের সূক্ষ্ম মাদক অংশ একত্রিত হইয়া স্থূল হইল, তখন তাহা স্বীয় বল প্রকাশ করিল, কিন্তু ভূতের সম্বন্ধে সে রূপ দৃষ্টান্ত খাটে না। শত সহস্র পরীক্ষা প্রয়োগ করিলেও কোন ভূতে চৈতন্য লুক্কায়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব চৈতন্য পদার্থ ভূতের ধর্ম্ম নহে, ভৌতিক দেহের ধর্ম্ম নহে, মন বা অন্তঃকরণের ধর্ম্মও নহে, উহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্র অবিনাশী অনুৎপন্ন নির্বিকার চৈতন্য পদার্থ আত্মা; মন প্রভৃতি ইহাঁর বলেই কার্য্য করিতেছে। এই চিৎস্বরূপ আত্মা সাংখ্যমতে অনন্তসংখ্য এবং প্রত্যেক আত্মাই বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক। যেমন অনন্ত দীপ প্রজ্বলিত হইলে প্রত্যেক দীপই ব্যাপক অর্থাৎ পরস্পরের অবিরোধে এবং পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় এই আত্মাও পরস্পর পরস্পরের অবিরোধে বর্ত্তমান আছে। আত্মার বিভুত্ব সম্বন্ধে সমস্ত হিন্দু দর্শনের সম্মতি আছে। আত্মার বিভুত্বনির্ণায়ক যে সকল তর্ক ও যুক্তি আছে সে সকল পরিত্যাগ করা গেল। কোন কোন মতে এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে যে আত্মা ঈশ্বরের অংশ এবং কোন কোন মতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, আত্মা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হয়। এই মতদ্বয় সাংখ্য-সম্মত নহে। এজন্য আমরা আগামী পত্রিকায় অংশের বিবরণ প্রকাশ করিব, এবং কতকগুলি আত্মার ঔপাধিক গুণ বর্ণন করিয়া প্রস্তাব শেষ করিব*।

* এই সকল মত খণ্ডন দেখিয়া আপাততঃ সাধ

নিরীশ্বর বিবাহ।

আমারদিগের পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, অদ্য চারি বৎসর হইল শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুবর্ত্তী ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্ম-বিবাহ আদালতে অবৈধ গণ্য হইবার আশঙ্কায় যাহাতে ঐ বিবাহ বৈধ বলিয়া গণ্য হয় এই প্রকার আইনের প্রণয়ন জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করেন; কিন্তু অন্য অন্য ব্রাহ্মেরা এই প্রকার আইন প্রচারিত হইলে তদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ব্যাঘাত হইবে এই আশঙ্কা করিয়া প্রস্তাবিত আইনের প্রতিবাদ করেন। তাঁহারা এই কথা বলিয়াছিলেন যে, হিন্দু-সমাজ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে হিন্দু-ধর্ম্মের সারাংশ বলিয়া গণ্য করেন, অতএব ব্রাহ্মেরা হিন্দু—কিন্তু উক্ত আইন বিধিবদ্ধ হইলে তাঁহারা যেন হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক্, লোকে এইরূপ মনে করিবে। ইহা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রচার-কার্য্যের মঙ্গলার্থে কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। শেষোক্ত ব্রাহ্মেরা এইরূপ আপত্তি করাতে ব্যবস্থাপক সভা প্রস্তাবিত আইনের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা নিয়মবদ্ধ করিলেন। পূর্ব্বে এই আইনের প্রথমে তাহা ব্রাহ্মদিগের জন্য করা হইতেছে এইরূপ উল্লেখ ছিল। কিন্তু এক্ষণে কোন ধর্ম্মের সহিত সংশ্রব না রাখিয়া উহা ১৮৭২ শালের তৃতীয় একট নামে নিয়ম-বদ্ধ হইল। উক্ত আইনে এতদ্রূপ বিধান আছে যে, কোন ব্যক্তির ধর্ম্ম-মত যাহা হউক না কেন, এমন কি নাস্তিক পর্য্যন্ত, ঐ আইন অনুসারে বিবাহ করিলে সেই বিবাহ বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে। ঐ আইন-বিহিত বিবাহ-প্রণালীতে কোন স্থানে ঈশ্বরের নাম-গন্ধ নাই। বাটী কিংবা ভূমি-সংক্রান্ত দলিল রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে যেমন রেজিষ্টরি করিতে হয়, তেমনি ঐ বিবাহে স্ত্রীকে এবং স্বামীকে রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে রেজিষ্ট্রারি করিয়া দিতে হয়। এতদ্রূপ বিবাহকে নিরীশ্বর বিবাহ বলিলে অযুক্ত সংজ্ঞা প্রদান করা হয় না।

উক্ত আইন যখন স্থিরীকৃত হয়, তখন রাজ-নিয়মার্থী ব্রাহ্মেরা বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্ম-বিবাহের আইন হইল। কিন্তু ব্রাহ্ম-বিবাহের সহিত এতদ্রূপ বিবাহের যে কি সম্বন্ধ আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। পৃথিবীতে যখন যে ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক উদিত হইয়াছেন, তখন তাঁহার বিহিত নূতন বিবাহ-প্রণালী তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগের মধ্যে বৈধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে—তাঁহারা উক্ত বিবাহ-প্রণালী বৈধ করিবার জন্য কখনো রাজ-সহায় প্রার্থনা করেন নাই। ঈশ্বরের সম্মুখে উদ্বাহ-কার্য্য সম্পাদিত হইলে তাঁহারা সেই বিবাহের বৈধতা জন্য তাহা যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন। প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি এই রূপ মনে করিবেন, ইহার বিচিত্র কি? ধর্ম্মের সঙ্গে পার্থিব বিবেচনা মিশ্রিত করিয়া উদ্বাহ-কার্য্য সম্পাদন করা এবং সকল প্রকার পার্থিব বিবেচনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া তাহা সম্পাদন করা; এই দুই প্রকার বিবাহের মধ্যে শেষোক্ত প্রকার বিবাহ যে মহত্তর, তাহা আইনের অত্যন্ত পক্ষপাতী ব্যক্তিও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

হয় যে সাংখ্য-দর্শন বৌদ্ধ চার্ব্বাক প্রভৃতি নাস্তিক দর্শনকারগণের পরভাবী। বস্তুতঃ তাহা নহে। যাঁহারা তত্ত্বান্বেষী তাঁহাদের মনে সকল প্রকার পক্ষেরই উদয় হইয়া থাকে। পশ্চাৎ যে পক্ষে যাহার রুচি ও বিশ্বাস সে পক্ষেই নিশ্চয় করিয়া যায়। কপিল প্রভৃতি ঋষিদিগের ঐরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। যে সকল পক্ষে তাঁহাদের রুচি বিশ্বাস হয় নাই, সে সমস্তকে পূর্ব্বপক্ষ স্থানে রাখিয়া সিদ্ধান্ত পক্ষে তাহা অপেক্ষা উচ্চতর বস্তু গ্রহণ করিয়াছেন। নাস্তিক সম্প্রদায়ের লোকেরা সেই সমস্ত পূর্ব্ব পক্ষকে ভাল বিবেচনা করিয়া তাহাই সিদ্ধান্ত পক্ষে নীত করিয়াছেন।

উল্লিখিত ব্রাহ্মেরা নিরীশ্বর বিবাহ-প্রণালীর দোষ ক্ষালন জন্য তাহার সঙ্গে ঈশ্বরোপাসনা সংযুক্ত করিয়া থাকেন; কিন্তু বিবেচনা করিলে প্রতীতি হইবে যে, তাহাতে সে দোষের ক্ষালন হয় না। উপাসনাত্মক ধর্ম্মানুপ্রাণিত বিবাহের সহিত নিরীশ্বর বিবাহ সংযুক্ত করিলে ধর্ম্মানুপ্রাণিত বিবাহের অবমাননা করা হয়। যাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি এতদ্রূপ নির্ভর করিতে উপদেশ দেন যে, কল্য কি প্রকারে চলিবে অদ্য তাহার বিবেচনা করা উচিত হয় না, তাঁহারা আবার ধর্ম্মের সঙ্গে পার্থিব বিবেচনা মিশ্রিত করিয়া উদ্বাহ-কার্য্য কেন সম্পাদন করেন তাহা আমরা স্থির করিতে পারি না। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি লোকের ধর্ম্মানুপ্রাণিত বিবাহ অবৈধ জ্ঞান করাকে কখনই প্রশ্রয় দিবেন না। উল্লিখিত ব্রাহ্মেরা অম্লানবদনে এরূপ প্রশ্রয় কিরূপে প্রদান করেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

যাঁহারা উক্ত প্রণালী অনুসারে বিবাহ দিয়াছেন, তাঁহারদিগকে আর আমরা কি বলিব? যাঁহারা ঐ প্রকার প্রণালীতে বিবাহ দিতে উন্মুখ, তাঁহারদিগকে আমরা সাবধান করিয়া দিতেছি। তাঁহারা উক্ত দোষাবহ প্রণালী যেন অবলম্বন না করেন। ঐ প্রণালী অনুসারে বিবাহ দিলে একেবারে হিন্দু-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়। যখন বিবাহের পূর্ব্বে বর-কন্যাকে 'আমরা হিন্দু নই' বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তখন তাঁহারা আর কিরূপে হিন্দুসমাজে থাকিতে পারেন? আমরা যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম রক্ষা করিয়া অপৌত্তলিক ভাবে বিবাহ দিয়া সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন না হই, তবে সে কি প্রার্থনীয় নহে? আমরা শ্রুত হইলাম যে, সম্প্রতি উক্ত প্রণালী অনুসারে একটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে দুইটী ভদ্রবংশ লিপ্ত হইয়াছে। কন্যাকর্ত্তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাকি কন্যাকর্ত্তাকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, তুমি যদি আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রণালী অনুসারে বিবাহ দেও; তাহা হইলে আমারদিগের পৈতৃক বাটীতে বিবাহ দিতে পার, নচেৎ তাহা তোমার অন্যত্র দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা শুনিতে পাই যে, কন্যাকর্ত্তা তাহাতে অসম্মত হইয়া অন্যত্র বিবাহ দেন। হিন্দুসমাজে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবিষ্ট করাইবার এমন সুযোগ থাকিতে কন্যাকর্ত্তা কেন যে সে সুযোগ অবহেলা করিলেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। বিশেষতঃ বরকর্ত্তা এমন প্রবীন ব্যক্তি এবং যৌবন কাল হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগী হইয়া এরূপ প্রণালীতে আপনার পুত্রের বিবাহ দিতে যে সম্মত হইলেন, ইহা অল্প আক্ষেপ ও দুঃখের বিষয় নহে।

উল্লিখিত বিবাহ-প্রণালী আর একটী কারণে আপত্তি-জনক। ঐ প্রণালী অনুসারে বিবাহ-কার্য্য সম্পাদিত হইলে স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার অধিকতর সুবিধা প্রাপ্ত হয়, এবং যাহা আমারদিগের দেশে কখন ঘটে নাই, স্ত্রীও স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারে। ইহাতে পতি-পত্নীর অকাট্য চির-সম্বন্ধ নিরাকৃত হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মেরা পৌত্তলিক অংশ বর্জ্জন করিয়া প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ দিয়া থাকেন। এবংপ্রকার বিবাহ আদালতে বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না কেন ইহা আমরা স্থির করিতে পারি না। বিশেষতঃ যখন কাশী নবদ্বীপ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানের পণ্ডিতেরা এতদ্রূপ বিবাহ বৈধ বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন, তখন ঐ প্রকার বিবাহ অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে কেন আমরা আমারদিগের শাস্ত্রের ব্যবস্থা অবহেলা করিয়া রাজ-নিয়মের অধীন হই? আমরা রাজ্যবিষয়ে স্বাধীনতা হারাইয়াছি, আবার কি সামাজিক বিষয়েও

স্বাধীনতা হারাইতে হইবে? যাহার কোন বিষয়ে স্বাধীনতা নাই, তাহার কি কিছু মাত্র মনুষ্যত্ব থাকে? সামাজিক বিষয়ে ইংরাজ রাজ-পুরুষদিগের একবার হাতে যাইলে তাঁহারা ঐ বিষয়ে ক্রমে অধিকতর আধিপত্য করিতে থাকিবেন। তখন অনুতাপ করিতে হইবে যে, কেন তাঁহাদিগকে আমারদিগের সামাজিক বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে দিয়াছিলাম।

ব্রাহ্ম-বিবাহের আইনের জন্য আন্দোলনের সময় কোন ব্রাহ্ম সাধারণ ব্রাহ্মদিগের প্রতি যে একটী সম্বোধন-পত্র ইংরাজীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি; তাহাতে এই প্রকৃত প্রস্তাবের বিলক্ষণ পোষকতা আছে।

An Appeal.

To

THE BRAHMOS OF INDIA.

Dear Brethren.

* * * * *

The Bill in question imposes a new form of marriage in the presence of the Registrar which bears on its face an implication that that form is indispensably necessary for the validity of Brahmo marriages whether they had been previously solemnized according to Brahmic rites or not. It is therefore plain that the Bill consider the solemnization of Brahmo marriages according to Brahmic rites a non-essential point. What! are Brahmic noptial rites nothing, and the form of marriage imposed by the Legtslature every thing? Is not this a plain insult to our religion? I do not condemn the Legislature for this but those who applied for the law. What could the Legislature do when they were implored to make such law? How could the applicants for the law, being religious men, act in this way I am at a loss to conceive. Had the Bill ordained the simple registration of marriages previousiy solemnized according to Brahmic rites only, it would have been a different thing. but when the Legislature is going to impose a civil form of marriage contrary to the spirit of the Brahmic form, how can you, I ask, being true Brahmos, submit to the same? You must have lost every sense of respect towards our holy religion if you can do so. You deceive yourselves with the thought that the civil form is a mere superadditon to the religious. How can this be, when the religious rites are nonessential, and the civil form the essential thing in the matter? * * * *

There is another point to be taken into consideration in connection with the Bill and that the most important one. For the first time in the history of India, the Government is going to interfere with the religion of a class of Her Majesty's Indian subjects, by rendering a civil ceremony essential for the validity of a religious one. Who is to be blamed for this? Not Government, but we ourselves who are going to surrender our religous rights into its hands of our own accord. The former Mahomedan Government as well as the present English Government have all along allowed Mahomedans or Hindoos differing from the orthodox faith to determine their own rites, manners and custom, and never questioned the legal validity of those rites and customs. The Seikhs, the Nanukpunthees, the Kubeer-punthees, the Sadhs, the Chaitanya Vaishnavas, the Ferazees, the newly sprung up Kokas of the Punjab as well as numerous other bodies of heterodox Hindoos or Mahomedans have all along enjoyed this privilege, as a spiritual patrimonial right handed down from generation to generatioh. Why should we only, Brahmos, be deprived of it? Never before this time did the Government interfere with this privilege. In the case of the abolition of the Suttee rite, the Gevernment did not act contrary to the dictates of the Shasters which were plainly proved by the illustrious founder of our religion, the Raja Rammohun Roy as not sanctioning that rite. In that of the widow marriage act, the Government simply enforced the ordinance of Parasara. In these two cases, Government did not interfere with the religion of any class of Her Majesty's Indian subjects. Now for the first time it is going to take away from us the right which all heterodox Hindoos and Mahomedans have all along enjoyed. If Government take away this privilege from our hands, we sball be obliged at every step in future to solicit government interference iu our roligious and social concerns. Just consider the calamitous consequences that will flow from the same. Better that our sons be deprived of their patrimonial inheritance than part with our religious independence. Never before in the history of India did any such instance occur of a body of religious men surrendering their religious rights into the hands of the Government of their own accord in the way we are doing. Ever in its pages will this stain remain over our memory. How can we professing a religion higher and nobler than all others commit such an ignoble act? Have we got less religious spirit than the followers of other religions? If so, we should not vaunt any more of our religion being the highest of all. Many in India suffered martyrdom before for the sake of religious independence. Are we Brahmos so base as to part with it of our own will? You will gradually lose all spirit and energy if you conduct yourselves in this way from this time, and I assure you that no nation—no religious denomination in the world will look upon you in future with any feeling of respect. * * *

A Brahmo.

জৈন ধর্ম্ম।

হেমচন্দ্র আচার্য্য-বিরচিত অভিধান-চিন্তামণি নামক সংস্কৃত অভিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে বিবিধ সম্প্রদায়ের উল্লেখ এবং পরস্পরভেদ বিবৃত আছে। তন্মধ্যে আমরা অষ্টবিধ সম্প্রদায়ের নাম দেখিতে পাইলাম। আর্হত বা জৈন, সৌগত বা বৌদ্ধ, নৈয়ায়িক বা ন্যায়দর্শনাবলম্বী, যোগী বা পাতঞ্জল দর্শনাবলম্বী, কাপিল বা কপিলপ্রণীত নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনবাদী, কাণাদ বা কণাদপ্রণীত বৈশেষিক দর্শনানুসারী, বার্হস্পত্য বা নাস্তিক এবং লোকায়তিক বা চার্বাকদর্শনবাদী। এস্থলে জৈন শব্দ প্রথমে নির্দ্দেশ করিবার হেতু এই, যে, হেমচন্দ্র স্বয়ং একজন জৈন ছিলেন। ইহাঁর প্রণীত একখানি জিনস্তোত্রের টীকা ১২১৪ শকাব্দে লিখিত হয়। ১২১৪ শকাব্দা ১২৯২ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং হেমচন্দ্র উহার পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জৈনধর্ম্ম এক্ষণে আমাদিগের বিবেচ্য।

তিমিরাচ্ছন্ন প্রদেশে অবস্থিত ব্যক্তির যেরূপ সম্মুখে সকল বস্তুসত্তেও একমাত্র আলোকাভাবে কোন বস্তুরই সম্যক্ প্রতীতি হয় না তদ্রূপ ভারতবর্ষে একমাত্র প্রকৃত ইতিহাসের অসদ্ভাবে কোন বিষয়েরই সম্যক্ উন্মেষ হয় না। সকল বিষয়েই ভারতবাসী আর্য্যগণ বিলক্ষণ কুশল ছিলেন, কিন্তু কি কারণে যে তাঁহারা ইতিহাস পুরাবৃত্তাদি

নিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। তাঁহারা কাব্যরসেই উন্মত্ত ছিলেন, সুতরাং ইতিহাসরসে তাঁহাদিগের রুচি ছিল না। ভারতবর্ষের বিবিধ দর্শনশাস্ত্র এবং বিবিধ ধর্ম্মপ্রণালীর ন্যায় জৈনধর্ম্মেরও পুরাবৃত্তাদি দুর্লভ। জৈনধর্ম্মবিষয়ক বহুসংখ্যক গ্রন্থ আছে বটে কিন্তু তাহাদিগের কোন অংশেই পুরাবৃত্তঘটিত কোন বিশেষ বিবরণ লক্ষিত হয় না। হেমচন্দ্রকোষ, জৈন কল্পসূত্র, মহাবীরচরিত, ঋষভস্তোত্র, পার্শ্বনাথচরিত, জৈনগ্রন্থ, জৈনশাস্ত্র, নবতত্ত্ব, জৈনপুরাণসংগ্রহ ও আর্হতদর্শন প্রভৃতি নানাবিধ জৈনগ্রন্থ এবং নানাবিধ তাম্রশাসন-পত্র পর্য্যালোচনা করিলে জৈন ধর্ম্মরহস্যের কতক উন্মেষ হইতে পারে এবং এই সমস্তই অবলম্বন পূর্ব্বক আমরা এই জৈনধর্ম্মশীর্ষক প্রস্তাবে ক্রমশঃ জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি, প্রবর্ত্তক, সময়নিরূপণ, মত, বিস্তার, ফলাফল এবং মতপরীক্ষা সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

জৈনগ্রন্থসমূহে যেরূপ বিবরণ আছে তাহা আলোচনা করিলে এবং দাক্ষিণাত্য, বেহার প্রভৃতি প্রদেশে জৈনদিগের যে সমস্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ ও স্তূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা পরিদর্শন করিলে সম্যক্ উপলব্ধি হইবে যে, জৈনধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা আধুনিক পদার্থ। প্রকৃত প্রস্তাবেও তাহাই ঘটিয়াছিল। মতভেদবিষয়ে জৈনধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্মের এবং বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তর্বর্ত্তী। ইহার অনেকাংশে হিন্দুধর্ম্মের সহিত এবং অনেকাংশে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত সাদৃশ্য আছে। জৈনেরা হিন্দুদিগের জাতিভেদ স্বীকার করিয়া থাকে এবং জন্মাবধি বিবাহ পর্য্যন্ত হিন্দুসংস্কার গুলি পালন করে। জৈনেরা হিন্দুদিগের উপবাসাদির অনুষ্ঠান করে এবং হিন্দুদেবদেবীর মধ্যে অনেকেরই পূজা করে। কিন্তু বৌদ্ধদিগের ন্যায় তাহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না। এবং বৈদিক যজ্ঞে পশুবধ তাহাদিগের অতীব অশ্রদ্ধেয়। তাহারা হিন্দুদেবদেবীর পূজা করে সত্য কিন্তু তাহাদিগের শ্রেষ্ঠ দেবতাস্বরূপ তীর্থকরদিগের অপেক্ষা তৎসমুদায় নিকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করে। বৌদ্ধ এবং জৈন উভয় সম্প্রদায়ই কতকগুলি প্রভুর অর্চনা করিয়া থাকে। বৌদ্ধ প্রভুদিগকে বুদ্ধ বলে এবং জৈন প্রভুদিগকে জিন, অর্থাৎ তীর্থকর বলে। প্রভু শব্দের অর্থ এই যে তাঁহারা সংসার হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট ও সর্ব্বজ্ঞ। উভয়ের মতেই প্রথম প্রভুদিগের অপেক্ষা পরবর্ত্তী প্রভুরা হীনতর এবং অল্পতর ক্ষমতাবিশিষ্ট, অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে বুদ্ধ অথবা তীর্থকর উভয়বিধ প্রভুরই শক্তি হ্রাস হইয়া থাকে। অধুনা অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্ম এবং জৈনধর্ম্মের প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত গোলযোগ করিয়া ফেলেন। তাঁহারা শ্রমণ শব্দ দেখিলেই জৈন বলিয়া গ্রহণ করেন। এমন কি শাক্যশ্রমণক শব্দও তাঁহাদিগের মতে জৈনবাচী। শ্রমণ শব্দ গ্রীসীয় গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রমণ শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলেই সন্দেহ নিরাস হইবেক। শ্রমণ শব্দের অর্থ বিবিধ প্রকার। কতকগুলি বিশেষ লক্ষণবিশিষ্ট বনবাসীকে শ্রমণ বলে, ভিক্ষুক মাত্রকে শ্রমণ বলে এবং শূদ্রসন্ন্যাসীকেও শ্রমণ বলে। অতএব শ্রমণ শব্দে বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই উপাসকদিগকে বুঝায়। এই নিমিত্তই সংস্কৃত গ্রন্থে শাক্যশ্রমণক এবং শাক্যভিক্ষু শব্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শাক্যশ্রমণক শব্দে বৌদ্ধসন্ন্যাসী বুঝায়। সুতরাং গ্রীস দেশীয় গ্রন্থকারদিগের উল্লিখিত শ্রমণ শব্দ দ্বারা যে জৈন বুঝিতে হইবে এমন

কোন বিনিগমনা নাই। গ্রীসীয়েরা যে কোন্ প্রকার ব্যক্তি দেখিয়া তাহাদিগকে শ্রমণক সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা নিশ্চয় করা দুরূহ। এবিষয়ে তাঁহাদিগের ভ্রম হওয়াই অধিক সম্ভব। তাঁহারা বুঝিতে না পারিয়া হিন্দুসমাজের নানাবিধ বিভাগ এবং সংজ্ঞা কল্পনা পূর্ব্বক স্ব স্ব গ্রন্থে নিবেশিত করিয়াছেন। তাঁহারা চন্দ্রগুপ্তের সাণ্ড্রাকোটস্ (Sandracotas) বা জাণ্ড্রামেস্ (Xandrames) নামে যে উল্লেখ এবং বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বিষম ভ্রান্তির ফল। কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, সাণ্ড্রাকোটস্ এবং জাণ্ড্রামেস্ উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি নহেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে প্রতীতি হইবে যে, গ্রীসীয়েরা যে শ্রমণ শব্দে কোন্ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। পুনর্ব্বার গ্রীসীয়েরা* প্রমাণী নামে আর এক সম্প্রদায়ের বর্ণনা করিয়াছেন। প্রমাণীরা ব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন এবং তর্কবিতর্ক করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পরিহাস করিতেন। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, প্রমাণী শব্দ দ্বারা জৈন-সম্প্রদায় বুঝিতে হইবেক, কিন্তু এবিষয়ে কোন অনুকূল তর্ক দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রমাণী শব্দ যে জৈনবাচী তাহার কোন প্রমাণ নাই। প্রমাণীরা প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহারা যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে না পান তাহা স্বীকার করেন না। প্রমাণীরা সুতরাং বেদের প্রামাণ্য স্বীকারে অসমর্থ এবং তাঁহারা বেদের প্রতিবাদ করেন। জৈনেরাও বেদের প্রমাণ্য স্বীকার করেন না এবং বেদের প্রতিবাদ করেন। এই সাদৃশ্য দর্শনেই বোধ হয় প্রমাণী এবং জৈন শব্দ একপর্য্যায় বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকিবে। জৈনেরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ গ্রাহ্য করেন বটে, কিন্তু তদতিরিক্ত অনুমানও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। যে হেতু জৈনদিগের বিবিধ আখ্যায়িকাতে উল্লিখিত মহাপুরুষদিগের অস্তিত্ব বিষয়ে অটল বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, তাঁহারা অনুমানকেও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। প্রত্যক্ষ দ্বারা মহাপুরুষ বিষয়ে কোন জ্ঞান হইতে পারে না, সুতরাং অনুমানের আবশ্যক। এক্ষণে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, জৈন সম্প্রদায় প্রমাণী শব্দের অভিধেয় নহে।

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে জৈন শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। অনেক গ্রন্থে বৌদ্ধ মতের প্রতিবাদ ও নিরাকরণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু জৈন বা অর্হৎ শব্দের কুত্রাপি উল্লেখ নাই। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শঙ্করাচার্য্য বেদান্তভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে জৈনমত খণ্ডন করিয়াছেন। অনেকে বলেন, 'প্রাচীন গ্রন্থকারেরা জৈন অর্থে বৌদ্ধ বা শাক্য বা শাক্যভিক্ষু শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। আমরা বলি যে, প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের এ ভ্রম কখনই সম্ভব হইতে পারে না। তাঁহারা যে স্থলে বৌদ্ধ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তথায় প্রকৃত বৌদ্ধই বুঝিতে হইবে। যদি জৈন শব্দ অথবা অর্হৎ শব্দ তাঁহাদিগের জ্ঞাত থাকিত তাহা হইলে জৈন অর্থে তাঁহারা কখনই বৌদ্ধ প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তি গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে প্রযুক্ত শাক্য প্রভৃতি শব্দ জৈন বুঝাইলেও বুঝাইতে পারে, কারণ বৌদ্ধেরা শঙ্করাচার্য্যের কঠোর প্রতিবাদে উদ্বেজিত হইয়া, ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে পর জৈনেরা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে শাক্য প্রভৃতি শব্দ জৈনবাচী হইতে পারে না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহাদিগের সময়ে জৈনধর্ম্মের আবির্ভাব

* 'Pramnas' in Strabo. XV. C. L.

হয় নাই। জৈনধর্ম্মের সময়-নিরূপণ-প্রস্তাবে এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করা যাইবে।

জৈনগ্রন্থসমূহের মতে জৈনধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্ম এক বৃক্ষের ফল। তাহাদের মত এই যে, জৈনধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক গৌতম অথবা শাক্যসিংহ। জৈনধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাবীর বা বর্দ্ধমানের শিষ্য। তন্মতে মহাবীর খৃঃ পূঃ ৬০০ বৎসরে সংসার ত্যাগ করেন এবং গৌতম ৫৪৩ বৎসরে মানবলীলা শেষ করেন। জৈন গৌতমের অপর নাম ইন্দ্রভূতি। ইনি গোতম-গোত্রোৎপন্ন মগধনিবাসী বসুভূতি নামক জনৈক ব্রাহ্মণের তনয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু বৌদ্ধ গৌতম ক্ষত্রিয় সিদ্ধোদন রাজার পুত্র। সুতরাং জৈনদিগের এরূপ অভেদ কল্পনা কেবল নিজ গরিমা প্রকাশের জন্যই বোধ হয়। এবিধায় জৈনধর্ম্ম যে বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা আধুনিক পদার্থ তাহার আর কোন সন্দেহ নাই, যে হেতু জৈনেরা কেবল স্বধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই বৌদ্ধধর্ম্মের মূল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অনেকের মতে পার্শ্বনাথ জৈনধর্ম্মের উদ্ভাবয়িতা, কিন্তু তন্মতপোষক কোন বিশেষ যুক্তি দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক, সে বিষয় আমরা প্রবর্ত্তক-নির্দ্দেশ-প্রস্তাবে বিশেষরূপে বলিব। পুনর্ব্বার যাঁহারা বলেন, ঋষভদেব জৈনধর্ম্ম উদ্ভাবন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, ভাগবত পুরাণের পঞ্চম স্কন্ধে যে ঋষভের আবির্ভাব এবং চরিত বর্ণিত আছে তাঁহার সহিত ইহাঁর ভেদ কি অভেদ? কল্পসূত্রের অনুসারে ঋষভ ঈক্ষ্বাকুবংশীয় নাভিরাজার পুত্র এবং তিনি কোশলা দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। ঋষভ প্রথম রাজা, প্রথম ভিক্ষাকর, প্রথম জিন এবং প্রথম তীর্থঙ্কর। ভাগবতের ঋষভ এবং জৈন ঋষভ যে অভিন্ন ব্যক্তি তাহা বলিতে আমরা সাহসী নহি। ভাগবতের ঋষভ সনাতন আর্য্যধর্ম্মানুরাগী এবং ভগবানের অবতার, কিন্তু জৈন ঋষভ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগী বলিয়া খ্যাত, ইহা দ্বারাও জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না।

জৈনধর্ম্মবিষয়ে যে প্রমাণসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের পরবর্ত্তী। বৌদ্ধধর্ম্মের সার সংকলন পূর্ব্বক জৈনেরা স্বধর্ম্ম সংস্থাপন করেন এবং তন্মধ্যে কতকগুলি নূতন বিষয়ও সন্নিবেশিত করেন। এই প্রকারে জৈনধর্ম্মের উদ্ভাবন হয়। বৌদ্ধ ও জৈন এতদুভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ মতভেদ থাকাতে ক্রমশঃ পরস্পরের মনোমালিন্য বর্দ্ধিত হয়। যৎকালে হিন্দুগণ বৌদ্ধদিগের প্রতিবাদ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদে প্রবৃত্ত হয়েন তখন জৈনেরা হিন্দুপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধদিগের দমনার্থ হিন্দুদিগের সহায়তা করিয়াছিলেন। এই সময়েই জৈনেরা স্বধর্ম্মমধ্যে অনেক হিন্দু আচার ব্যবহার নিবিষ্ট করেন। এইরূপে ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যূনবলতা এবং উচ্ছেদের সহিত জৈনধর্ম্ম ভারতের অনেক স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে প্রবাদ আছে, কাঞ্চী নগরে বৌদ্ধেরা বাস করিত, কিন্তু অকলঙ্ক নামক জনৈক জৈন উপাসকের সহিত তর্কবিতর্কে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া তাহারা ঐ দেশ ত্যাগ করে। গুজরাটের (গুর্জ্জরের) ইতিহাস রাসমালায় লিখিত আছে যে, তত্রত্য বৌদ্ধনৃপতিগণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন এবং বৌদ্ধদিগের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন, এতদ্ভিন্ন অনেক রাজার বৌদ্ধধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক জৈনধর্ম্ম পরিগ্রহণ

অনেক স্থলে উল্লিখিত আছে। এই সমস্ত যুক্তি দ্বারা প্রমানিত হইতেছে যে, বৌদ্ধধর্ম্মাপেক্ষা জৈনধর্ম্ম অনেক আধুনিক। ভারতবর্ষে আদিম কালে বৈদিক ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। তখন হৃদয়ের কাল ছিল, কিন্তু বিচারের কাল আরম্ভ হইলে পর উপনিষদ এবং দর্শনশাস্ত্রের উদ্ভাবন হয়। ক্রমশঃ বিচারের যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই সমাজের ভাব পরিবর্ত্ত হইয়া, বৌদ্ধধর্ম্ম তৎপরে জৈনধর্ম্ম এবং তৎপরে অন্যান্য ধর্ম্মের উদ্ভব হইতে লাগিল।

বৈদিক আর্য্যসমাজ।

বেদ যে চিরকাল হিন্দুসমাজে অভ্রান্ত এবং প্রমাণ বলিয়া মান্য ও সমাদরণীয় হইয়া আসিতেছে তাহাই প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, পুরাণ, মহাভারত এবং ষড়দর্শন হইতে বেদের উৎপত্তি-বিভাগ, প্রামাণ্যবিভাগ প্রভৃতি বিষয়ে বিবিধ মত সমালোচনা করা হইয়াছে। বেদের সহিত উপনিষদের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, উপনিষৎ বেদের চরম অংশ। যজুর্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, উপনিষৎ বেদের সার। বেদের মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণভাগ কেবল হৃদয়ের ও বিশ্বাসের কালের নিদর্শন। উপনিষৎ বিচারের বিশেষ সাক্ষ্য দিতেছে। উপনিষৎ হইতে দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি, সুতরাং উপনিষৎ এবং দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অতএব বেদশাস্ত্রের সহিত দর্শনের বিশেষ সম্বন্ধ স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে। এই নিমিত্তই দর্শন হইতে বেদের প্রামাণ্যবিষয়ে মতসমূহ প্রকটিত হইয়াছে। হিন্দুসমাজের অতি শৈশব অবস্থা হইতেই তর্কের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা তর্করসিক ছিলেন। তাঁহারা তর্কতরঙ্গে বিশেষ কৌতূহল প্রাপ্ত হইতেন এবং তাহাই চরিতার্থ করিবার জন্য সকল বিষয় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত করিতেন। এইরূপে অতি গুরুতর বিষয়েও নিতান্ত কাল্পনিক ও অতিশয় ভয়ানক মত সকল প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যে সমুদয় যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তন্মধ্যে কোন দুর্যুক্তি নিবেশিত হয় নাই।

এক্ষণে মন্বাদিপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র হইতে বেদের প্রামাণ্য এবং সমাদরপ্রতিপাদক কতকগুলি বচন সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। গৃহ্যসূত্র এবং সাময়াচারিকসূত্র দ্বারা বেদ এবং স্মৃতি পরস্পর সম্বদ্ধ। মহর্ষিরা বেদার্থ স্মরণ পূর্ব্বক যে সকল শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তৎসমুদায়েরই নাম স্মৃতি শাস্ত্র। স্মৃতিসমূহ বেদমূলক বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া থাকে। যে স্মৃতিতে বেদার্থ যত পরিমাণে উপনিবদ্ধ আছে তাহা তদনুসারে প্রধান এবং আদরণীয়। স্মৃতিকেই ধর্ম্মশাস্ত্র কহে। প্রাচীন স্মৃতির সংখ্যা বিংশতি, তন্মধ্যে মনুসংহিতা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বৃহস্পতি বলিয়াছেন,

বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতং।
মন্বর্থবিপরীতা তু যা স্মৃতিঃ সা ন শস্যতে॥

বেদার্থ সম্যকরূপে নিবেশিত হইয়াছে বলিয়াই মনুসংহিতার প্রাধান্য এবং মনুসংহিতার বিপরীত-মত-বিশিষ্ট স্মৃতির আদর নাই। বশিষ্ঠসংহিতা, হারীতসংহিতা, ব্যাসসংহিতা এবং পরাশরসংহিতা সাত্ত্বিকসংহিতার অন্তর্গত। অত্রিসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা, দক্ষসংহিতা এবং কাত্যায়নসংহিতা রাজসিকসংহিতা বলিয়া কীর্ত্তিত। বৃহস্পতিসংহিতা, সম্বর্ত্তসংহিতা, যমসংহিতা এবং শংখসংহিতা তামসিকসংহিতার অন্তর্নিবিষ্ট। এই চতুর্দশ সংহিতা হইতে আমরা বচন সংগ্রহ করিব। এতদ্ভিন্ন উশনাসংহিতা, অঙ্গিরা-

সংহিতা, আপস্তম্বসংহিতা, লিখিতসংহিতা, গোতমসংহিতা এবং শাতাতপসংহিতা নামে ষট্ প্রাচীন সংহিতা আছে।

মনুসংহিতা। ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং দ্বাদশাধ্যায়ে বিভক্ত। ইহার মতে বেদের সংখ্যা তিন—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ এবং সামবেদ। ইহাতে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ আছে, কিন্তু অথর্ব্ববেদ তখনও সম্যক্ সমাদৃত হইয়া বেদমধ্যে গণনীয় হয় নাই। একাদশ অধ্যায়ের ৩৩ শ্লোকে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—

“শ্রুতীরথর্ব্বাঙ্গিরসীঃ কুর্য্যাৎ ইত্যবিচারয়ন্।” ১১। ৩৩

বেদাঙ্গসকল মনুসংহিতার সময় সমাদরের বস্তু। উহার তৃতীয় অধ্যায়ে প্রবচন শব্দের উল্লেখ আছে। টীকাকার কুল্লূকভট্ট প্রবচন শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন “প্রকর্ষেণ উচ্যন্তে বেদার্থা এভিরিতি প্রবচনানি” অর্থাৎ বেদাঙ্গ, যাহাতে বেদার্থ প্রকৃষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে। উপনিষৎও তৎকালে প্রচলিত এবং আদৃত হইয়াছিল। অতঃপর বেদবিষয়ক যুক্তি সংকলন করা যাইতেছে।

“ধর্ম্মজিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ।” ২। ১৩

ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির বেদই প্রকৃষ্ট প্রমাণ, যেহেতু বেদ ও স্মৃতির অনৈক্যে বেদের মতই গ্রাহ্য হয়।

“বেদকৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যোদ্বিজন্মনা।
বেদাভ্যাসোহি বিপ্রস্য তপঃ পরমিহোচ্যতে ॥২।১৬৬
যোনধীত্যদ্বিজোবেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥’ ২। ১৬৮

দ্বিজগণ উপনিষৎ এবং মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করিবেন। মুনিগণ ইহ লোকে ব্রাহ্মণাদির বেদাভ্যাসই পরম তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্যান্য অর্থশাস্ত্রাদিতে অতিশয় যত্ন করেন, তিনি সবংশে শীঘ্র শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

‘যত্নেন ভোজয়েৎ শ্রাদ্ধে বহ্বৃচং বেদপারগং।
শাখান্তগমথাধ্বর্য্যুং ছন্দোগন্তু সমাপ্তিকং ॥ ৩। ১৪৫
অগ্র্যাঃ সর্ব্বেষু বেদেষু সর্ব্বপ্রবচনেষু চ।
শ্রোত্রিয়ান্বয়জাশ্চৈব বিজ্ঞেয়াঃ পংক্তিপাবনাঃ।’ ৩। ১৮৪

ঋক্, যজুঃ এবং সামবেদের মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক সমস্ত শাখাধ্যায়ী বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে প্রযত্ন পূর্ব্বক ভোজন করাইলে অতিশয় ফল হয়। যাঁহারা সমগ্র বেদ এবং সমস্ত বেদাঙ্গে সমধিক ব্যুৎপন্ন এবং দশ পুরুষ পর্য্যন্ত যাঁহাদিগের বংশে বেদাধ্যয়নের বিচ্ছেদ হয় নাই, তাঁহাদিগকে পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণ কহে, অর্থাৎ তাঁহারা অতি দূষিত ব্যক্তিকেও সংসর্গ দ্বারা পবিত্র করেন।

‘যথোদিতেন বিধিনা নিত্যং ছন্দস্কৃতং পঠেৎ।
ব্রহ্ম ছন্দস্কৃতং চৈব দ্বিজোযুক্তোহ্যনাপদি ॥ ৪। ১০০
ঋগ্বেদোদেবদৈবত্যোযজুর্ব্বেদস্তু মানুষঃ।
সামবেদঃ স্মৃতঃ পিত্র্যস্তস্মাৎ তস্যাশুচির্ধ্বনিঃ ॥ ৪।১২৪
এতৎ বিদন্তো বিদ্বাংসস্ত্রয়ীনিষ্কর্ষমন্বহং।
ক্রমশঃ পূর্ব্বমভ্যস্য পশ্চাৎ বেদমধীয়তে ॥’ ৪। ১২৫

যদি কোন কারণে অসমর্থ না হয়েন তবে প্রতিদিন নিয়মানুসারে দ্বিজগণ বেদের মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ উচিত প্রকারে পাঠ করিবেন। যেহেতু ঋগ্বেদে কেবল দৈবকার্য্যেরই অনুষ্ঠান অভিহিত হইয়াছে, যজুর্ব্বেদে প্রায় মনুষ্যদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানই উক্ত হইয়াছে এবং সামবেদে পিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠানই কথিত হইয়াছে; অতএব সামবেদ অধ্যয়ন করিবার পর ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করা অনুচিত। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা এই সমস্ত জানিয়া প্রথমে বেদত্রয়ের সারভূত ওঙ্কার-ব্যাহৃতি-সহিত গায়ত্রী অধ্যয়ন করিয়া পশ্চাৎ বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।

‘বিবিধাশ্চৌপনিষদীরাত্মসংসিদ্ধয়ে শ্রুতীঃ। ৬। ২৯
ইদং শরণমজ্ঞানাং ইদমেব বিজানতাং।
ইদমন্বিচ্ছতাং স্বর্গমিদমানন্ত্যমিচ্ছতাং ॥’ ৬। ৮৪

আত্মার সম্যক্ সিদ্ধির নিমিত্ত উপনিষদে পঠিত ব্রহ্মপ্রতিপাদক বিবিধ বেদবচন অভ্যাস করা উচিত। যাহারা বেদার্থের অনভিজ্ঞ, যাঁহারা বেদার্থের তত্ত্বজ্ঞ, যাঁহারা স্বর্গ কামনা করেন এবং যাঁহারা অমরত্ব ইচ্ছা করেন এই বেদ সকলেরই পরম গতি ও শরণ।

‘হত্বা লোকানপীমাংস্ত্রীনশ্নন্নপি যতস্ততঃ।
ঋগ্বেদং ধারয়ন্ বিপ্রোনৈনঃ প্রাপ্নোতি কিঞ্চন ॥ ১১।২৬১
ঋক্‌সংহিতাং ত্রিরভ্যস্য যজুষাং বা সমাহিতঃ।
সাম্নাং বা সরহস্যানাং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১১। ২৬২
যথা মহাহ্রদং প্রাপ্য ক্ষিপ্তং লোষ্টং বিনশ্যতি।
তথা দুশ্চরিতং সর্ব্বং বেদে ত্রিবৃতি মজ্জতি ॥ ১১। ২৬৩
ঋচোযজূংষি চান্যানি সামানি বিবিধানি চ।
এষ জ্ঞেয়স্ত্রিবৃৎ বেদো যো বেদৈনং স বেদবিৎ ॥’ ১১।২৬৪

লোকত্রয় হত্যা করিলে এবং মহাপাতকীদিগের অন্ন ভক্ষণ করিলেও ঋগ্বেদজ্ঞ দ্বিজের কোন পাপস্পর্শ হয় না। মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদত্রয় এবং ব্রাহ্মণোপনিষৎ সংহিতা তিনবার অভ্যাস করিলে দ্বিজগণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। যদ্রূপ মহাহ্রদে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট নিমগ্ন হয় তদ্রূপ সকল দুশ্চরিত ত্রিবেদে বিনষ্ট হয়। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ এবং বৃহৎ রথন্তরাদি বিবিধ সাম অবশ্য জ্ঞাতব্য। যিনি তিন বেদ জানেন তাঁহাকে বেদজ্ঞ বলে।

‘বেদাভ্যাসস্তপোজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সকরং পরং।” ১২৮৩

বেদের অর্থানুসারে আবৃত্তি, কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি তপ এবং ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান প্রকৃষ্ট মোক্ষের সাধন।

‘পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনং।
অশক্যং চাপ্রমেয়ং চ বেদশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ ॥ ১২। ৯৪
ভূতং ভবৎ ভবিষ্যৎ চ সর্ব্বং বেদাৎ প্রসিদ্ধ্যতি। ১২।৯৭
বিভর্ত্তি সর্ব্বশাস্ত্রাণি বেদশাস্ত্রং সনাতনং।
তস্মাদেতৎ পরং মন্যে যৎ জন্তোরস্য সাধনং ॥ ১২।৯৯
সৈনাপত্যং চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ।
সর্ব্বং লোকাধিপত্যং চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি ॥ ১২।১০০
বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসন্।
ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ১২। ১০২

দেবগণ পিতৃগণ এবং মনুষ্যগণকে হব্য কব্য এবং অন্নদানের নিমিত্ত বেদ চক্ষুস্বরূপ। বেদশাস্ত্র রচনার অশক্য অর্থাৎ অপৌরুষেয় এবং অপ্রমেয় অর্থাৎ মীমাংসাদি ন্যায়নিরপেক্ষ হইয়া অজ্ঞেয়। বেদ হইতে বর্ত্তমান অতীত এবং ভবিষ্যৎ, সমস্তই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বেদশাস্ত্র নিত্য এবং সমস্ত ভূতের ধারণসমর্থ। অতএব ইহা বৈদিক কর্ম্মাধিকারি পুরুষের প্রকৃষ্ট পুরুষার্থ সাধন করিতে পারে। বেদজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্ব-লোকের অধিপতি হইবার যোগ্য। তিনি সেনাপতি, রাজা এবং দণ্ডপ্রণেতা হইবার উপযুক্ত। বেদ-শাস্ত্রের তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি যে কোন আশ্রমে বাস করিলেও ইহলোকেই ব্রহ্মত্বের নিমিত্ত উপযুক্ত হয়েন। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, বেদ কত সমাদরের বস্তু। বেদের প্রামাণ্য এবং প্রতিপত্তি বিষয়ে স্থির সত্য প্রকাশিত হইল। বেদ সর্ব্বশাস্ত্রের মূল এবং মোক্ষের সাধন। বেদবিবর্জ্জিত দ্বিজ অতি নীচ শূদ্র অপেক্ষাও নীচতর। সুতরাং বেদ আর্য্যদিগের জীবনসর্ব্বস্ব এবং হৃদয়ের সামগ্রী।

বশিষ্ঠ সংহিতা। ইহা একবিংশতি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বেদের অবশ্য পাঠ্যতা এবং প্রামাণ্য সম্যক্ স্বীকৃত হইয়াছে। যথা,

‘অশ্রোত্রিয়াননুবাক্যাঅনগ্নয়ঃ শূদ্রধর্ম্মাণো ভবন্তি’ তৃতীয় অধ্যায়। পুনশ্চ

‘যশ্চ কাষ্ঠময়োহস্তী যশ্চ চর্ম্মময়োমৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নামধারকাঃ
শ্রোত্রিয়ায়ৈব দেয়ানি হব্যকব্যানি নিত্যশঃ।
অশ্রোত্রিয়ায় দত্তানি তৃপ্তিং নায়ান্তি দেবতাঃ ॥’ ৩ অ

কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তী, চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগ এবং বেদপাঠরহিত বিপ্র এই তিন পদার্থই সমান। প্রতি দিন বেদজ্ঞ বিপ্রকেই হব্য কব্য দান করিবে, যে হেতু বেদরহিত বিপ্রকে দান করিলে দেবগণ তৃপ্ত হয়েন না।

হারীতসংহিতা। ইহা সপ্তাধ্যায়। ইহার মতে বেদ এবং স্মৃতি বিপ্রগণের দেবনির্ম্মিত চক্ষুস্বরূপ।

'শ্রুতিস্মৃতী চ বিপ্রাণাং চক্ষুষী দেবনির্ম্মিতে।'
'বেদঞ্চৈবাভ্যসেৎ নিত্যং শুচৌ দেশে সমাহিতঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং তথা পাঠ্যং ব্রাহ্মণৈঃ শুদ্ধমানসৈঃ॥ ১। ২২
স্মৃতিহীনায় বিপ্রায় শ্রুতিহীনে তথৈব চ।
দানং ভোজনমন্যচ্চ দত্তং কুলবিনাশনং॥' ১। ২৪

শুদ্ধ প্রদেশে সমাহিত হইয়া বিপ্রেরা একাগ্রচিত্তে বেদ অভ্যাস করিবেন এবং ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিবেন। বেদবিহীন এবং স্মৃতিরহিত বিপ্রকে দান এবং ভোজন প্রদান কুলবিনাশের কারণ।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

ভগবদ্গীতা হইতে শ্লোক সংগ্রহ।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥

যোগী ব্যক্তি সংযতচিত্ত জিতেন্দ্রিয় নিরাকাঙ্ক্ষ ও প্রতিগ্রহশূন্য হইয়া একাকী নিরন্তর নির্জনে অবস্থান পূর্ব্বক আত্মসমাধান করিবেন।

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তোযুক্তআসীত মৎপরঃ॥

শান্তচিত্ত নির্ভয় ব্যক্তি ব্রহ্মচারি-ব্রত ধারণ করিয়া মন সংযত করিয়া ঈশ্বরে চিত্ত অর্পণ পূর্ব্বক ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া অবস্থিত হইবেন।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি নচৈকান্তমনশ্নতঃ।
নচাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতোনৈব চার্জ্জুন॥

যিনি অধিক ভোজনশীল তাঁহার, এবং যিনি এককালে কিছুমাত্র ভোজন করেন না তাঁহারও সমাধি হয় না। যিনি নিদ্রাকে অত্যন্ত সেবা করেন তাঁহার, এবং যিনি নিরবচ্ছিন্ন জাগরণ করিয়া থাকেন তাঁহারও সমাধি হয় না।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগোভবতি দুঃখহা॥

যাঁহার আহার বিহার নিয়মিত, যিনি কার্য্যে চেষ্টাবান এবং যাঁহার নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, যোগ তাঁহারই দুঃখনিবর্ত্তক হইয়া থাকে।

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যোযুক্তইত্যুচ্যতে তদা॥

যখন চিত্ত সংযত হইয়া আপনাতে অবস্থিতি করে সেই অবস্থায় কামনাশূন্য ব্যক্তিকে যোগী বলা যায়।

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং।
বেত্তি যত্র নচৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥

যে নিত্য সুখ ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য কেবল জ্ঞান দ্বারা অনুভূত হয় সেই সুখ যিনি অনুভব করিতে পারেন তিনি আত্মস্বরূপ হইতে কদাচই বিচলিত হন না।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

আত্মস্বরূপ লাভ হইলে অন্য লাভ তাহা হইতে অধিক বোধ হয় না এবং আত্মতত্ত্বে অবস্থিত হইলে শস্ত্রনিপাত প্রভৃতি গুরুতর দুঃখেও বিচলিত হইতে হয় না।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥

যে যোগী সর্ব্বদা এইরূপে আত্মাকে যোগযুক্ত করেন তিনি নিষ্পাপ হইয়া অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

যোমাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্যতি॥

যিনি সকল বস্তুতে ঈশ্বরকে দেখেন এবং ঈশ্বরে সকল বস্তু দেখেন, ঈশ্বর তাঁহার পরোক্ষে থাকেন না এবং তিনিও ঈশ্বরের পরোক্ষে থাকেন না।

সর্ব্বভূতস্থিতং যোমাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোপি সযোগী ময়ি বর্ত্ততে॥

ঈশ্বর সকল দেহে অবস্থিত কিন্তু যিনি তাঁহাকে অদ্বিতীয় দেখেন তিনি কর্ম্মত্যাগী হইলেও তাঁহাকে প্রাপ্ত হন।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং সযোগী পরমোমতঃ॥

যিনি আত্মদৃষ্টান্তে অন্যের সুখ দুঃখ সমভাবে দেখেন তিনিই উৎকৃষ্ট যোগী।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি যোগভ্রষ্ট হয় তাহার ইহ লোক ও পর লোকে বিনাশ নাই, কারণ সদনুষ্ঠায়ী লোক কোন দুর্গতি প্রাপ্ত হন না।

তপস্বিভ্যোঽধিকোযোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকোযোগী তস্মাৎ যোগী ভবার্জ্জুন॥

তপস্বী জ্ঞানী ও কর্ম্মশীল হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যোমাং সমে যুক্ততমোমতঃ॥

সমস্ত যোগীর মধ্যে যিনি, শ্রদ্ধাবান হইয়া তদ্গত চিত্তে ঈশ্বরকে ভজনা করেন তিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধি লাভার্থে যত্ন করেন, সেই সমস্ত লোকের মধ্যেও আবার কেহ কেহ ঈশ্বরকে যথার্থত জানিতে পারেন।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব॥

হে অর্জ্জুন! সৃষ্টি-কার্য্যাদি বিষয়ে ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র কোন কারণ নাই। সূত্রে মণি সকল যেমন গ্রথিত থাকে সেইরূপ ঈশ্বরে সমস্ত জগৎ অনুস্যূত রহিয়াছে।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

যাহাদের জ্ঞান মায়া দ্বারা অপহৃত হইয়াছে, যাহারা আসুরিক ভাব আশ্রয় করিয়াছে সেই পাপাচার দুষ্কৃতকারী মূঢ়েরা ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয় না।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক সকল নিম্নলিখিত নগদ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

মফস্বলের ক্রেতাগণ ১১ মাঘের মধ্যে মণিঅর্ডার বা হুণ্ডি দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাক মাশুল পাঠাইলেই পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন, ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না।

নির্দ্ধারিত মূল্য।

ব্রহ্মবিদ্যালয় ...	১
বেদান্ত প্রবেশ ...	১
সৃষ্টি ...	১
বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি ...	১
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	।৵
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	।৵
গীতাঙ্কুর ...	।৵
A Discourse against Hero-making in religion	As. 12
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে)	১৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (ঐ ভাল বাঁধা)	১৸৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	।৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ	।৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ	।৵০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ...	।৵০
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ	৶০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ভাগ	।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	৷৷৵০
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	।৵০
আত্মোৎকর্ষ বিধান ...	১ (১০
পৌত্তলিক প্রবোধ	৶০
গৃহকর্ম্ম	৶০

	As.	P.
Defence of Brahmoism and the Brahma Samaj	3	
Brahmic Questions of the Day	4	6
Brahmic Advice, Caution and Help ...	2	3
Adi Brahma Samaj, its Views and Principles ..	1	6
Adi Brahma Somaj as a Church	2	3

	As.	P.
A Reply to the Query; "What is Brahmoism?"	3	
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	0	9
Reply to Bishop Watson's Apology for the Bible ..	4	6

নির্দ্ধারিত অর্দ্ধ মূল্য।

সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	।০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	৵০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড ...	/০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত ...	।০
মাঘোৎসব	॥০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৵০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৵০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা	।০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	৵০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা ...	(১০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	॥০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ	৸০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ	॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা দ্বিতীয় ভাগ ...	॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	১
অধিকারতত্ত্ব	।০
হিন্দুধর্ম্মনীতি	॥০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা	/১০
তত্ত্বপ্রকাশ	/১০
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা	/১৫
ব্রহ্মোপাসনা	(১০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	(১০
ব্রহ্ম-স্তোত্র	(১৫
ধর্ম্ম-শিক্ষা	/১
প্রবচন সংগ্রহ	(১৫
ব্রহ্ম-সঙ্গীত চতুর্থ ভাগ	/০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত পঞ্চম ভাগ	/০
সুভাব সঙ্গীত	৵০
সংগীত মুক্তাবলি ১।২ ভাগ একত্রে ...	৵০
সংগীত মুক্তাবলি তৃতীয় ভাগ	৵০
কুমার শিক্ষা ...	৵০
প্রশ্নমঞ্জরী	।০
প্রভাত-কুসুম	৵১০
উদ্বোধনাঞ্জলি	(১০
ধর্ম্ম দীক্ষা	(১০
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা১৭৮৭শকের একত্র বাঁধান	।৵০
ব্রহ্মসাধন	/০
ব্রহ্মজ্ঞান	(১০
ব্রহ্মজ্ঞান সূত্র তাৎপর্য্য সহিত ...	/১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড ...	(১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড ...	/০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জন-সমাজের সম্বন্ধ	(১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব	(১০
উপদেশ	(৫
দুর্গোৎসব	(১০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	(১০
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা ...	(৫
বর্ণমালা দ্বিতীয় সংখ্যা	(১০

	Rs.	As.	P.
Ontology ..	1		
Hindoo Theism			6
Theist's Prayer Book			6
Signs of the Times			6
Vedantic Doctrines Vindicated	1		
Doctrine of Christian Resurrection	1		
Physiology of Idolatry ..	1		
Miracles or the Weak Points of Revealed Religion ..		4	

নির্দ্ধারিত সিকি মূল্য।

দশোপদেশ	৵১০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) ...	/০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ...	৵
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	(১০

১৭৬৯ শক অবধি ১৭৯৫ শক পর্য্যন্ত (১৭৭৪ ও ১৭৮১ শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ও অর্দ্ধমূল্যে অর্থাৎ প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান ২॥০ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

নির্দ্ধারিত মূল্যের পুস্তক সকল অন্যূন দশ টাকার ক্রয় করিলে, শতকরা ১২॥০ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবে।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

এই পুস্তক পুনর্ম্মুদ্রিত হইতেছে। আগামী ১১ মাঘের মধ্যে ইহা প্রস্তুত হইবে। পূর্ব্বকার সমুদায় এবং কতকগুলি নূতন, সঙ্গীত সন্নিবেশিত হইয়া ইহার আকার বর্দ্ধিত হইবে।

আগামী ৩ পৌষ রবিবার প্রাতে ৭॥ ঘণ্টার সময় মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

আগামী ৫ পৌষ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার পর বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজের উনবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

শ্রী মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদক।

সম্বৎ ১৯৩৩। কলিগতাব্দ ৪৯৭৮। ১ পৌষ শুক্রবার।

Registered No 52,

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
মাঘ ১৭৯৮ শক

৪০২ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৭

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

সপ্তচত্বারিংশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ মঙ্গলবার প্রাতঃকালে ৮ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

১০ মাঘ সোমবার রাত্রি ৭ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের গ্রন্থ পাঠ হইবে।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

উপদেশ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথমেই আছে, 'ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে, সকল্পের আত্মাতেই ধ্রুবের অনন্ত মঙ্গলভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে, কিন্তু বিশ্বকার্য্যের আলোচনা দ্বারা তাহা প্রজ্বলিত করিলেই অনন্ত মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বরকে দর্শন পাই। তিনি আপনার বিশুদ্ধ মঙ্গল-রূপ এই তাবৎ ভৌতিক পদার্থে এবং মনুষ্যের মানস-পটে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। যে সকল ভাগ্যবান্ সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন নিষ্পাপ যত্নশীল মহাত্মা তাহা প্রতীতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই ব্রহ্মবিৎ এবং যাঁহারা এইরূপে প্রতীতি করিয়া উপদেশ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মবাদী।' ইহাতে আমরা এই জানিতেছি যে, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি নাই যে তাহা নহে—আছে; কোথায় আছে? কোন অনির্দ্দেশ্য দূর প্রদেশে? তাহা নহে, আমারদের হৃদয়ে। কোন বিশেষ ব্যক্তির হৃদয়ে নহে, সকলেরই হৃদয়ে। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি আছে শুধু নয়,

তাহা আমারদের হৃদয়ে আছে, আমারদের আত্মাতে আছে। এমন অমূল্য ধন এত নিকটে রহিয়াছে, তবে কেন আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত হই? আমারদের গৃহমধ্যে যদি হীরকের খনি বর্ত্তমান থাকিত, তবে কি আমরা হীরকের অন্বেষণে এক মুহূর্ত্তও বিরত হইতাম? হীরকের গুণ আমরা জানি, তাই তাহার অন্বেষণে এত আমারদের আগ্রহ। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নির যে কি অনির্ব্বচনীয় গুণ, তাহা যদি আমরা জানিতাম, তাহা হইলে তাহার অন্বেষণে তিলার্দ্ধও বিরত হইতাম না। ব্রহ্মজ্ঞান সেই অমূল্য রত্ন মনুপলক্ষে কোন পূর্ব্বতন ঋষি বলিয়াছেন,

"যংলব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।"

"যাহা লাভ করিলে আর কোন লাভই তাহা হইতে অধিক বলিয়া বোধ হয় না।" অতএব ব্রহ্মজ্ঞানের যে কি অমূল্য সম্পদ তাহা অগ্রে আমারদের জানা উচিত; তাহা হইলে তাহার অন্বেষণে আমারদের যত্ন হইবে। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নির গুণ যখন আমরা জানি, তখন কি উপায়ে তাহাকে প্রজ্বলিত করা যায় তাহাই আমারদের চেষ্টা হইবে। উক্ত হইয়াছে, বিশ্ব-কার্য্যের আলোচনা দ্বারা তাহা প্রজ্বলিত করিলেই অনন্ত মঙ্গল-স্বরূপকে দর্শন পাই। বিশ্ব-কার্য্যের আলোচনা ব্রহ্মজ্ঞানের ইন্ধনস্বরূপ। ইন্ধন-কাষ্ঠ যেমন অগ্নির সংযোগে অগ্নিরূপ ধারণ করে, সেইরূপ জগৎ-সংসার মঙ্গলস্বরূপ পরব্রহ্মের সত্তাতে মঙ্গল-রূপ ধারণ করিতেছে; এবং ইন্ধন-কাষ্ঠকে অগ্নি হইতে বিযুক্ত করিলে তাহা যেমন মলিনবর্ণ অঙ্গার-রূপ ধারণ করে, সেইরূপ বিশ্বসংসারকে মঙ্গল-স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে বিযুক্ত করিয়া দেখিলে তাহা অমঙ্গল-রূপ ধারণ করে। যাঁহাকে পাইয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড প্রাণ পাইয়াছে, যাঁহাকে ছাড়িয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই থাকে না, তিনিই একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্ম। এমনিই যাহাকে পাইলে বিদ্যা-ব্রহ্মাণ্ড প্রাণ পায়, এবং যাহার অভাব হইলে তাহা অর্থ-শূন্য শব্দ অথবা অগ্নিশূন্য ইন্ধন-কাষ্ঠের আকৃতি ধারণ করে, তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্ম যেমন জগতের প্রাণ-স্বরূপ, ব্রহ্মজ্ঞান সেইরূপ আমারদের বুদ্ধি এবং বিদ্যার প্রাণ-স্বরূপ, ভগবদ্গীতা বলিতেছেন,

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাং॥"

'যে বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা তাহা এক, যাঁহারা অব্যবসায়ী তাঁহারদের বুদ্ধি বহুশাখা-বিশিষ্ট এবং অনন্ত।' ব্রহ্মজ্ঞান-ব্যতীত ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কদাপি সম্ভবে না। বহুশাখা-যুক্ত এবং অশেষ বিজ্ঞানশাস্ত্র এক দিকে রাখ, এবং ব্রহ্মজ্ঞান এক দিকে রাখ, দেখিবে ব্রহ্মজ্ঞানের গুরুভারের নিকটে সমুদায়ই লঘু। মূর্খের চপলতা যেমন মূর্খের নিকটেই বিজ্ঞতার পরিচয় দেয়, কিন্তু পণ্ডিতের নিকটে মূর্খতারই পরিচয় দেয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান-শূন্য বিজ্ঞান-জল্পনা আপাতদর্শী অব্যবসায়ী বুদ্ধিতেই গুরুতর আকার ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু পরিণামদর্শী ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিতে বাল্যক্রীড়ারূপে প্রতীয়মান হয়। অতএব বিদ্যার্থী যুবকদিগের অতীব সাবধান হওয়া উচিত, যেন বিজ্ঞানের আলোচনা-কালে তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানকে বিস্মৃত না হন। কোন আলেখ্য রচনার নানা স্থান হইতে নানা সৌন্দর্য্য উদীরিত হইলেও, যে পর্য্যন্ত না সকল স্থান হইতে এক অদ্বিতীয় সৌন্দর্য্য উদ্গীর্ণ হয়, সে পর্য্যন্ত চিত্র-লেখকের নয়ন কখনই তৃপ্তি লাভ করে না। সেইরূপ নানা বিষয়ের নানা বিজ্ঞান উপার্জ্জন করিলেও, যে পর্য্যন্ত না সকল হইতে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান মন্থন করিয়া পাওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত প্রকৃত বিদ্যার্থী ব্যক্তির মন কখনই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে কত শত বিদ্বান্ ব্যক্তি নানা বিদ্যায় এমনি বিভ্রান্ত-চিত্ত হইয়াছেন যে, তাঁহারা তৃপ্ত না হইয়া বরং ক্ষিপ্ত হইয়া জীবন অবসান করিতেছেন; এবং কেবল এক ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাবে আমারদের পূর্ব্বতন ঋষিরা অপার তৃপ্তি-সাগরে নিমগ্ন হইয়া মনুষ্য-জন্মের যার পর নাই কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন।

"সংপ্রাপ্যেনং ঋষয়োজ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরাঃ
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি।

"সংপ্রাপ্যেনং ঋষয়োজ্ঞানতৃপ্তাঃ" পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া ঋষিরা জ্ঞানতৃপ্ত হইয়াছেন, "কৃতাত্মানঃ" কৃতাত্মা হইয়াছেন, "বীতরাগাঃ" বীতরাগ হইয়াছেন, "প্রশান্তাঃ" প্রশান্ত হইয়াছেন, তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য, সর্ব্বত্র-গামী পরব্রহ্মকে তাঁহারা সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইয়া, "ধীরাঃ" ধীর হইয়া "যুক্তাত্মানঃ" যুক্তাত্মা হইয়া সর্ব্বমেবাবিশন্তি, সকলেতে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ সকলের মধ্যে সেই প্রেমময় অমৃতময়কে দেখিতে পান। হে পরমাত্মন্! তোমার জ্ঞান আমারদের সকলের মোহরাশি দহন করিয়া প্রজ্বলিত হউক্। আমরা যে ঘোর মোহনিদ্রায় অভিভূত, তোমার জ্ঞানব্যতীত আমারদের আর অন্য উপায় নাই। তুমি যদি আমাদের আত্মাকে দর্শন না দেও তবে কোন্ সাহসে এই ভয়াবহ সংসারের সংগ্রাম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিব, তুমি যদি আমারদিগকে জ্ঞান না দেও তবে এই সংসারের কুটিল পথে কে আমারদিগকে পথ প্রদর্শন করিবে? আমারদের দেশ এমনি ঘোর মোহ-তিমিরে আচ্ছন্ন যে, কে আমারদের বন্ধু, কে আমারদের শত্রু, তাহা আমরা দেখিতে পাই না। তোমার নিকট হইতে সুমধুর জ্ঞান পাইয়া যাহাতে আমরা আমারদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারি, তোমার চরণ-বলে বলী হইয়া যাহাতে আমরা সংসার-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারি, তোমার সহিত যুক্তাত্মা হইয়া যাহাতে সকল বাধাবিঘ্ন অপরাজিত চিত্তে অতিক্রম করিতে পারি, তুমি আমারদের মনে সেইরূপ জ্ঞান সেইরূপ ধৈর্য্য সেইরূপ উৎসাহ সেইরূপ অভয় প্রদান কর, এবং তাহা হইতেও অধিক তোমার প্রতি যাহাতে আমারদের অচলা ভক্তি অচলা শ্রদ্ধা অচলা নিষ্ঠা হয়, শরীর হইতে হৃদয় বিচ্ছিন্ন হইবে তথাপি তোমাকে ছাড়িব না, এইরূপ যাহাতে আমারদের মনের একাগ্রতা হয়, সেইরূপ কৃপা আমারদিগকে বিতরণ কর। হে পতিতপাবন! পরমেশ্বর! তোমার জ্ঞান আমারদের অজ্ঞতা দূর করুক, তোমার বল আমারদের দুর্ব্বলতা হরণ করুক, তোমার আনন্দ আমারদের দুঃখ-নিশা অবসান করুক, তুমি যখন আমারদের বাহুবল হইবে, তখন কে আমারদিগকে দুর্ব্বল বলিয়া উপেক্ষা করিবে? তুমি যখন আমারদের নেতা হইবে, তখন কোন্ প্রতিপক্ষ আমারদের সম্মুখে তিলার্দ্ধ দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবে? তোমার উৎসাহে যাহার মুখ-চক্ষু অগ্নিময় হইয়াছে তাহার কোথায় পরাজয়? তোমার বলে যাঁহার শরীর নূতন স্ফূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে তাহার কোথায় পরাজয়? তোমার বিশ্ববিজয়ী নামোচ্চারণ মাত্রে ভয় যাহার ত্রিসীমা হইতে ভীত হইয়া পলায়ন করে তাহার কোথায় পরাজয়? হে সংকটমোচন! তোমা ভিন্ন আর কাহাকে ডাকিব? তোমা ভিন্ন আমারদের সুখ কোথায়? আমাদের শান্তি কোথায়? দারুণ কঠোর ঘোর বন্ধনে আমারদের অস্থি পে-

ষিত হইতেছে, এখন আমারদের চেতন হউক্, আমারদের হৃদয় পর্য্যন্ত দলিত হইতেছে এখন আমারদের চেতন হউক্, মর্ম্মে মর্ম্মে মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণা প্রবেশ করিতেছে এখন আমারদের চেতন হউক্!

হে পরমাত্মন্! তোমার বিচ্ছেদ দিন দিন আমারদের অসহ্য হইয়া উঠিতেছে, দিন দিন আমারদের দেশ নির্জ্জীব শ্মশানতুল্য হইয়া উঠিতেছে, আরো কিছু কাল যদি এরূপ যায় তবে দুগ্ধপোষ্য বালকেরাও বিষাদ-ভারে ক্রন্দন করিতে শিখিবে। আমারদের উৎসাহ কোথায়? আনন্দ কোথায়? বলবীর্য্য কোথায়? ভক্তি-নিষ্ঠা কোথায়? মনুষ্যের যে সকল উপকরণ তাহা আমারদের মধ্যে কোথায়?

হে আত্মার আত্মা নিখিল জগতের স্বামী, তোমাকে হারাইয়া আমরা সকলই হারাইয়াছি, অতএব এখন আমারদের চেতন হউক্! এখন হইতে আর যেন আমরা তোমা হইতে বিচ্যুত না হই, তুমি কৃপা করিয়া আমারদের সকলকে তোমার প্রতি সেইরূপ ভক্তি সেইরূপ শ্রদ্ধা সেইরূপ একাগ্রতা সেইরূপ নিষ্ঠা প্রদান কর তাহা হইলে আমারদের সকল অভিলাষ পূর্ণ হইবে।

বৈদিক আর্য্যসমাজ।

বেদের প্রামাণ্য এবং সমাদর প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত স্মৃতিশাস্ত্র হইতে যুক্তি সংকলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, মনুসংহিতা বশিষ্ঠসংহিতা এবং হারীতসংহিতার মত সমালোচিত হইয়াছে। এক্ষণে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার মত প্রদর্শন করা যাইতেছে। মিথিলানিবাসী যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য মুনিদিগকে ধর্ম্মবিষয়ক যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় প্রকটিত হইয়াছে। ধর্ম্ম ষড়্‌বিধ—বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, গুণধর্ম্ম, নিমিত্তধর্ম্ম এবং সাধারণধর্ম্ম। "ব্রাহ্মণ কখনও মদ্য-ব্যবহার করিবেন না" ইহা বর্ণধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের পালনীয় ধর্ম্ম। অগ্ন্যাধান, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ইত্যাদি আশ্রমধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের পলাশকাষ্ঠনির্ম্মিত দণ্ড ব্যবহারযোগ্য, গৃহস্থাশ্রম-কাল শেষ হইলে বানপ্রস্থাশ্রম আশ্রয় করিবে ইত্যাদি ধর্ম্মকে বর্ণ এবং আশ্রমের ধর্ম্ম কহে। রাজা শাস্ত্রানুসারে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রজা পরিপালন করিবেন ইত্যাদির নাম গুণধর্ম্ম। বিহিত কার্য্য না করিলে অথবা নিষিদ্ধ কার্য্য করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ইত্যাদি নিমিত্তধর্ম্ম। কোন জীবহিংসা করিবে না ইত্যাদি আচাণ্ডাল সাধারণ ধর্ম্মের নাম সাধারণ ধর্ম্ম। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা অধ্যায়ত্রয়ে সংবিভক্ত—আচারাধ্যায়, ব্যবহারাধ্যায় এবং প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়। আচারাধ্যায়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপদেশ এবং ব্যবহারাধ্যায়ে রাজ্য পালনাদি ব্যবহারবিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়ে কেবল বিহিতের অকরণ এবং প্রতিষিদ্ধের করণ নিমিত্ত নানাবিধ প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আচারাধ্যায়ে বেদবিষয়ক যে সকল মত লিখিত আছে তাহা আমরা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

"যজ্ঞানাং তপসাং চৈব শুভানাং চৈব কর্ম্মণাং।
বেদএব দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ॥
মধুনা পয়সা চৈব স দেবান্ তর্পয়েৎ দ্বিজঃ।
পিতৄন্ মধুঘৃতাভ্যাং চ ঋচোধীতেহি যোঽহং॥
যজূংষি শক্তিতোঽধীতে যোঽহং স ঘৃতামৃতৈঃ।
প্রীণাতি দেবানাজ্যেন মধুনা চ পিতৄংস্তথা॥
সতু সোমঘৃতৈর্দেবান্ তর্পয়েৎ যোঽহংপঠেৎ।
সামানি তৃপ্তিং কুর্য্যাৎ চ পিতৄণাং মধুসর্পিষা॥
মেদসা তর্পয়েৎ দেবানথর্বাঙ্গিরসঃ পঠন্।
পিতৄংশ্চ মধুসর্পির্ভ্যাং অঽহং শক্তিতোদ্বিজঃ॥"

শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত যজ্ঞের, শরীর-সন্তাপাদিরূপ চান্দ্রায়ণাদির এবং উপনয়ন প্রভৃতি শুভ সংস্কারের অববোধক বলিয়া বেদ দ্বিজগণের মোক্ষকর। যে দ্বিজ প্রতিদিন ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করেন তিনি দেবগণকে মধু ও ক্ষীর দ্বারা তৃপ্ত করেন এবং পিতৃগণকে মধু ও ঘৃত দ্বারা তৃপ্ত করেন। যিনি প্রতিদিন যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন তিনি অমৃত ও ঘৃত দ্বারা দেবগণকে এবং মধু ও ঘৃত দ্বারা পিতৃগণকে প্রীত করেন। যিনি প্রতিদিন সামবেদ পাঠ করেন তিনি সোমরস ও ঘৃত দ্বারা দেবগণের এবং মধু ও ঘৃত দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি বিধান করেন। যে দ্বিজ শক্তি অনুসারে প্রতি দিন অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করেন তিনি দেবগণকে এবং পিতৃগণকে মধু ও ঘৃত দ্বারা তৃপ্ত করেন। এইরূপে বেদ গ্রহণ এবং অধ্যয়নের ফল বর্ণনা করিয়া তৎপরে কাম্য ব্রহ্মযজ্ঞরূপ বেদাধ্যয়নের ফল বলিতেছেন।

"বাকোবাক্যং পুরাণং চ নারাশংসীশ্চ গাথিকাঃ।
ইতিহাসান্ তথা বিদ্যাঃ শক্ত্যাধীতে হি যোঽহং॥
মাংসক্ষীরৌদনমধুতর্পণং স দিবৌকসাং।
করোতি তৃপ্তিং কুর্য্যাৎ চ পিতৄণাং মধুসর্পিষা॥
তে তৃপ্তাস্তর্পয়ন্ত্যেনং সর্ব্বকামফলৈঃ শুভৈঃ।
যং যং ক্রতুমধীতে চ তস্য তস্যাপ্নুয়াৎ ফলং॥
ত্রির্ব্বিত্তপূর্ণপৃথিবীদানস্য ফলমশ্নুতে।
তপসশ্চ পরস্যেহ নিত্যস্বাধ্যায়বান্ দ্বিজঃ॥
নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী তু বসেদাচার্য্যসন্নিধৌ।
তদভাবেঽস্য তনয়ে পত্ন্যাং বৈশ্বানরেঽপি বা॥
অনেন বিধিনা দেহং সাধয়ন্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি ন চেহ জায়তে পুনঃ॥

প্রশ্নোত্তররূপ বেদবাক্য, ব্রাহ্মাদি পুরাণ, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র, রুদ্রদৈবত্য মন্ত্র (নারাশংসী) যজ্ঞগাথা ইন্দ্রগাথা প্রভৃতি, মহাভারতাদি ইতিহাস এবং বারুণী প্রভৃতি বিদ্যা যিনি স্বশক্তির অনুসারে প্রতিদিন অধ্যয়ন করেন তিনি অমরবৃন্দকে মাংস ক্ষীর ও মধু প্রদান পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত করেন এবং পিতৃবর্গকে মধু ও ঘৃত প্রদান পূর্ব্বক সন্তৃপ্ত করেন। দেবগণ এবং পিতৃবর্গ তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া তাঁহার সকল শুভ কামনা সিদ্ধি করেন। তিনি যে যে যজ্ঞের প্রতিপাদক বেদের যে যে অংশ পাঠ করেন তৎসমুদায়ের ফল প্রাপ্ত হয়েন। তিনি বসুপূর্ণা বসুন্ধরা তিন বার দান করিলে যে ফল হয় তাহা লাভ করেন। যে দ্বিজ প্রতিদিন স্বাধ্যায়নিরত হন, তিনি কঠোর তপস্যা ও চান্দ্রায়ণাদির ফল প্রাপ্ত হয়েন। যে দ্বিজ গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করেন (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী) তিনি বেদাধ্যয়ন সমাপ্তির পর স্বতন্ত্র থাকিবেন না, কিন্তু আচার্য্যের সমীপে বাস করিবেন। যদি আচার্য্য জীবিত না থাকেন তবে তাঁহার পুত্রের সমীপে, পুত্রের অভাবে তাঁহার ভার্য্যার সমীপে, এই সকলের অভাবে গুরুগৃহস্থিত অগ্নির সমীপে বাস করিবেন, অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর যাবজ্জীবন গুরুগৃহে বাস, কর্ত্তব্য। এই প্রকার ইন্দ্রিয়-জয়ে বিশেষ যত্নবান হইয়া দেহক্ষয় করিলে তিনি অমরত্ব লাভ করেন এবং আর কখন জন্ম লাভ করেন না, অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন। উপরি উক্ত স্বাধ্যায়-প্রশংসা এবং স্বাধ্যায়ের ফল বর্ণনা পূর্ব্বোক্ত শতপথ ব্রাহ্মণের স্বাধ্যায়-প্রশংসার কিয়দংশে অনুরূপ* ইহার হেতু নির্দ্দেশ করিতে হইলে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য উভয়েরই রচয়িতা, সুতরাং উভয়ে ভাবের সমতা দৃষ্ট হইতেছে।

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার মত প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে কাত্যায়ন-সংহিতার মত আলোচিত হইতেছে। ইহার অপর নাম কাত্যায়ন-বিরচিত কর্ম্ম-প্রদীপ। ইহা তিন প্রপাঠকে বিভক্ত, প্রথম প্রপাঠকে দশ খণ্ড, দ্বিতীয়

* ৯ কল্প ২ ভাগ ১০৫ পৃষ্ঠা দেখ।

প্রপাঠকে নয় খণ্ড এবং তৃতীয় প্রপাঠকে দশ খণ্ড—সর্ব্বশুদ্ধ ঊনত্রিশ খণ্ড। ইহাতে গোভিল কর্ত্তৃক উক্ত সামবেদীয় কর্ম্ম এবং অন্যান্য কর্ম্মের বিধি নিবেশিত হইয়াছে।

"বেদমাদিত আরভ্য শক্তিতোহরহর্জপেৎ।"

বেদ প্রথম হইতে প্রতিদিন শক্ত্যনুসারে পাঠ করিবে।

"ঋচঃ পঠন্ মধুপয়ঃকুল্যাভিস্তর্পয়েৎ সুরান্।
ঘৃতামৃতৌঘকুল্যাভিঃ যজূংষ্যপি পঠন্ সদা॥
সামান্যপি পঠন্ সোমঘৃতকুল্যাভিরন্বহম্।
মেদঃকুল্যাভিরপি চ আথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পঠন্॥
মাংসক্ষীরৌদনমধুকুল্যাভিস্তর্পয়েৎ পঠন্।
বাকোবাক্যং পুরাণানি ইতিহাসানি চান্বহম্॥
ঋগাদীনামন্যতমং এতেষাং শক্তিতোঽন্বহম্।
পঠন্ মধ্বাজ্যকুল্যাভিঃ পিতৄনপি চ তর্পয়েৎ॥
তে তৃপ্তাস্তর্পয়ন্ত্যেনং জীবন্তং প্রেতমেব চ।
কামচারী স ভবতি সর্ব্বেষু সুরসদ্মসু॥
গুর্ব্বপ্যেনো ন তং স্পৃশ্যেৎ পংক্তিঞ্চৈব পুনাতি সঃ।
যং যং ক্রতুঞ্চ পঠতি ফলভাক্ তস্য তস্য চ॥
বসুপূর্ণা বসুমতী ত্রির্দ্দানফলমাপ্নুয়াৎ।
ব্রহ্মযজ্ঞাদপি ব্রহ্মদানমেবাতিরিচ্যতে॥"

ঋগ্বেদ পাঠ করিলে দেবগণের মধু ও ক্ষীর দ্বারা তৃপ্তি সাধন করা হয়। যজুর্ব্বেদ পাঠ করিলে ঘৃত ও অমৃত দ্বারা দেবগণ তৃপ্ত হয়েন। সামবেদ অধ্যয়ন করিলে সোম ও ঘৃত দ্বারা অমরগণের প্রীতি বিধান করা হয়। অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিলে মেদঃকুল্যা দ্বারা দেবগণ সন্তৃপ্ত হয়েন। প্রশ্নোত্তররূপ বেদবাক্য, ব্রাহ্মাদি পুরাণ এবং মহাভারতাদি ইতিহাস প্রতিদিন পাঠ করিলে মাংস ক্ষীর এবং মধু দ্বারা দেবগণের তৃপ্তি সম্পাদন করা হয়। বেদচতুষ্টয়ের অন্যতম অধ্যয়ন করিলে মধু ও আজ্যের দ্বারা পিতৃগণ সন্তৃপ্ত হয়েন। দেবগণ এবং পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইলে বেদপাঠককে ইহলোকে ও পরলোকে পরিতৃপ্ত করেন এবং বেদপাঠক অমরালয়ে সুখে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়েন। গুরু পাপও ইহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং ইনি পংক্তিকে পবিত্র করেন। ইনি যে যে যজ্ঞপ্রতিপাদক বেদের যে যে অংশ পাঠ করেন তাহার ফল প্রাপ্ত হয়েন। ইনি ধনপূর্ণ পৃথিবী তিন বার দান করিলে যে ফল হয় তাহা লাভ করেন। অন্য ব্যক্তিকে বেদের উপদেশ প্রদান বেদপাঠ অপেক্ষা মহত্তর।

অষ্টাবিংশতিতম খণ্ডের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্লোকে বেদপাঠের কাল এবং অকাল নির্দ্দিষ্ট আছে। দক্ষিণায়ন ছয় মাস বেদ ও উপনিষৎ অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ এবং উত্তরায়ণ হইলে বেদপাঠ ধর্ম্মজ্ঞের কর্ত্তব্য। যথা,

"নাধীয়ীত রহস্যানি সোত্তরাণি বিচক্ষণঃ।
ন চোপনিষদশ্চৈব যষ্মাসান্ দক্ষিণায়ণান্॥
উপাকৃত্যোদগয়নে ততোঽধীয়ীত ধর্ম্মবিৎ॥"

এই পর্য্যন্ত কাত্যায়ন-সংহিতা। অতঃপর সম্বর্ত্তসংহিতা। ইহার একশত ষষ্ঠতম শ্লোকে লিখিত আছে যে বেদশাস্ত্রজ্ঞ দ্বিজ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন। যথা,

"ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি বেদশাস্ত্রার্থবিৎ দ্বিজঃ।"

যমসংহিতায় বেদের প্রশংসা দৃষ্ট হয় এবং উহার মতে সন্ধ্যাকালে বেদপাঠ করিলে মৃত্যু হয়। যথা

"স্বাধ্যায়ে মরণং ধ্রুবং॥"

শংখসংহিতা অষ্টাদশাধ্যায়ে সংবিভক্ত। ইহার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এইরূপ আছে। যথা,

ষড়ঙ্গবেদবেত্তারো বহ্বৃচশ্চৈব সামগাঃ।
ত্রিণাচিকেতঃ পঞ্চাগ্নিব্রাহ্মণাঃ পংক্তিপাবনাঃ॥
ঋগ্যজুঃপারগোযশ্চ সাম্নাং যশ্চাপি পারগঃ।
অথর্ব্বাঙ্গিরসোধ্যেতা ব্রাহ্মণাঃ পংক্তিপাবনাঃ॥"

সাঙ্গবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ঋগ্বেদাধ্যায়ী বহ্বৃচ, সামবেদাধ্যায়ী সামগ, তিন বার যিনি অগ্নিচয়ন করিয়াছেন এবং যাঁহার পঞ্চ অগ্নি আহিত আছে এই সমস্ত ব্রাহ্মণই পংক্তিকে পবিত্র করিতে পারেন। ঋগ্বেদের সামবেদের এবং অথর্ব্ববেদের অধ্যেতৃ বিপ্রগণ পংক্তিপাবন বলিয়া কীর্ত্তিত। ব্যাসসংহিতার অপর নাম বেদব্যাসীয় ধর্ম্মশাস্ত্র। ইহা অধ্যায়-চতুষ্টয়ে বিভক্ত। ইহার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এইরূপ আছে, যথা,

ঋচাং চ যজুষাং সাম্নাং অথর্ব্বাঙ্গিরসামপি।
ইতিহাসপুরাণানাং বেদোপনিষদাং দ্বিজঃ॥
শক্ত্যা সম্যক্ পঠেৎ নিত্যং অপ্রমপ্যাসমাপনাৎ।
স যজ্ঞদানতপসাং অখিলং ফলমাপ্নুয়াৎ।
তস্মাদহরহর্ব্বেদং দ্বিজোধীয়ীত বাগ্যতঃ॥

যে দ্বিজ ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ এবং উপনিষৎ নিয়ত শক্ত্যনুসারে সম্যক্‌রূপে অল্পে অল্পে সমাপ্তি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন তিনি যজ্ঞ, দান ও তপস্যার সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয়েন। অতএব সংযত বাক্যে দ্বিজের প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন অতীব কর্ত্তব্য।

"বেদবেদাঙ্গশাস্ত্রাণি ইতিহাসানি চাভ্যসেৎ।
অধ্যাপয়েৎ চ সচ্ছিষ্যান্ সদ্বিপ্রাংশ্চ দ্বিজোত্তমঃ।
পয়োমৃতাভ্যাং মধুভিঃ সাজ্যৈঃ প্রীণন্তি দেবতাঃ।
তস্মাদহরহর্ব্বেদমনধ্যায়মৃতে পঠেৎ॥"

বেদবেদাঙ্গ শাস্ত্র ও ইতিহাস সতত অধ্যয়ন করিবেক এবং সৎশিষ্য ও সৎ বিপ্রদিগকে উপদেশ দিবেক। যেহেতু দেবগণ বেদ পাঠ হইলে ক্ষীর, অমৃত, মধু এবং ঘৃতের দ্বারা প্রীত হয়েন, অতএব প্রতিদিন অনধ্যায় বর্জ্জন পূর্ব্বক বেদ পাঠ করিবেক।

পরাশরসংহিতা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহার মতে ব্রহ্মা বেদ স্মরণ করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু বেদকর্ত্তা কেহ নাই। বেদজ্ঞ দ্বিজের এতাদৃশ সম্মান যে, এক জন বেদবিৎ দ্বিজই এক পরিষৎ হইতে পারেন। সাগ্নিক বেদজ্ঞ বিপ্রগণের চার পাঁচ বা সর্ব্বব্যক্তি একত্র হইলে এক পরিষৎ হয়। কিন্তু বেদব্রতে স্নাত এক ব্যক্তি তৎস্বরূপ।

'বেদব্রতেষু স্নাতানাং একোপি পরিষৎ ভবেৎ।'

পুনশ্চ "যথা কাষ্ঠময়োহস্তী যথা চর্ম্মময়োমৃগঃ।
ব্রাহ্মণাস্ত্বনধীয়ানাস্ত্রয়স্তে নামধারকাঃ॥
গ্রামস্থানং যথা শূন্যং যথা কূপস্তু নির্জ্জলঃ।"
যথা হুতং অনগ্নৌ চ অমন্ত্রো ব্রাহ্মণস্তথা॥

কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তী, চর্ম্মরচিত মৃগ এবং বেদাধ্যয়নবর্জ্জিত বিপ্র এই তিনই কেবল নামমাত্রধারী। শূন্যগ্রাম, জলরহিত কূপ, অগ্নিরহিত প্রদেশে হোম এবং বেদরহিত ব্রাহ্মণ সমান ও একরূপ পদার্থ।

বৃহস্পতিসংহিতায় কেবল দানধর্ম্মের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার শেষাংশে বেদজ্ঞ বিপ্রের স্তুতিবাদ দৃষ্ট হয়। ইহাতে অধ্যায়বিভাগ নাই।

"বেদবিদ্যাব্রতস্নাতে শ্রোত্রিয়ে গৃহমাগতে।
জীবন্ত্যোষধয়ঃ সর্ব্বা যাস্যামঃ পরমাং গতিং॥
নষ্টশৌচে ব্রতভ্রষ্টে বিপ্রে বেদবিবর্জ্জিতে।
দীয়মানং রুদত্যন্নং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং॥
সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।
সহস্রং শ্রোত্রিয়ে দানং অনন্তং বেদপারগে॥"

বেদশাস্ত্রের পারগত বিপ্র গৃহে অতিথি হইলে পরম শ্রেয়োলাভ হয়। পতিত ব্রতহীন বেদরহিত বিপ্রকে দান করিলে তাহা দুষ্কৃতস্বরূপ হয়। অব্রাহ্মণকে দান দানমাত্র। কিয়দ্‌গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে দান তদপেক্ষা দ্বিগুণফলপ্রদ, শ্রোত্রিয়কে দান সহস্রগুণফলপ্রদ এবং বেদবিৎ বিপ্রকে দান অশেষফলপ্রদ। অত্রিসংহিতায়ও অধ্যায়বিভাগ নাই, কিন্তু ইহা ক্ষুদ্র নহে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন স্থান উদ্ধৃত করা হইতেছে। অত্রিসংহিতার মতে তিন বেদ, তিন অগ্নি, তিন লোক এবং তিন আশ্রম।

"ত্রয়োবেদাস্ত্রয়োলোকা আশ্রমাশ্চ ত্রয়োগ্নয়ঃ"।
"ব্রাহ্মণান্ বেদবিদুষঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদান্॥
তত্র বর্ষতি পর্জ্জন্যোযত্রৈতান্ পূজয়েৎ নৃপঃ॥"
"বেদাভ্যাসরতং ক্ষান্তং মহাযজ্ঞক্রিয়াপরম্।
ন স্পৃশন্তীহ পাপানি মহাপাতকজান্যপি॥"
"ব্রাহ্মণে বেদবিদুষি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদে।
তস্যৈব দীয়তে দানং যদীচ্ছেৎ শ্রেয়ঃ আত্মনঃ॥"
"তস্মাৎ বেদেন শাস্ত্রেণ ব্রাহ্মণ্যং ব্রাহ্মণস্য তু।

যে নৃপতি বেদবিদ্বান্ সর্ব্বশাস্ত্রপ্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের আদর করেন তাঁহার রাজ্যে সুবৃষ্টি হয়। মহাপাতকজনিত পাপও বেদজ্ঞ ক্ষমাশীল এবং যাগানুষ্ঠাননিরত বিপ্রকে স্পর্শ করিতে

পারে না। যে দানশীল ব্যক্তি নিজের শ্রেয়স্কামনা করেন তিনি বেদপারগ এবং সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বিপ্রকে দান করিবেন। অতএব বেদ এবং শাস্ত্র দ্বারাই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

বিষ্ণুসংহিতা শত অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহা অধিকাংশ গদ্যে বিবৃত। ইহার মতে বেদাধ্যয়ন ব্রহ্মযজ্ঞস্বরূপ এবং উহা সর্ব্বদা যথাবিধি কর্ত্তব্য।

"যস্তনধীতবেদোন্যত্র শ্রমং কুর্য্যাৎ অসৌ, সসন্তানঃ শূদ্রত্বমেতি।" ২৮ অধ্যায়॥ "তত্রচ যৎঋচোধীতে তেনাস্যাজ্যেন পিতৃণাং তৃপ্তির্ভবতি। যৎ যজুংষি তেন মধুনা। যৎ সামানি তেন পয়সা। যচ্চ আথর্ব্বণং তেন মাংসেন।" ৩০ অধ্যায়। পুনশ্চ

"সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেতৎ ত্রিকং দ্বিজঃ।
মহতোস্যেনসো মাসাৎ ত্বচেবাহিবিমুচ্যতে॥"

যিনি বেদত্যাগ করিয়া অন্য গ্রন্থে সময় ক্ষেপণ করেন তিনি সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিলে ঘৃত দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি হইয়া থাকে। যজুর্ব্বেদ পাঠ করিলে মধু দ্বারা এবং সামবেদ অধ্যয়ন করিলে ক্ষীর দ্বারা এবং অথর্ব্ববেদ পাঠ করিলে মাংস দ্বারা পিতৃবর্গের তৃপ্তিসাধন হয়। বেদত্রয় বারংবার অভ্যাস করিলে সর্প যদ্রূপ ত্বক্ হইতে নির্মুক্ত হয় তদ্রূপ মহাপাপ হইতেও একমাস কালের মধ্যে নির্মুক্ত হওয়া যায়। প্রাচীন সংহিতাসমূহ হইতে বেদবিষয়ক প্রমাণ সঙ্কলন পূর্ব্বক সম্পূর্ণ রূপে প্রতিপন্ন করা হইল যে, বেদ চিরকাল হিন্দুসমাজে অভ্রান্তরূপে প্রামাণিক এবং আদরণীয় হইয়া আসিয়াছে।

জৈনধর্ম্ম।

পূর্ব্বপ্রস্তাবে জৈনধর্ম্মের উৎপত্তির বিষয় যথাসম্ভব লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে জৈনধর্ম্মের মূলসূত্র এবং জৈনদিগের প্রবর্ত্তক সিদ্ধপুরুষদিগের বিষয় যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মনুষ্য-পূজা জৈনদিগের ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। তাহারা কতকগুলি সিদ্ধপুরুষকে দেবতা বলিয়া অর্চ্চনা এবং আরাধনা করিয়া থাকে। সিদ্ধপুরুষ হইবার নিমিত্ত উপযোগী কতিপয় গুণ নির্দ্দিষ্ট আছে। জগৎপ্রভু, ভগবান, অধীশ্বর, পরমেষ্ঠী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, ত্রিকালবিৎ, দেবাধিদেব, ক্ষীণাষ্টকর্ম্মা, তীর্থকর, তীর্থঙ্কর, পারগত, অর্হৎ, জিন, জিনেশ্বর, কেবলী, শম্ভু, স্বয়ম্ভু, অভয়দ, স্যাদ্বাদী, বোধদ, আপ্ত, বীতরাগ এবং সার্ব ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট না হইলে সিদ্ধপুরুষ বা মহাপুরুষ হইতে পারে না। সমস্ত জগতের প্রভু এবং কর্ত্তা হয়েন বলিয়া তাঁহার নাম জগৎপ্রভু বা ভগবান্। তিনি সর্ব্বকার্য্যসমর্থ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া অধীশ্বর বা পরমেষ্ঠী। তাঁহার ইচ্ছামাত্র দুঃসাধ্য কার্য্য সকল মুহূর্ত্তমধ্যে সুষ্ঠু সম্পন্ন হইতে পারে। তিনি অতীত, বর্ত্তমান এবং অনাগত (ভবিষ্যৎ) ভেদে কালত্রয়ের এবং ভুবনত্রয়ের সকল বিষয় জানিতে পারেন বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী বা ত্রিকালবিৎ শব্দে অভিহিত হয়েন। তিনি দেবগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর এবং অধিক সুকৃতশালী অতএব তিনি দেবাধিদেব। তাঁহার পক্ষে বেদবিহিত আনুশ্রবিক যাগাদি কর্ম্ম অনাবশ্যক সুতরাং তিনি ক্ষীণাষ্টকর্ম্মা। কর্ম্ম জৈনশাস্ত্রমতে অষ্টবিধ। সে সকল কর্ম্ম কি কি, তাহা পরে উল্লিখিত হইবে। তিনি দুঃখসঙ্কুল সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে তীর্থকর, তীর্থঙ্কর বা পারগত বলে। উপর্য্যুপরি বহুবার জন্মগ্রহণ করিবার পর অবশেষে কঠোর তপস্যা প্রভৃতির বলে তীর্থঙ্করত্ব লাভ হয়। তিনি সকল দেবের এবং সকল মনুষ্যের পূজ্য এই নিমিত্ত অর্হৎ নামে

কীর্ত্তিত হয়েন। তিনি রাগদ্বেষাদি সমস্ত রিপু জয় করিয়া আত্মেশ্বর এবং সর্ব্বজয়ী হইয়াছেন বলিয়া, তাঁহার নাম জিন বা জিনেশ্বর। তিনি ভ্রমশূন্য প্রমাদরহিত এবং জ্ঞানময় বলিয়া তাঁহার নাম কেবলী। তাঁহার কোন প্রকার মানুষিক বিকার নাই, অর্থাৎ তাঁহার শরীরাবয়বের বৃদ্ধি হয় না এবং ক্ষুৎপিপাসা, রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি ভোগ করিতে হয় না। তিনি শম্ভু অর্থাৎ মঙ্গলের নিদান। তিনি অভয়দ অর্থাৎ ভয়হারী। তিনি বোধদ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানপ্রদ। তিনি বীতরাগ, অর্থাৎ জগতে তাঁহার আসক্তি নাই। তিনি যথার্থবাদী এবং যথার্থদর্শী অতএব আপ্ত। তিনি স্যাদ্বাদী অর্থাৎ সকল পদার্থই কথঞ্চিৎ স্থায়ী কথঞ্চিৎ অস্থায়ী ইত্যাদি সপ্তভঙ্গীনয় দ্বারা সকল জগতের অনিত্যত্ব এবং ক্ষণিকত্ব বলিয়াছেন। স্যাদ্বাদ জৈনমতপ্রস্তাবে বিশেষরূপে প্রকটিত হইবেক। জৈন মহাপুরুষদিগের গুণ সমুদায়ই অলৌকিক এবং সর্ব্বলোকাতিগামী। যাঁহাদিগকে জৈনগণ উক্ত গুণগ্রামের প্রকৃত অধিকারী বলিয়া মনে করে, তাঁহাদিগকে সিদ্ধপুরুষ বা মহাপুরুষ সংজ্ঞা প্রদান করে। সিদ্ধপুরুষপূজা বৌদ্ধদিগেরও দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধেরা অসংখ্য বুদ্ধ অর্থাৎ সিদ্ধপুরুষের উল্লেখ করেন বটে, কিন্তু সাত জন বুদ্ধমাত্রের আরাধনা করেন। হেমচন্দ্রকোষের দ্বিতীয় কাণ্ডের ১৫০ শ্লোকে সাত জন বুদ্ধের নাম আছে*, যথা বিপশ্বী, শিখী, বিশ্বভূ, ক্রুতুচ্ছন্দ, কাঞ্চন, কাশ্যপ এবং শাক্যসিংহ। শেষ বুদ্ধের বিশেষ পরিচয় দৃষ্ট হয়। শাক্যসিংহ শুদ্ধোদন রাজার এবং মায়াদেবীর পুত্র, গোতম বংশীয় এবং অর্কবান্ধব। তাঁহার পুত্রের নাম রাহুল এবং কন্যার নাম দেবদত্তা। তাঁহার অপর নাম সর্ব্বার্থসিদ্ধ।

জৈনধর্ম্মাবলম্বীরা অনাদি অনন্ত কালকে বিবিধ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তৎসমস্ত পরে প্রদর্শিত হইবে। ঐ সকল কালের উৎসর্পিণী এবং অবসর্পিণী এই দুইটী প্রধান নাম। বর্ত্তমান অবসর্পিণীকালে চব্বিশ জন সিদ্ধপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন। অতীত উৎসর্পিণীকালে চব্বিশ জন আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং অনাগত উৎসর্পিণীকালে চব্বিশ জন অর্হৎ আবির্ভূত হইবেন, জৈনদিগের এইরূপ বিশ্বাস। জৈনদিগের মহাপুরুষের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ বাহাত্তর জন। প্রত্যেক জৈন আয়তনে এই সকল সিদ্ধপুরুষদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং জৈনপুরোহিতগণ অতি সমারোহের সহিত উহাঁদিগকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। প্রথম সিদ্ধপুরুষ বা অর্হৎগণ অপেক্ষা পরবর্ত্তী অর্হৎগণ হীনতর অর্থাৎ আদিম কালের অর্হৎগণ সর্ব্ববিষয়েই সর্ব্বলোকাতিগ বা অলৌকিক ছিলেন, কিন্তু কালসহকারে শেষ অর্হতেরা ক্রমশঃ ন্যূনতা প্রাপ্ত হয়েন; ইহা জৈনদিগের কল্পনা মাত্র। সকল অর্হৎই অপূর্ণ মনুষ্য ছিলেন, তবে জৈন গ্রন্থকারেরা প্রথম জিনদিগের বর্ণনাকালে অতিশয়োক্তির আশ্রয় লইয়াছিলেন। স্বধর্ম্মের উৎকর্ষসাধন নিমিত্তই যে, তাঁহারা এরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে বোধ হয় কোন সন্দেহ নাই। সকল দেশীয় ধর্ম্মপুস্তকেই আদিম কালের লোক অপেক্ষা অনন্তর কালের লোক অনেকাংশে হীনতর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কি গ্রীসীয়, কি মিসর দেশীয়, কি চীন দেশীয়, কি ভারতবর্ষীয় সকল ধর্ম্মপুস্তকেরই এই মত। এমন কি, যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তক বাইবলের ইউরোপে এতাদৃশ প্রতিপত্তি, তাহাতেও উপরি উক্ত মত দেখিতে

* Five Buddhas in Aaiatic Researches vol. VII. P32, P414.

পাওয়া যায়। জৈনশাস্ত্রে প্রথম জিনদিগের কাল্পনিক বর্ণনা কেবল স্তুতিবাদমাত্র, প্রকৃত নহে। হিন্দুধর্ম্মেও সত্যযুগের অপেক্ষা ত্রেতাদি যুগে মনুষ্যের হ্রাস হইয়াছে। অনেকে এইরূপ স্তুতিবাদ বুঝিতে না পারিয়া প্রতীতি করিয়াছেন যে, জৈনদিগের চরম তীর্থকরদ্বয় ব্যতীত সকলগুলিই জৈনগ্রন্থকারদিগের কপোলকল্পিত খ-কুসুমমাত্র, কেবল পার্শ্বনাথ এবং মহাবীরই প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন।

মেজর মেকেঞ্জি দুই জন জৈন পুরোহিতের মুখ হইতে জৈন ধর্ম্মবিষয়ক যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন* তাহা অবশ্য প্রমাণ বলিতে হইবে। আর ডাক্তার আই বকানন ১৮০০ খৃষ্টাব্দে যে মহীসুর প্রদেশে পর্য্যটনকালে জনৈক জৈন পুরোহিতের মুখ হইতে অনেক জৈনসংক্রান্ত বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন, তাহাও অমূলক নহে। কিন্তু আমরা সংস্কৃত, পালি এবং মাগধী ভাষাতে জৈনধর্ম্মবিষয়ক যে সমুদয় গ্রন্থ আছে তাহা সমালোচনা পূর্ব্বক তাহা হইতে ষট্‌পদবৎ সারাদান করিব। জৈনধর্ম্মে বিবিধ গ্রন্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তধর্ম্মসার গ্রন্থানুসারে জৈনশাস্ত্র পঞ্চাশৎ বিভিন্ন গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থকে সূত্র কিংবা সিদ্ধান্ত বলে। তৎসমুদয় নানা প্রকারে শ্রেণীভুক্ত; কল্পসূত্র এবং আগম এক বিভাগ। কল্পসূত্রের সংখ্যা পঞ্চ এবং আগমের সংখ্যা পঞ্চচত্বারিংশ। উত্তরাধ্যয়নসূত্র, ব্যবহারসূত্র, নিশীতসূত্র, কল্পসূত্র এবং জীতকল্পসূত্র প্রথমটী এই পঞ্চবিধ। আগম আবার সপ্ত ভাগে বিভক্ত, যথা—অঙ্গানি, উপাঙ্গানি, মূলসূত্র, ছেদ, পয়ন্ন, নান্দীসূত্র এবং অনুযোগদ্বারসূত্র। তন্মধ্যে অঙ্গানি একাদশ সংখ্যক, উপাঙ্গানি দ্বাদশ, মূলসূত্র চার, ছেদ ষট্, পয়ন্ন দশ, নান্দীসূত্র এক এবং অনুযোগদ্বারসূত্র এক। সর্ব্বসমেত আগমের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ। ইহাদের মধ্যে কতকগুলিকে পঞ্চাঙ্গসূত্র কহে। তাহার হেতু এই—তাহাদিগের চতুর্বিধ ব্যাখ্যা আছে; যথা টীকা, নির্যুক্তি, চূর্ণী, ভাষ্য; এই চতুর্বিধ ব্যাখ্যা এবং মূল লইয়া পঞ্চাঙ্গসূত্র নাম হইয়াছে। এতৎ সকলের মধ্যে কল্পসূত্রের সমধিক সমাদর দৃষ্ট হয়। জৈনশাস্ত্রের শিরোভূষণ কল্পসূত্র। বর্ষাকালের মধ্যসময়ে জৈনদিগের পর্য্যুষণ নামক উৎসবে অষ্টাহ জৈনশাস্ত্র পাঠ হইয়া থাকে এবং তন্মধ্যে পঞ্চ দিবস কেবল কল্পসূত্রের পাঠ নিষ্পন্ন হয়। অতএব কল্পসূত্র যে জৈনদিগের অতি সমাদর এবং সম্যক্ আরাধনার বস্তু তদ্বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। কল্পসূত্র চরম তীর্থকর মহাবীরের জীবনচরিত। ইহা গুর্জ্জরনিবাসী ভদ্রবাহুর কৃতি। ধ্রুবসেনাখ্য গুর্জ্জররাজের সময়ে ভদ্রবাহুর আবির্ভাব হইয়াছিল। কল্পসূত্রে যেরূপ লিখিত আছে তদনুসারে ইহা মহাবীরের সংসারত্যাগের নয় শত অশীতি বৎসরান্তর অথবা ৪১১ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে। ইহা মাগধী ভাষাতে বিরচিত। ইহাতে জিনবংশের অল্প কীর্ত্তনও দেখিতে পাওয়া যায়। বোম্বাই নগরে ডাক্তর ষ্টিভেন্সন ইহার ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন এবং ইহার দুইটী লিথগ্রাফ-সংস্করণ সুলভ।

মহাবীরচরিত নামক জৈনগ্রন্থে বর্দ্ধমান বা মহাবীরের জীবনী বিবৃত হইয়াছে। পার্শ্বনাথচরিত নামক গ্রন্থে ত্রয়োবিংশতিতম জিনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জৈনগ্রন্থাখ্য জৈনগ্রন্থে জৈনদিগের আচার্য্যপরম্পরার উল্লেখ আছে। জৈনশাস্ত্রাভিধ গ্রন্থে জৈনধর্ম্মের অনেক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নরতত্ত্ব নামক পুস্তকে জৈনদিগের নববিধ তত্ত্বের বিশেষ বিবৃতি দৃষ্ট হয়। প্রায় সমুদয় জৈনগ্রন্থই স্বর্ণোদকে রঞ্জিত, বিবিধ বর্ণে চিত্রিত এবং নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুস্তকগুলি দেখিতে অতি সুন্দর এবং নয়নপ্রীতিকর।

হেমচন্দ্র আচার্য্যের অভিধানচিন্তামণি নামক সংস্কৃত অভিধানের মধ্যে মধ্যে জৈনধর্ম্ম-সংঘটিত অনেক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হেমচন্দ্র জনৈক জৈন আচার্য্য ছিলেন এবং গুর্জ্জরনৃপতিগণকে স্বধর্ম্মচ্যুত করিয়া জৈনমতে দীক্ষিত করেন। অভিধানচিন্তামণি ষট্‌কাণ্ডে বিভক্ত। প্রথম কাণ্ডে দেবাধিদেব, দ্বিতীয় কাণ্ডে দেবগণ, তৃতীয়ে মনুষ্য, চতুর্থে এক বা একাধিক ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট তির্য্যক্, পঞ্চমে নারক বা নরকবাসী এবং ষষ্ঠে সাধারণব্যবহারযোগ্য বিষয় স্ফুটরূপে উল্লিখিত আছে। পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু এবং তরুগুল্মাদি একেন্দ্রিয়বিশিষ্ট; কৃমি পিপীলিকা প্রভৃতির দুই তিন বা চারি ইন্দ্রিয়; হস্তী, ময়ূর, মৎস্য প্রভৃতি ভূচর, খেচর ও জলচর প্রাণীদিগের পঞ্চ ইন্দ্রিয় নির্দ্দিষ্ট আছে। দেবগণ, মনুষ্যগণ এবং নারকীদিগেরও পঞ্চ ইন্দ্রিয়। প্রথমকাণ্ডের সমস্তই জৈনধর্ম্মবিষয়ক বিবরণে পরিপূর্ণ। অমরকোষে জিন, বুদ্ধ, সুগত, সর্ব্বজ্ঞ একপর্য্যায় শব্দ। কিন্তু হেমচন্দ্র কোষে জিন, অর্হৎ, সর্ব্বজ্ঞ একপর্য্যায় শব্দ এবং বুদ্ধ, সুগত, বোধিসত্ত্ব, আর একপর্য্যায় শব্দ। কল্পসূত্রের ন্যায় ইহাতেও বর্ত্তমান অবসর্পিণী কালে যে চব্বিশ জন অর্হৎ আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহাদিগের নাম, কুল, ধ্বজ এবং বর্ণ বিশেষরূপে উল্লিখিত আছে। তৎপরে অতীত এবং অনাগত উৎসর্পিণী কালে যে সমস্ত অর্হৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং হইবেন তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। অনন্তর অর্হৎদিগের দেহাদি বর্ণনা জিনদিগের দোষাভাবকথন এবং গুণাদি কীর্ত্তন নিবেশিত আছে। অতঃপর জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবিধ শব্দের ব্যাখ্যান বিবৃত হইয়াছে। উপরি বর্ণিত গ্রন্থ সমূহ হইতে অর্হৎগণের জীবনী বিষয়ে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা পরপ্রস্তাবে বিবৃত করা যাইবেক।

* (Asiatic Researches vol. VII and vol IX.)

বঙ্গদেশে শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা।

শিক্ষা জাতীয় উন্নতির মূল। শিক্ষাপ্রণালী যদি অপকৃষ্ট হয় তবে কোন জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মনুষ্যের সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির উন্মেষ-কার্য্য সম্পাদন। যাহাতে মনুষ্যের শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন হয় শিক্ষাকার্য্যের তাহাই লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য। ইহার কোন বিষয়ে শিক্ষা-কার্য্যের ত্রুটি হইলে জাতীয় উন্নতির ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে, অতএব শিক্ষা-কার্য্যের ন্যায় গুরুতর কার্য্য জগতে আর নাই। রাজ্যের লোকের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখা রাজার একটী প্রধান কর্ত্তব্য। যে রাজা এই কর্ত্তব্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগী নহেন তিনি ঈশ্বরের নিকট ও লোকসমীপে দোষী হয়েন।

আমাদিগের দেশে ইংরাজি শিক্ষা প্রচুর মঙ্গলের কারণ হইয়াছে। কিন্তু তথাপি তাহাতে যে সকল ত্রুটি লক্ষিত হইতেছে তাহা জাতীয় উন্নতির বিশেষ অন্তরায়-স্বরূপ গণ্য করিতে হইবে। প্রথমতঃ কলেজ ও স্কুলে যেরূপ শিক্ষা-প্রণালী ব্যবহৃত হইতেছে তাহা কেবল স্মরণশক্তির উন্নতিসাধনপক্ষে বিশেষ অনুকূল, বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা ও উন্নতিসাধনের প্রতি তত অনুকূল নহে। শুনিতে পাওয়া যায় যে, প্রধান প্রধান কালেজের অধ্যাপকেরা ছাত্রদিগকে কোন প্রশ্ন করেন না, কেবল গ্রন্থের ব্যাখ্যা

করিয়া যান, ছাত্রেরা কেবল নোট লয়। ইহাতে বুদ্ধিবৃত্তির কিরূপ পরিচালনা হইতে পারে, পাঠকবর্গ তাহা সহজে বুঝিতে পারেন। আমাদিগের কোন বন্ধু একটী কালেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছাত্রদিগকে স্বকীয় বুদ্ধিপরিচালনা করিয়া গ্রন্থের অর্থসম্বন্ধে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে বলেন। তাহাতে ছাত্রেরা অসন্তুষ্ট হইয়া, কালেজের অধ্যক্ষের নিকট তাঁহার নামে অভিযোগ করে। কলেজের অধ্যক্ষ তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "অন্যান্য কালেজে সাহিত্যবিষয়ে শিক্ষার যে রূপ প্রণালী আছে তাহাই আপনার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। আপনি শিক্ষক নহেন, কেবল ব্যাখ্যাতা মাত্র ও ছাত্রেরা ছাত্র নহে, কেবল শ্রোতা মাত্র।"

ইংরাজী কালেজ ও স্কুলে যেরূপ শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহাতে যে ছাত্রের যে বিষয়ে স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে সে বিষয়ে তাহার স্বাভাবিক ক্ষমতা স্ফূর্ত্তি পায় না। এক্ষণে প্রবেশিকা ও অন্যান্য পরীক্ষার এইরূপ নিয়ম যে, প্রত্যেক বিষয়ে পারদর্শিতার চিহ্নস্বরূপ একটী নির্দ্দিষ্ট অঙ্ক পাইতে হইবে, কোন বিষয়ে সেই অঙ্কের ন্যূন হইলে অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শিতা থাকিলেও তাঁহাকে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া গণ্য করা হয় না। পূর্ব্বে হিন্দু কালেজে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, সকল বিষয়ে উল্লিখিত অঙ্কের সমষ্টি ধরিয়া ছাত্রের পারদর্শিতা নিরূপিত হইবে; তাহাতে কোন ছাত্রের পাঠ্য কোন বিষয়ে স্বাভাবিক অক্ষমতা থাকিলেও তাহার অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শিতা দ্বারা তাহা সম্পূরিত হইত, কিন্তু এক্ষণে সেরূপ হয় না। এমন সকল ছাত্র দৃষ্ট হয় যাহাদিগের সাহিত্যবিষয়ে স্বাভাবিক বুদ্ধি আছে, কিন্তু গণিতবিষয়ে সেরূপ স্বাভাবিক বুদ্ধি দৃষ্ট হয় না। তাহারা বহু আয়াস ও বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও শেষোক্ত বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে সক্ষম হয় না। তাহারা গণিতবিষয়ে নির্দ্দিষ্ট অঙ্ক প্রাপ্ত না হইলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না সুতরাং তাহারা ভগ্নোদ্যম হয়, এবং সেই ভগ্নোদ্যম নিবন্ধন তাহাদিগের ভাবী উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ সাহিত্যবিৎ পণ্ডিত অথবা সুলেখক হইয়া জগতে খ্যাতি লাভ করিতে সক্ষম হইত, সে বিশীর্ণ পুষ্পের ন্যায় হতশ্রী ও ম্লান হইয়া জগতে আপনার সৌরভ বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না।

এতদ্দেশে কালেজ ও স্কুলে ছাত্রদিগের শারীরিক উন্নতিসাধনের প্রতি তত মনোযোগ প্রদত্ত হয় না। শুনিতে পাওয়া যায়, ইংলণ্ডের বিদ্যালয় সকলে ব্যায়াম ও পুরুষত্বসাধক ক্রীড়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইহাতে যে ইংরাজেরা দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ হইয়া সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে ইহার আশ্চর্য্য কি? ইংরাজেরা আপনাদিগের দেশে উভয় শারীরিক ও মানসিক উন্নতিসাধক শিক্ষার প্রতি সমান মনোযোগ প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকের সম্বন্ধে সেরূপ করেন না। কেনই বা করিবেন? ইহা ত তাঁহাদিগের স্বদেশ নহে। ছাত্রেরা দিবারাত্রি কেবল পুস্তক অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকে। আপনাদিগের শারীরিক উন্নতিসাধনের প্রতি কিছু মাত্র মনোযোগ প্রদান করে না, সুতরাং তাহারা শীঘ্র ক্ষীণ রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। অনেক নব যুবককে চক্ষুর পীড়া ও শিরোভ্রমণ-রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে দৃষ্ট হয়ণ যদি শারীরিক ক্ষীণতা ও রুগ্নতা বশত তাহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল তবে কেবল গ্রন্থ পাঠ করিয়া কি লাভ হইল? স্বাস্থ্যই সকল উন্নতি ও সকল ধর্ম্মসাধনের মূল।

জাতীয় ভাবের অভাব বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর আর এক দোষ। আমাদিগের যদি স্বদেশীয় রাজা থাকিত তাহা হইলে তাঁহার সংস্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য ভাষা অধীত হইত বটে, কিন্তু প্রধানরূপে সংস্কৃত ও বাঙ্গালার প্রতি মনোযোগ প্রদত্ত হইত, সন্দেহ নাই। এক্ষণে যেমন ইংরাজীতে উচ্চ উচ্চ উপাধি প্রদত্ত হইয়া থাকে তখন সংস্কৃত ও বাঙ্গালাতে উচ্চ উচ্চ উপাধি প্রদত্ত হইত, এরূপ হওয়াই এদেশের পক্ষে ন্যায্য। কিন্তু রাজা বিদেশীয়, তন্নিবন্ধন সেরূপ হইতেছে না ও অন্য দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তাহা হওয়াও উচিত নহে। আজিকার দিনে ইংরাজীতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে কোন মতেই চলে না এবং ইংরাজদিগের নিকট হইতে আমাদিগকে এখনও অনেক শিক্ষা করিতে হইবে, তথাপি ইহা প্রকৃত জাতীয় উন্নতির একটী বিশেষ প্রতিবন্ধক-স্বরূপ বলিতে হইবে। স্বকীয় ভাষার অনুশীলন হইয়া স্বভাবতঃ যে জাতীয় উন্নতির অভ্যুদয় হয় তাহাই প্রকৃত জাতীয় উন্নতি। এ প্রকার স্বভাবসিদ্ধ জাতীয় উন্নতি সাধনের সময় আমরা জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধন জন্য অন্যান্য ভাষার সাহায্য লইলেও উন্নতির জাতীয় ভাব বিলোপিত হইত না। অন্যান্য ভাষা হইতে আমরা যে সাহায্য লইতাম তাহা আমাদিগের জাতীয় ভাষার শরীরে পরিণত হইয়া আমাদিগের উন্নতিকে কখন বিজাতীয় প্রকৃতি প্রদান করিতে সমর্থ হইত না। এক্ষণে যেমন আমাদিগের মনের সকল ভাব ইংরাজী ছাঁচে বিগঠিত হইতেছে, এমন কি, আমরা ইংরাজীতেও চিন্তা করিয়া থাকি, সে প্রকার না হইয়া আমাদিগের স্বাভাবিক বৃত্তি সকল স্বাধীনরূপে স্ফূর্ত্ত হইত এবং এইরূপে স্ফূর্ত্ত হইয়া যে জাতীয় উন্নতির অভ্যুদয় হইত তাহাই প্রকৃত জাতীয় উন্নতি। আমাদিগের কালেজ ও স্কুলে যে সকল পুস্তক পঠিত হইয়া থাকে তাহাতে জাতীয় ভাবের অভাব বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উক্ত হইতেছে যে, যে সকল ভূগোল-বিষয়ক গ্রন্থ কালেজ ও স্কুলে অধীত হইয়া থাকে তাহাতে যে স্থানে সুমাত্রা, বালী অথবা সুখতর উপদ্বীপের উল্লেখ আছে সেখানে তাহা প্রাচীন হিন্দু-উপনিবেশ বলিয়া যদি উল্লিখিত হইত তাহা হইলে ছাত্রেরা তাহা অধ্যয়ন করিবার সময় ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া কি পর্য্যন্ত না উৎসাহ প্রাপ্ত হইত। অন্যান্য বিষয়েও পাঠ্য গ্রন্থ সকলে জাতীয় ভাবের অভাব বিলক্ষণ রূপে পরিলক্ষিত হয়। ভারতের ইতিবৃত্ত বিদেশীয় লোকের দ্বারা অর্থাৎ ইংরাজদিগের দ্বারা লিখিত হইয়াছে। ভারতের ইংরাজ পুরাবৃত্তলেখকেরা অনেক স্থানে আপনার জাতির প্রতি বিলক্ষণ পক্ষপাত করিয়াছেন ও এতদ্দেশীয় লোকদিগের অযথা নিন্দা করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় লোকে স্বাধীনভাবে তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া, ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিলে কখনই এরূপ হইত না। আমাদিগের কালেজ ও স্কুলের ছাত্রেরা ইংরাজদিগের দ্বারা লিখিত ভারতের পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া থাকে, সুতরাং তাহারা ভারতের প্রকৃত ইতিহাস পাঠ করিতে পায় না।

অর্থকরী ও লোকোপকারী বিদ্যা শিক্ষার অভাব বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর আর একটী দোষ। এক্ষণে উকীল ও ডাক্তার ব্যবসায়ী লোকের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, ঐ সকল ব্যবসায়ে নূতন প্রবৃত্ত লোকের অন্ন হওয়া সুকঠিন, এক্ষণে অন্যান্য ব্যবসায় অবলম্বন না করিলে আর উপায় নাই।

এক্ষণে সন্তানেরা ভবিষ্যতে কি প্রকারে উপজীবিকা আহরণ করিবে এবিষয়ে বয়স্ক লোকের বিলক্ষণ উদ্বেগ ও আশঙ্কা জন্মিতেছে। গবর্ণমেণ্ট যদি স্থানে স্থানে শিল্প ও শ্রামিক বিদ্যালয় সকল সংস্থাপন করেন তাহা হইলে দেশের মহোপকার সাধন হয়। আমাদিগের বর্ত্তমান লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর মহোদয় উল্লিখিত বিদ্যালয় সকল সংস্থাপনের প্রতি কিঞ্চিৎ যত্ন প্রকাশ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইলাম, কিন্তু এ বিষয়ে কেবল গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী হইলে হইবে না। আমাদিগের দেশের ধনাঢ্য লোকদিগেরও বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের বিবেচনা করা উচিত যে, তাঁহারা ঈশ্বরের কোষাধ্যক্ষ, সংসারের উপকারার্থই ঈশ্বর তাঁহাদিগকে ধনশালী করিয়াছেন।

যখন বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী দ্বারা দেশীয় যুবকদিগের শারীরিক উন্নতি সাধন হইতেছে না, যখন তদ্দ্বারা তাহাদিগের কেবল স্মরণশক্তিরই উন্নতি সাধন হইতেছে, যখন ঐ প্রণালীনিবন্ধন যে ছাত্রের যে বিষয়ে যে স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে তাহার স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না, যখন অর্থকরী ও লোকোপকারী বিদ্যার শিক্ষা-বিরহে লোকের ভবিষ্যতে অন্নাভাবে ক্লিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তখন শিক্ষাসম্বন্ধে দেশের অবস্থা অবশ্য অতি শোচনীয় বলিতে হইবে। এই শোচনীয় অবস্থা নিরাকরণের প্রতি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। এ দেশের প্রতি তত মমতা না থাকা প্রযুক্ত উল্লিখিত বিষয় সকলের মধ্যে যে যে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের তত মনোযোগ পরিলক্ষিত হইবে না, সেই সেই বিষয়ে আমাদিগের নিজের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। সমবেত চেষ্টা দ্বারা কি না হইতে পারে? শিক্ষাসম্বন্ধে একটী অভাব আছে তাহার দূরীকরণার্থ গবর্ণমেণ্ট যত্নবান হইবেন এমত আমরা কখন প্রত্যাশা করিতে পারি না, সে অভাব শিক্ষা-প্রণালীতে জাতীয় ভাবের অভাব। এই অভাব মোচনার্থ আমাদেরই যত্নবান হইতে হইবে। যদ্যপি আমাদিগের দেশের ধনাঢ্য ও অন্যান্য লোক একত্রিত হইয়া একটি জাতীয় শিক্ষাসমাজ স্থাপন করেন এবং সেই জাতীয় শিক্ষাসমাজে যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষাতে শিক্ষার উচ্চতম বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করিবেন তাঁহাদিগকে এবং যে সকল ব্যক্তি ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হইবার পর সেই সকল গ্রন্থে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাদিগকে লোভনীয় অর্থ পারিতোষিক ও উপাধি প্রদান করেন তাহা হইলে দেশের গৌরব কত দূর রক্ষিত হয় তাহা বলা যায় না। যখন আমাদিগের দেশের লোকে যাঁহারা উল্লিখিত শিক্ষাসমাজ হইতে উপাধি প্রাপ্ত না হইবেন তাঁহাদিগকে প্রকৃত বিদ্বান বলিয়া গণ্য করিবেন না তখন বঙ্গসমাজে নব জীবনের সঞ্চার হইয়াছে এমৎ বলা যাইতে পারিবে।

তারাকদম্বকুসুমান্যবকীর্য্য দিক্ষু
ক্ষেমায় সর্ব্বজগতাং স্বকরৈঃ প্রকামং।
হিণ্ডীরপাণ্ডররুচিঃ শশলাঞ্ছনোঽয়ং
নীরাজয়ন্ ভুবনভাবনমুজ্জিহীতে।

স্বৈরং শৈলবনাবলীং বিঘটয়ন্
সংক্ষোভয়ন্ সাগরং
প্রধ্যাতৈর্গিরিকন্দরান্ মুখরয়ন্
ব্রহ্মাণ্ডমুদ্বোধয়ন্।
বায়ো ত্বং শুভশঙ্খচামরভবাং প্রীতিং
বিধেহি প্রভোঃ
সন্ধ্যামঙ্গলদীপকোঽয়মুদগাৎ ব্যোম্নি
স্ফুরত্তারকে।

তারকা-কুসুমচয় ছড়ায়ে আকাশময়
চন্দ্রমা আরতি তাঁর করিছে গগনে।
দুলায়ে পাদপগুলি, সাগরে তরঙ্গ তুলি,
জাগাইয়া জগতের জীবজন্তুগণে।
পর্ব্বতকন্দরে গিয়া, শুভ শঙ্খ বাজাইয়া,
পবন হরষে তাঁরে চামর দুলায়।
অগণ্য তারকাবলী চৌদিকে রয়েছে জ্বলি,
মঙ্গলকনকদীপ গগণের গায়॥

কামকাট্‌কা দেশ।

মানচিত্রে সাইবিরিয়া দেশ দেখিলে কামকাট্‌কার অদ্ভুত আকৃতি আমাদিগের দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ আকর্ষণ করে। উহা দেখিতে একটী হ্রস্ব মানব-বাহুর ন্যায়। উহা একটি প্রায়দ্বীপ। দেশটী দেখিতে অতি সুন্দর; উহা পর্ব্বত নদ নদী, কানন ও জলপ্রপাতে পরিপূর্ণ এবং উত্তর সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী বলিয়া, যত হিমপ্রধান মনে করা যায় তত নহে। দেশটী দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু তাহাতে অধিক লোকের বসতি নাই। উহা গ্রেটব্রিটন অপেক্ষা বৃহৎ হইলেও গ্রেটব্রিটনের একটি ক্ষুদ্র নগর কামকাট্‌কার সমস্ত নিবাসীকে ধারণ করিতে পারে। এমন সুন্দর দেশে এত অল্প লোক থাকিবার কারণ এই যে, তন্নিবাসীরা পরিশ্রম অপেক্ষা ব্রাণ্ডী অধিক ভাল বাসে। উহারা রুশসৈন্য, বণিক ও কয়েদীর সংসর্গপ্রভাবে পানদোষে লিপ্ত হইয়াছে এবং রোগাতুর হইয়া, অকালে কাল-সদনে নিপতিত হইতেছে। যে অসভ্য জাতিমধ্যে ইওরোপীয়েরা প্রবেশ করে তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে তথায় ব্রাণ্ডি ও রম্ প্রবেশ করিয়া সেই জাতির নিধন সাধন করে। জাতিসাধারণ নিধনের এরূপ উপায় আর দ্বিতীয় নাই।

কামকাট্‌কাবাসীদিগকে কামকাড্‌ডেল বলে। এক জন পথিক একটি কামকাড্‌ডেলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, চীন দেশ হইতে যদ্যপি একটি জাহাজ চা এবং শর্করাপূর্ণ হইয়া আইসে তাহা হইলে তাহা তাহার মনোনীত হয় কি না। কামকাড্‌ডেল উত্তর করিল, মনোনীত হয় কিন্তু ইহা অপেক্ষা যদ্যপি একটি জাহাজ মনুষ্য বোঝাই হইয়া আইসে তাহা হইলে তাহা আমাদিগের অধিকতর মনোনীত হয়। মনুষ্যই আমাদিগের অধিক প্রয়োজন, কারণ, আমাদিগের লোক সকল প্রায়ই রোগাতুর। এই যে আমার বারটী লোক দেখিতেছেন ইহাদিগের মধ্যে ছয়টী এত ক্ষীণ যে, তাহারা মৃগয়া করিতে কিংবা মৎস্য ধরিতে পারে না। কামকাড্‌ডেলদিগের দৃষ্টান্ত হইতে বঙ্গবাসীরা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারেন। ব্রাণ্ডীর ন্যায় অস্বাস্থ্যকর ও লোকক্ষয়কারী পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই।

ধর্ম্মবিষয়ে কামকাড্‌ডেলেরা গ্রীকচর্চ্চ সম্প্রদায়-ভুক্ত, কিন্তু তাহারা ধর্ম্মের কোন ধার ধারে না; কেবল মৃগয়ায় এবং মৎস্য ধরা কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকে।

যেখানে অল্প মনুষ্য বাস করে সেখানে অধিক পশুপক্ষী থাকে। কামকাট্‌কায় এইরূপ ঘটিয়াছে। কামকাট্‌কা দেশের জন্তু সকলের মধ্যে অর্গলী নামক পার্ব্বতীয় মেষ সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত। উহাদের শৃঙ্গ প্রকাণ্ড এবং অদ্ভুত প্রকারে বক্রীভূত। উহারা সামান্য মেষের ন্যায় নিরীহ ও নির্ব্বোধ নহে। বোধ হয়, উহাদের অপেক্ষা বলবান ও চটুল পশু আর নাই। উহারা অতি ভয়ানক উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে এত শীঘ্র শীঘ্র আরোহণ করে যে, কোন বৃক কিংবা ভল্লুক উহাদিগকে ধৃত করিতে সক্ষম হয় না। আমরা যেমন গৃহের মেজের উপরে অবলীলাক্রমে বেড়াই, উহারা সেইরূপ অবলীলাক্রমে সেই সকল স্থানে বেড়ায়। যখন কোন পর্ব্বতারূঢ় মৃগয়ার্থী উহাদিগকে গুলি করে তখন উহারা

একেবারে অন্তর্হিত হয়। উহারা তৎক্ষণাৎ শৃঙ্গ হইতে নিম্নে লম্ফ দিয়া পড়ে। এতদ্রূপ উচ্চ স্থান হইতে লম্ফ দিয়া পড়িলে শরীর একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, কিন্তু উহাদের কিছুই হয় না, কারণ উহাদের অস্থি অতি দৃঢ় ও চর্ম্ম অতি স্থূল।

কামকাট্‌কার ভল্লুকেরা প্রধানত মৎস্য এবং জাম ফল খাইয়া প্রাণ ধারণ করে এবং মনুষ্যকে প্রায় আক্রমণ করে না, কিন্তু মনুষ্যেরা চর্ম্ম ও বসার জন্য তাহাকে শীকার করে। উহার চর্ম্মে চোগা নির্ম্মিত হয় এবং উহার বসা দীপালোকের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উহার চর্ম্ম কুক্কুরদিগকে ভক্ষণার্থ দেওয়া হয়। কামকাট্‌কার অধিকাংশ ভল্লুক অতি কৃশ। স্থূলকায় ভল্লুকেরা বিনা আহারে সমস্ত শীতকাল গর্ত্তে নিদ্রা যায়। কৃশ ভল্লুকেরা ঐ কালে অধিক ক্ষণ নিদ্রিত থাকিতে পারে না, এবং আহারার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। ঐ সকল ভল্লুককে কুক্কুরেরা অত্যন্ত ভয় করে। কামকাট্‌কা দেশে কুক্কুরেরা গাড়ী টানে। একদা অনেক গুলি পথিক কুক্কুর-যোজিত শকটে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে ছিলেন। এমত সময়ে তাঁহারা দেখিলেন, কুক্কুরেরা নাশিকা স্পন্দন পূর্ব্বক যেন কোন দ্রব্যের আঘ্রাণ লইতে লাগিল এবং পরক্ষণেই তাঁহারা দেখিলেন, একটী ভল্লুক তাঁহাদিগের সম্মুখ দিয়া পথ পার হইয়া বনের দিকে দৌড়িয়া গেল। কুক্কুরেরা ইহাতে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। কতকগুলি রজ্জু ছিন্ন করিয়া কোথায় পলাইয়া গেল, কতকগুলি যাইতে যাইতে বৃক্ষে আবদ্ধ হইয়া গেল এবং শকট উল্টাইয়া দিল, কিন্তু ভল্লুক পরিত্রাণ পাইল না। পথিকেরা তাহাকে গুলি করিল এবং তাহার শরীর কুক্কুরদিগকে ভক্ষণার্থ অর্পণ করিল। কোথায় ভল্লুক কুক্কুরের মাংস ভক্ষণ করিবে, না কুক্কুরেরা তাহার মাংস ভক্ষণ করিল!

শীল মৎস্য ধরা কাম্‌কাডডেলদিগের একটী প্রধান কর্ম্ম। একদা তিনটি ব্যক্তি প্রত্যেকে পঞ্চ-কুক্কুর-যোজিত শকটে আরোহণ পূর্ব্বক শীল বধার্থ সমুদ্রের উপকূল-সন্নিহিত ভাসমান একটী প্রকাণ্ড তুষার-শৈলে গিয়া উঠিল। তাহারা দুইটী শীলবধ করিতে কৃতকার্য্য হইল। কিন্তু তাহারা অনুভব করিল যে,তুষার-শৈল সরিয়া গিয়া তাহাদিগকে সমুদ্রে লইয়া ফেলিতেছে। তখন তাহারা তীর হইতে এত দূরে গিয়াছে যে আর ফিরিয়া আসিতে পারে না। তাহাদিগের ভাগ্যে অবশেষে কি আছে ইহা স্থির করিতে না পারিয়া, তাহারা অত্যন্ত ভীত হইল এবং হিম ও ক্ষুধাতে পঞ্চত্ব পাইবে এমত আশঙ্কা করিতে লাগিল। ঐ তুষার-খণ্ড এতদ্রূপ পিচ্ছিল,যে তাহাদিগের সমুদ্রে গড়াইয়া পড়িবার অত্যন্ত সম্ভাবনা ছিল। ইহা নিবারণ করিবার জন্য তাহারা ঐ তুষারে খুটি গাড়িয়া সে খুটিতে আপনাদিগের শরীর বন্ধন করিয়া রাখিল। এইরূপ অনেক দিন ভাসিতে ভাসিতে যাইতে লাগিল। এক দিন প্রাতে সমুদ্রতীর নিকটবর্ত্তী দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। তাহারা পরিত্রাণ পাইয়া করুণাময় ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বিস্মৃত হইল না। তাহারা আহার-অভাবে এত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়া ছিল যে,হামাগুড়ি দিয়াও তীরে উঠিবার সামর্থ ছিল না!

কামকাড্‌ডেলেরা অতি উদার ও কৃতজ্ঞ জাতি। এক দরিদ্র-পরিবার আর একটী পরিবারকে আপনাদিগের আলয়ে ছয় সপ্তাহকাল রাখিয়া বিলক্ষণ আতিথেয়তা করে এবং খাদ্যভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষিত হয়, এমন সময়ে অতিথিদিগকে অনটনের

অবস্থা স্পষ্টরূপে না জানাইয়া নানা প্রকার মাংস ও উদ্ভিদ একত্র পাক করিয়া এক চড়চড়ি প্রস্তুত করে এবং সেই চড়চড়ি তাহাদিগের সম্মুখে ধরিয়া দেয়। এই প্রকার চড়চড়ি দেখিলেই অতিথিরা জানিতে পারে যে খাদ্যভাণ্ডার ফুরাইয়াছে এবং তাহারা তৎক্ষণাৎ বিদায় গ্রহণ করে। তাহাদিগের কৃতজ্ঞতার একটি উদাহরণ বিবৃত হইতেছে। একদা এক জন পথিক এক দরিদ্র বালককে দেখিয়া তাহাকে পরিচিত মনে করিয়া বলিলেন "আমি বোধ হয় পূর্ব্বে তোমাকে দেখিয়াছি।" বালক উত্তর করিল "হাঁ মহাশয়! আমাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছেন। আমি গত নিদাঘে আপনাকে নদীর উপর দিয়া নৌকা বাহিয়া আনিয়াছি এবং তজ্জন্য আপনি অনুগ্রহ করিয়া এক খণ্ড চর্ম্ম এবং কতকগুলি চক্‌মকি পাথর আমাকে দিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনার জন্য একটি সেবেল চর্ম্ম আনিয়াছি" কামকাট্‌কা দেশের সেবেল পশুর রোমশ চর্ম্ম মূল্যবান। পথিক দেখিল, বালকের কামিজ নাই এবং ক্যাম-ক্যাড্‌ডেলেরা কামিজের উপর যে চর্ম্ম-পরিচ্ছদ পরে সেই চর্ম্ম-পরিচ্ছদেরও অনেক স্থান ছিন্ন হইয়াছে। ইহা দেখিয়া পথিক বালকদত্ত উপহার লইতে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু বালক ক্রন্দন করিতে করিতে যাইতেছে দেখিয়া,তিনি তাহাকে পুনরায় ডাকিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে, ইউরোপীয় সভ্যতা কোন অসভ্য জাতির মধ্যে যত প্রবেশ করে ততই মনুষ্যের এই সকল প্রধান গুণ ক্রমে অন্তর্হিত হইতে থাকে বরং তাহাদিগের আদর্শে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ঐ সকল গুণ দৃষ্ট হয়'কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

ভগবদ্গীতা হইতে শ্লোক সংগ্রহ।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ॥

যিনি স্বদৃষ্টান্তে সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া অন্যের কেবল সুখ ইচ্ছা করেন, কদাচ দুঃখ কামনা করেন না, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥

হে অর্জ্জুন, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির ইহলোকে পাতিত্য জন্মে না এবং পরলোকেও নরকযন্ত্রণা সহিতে হয় না; যিনি শুভোদ্দেশে কোনরূপ অনুষ্ঠান করেন তাঁহার কদাচই দুর্গতি লাভ হয় না।

তপস্বিভ্যোঽধিকোযোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকোযোগী তস্মাৎ যোগী ভবার্জ্জুন॥

হে অর্জ্জুন, তপস্বী, জ্ঞানী ও যাগযজ্ঞপরায়ণ অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, অতএব তুমি যোগী হও।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যোমাং স মে যুক্ততমোমতঃ॥

যোগীদিগের মধ্যেও যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া একান্ত মনে ঈশ্বরকে ভজনা করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী।

মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে অল্প লোকই সিদ্ধি লাভের জন্য যত্ন করেন। আবার ঐ অল্পের মধ্যেও অল্প লোক যথার্থত ঈশ্বরকে জানিতে পারেন।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব॥

হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র কিছুই নাই। সূত্রে যেমন মণি সকল গ্রথিত থাকে সেইরূপ তাঁহাতে সমস্ত জগৎ অনুস্যূত রহিয়াছে।

ন মাং দুষ্কৃতিনোমূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াঽপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাস্থিতাঃ॥

যাহাদিগের জ্ঞান মোহবলে অপহৃত হইয়াছে এবং যাহারা দম্ভঅভিমান প্রভৃতি আসুর ভাবে নীয়মান হইতেছে সেই সমস্ত পাপকারী পামরেরা ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয় না।

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তোজিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

হে অর্জ্জুন, ব্যাধিনিপীড়িত,আত্মতত্ত্বানুসন্ধায়ী, ধনাকাঙ্ক্ষী এবং জ্ঞানী এই চতুর্বিধ লোকই ঈশ্বরকে ভজনা করেন।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়োহি জ্ঞানিনোত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥

এই চতুর্বিধ লোকের মধ্যে ঈশ্বরনিষ্ঠ একমাত্র ঈশ্বরের ভক্ত জ্ঞানীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, ঈশ্বর জ্ঞানীর প্রিয় এবং জ্ঞানবানও ঈশ্বরের প্রিয়।

অনন্যচেতাঃ সততং যোমাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

যিনি অনন্যমনে নিরন্তর ঈশ্বরকে স্মরণ করেন সেই ব্রহ্মপরায়ণ যোগীর পক্ষে ঈশ্বর সুলভ হইয়া থাকেন।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্তনন্যয়া।
যস্যান্তস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততং॥

হে অর্জ্জুন, স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত সকল যাঁহার মধ্যে অবস্থিত এবং যাঁহা দ্বারাই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তিনিই পরম পুরুষ, অসাধারণ ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায়।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টং।
অত্যেতি তৎসর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যং॥

এই তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া বেদ, যজ্ঞ,তপস্যা, ও দানে যে পুণ্যফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তৎসমুদায় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যোগী হইয়া ঈশ্বরের পরম পদও লব্ধ হইয়া থাকে।

সততং কীর্ত্তয়ন্তোমাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥

কেহ কেহ স্তোত্র দ্বারা গুণকীর্ত্তন করিয়া কেহ কেহ ব্রতপালনে সুদৃঢ় নিষ্ঠা রাখিয়া, কেহ কেহ জ্ঞানবৈরাগ্যাদিতে যত্নশীল হইয়া এবং কেহ কেহবা ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকেন।

পিতাহমস্য জগতোমাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥

ঈশ্বর এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা ও পিতামহ। তিনি জ্ঞেয় বস্তু, পবিত্র, প্রণব, ঋক, সাম ও যজু।

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ং॥

তিনি গতি, পালক, নিয়ন্তা, সাক্ষী, ভোগস্থান, রক্ষক, সুহৃৎ, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, আধার, লয়স্থান ও অব্যয় বীজ।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥

যাঁহারা অনন্যপরায়ণ হইয়া ঈশ্বরকে চিন্তা করত সেবা করেন সেই সমস্ত ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের যোগক্ষেম (অলব্ধ লাভ ও লব্ধরক্ষা) ঈশ্বরই বহন করিয়া থাকেন।

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং॥

হে অর্জ্জুন, যে সমস্ত ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অন্য দেবতাকে পূজা করেন তাঁহারা ঈশ্বরকেই অবিধিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যোমে ভক্ত্যা প্রয়চ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতং অশ্নামি প্রয়তাত্মনঃ॥

যিনি ঈশ্বরকে ভক্তি পূর্ব্বক পত্র পুষ্প ফল ও জল প্রদান করেন ঈশ্বর সেই শুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তির ঐ সমস্ত ভক্তির উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণং॥

হে অর্জ্জুন! তুমি যা কিছু অনুষ্ঠান কর এবং যা কিছু আহার, হোম, দান এবং তপস্যা করিয়া থাক তৎসমুদায় ঈশ্বরেতে অর্পণ কর।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তোমামুপৈষ্যসি॥

হে অর্জ্জুন! এইরূপে তুমি শুভাশুভফলপ্রদ কর্ম্মবন্ধন দ্বারা বিমুক্ত হইবে এবং ঈশ্বরে কর্ম্মসমর্পণরূপ যোগে নিষ্ঠিত হইয়া ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবে।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং॥

ঈশ্বর সর্ব্বভূতে সমদর্শী, কেহ তাঁহার প্রিয় ও দ্বেষ্যও নাই। যিনি ভক্তি সহকারে ঈশ্বরকে ভজনা করেন তিনি ঈশ্বরে, এবং ঈশ্বর তাঁহাতে অবস্থান করেন।

অপিচেৎ সুদুরাচারোভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ॥

যদি সুদুরাচারও ঈশ্বরনিষ্ঠ হইয়া ঈশ্বরকে ভজনা করেন তাহা হইলে তাঁহাকে সাধুই বলিতে হইবে,কারণ তাঁহার অধ্যবসায় অতি শোভন।

কৃতান্তকরপাড়নক্রটিতদেহগেহোজ্বলৎ-
শ্মশানতটপাবকং বহসি জীব জীবন্ শতং।
অতোবিমুষ নশ্বরং সুখমনীশ্বরং কিং মুধা
প্রমাদমদবিহ্বলোবিষয়দুর্ম্মদস্তাম্যসি॥

জীব! তুমি,শত বৎসর জীবিত থাকিয়াও কৃতান্তের উপদ্রবে নষ্টদেহ হইয়া শ্মশানাগ্নিতে ভস্মীভূত হও। অতএব পার্থিব সুখ নশ্বর জ্ঞান কর, প্রমাদমদে বিহ্বল ও বিষয়ে স্ফীত হইয়া কেন বৃথা ক্লেশ ভোগ করিতেছ।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক সকল নিম্নলিখিত নগদ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

মফস্বলের ক্রেতাগণ ১১ মাঘের মধ্যে মণিঅর্ডার বা হুণ্ডি দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাক মাশুল পাঠাইলেই পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন, ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না।

নির্দ্ধারিত মূল্য।

ব্রহ্মসঙ্গীত (সম্পূর্ণ)	...	৷৷০
ব্রহ্মবিদ্যালয়	...	১
বেদান্ত প্রবেশ	...	১
সৃষ্টি	...	১
বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি	...	১
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?		।০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়		৵০
গীতাঙ্কুর	...	।০
A Discourse against Hero-making in religion	....	As. 12

২৫ টাকা কমিসন বাদে নির্দ্ধারিত মূল্য।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে)	১৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (ঐ ভাল বাঁধা)	১৸৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস,	।৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ	।৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ	।৵০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ...	।৵০
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ	৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ভাগ	।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	৷৷৵০
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	।৵০
আত্মোৎকর্ষ বিধান ...	১ (১০
পৌত্তলিক প্রবোধ	৵০
গৃহকর্ম্ম	৵০

	As. P.
Defence of Brahmoism and the Brahma Samaj	3
Brahmic Questions of the Day	4 6
Brahmic Advice, Caution and Help ...	2 3
Adi Brahma Samaj, its Views and Principles ..	1 6

	As.	P.
Adi Brahma Somaj as a Church	2	3
A Reply to the Query; "What is Brahmoism?"	3	
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	0	9
Reply to Bishop Watson's Apology for the Bible ..	4	6

নির্দ্ধারিত অর্দ্ধ মূল্য।

সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	।০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	৵০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড ...	।০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত ...	।০
মাঘোৎসব	॥০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৶০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৶০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা	।০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	৶০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা ...	(১০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	॥০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ	৸০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ	॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা দ্বিতীয় ভাগ ...	॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	১
অধিকারতত্ত্ব	।০
হিন্দুধর্ম্মনীতি	॥০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা	/১০
তত্ত্বপ্রকাশ	/১০
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা	/১৫
ব্রহ্মোপাসনা	(১০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	(১০
ব্রহ্ম-স্তোত্র	(১৫
ধর্ম্ম-শিক্ষা	/০
প্রবচন সংগ্রহ	(১৫
ব্রহ্ম-সঙ্গীত চতুর্থ ভাগ	/০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত পঞ্চম ভাগ	/০
সুভাব সঙ্গীত	৵০
সংগীত মুক্তাবলি ১।২ ভাগ একত্রে ...	৵০
সংগীত মুক্তাবলি তৃতীয় ভাগ	৵০
কুমার শিক্ষা ...	৵০
প্রশ্নমঞ্জরী	।০
প্রভাত-কুসুম	৵১০
উদ্বোধনাঞ্জলি	(১০
ধর্ম্ম দীক্ষা	(১০
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৭ শকের একত্র বাঁধান	।৵০
ব্রহ্মসাধন	/০
ব্রহ্মজ্ঞান	(১০
ব্রহ্মজ্ঞান সূত্র তাৎপর্য্য সহিত ...	/১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড ...	(১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড ...	/০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জন-সমাজের সম্বন্ধ	(১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব	(১০
উপদেশ	(৫
দুর্গোৎসব	(১০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	(১০
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা ...	(৫
বর্ণমালা দ্বিতীয় সংখ্যা	(১০

	Rs.	As.	P.
Ontology ..	1		
Hindoo Theism		6	
Theist's Prayer Book		6	
Signs of the Times		6	
Vedantic Doctrines Vindicated	1		
Doctrine of Christian Resurrection		1/2	
Physiology of Idolatry ..		1	
Miracles or the Weak Points of Revealed Religion ..		4	

নির্দ্ধারিত সিকি মূল্য।

দশোপদেশ	৵১০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) ...	/০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ...	৵০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	(১০

১৭৬৯ শক অবধি ১৭৯৫ শক পর্য্যন্ত (১৭৭৪ ও ১৭৮১ শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ও অর্দ্ধমূল্যে অর্থাৎ প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান ২৷৷০ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

নির্দ্ধারিত-মূল্যের পুস্তক সকল অন্যূন দশ টাকার ক্রয় করিলে, শতকরা ১২৷৷০ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবে।

নূতন বিক্রেয় পুস্তক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত। মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে এবং অর্থ ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নরূপে লাল কাল কালিতে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ৩৷৷০ তিন টাকা আট আনা। আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯৩৩। ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৯৭৮। ১ মাঘ শনিবার।

Registered No 52.

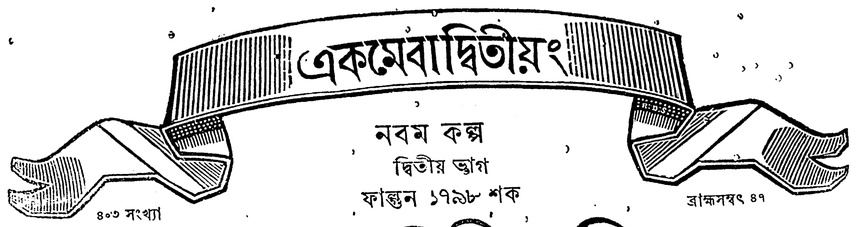

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

উপদেশ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১০ মাঘ ১৭৯৮ শক।

শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিবৃত।

তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বং এতদমৃতমভয়ং
শান্ত উপাসীত।
ব্রাহ্মধর্ম্ম ১খ, ১১ অ, ৫ শ্লোক।

সেই যে এই ব্রহ্ম ইহাঁর পূর্ব্বে আর কেহ নাই; ইনি অমৃত ও অভয়। শান্ত হইয়া ইহাঁর উপাসনা করিবেক।

প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকই ঈশ্বরোপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। ধর্ম্মবিষয়ে সম্প্রদায়-ভেদে যত প্রকার মতভেদ ও অনৈক্য দৃষ্ট হউক না কেন, উপাসনার কর্ত্তব্যতা পক্ষে প্রায় সকলেরই এক মত; সকল ধর্ম্মেই বলে, "অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর; নিত্য উপাসনা কর, কারণ উপাসনা মনুষ্যকে জঘন্য অপরাধ এবং যাহা কিছু দূষণীয়; তাহা হইতে রক্ষা করে।" কেবল উপাসনার প্রণালী-বিষয়ে মতের তারতম্য বশত উপাসনাসম্বন্ধে মতের এত প্রভেদ বোধ হয়। সে যাহা হউক, অন্য কোন প্রকার ধর্ম্মের মতামতের বিষয় কোন উল্লেখ না করিয়া, কেবল হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই যে, ঈশ্বরোপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া সর্ব্বত্রই উক্ত হইয়াছে। বেদে বলে "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবেক। মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে, "উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ" সেই পরব্রহ্মই উপাস্য, যাঁহাতে এই জীবাত্মা প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। তন্ত্রে বলে, "সকল-ভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে" সকল ভুবনের বীজ যে ব্রহ্মচৈতন্য তাঁহাকে ধ্যান করি। ব্রহ্ম-সঙ্গীতে বলে, "ভাব, তাঁরে হবে ধন্য সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়।" এইরূপে প্রায় সকল শাস্ত্রেই সকল ধর্ম্মেই ঈশ্বরোপাসনার আবশ্যকতা ও কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিতেছে। এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজে দেখিতে পাই যে একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। কিন্তু যেমন কেবল কর্ত্তব্যতা বোধ বা কোন বিষয়ের আবশ্যকতার জ্ঞান দ্বারা প্রকৃত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই রূপ ঈশ্বরোপাসনা নিতান্ত প্রয়োজনীয়,

ব্রহ্মারাধনা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য,কেবল এই মাত্র জ্ঞান দ্বারা আমরা কোন বিশেষ ফল লাভ করিতে পারি না। তবে এপ্রকার জ্ঞানের" প্রধান এক উপকার এই যে, ঈশ্বরোপাসনার আবশ্যকতা ও কর্ত্তব্যতার জ্ঞান হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইলে তাহা সেই কর্ত্তব্য সাধনের উপায় উদ্ভাবন না করিয়া আমাদিগকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেয় না। পরব্রহ্মের উপাসনা জীবনের লক্ষ্য সাধনের একমাত্র উপায় এবং সর্ব্বক্ষণ তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত থাকা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, এই কথা যাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে তিনি উপাসনা না করিয়া কখনই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। পিপাসা-নিবৃত্তির নিমিত্ত সুশীতল বারি আবশ্যক ইহা জানিয়া কোন্ পিপাসাতুর ব্যক্তি জল অন্বেষণ না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? একমাত্র ঈশ্বরোপাসনার দ্বারা আত্মার পিপাসাশান্তি হয়; করুণাময় পিতা ব্যতিরেকে আত্মার ব্যাকুলতা দূর করে এমন আর কেহ নাই; শান্তি ও অমৃতের তিনিই একমাত্র আধার এবং তিনিই পবিত্রতার একমাত্র উৎস, এই বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করত কোন্ ব্রাহ্ম সেই নিখিল-মাতার উপাসনা না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। স্নেহময়ী জননীর ক্রোড় প্রসারিত দেখিয়া কোন্ শিশু তাহা উপেক্ষা করে; এমন পাষণ্ডহৃদয় কে আছে যে, মাতার ক্রোড়কে অবহেলা করিয়া কণ্টকাবৃত শয্যাকে আলিঙ্গন করে। সেইরূপ যখন জানিলাম যে, প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বর আমাদিগের জীবনের পরম উদ্দেশ্য এবং তাঁহার উপাসনাই আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, তখন তাঁহার উপাসনা কি ও তাহা কিরূপে সম্পন্ন হয় তাহা না জানিয়া কোন প্রকারেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। কিন্তু উপাসনা কি ও কিরূপে উপাসনা করিতে হয় এই বিষয়ের আলোচনা অতি অল্প কালের মধ্যে কখনই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। উপাসনার ভাব, প্রকৃতি, ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিষয় পর্য্যালোচনা করাও এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে; এবং উপস্থিত বিষয়ের সম্যক বোধের নিমিত্ত সে প্রকার সমালোচনারও প্রয়োজন নাই। উপাসনার কেবল একটী প্রধান অঙ্গের উল্লেখ করিলেই উপস্থিত প্রস্তাবের পক্ষে যথেষ্ট হইবে এবং তাহাতে আমরা দেখিতে পাইব যে, যদি আমরা কেবল সেই প্রধান অঙ্গের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে পারি, তাহা হইলেই উপাসনার অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ আপনা হইতেই আসিবে, কেবল তাহা হইতেই আমরা উপাসনার পূর্ণ ভাব প্রাপ্ত হইতে পারিব। কিন্তু যদি আমাদিগের উপাসনা সেই প্রধান অঙ্গ বিবর্জ্জিত হয় তাহা হইলে আমাদিগের উপাসনা যে কেবল অঙ্গহীন হইবে তাহা নহে, আমাদিগের উপাসনাই হইবে না। কাজেই উপাসনা-বিহীন এবং ঈশ্বর-সহবাসে বঞ্চিত হইয়া আমরা ক্রমেই অধোগতি প্রাপ্ত হইব, ক্রমেই মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতে থাকিব। অতএব উপাসনার সেই প্রধান অঙ্গকে এস্থলে আপাততঃ উপাসনা বলিলেও বিশেষ ক্ষতি দেখা যায় না। এনিমিত্ত যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে উপাসনা কি? তাহা হইলে তাহার উত্তরে আমরা বলিব যে, আত্মাতে ঈশ্বরকে আবির্ভূত করিবার চেষ্টা ও স্বীয় আত্মাতে করুণাময় পরমেশ্বরের স্বরূপ দর্শন করাকে উপাসনা বলে। যদি আত্মাতে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রতিভাত না হয়, যদি তাঁহার পবিত্র মূর্ত্তি স্বীয় আত্মাতে দেখিতে না পাই তাহা হইলে আমাদিগের ঈশ্বরের উপাসনা করা হয় না। ব্রাহ্মধর্ম্মে কথিত হইয়াছে যে, "তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহাদিগের নিত্য শান্তি

হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।" যদি বলি যে ঈশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা; তাহাতেও বুঝিতে পারিব যে, স্বীয় আত্মাতে ঈশ্বরের স্বরূপ দর্শন করাই তাঁহার উপাসনা; কেন না, যদি হৃদয়-মন্দিরে ঈশ্বরের আবির্ভাব না হয়, যদি স্বীয় আত্মাতে তাঁহার পবিত্র মূর্ত্তি প্রতিভাত না হয়, যদি আত্মাতে আত্মাকে অনুক্ষণ দেখিতে না পাই, তাহা হইলে জানিব যে, আমি ঈশ্বরকে প্রীতি করি না, এবং যদি ঈশ্বরকে প্রীতি না করি তাহা হইলে তাঁহার প্রিয় কার্য্যও আমার দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। এইরূপে যে প্রকারে ইচ্ছা, উপাসনার ভাব গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি না কেন, সর্ব্বপ্রকারেই ইহা উপলব্ধ হইবে যে, স্বীয় আত্মাতে ঈশ্বরের স্বরূপ দর্শন করিতে না পারিলে আমাদিগের উপাসনা সম্পন্ন হয় না, এবং এই নিমিত্তেই উপাসনাকালে আমাদিগের আত্মাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব না হইলে, আত্মাতে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রতিভাত না হইলে উপাসনা করিলাম বলিয়া মনের ক্ষোভ নিবৃত্তি হয় না, উপাসনা সম্পন্ন হইল বলিয়া কখনই আত্মা পরিতৃপ্ত হয় না।

এক্ষণে দেখা যাউক যে, এই উপাসনা কি প্রকারে সম্পন্ন হয়? কি রূপে ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য? তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এই যে, শান্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবেক। "শান্তি ঈশ্বর-প্রীতির নিবাস-ভূমি।" যেমন কম্পমান জলাশয় নিতান্ত স্বচ্ছ হইলেও তন্মধ্যে কোন পদার্থের প্রতিবিম্ব স্পষ্ট এবং সম্পূর্ণরূপে দৃষ্ট হয় না, যেমন কোন বস্তুর আকৃতি যতই সুন্দর এবং মনোহর হউক না কেন বাতকম্পিত জলের মধ্যে তাহার কান্তি মনোহর জ্ঞান হয় না, যেমন কম্পমান জলের মধ্যে সকলই কম্পিত দেখা যায়, এবং এক বস্তুকে অনেক বোধ হয়,—আকাশ সূর্য্য বৃক্ষ লতা প্রভৃতিকে ভগ্ন এবং বহুধা জ্ঞান হয়, এবং একের উপর অপর বস্তু এরূপে পতিত ও পরস্পর এরূপ সংলগ্ন বোধ হয় যে, এক পদার্থকে অন্য পদার্থ হইতে পৃথক করিয়া লওয়া যায় না। সেইরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি যতই দৃঢ় হউক না কেন, উপাসনা-কালে আত্মা শান্ত এবং সমাহিত না হইলে ঈশ্বরের স্বরূপ তাহাতে প্রতিভাত হয় না। উপাসনা-কালে কোন প্রবল বৃত্তি দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে অথবা দুশ্চিন্তায় মন অশুচি থাকিলে পরমপবিত্র ব্রহ্মানন্দ-উপভোগে সামর্থ্য থাকে না, বরং হয় ত মোহপ্রমাদ বশতঃ কোন প্রকার মনোবৃত্তির প্রাবল্যকে ঈশ্বরের আবির্ভাব বলিয়া ভ্রম হয়। কলুষিত আত্মা ঈশ্বর-অর্চ্চনার স্থান নহে, নির্ম্মল এবং সুস্থির হ্রদের ন্যায় আত্মাকে পরিশুদ্ধ এবং শান্ত করিতে না পারিলে তাহাতে কখনই পরমাত্মার আবির্ভাব হইতে পারে না। এই নিমিত্ত শান্ত এবং সমাহিত-চিত্ত হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা কর্ত্তব্য। সামান্য কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে মনকে স্থির করিতে হয়, সংযতচিত্ত ব্যতিরেকে মানসিক অতীব লঘু কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না; তবে আমাদের চির জীবনের কার্য্য, জীবনেশ্বরের সহিত নিত্য-সহবাস-জনিত ভূমানন্দ লাভের চেষ্টা কি রূপেই বা বিক্ষিপ্ত ও অশান্ত চিত্তে সম্পন্ন হইতে পারে? এই নিমিত্তই কথিত হইয়াছে যে, শান্ত হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিবেক।

কিন্তু শান্তরূপে উপাসনা কি, এবং তাহা কি প্রকারে সম্পন্ন হয়? বোধ করি সকলেই আপন আপন জীবনের পরীক্ষা-কালে দেখিয়া থাকিবেন যে, নিয়মিতরূপে উপাসনার কালে অনেক দিন এমন ঘটে যে, অন্য দিবস যেরূপে ঈশ্বরচিন্তা করিয়া থাকেন, অন্য

দিন যেরূপে পিতার নিকট উপস্থিত হয়েন, অন্য দিন যে নিয়মে ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা করিয়া থাকেন, সে দিনও সেইরূপ করিলেন, এমন কি হয় ত অধিকতর শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, হয় ত সেই দিবস অন্য দিনের অপেক্ষা অধিক সময় ঈশ্বর-আরাধনায় ক্ষেপণ করিলেন; কিন্তু চিত্তের প্রফুল্লতা কিছুমাত্র লাভ করিতে পারিলেন না। উপাসনার দ্বারা প্রত্যহ আত্মার যে প্রকার শান্তি লাভ করেন আত্মার ভার যে প্রকার লঘু বোধ হয়, তাহা হওয়া দূরে থাকুক, বরং চিত্ত আরও ম্লান এবং আত্মা অধিকতর ম্রিয়মাণ বোধ হইতে লাগিল। যেন উপাসনা করিয়াছি বলিয়া বোধ হইল না। এরূপ অবস্থা যে কেবল নিভৃত উপাসনাতেই উপলব্ধ হয় তাহা নহে; পারিবারিক বা সামাজিক উপাসনাতেও তাহা মধ্যে মধ্যে লক্ষিত হইয়া থাকে। এপ্রকার ঘটনার কারণ কি? কি নিমিত্তেই বা একই কার্য্যে এক সময়ে এক প্রকার সময়ান্তরে অন্য প্রকার ফল উপলব্ধ হয়? বিশেষ মনোযোগ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, চিত্তের বিক্ষিপ্ততাই এই প্রকার বৈষম্যের কারণ। ঈশ্বর-উপাসনার নিমিত্ত বাক্য চাহি না বা কোন বাহ্য আড়ম্বরও আবশ্যক হয় না, যে, বাক্যের বা আড়ম্বরের ইতর-বিশেষে ফলের তারতম্যের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। ঈশ্বর-উপাসনার নিমিত্ত কেবল শান্ত ও সমাহিত চিত্ত আবশ্যক। এই নিমিত্ত যখন উপাসনার পরে আমাদিগের এ প্রকার অবস্থা দেখিব তখন জানিব যে সংযত চিত্তের অভাবই ঐ প্রকার অবস্থার কারণ; শান্তরূপে উপাসনা করিতে পারি নাই বলিয়াই আমাদিগের প্রকৃতরূপে উপাসনা হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা আত্মার এ প্রকার বিকৃতি অনুভব না করেন, উপাসনা করিলাম কিন্তু উপাসনা সম্পন্ন হইল না এরূপ ভাব কখন যাঁহাদিগের মনে উদয় না হয় তাঁহাদিগের সকলেরই যে প্রকৃতরূপে উপাসনা করা হয় এমন নহে। যেমন শারীরিক স্বাস্থ্য-বিষয়ে দেখা যায় যে, এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহারা নিতান্ত প্রবল-রোগাক্রান্ত না হইলে শরীরে যে রোগ হইয়াছে ইহা জানিতেও পারে না, এবং গুরুতর পীড়া নিতান্ত কষ্টদায়ক না হইলে আপনাদিগকে সুস্থ ও সবল মনে করে; আত্মার বিকারসম্বন্ধেও অনেকে সেইরূপ; প্রকৃতরূপে ধর্ম্মসাধন বা ঈশ্বর-উপাসনা করিতে না পারিলেও তাঁহারা নিজতত্ত্ব-বিষয়ে এরূপ অন্ধ, তাঁহাদিগের অন্তরে বিবেকের প্রাখর্য্য এত দূর তীক্ষ্ণতা হীন হইয়াছে, হিতাহিত জ্ঞান এপ্রকার হীনবল হইয়াছে যে, মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছি বলিয়া একবারও তাঁহাদিগের বোধ হয় না। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এক্ষণে কিছু বলা যাইতেছে না। কিন্তু যাঁহাদিগের আত্মা অদ্যাপি নিতান্ত অসাড় হইয়া পড়ে নাই তাঁহারা যে, মধ্যে মধ্যে এপ্রকার হৃদয়ের শুষ্কতা ও উপাসনার অসম্পন্নতা অনুভব করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই এবং যে কারণে ইহা অনুভূত হয় তাহাও এক প্রকার বোধগম্য হইল। রোগ নির্ণীত হইল; আত্মা যে রোগগ্রস্ত ও বিকার-প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা অবধারিত হইল। এক্ষণে দেখা যাউক যে, এ রোগের কোন ঔষধ আছে কি না? এ রোগের ঔষধ কোথায়? সত্য বটে যে ওষধির বা বনস্পতির এপ্রকার কোন আরোগ্যদায়ক শক্তি নাই যে আত্মাকে পাপ-বিকার হইতে মুক্ত করে; পার্থিব এমন চিকিৎসক কেহ নাই যে, রুগ্ন আত্মাকে রোগ হইতে মুক্ত করিতে পারে। কিন্তু এ রোগের এক কালে ঔষধ নাই বলিলে, করুণাময় পরমেশ্বরের অপার করুণার প্রতি দোষারোপ করা হয়। আত্মবিকারের অবশ্যই কোন না কোন ঔষধ আছে। সেই রোগের মুক্তিদাতা শান্তিকর্ত্তা স্বয়ং পরমেশ্বর, এবং রোগীকে আপন ঔষধ আপনাকেই বিধান করিতে হয়। সে ঔষধ কি এবং তাহা কিরূপে সেবন করিতে হয়? শান্তভাবে ঈশ্বরের উপাসনাই সেই মহৌষধ; এবং তজ্জন্য আমাদিগকে পার্থিব কোন পদার্থের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না, পার্থিব কোন চিকিৎসকের দ্বারস্থ হইতে হয় না, কেবল সংযত ও সমাহিত চিত্তে অহরহঃ পরাৎপর পরমেশ্বরের পরম-মঙ্গল-স্বরূপ চিন্তনে প্রবৃত্ত থাকিলে, এবং যাহাতে সকল সময়ে সকল অবস্থাতে তাঁহার অপার করুণা সম্ভোগ এবং অনন্ত মহিমাকে মহীয়ান করিতে সমর্থ হই তজ্জন্য সচেষ্ট থাকিলে আমরা আত্মার সেই রোগ হইতে মুক্ত হই। কিন্তু যখন দেখি যে, শান্তভাবে উপাসনা করিবার চেষ্টা করিলেও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি না তখন উপায় কি? যিনি মূল সত্য, আদি সত্য, পরম সত্য, ধ্রুবসত্য সনাতন, যিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব পরমেশ্বর, তাঁহার সহিত আমাদিগের চির-সম্বন্ধ, তাঁহার সহিত আমাদিগের যে সম্বন্ধ তাহা দেশেতে বা কালেতে পরিমিত নহে; কাযেই ঈশ্বর-জ্ঞান বা তাঁহার উপাসনা-বিষয়ে আমরা সময় বা সুযোগ সাপেক্ষ হইলে প্রকৃত তত্ত্ব প্রাপ্ত হই না। যখন ঈশ্বর-প্রীতি আপনা হইতে উদয় হইবে, অথবা যখন উপাসনার নিয়মিত কাল উপস্থিত হইবে তখনই উপাসনা করিব, এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে আমরা কখনই প্রকৃতরূপে উপাসনা করিতে সমর্থ হইব না; তাহাতে উপাসনার ভাব ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাণ হইতে থাকিবে, ক্রমে তাহার বিমল জ্যোতিঃ সংসারের

মলিন ভাবে মেঘাচ্ছন্ন গগনের ন্যায় আবৃত হইবে, তখন পৌর্ণমাসীর সমুজ্জ্বল শোভাও অমাবস্যার তামসী নিশা অপেক্ষা মলিন হইয়া উঠিবে। এই নিমিত্ত প্রকৃত উপাসনার জন্য আমাদিগের চির জীবন প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। সকল বিষয়ে ঈশ্বরকাম হইয়া প্রবৃত্ত হইতে শিক্ষা না করিলে এবং সমুদয় কার্য্য শান্ত ও সমাহিত চিত্তে ঈশ্বরোদ্দেশে করিতে না পারিলে, "যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ" যে কোন কর্ম্ম করুন তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন," ব্রাহ্মধর্ম্মের এই উপদেশ সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরূক না রাখিলে এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে না পারিলে আমরা কখনই প্রকৃতরূপে উপাসনা করিতে সমর্থ হইব না, কখনই অবিক্ষিপ্ত এবং শান্ত ও সমাহিত চিত্তে অনুক্ষণ ঈশ্বরের আরাধনা করিতে পারিব না। ব্রাহ্মধর্ম্মে বলে "যিনি সত্য-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্মকে স্বীয় শরীরের পরমাকাশে আত্মস্থ করিয়া জানেন; তিনি সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদায় বিষয় উপভোগ করেন।" অতএব যদি করুণাময় পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ সহবাসে পরিতৃপ্ত হইয়া আপ্তকাম হইবার বাসনা থাকে, যদি প্রকৃত ব্রহ্মোপাসক হইতে চাও তাহা হইলে হৃদয়ের পরমাকাশে ব্রহ্মকে আত্মস্থ করিয়া জান; আত্মার অন্তরতম প্রদেশে ঈশ্বরকে ধারণ কর, চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর-অর্চ্চনার উপযোগী কর। ঈশ্বর-উপাসনার ভাব এরূপ যে, অন্য প্রকার সমস্ত চিন্তা হইতে মনকে একেবারে সম্পূর্ণ রূপে নির্লিপ্ত করিতে না পারিলে আত্মাতে ঈশ্বরকে ধারণ করিতে পারা যায় না। সুস্থির ও স্বচ্ছ জলাশয়ে যেরূপ দেখি যে, তাহাতে কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব সুন্দর এবং পূর্ণরূপে দৃষ্ট হইবার জন্য তাহার স্বচ্ছতা এবং স্থিরতা

উভয়ই আবশ্যক; যেমন দেখি যে জল পরিষ্কার থাকিলেও যদি তাহা কম্পিত হয় তাহা হইলে তাহাতে কোন পদার্থের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় না; আবার এ দিকে জল স্থির থাকিলেও তাহা যদি অপরিষ্কার থাকে, স্বচ্ছ না থাকে, তাহা হইলেও তাহাতে কোন পদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হয় না; আত্মাতেও সেইরূপ। ঈশ্বর-আরাধনার নিমিত্ত কেবল নির্ম্মল ও পরিশুদ্ধ চিত্ত হইলেই যথেষ্ট হয় না, তাহা শান্ত ও সমাহিত হওয়া আবশ্যক। যেমন চিত্রকর যে পটে চিত্র করেন যদি পূর্ব্ব হইতে সেই পটে অন্য কেহ কোন প্রকার বর্ণ সংযোগ করিয়া রাখে তাহা হইলে তাহাতে তাঁহার চিত্র বিশুদ্ধ ও সুন্দর হয় না। উত্তম চিত্র হওয়ার নিমিত্ত যেমন চিত্রপট পরিশুদ্ধ ও সরল থাকা আবশ্যক আত্মাতেও সেইরূপ কোন প্রকারের চিত্ত-উত্তেজনার ভাব লক্ষিত হইলে, মানসপট পরিশুদ্ধ এবং উদ্বেগশূন্য না থাকিলে, তাহাতে ঈশ্বরের পবিত্র মূর্ত্তি অঙ্কিত হইতে পারে না। ঈশ্বর-উপাসনার নিমিত্ত শিশুর ন্যায় পরিষ্কৃত-হৃদয় ও বিশুদ্ধ-মনা হওয়া আবশ্যক; আত্মাকে সর্ব্বপ্রকার কামনা-রহিত ও প্রবৃত্তিশূন্য করিতে না পারিলে এবং সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম ও নির্লিপ্ত না হইলে আমাদিগের প্রকৃতরূপে উপাসনা হয় না। কিন্তু অনেকে নিষ্কাম উপাসনা কি তাহা বুঝিতে না পারিয়া ভ্রমে পতিত হয়েন। উপাসনা-কালে ঈশ্বর-প্রীতিতে মগ্ন এবং ভক্তিরসে পূর্ণ হইয়া অনেকে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করেন; ইহা উপাসনার এক প্রকার ফলমাত্র; কিন্তু অনেকে তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাহাকেই উপাসনার উদ্দেশ্য মনে করেন এবং ফলকে উদ্দেশ্য মনে করাতে কিসে, সেই স্বকপোল-কল্পিত উদ্দেশ্য লাভ করিবেন তাহার চেষ্টাতেই আত্মা বিক্ষিপ্ত হয়; এবং তজ্জনিত ধর্ম্মভাবের উচ্ছ্বাসের আকারে এক প্রকার মত্ততা উপস্থিত হইয়া প্রকৃত শান্ত উপাসনার বাধা জন্মায় এবং তাহাদিগকে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে বঞ্চিত করে।

ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! সাবধান, যেন ধর্ম্মভাবের উচ্ছ্বাসকে প্রকৃত উপাসনা বা উপাসনার উদ্দেশ্য মনে করিয়া আমরা ভ্রমে না পড়ি; যেন মুক্তাবোধে কেবল শূন্যগর্ভ শুক্তিকা লাভে আমরা আপনাদিগকে আপ্তকাম মনে না করি। মত্ততা এবং শান্তভাব পরস্পর বিষম-কক্ষ। যেমন প্রবল-বাত্যা-তাড়িত তরঙ্গমালা অর্ণবপোতের গতিকে বেগবান করিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে বিশেষ উপযোগী হয় বটে, কিন্তু তাহার স্থৈর্য্য সাধন বা নির্ব্বিঘ্নতা সম্পাদনের নিমিত্ত কার্য্যকর হয় না। ধর্ম্মভাবের উচ্ছ্বাসও সেইরূপ সময়ে সময়ে যদিও ধর্ম্মপ্রচার বা তদনুরূপ কোন প্রকার কার্য্য সাধনের উপযোগী হউক তাহা শান্ত উপাসনার—প্রকৃত উপাসনার প্রতিরোধী। মত্ততায় আমরা আনন্দ লাভ করিতে পারি, ধর্ম্মভাবের উচ্ছ্বাসের দ্বারা আমরা উপাসনা-জনিত আমোদ প্রাপ্ত হইতে পারি; কিন্তু প্রকৃত উপাসনার যে উদ্দেশ্য তাহা কখনই এরূপ মত্ততার দ্বারা সংসিদ্ধ হইতে পারে না। শান্ত এবং সমাহিত চিত্তে উপাসনা করিতে না পারিলে; করুণাময় পরমেশ্বরের পবিত্র মূর্ত্তি আত্মাতে আবির্ভূত দেখিতে সক্ষম না হইলে; সর্ব্বপ্রকারে নির্লিপ্ত এবং উপাসনার ফল বিষয়ে নিষ্কাম হইতে না পারিলে আমরা কখনই প্রকৃত উপাসক বলিয়া গণ্য হইতে পারি না। অতএব ভ্রাতৃগণ! যিনি জীবের অনন্যগতি এবং আমাদিগের সকলের একমাত্র আশ্রয়, মুক্তিদাতা পরমেশ্বর; যাঁহার প্রসাদে আমরা সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ ও মঙ্গল প্রাপ্ত হইতেছি; যাঁহার করুণা-প্রভাবে সুখকর সামগ্রী সমস্ত উপভোগের অধিকারী হইয়াছি; তাঁহাকে প্রাপ্তির জন্য সেই সমস্ত উপভোগ-সামগ্রী যেন সচ্ছন্দচিত্তে উপেক্ষা করিতে সমর্থ হই। তাঁহার উপাসনা-কালে যেন কোন প্রকার বিষয়-লালসা বা দুশ্চিন্তা হৃদয়ে স্থান না পায়, যেন সকল সময়ে সকল অবস্থাতে অবিক্ষিপ্ত চিত্তে তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হই। তিনি শান্ত মঙ্গল এবং অদ্বিতীয়, অতএব যেন অনন্যমনা হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক অহরহঃ সেই পরম মঙ্গলস্বরূপে আত্মসমাধান করি, এবং শান্ত ও সমাহিত চিত্তে অনুক্ষণ তাঁহার উপাসনায় রত থাকি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ মঙ্গলবার ১৭৯৮ শক।

প্রাতঃকাল।

উদ্বোধন।

লোকে পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে উৎসব করিয়া থাকে, রাজা যুদ্ধে জয় লাভ করিলে উৎসব করিয়া থাকেন, গ্রন্থকার বহু দিবসের পরিশ্রমের ফল কোন গুরুতর গ্রন্থ প্রকাশ করিলে উৎসব করিয়া থাকেন, কিন্তু সকল উৎসব অপেক্ষা ধর্ম্মোৎসব যেমন আনন্দের কারণ এমন অন্য কোন উৎসব নহে, যেহেতু ধর্ম্ম অত্যন্ত স্নেহের সামগ্রী। ধর্ম্মের জন্য লোকে কত নিগ্রহ ও পীড়ন সহ্য করিতেছে; ধর্ম্মের জন্য লোকে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতেছে। যে, অনুসারে ধর্ম্মের গুরুত্ব সেই অনুসারে ধর্ম্মোৎসবের মধুরত্ব। ধর্ম্মোৎসবের দিবস কি মধুর! অদ্য বোধ হইতেছে যেন, বিশ্বজন মধুর স্বরে গান করিতেছে, পূর্ণ গগন অনাদিনাদ আলাপ করিতেছে, জলধি গম্ভীর স্বরে মনের উল্লাস প্রকাশ করিতেছে, অমরবৃন্দ-পরিসেবিত বিশ্বনাথ পরমেশ্বর অদ্য অসীম আকাশে অনুপম জ্যোতিতে বিরাজ করিতেছেন। সেই বিশ্বনাথ পরমেশ্বরই এই উৎসব-সমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; তিনি এই উৎসব-সমাজে, অজস্রধারে আনন্দ বর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার এই আধ্যাত্মিক সদাব্রতে আমরা নিজে আসিয়া পরিতৃপ্ত নহি, মনের উল্লাসে অদ্য সকলকেও অদ্য এই উৎসব-সমাজে নিমন্ত্রণ করিতেছি। এস আমরা এক্ষণে অদ্যকার প্রাতঃকালের সুমধুর উৎসবে অমৃতের অধিকারী দিব্যধামবাসী বিশ্বজনদিগকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করি।

"জাগো সকল অমৃতের অধিকারী। নয়ন খুলিয়ে দেখ, করুণা-নিধান পাপ-তাপ-হারী।
পূরব অরুণ-জ্যোতি মহিমা প্রচারে, বিহগ যশ গায় তাঁহারি।
হৃদয়-কবাট খুলি দেখ রে যতনে, প্রেমময় মূরতি জনচিত্তহারী, ডাকো রে নাথে বিমল প্রভাতে পাইবে শান্তির বারি।"

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া আজ তরুণ ভানু শশ-ব্যস্তে গগন-পথে উদিত হইয়া কি মঙ্গল-বার্ত্তা প্রচার করিতেছে! আজ কল-কণ্ঠ বিহঙ্গ-দল নগর-গ্রামে, কানন-বিমানে উড্ডীন হইয়া অব্যক্ত মধুর নিনাদে কি সুসংবাদ ঘোষণা করিতেছে! চতুর্দ্দিকে ওষধি-বনস্পতি-সকল শিশির-পরিস্নাত হইয়া স্তব্ধ-পুলকে উন্নত মস্তকে আজ কি গভীর তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে! বালক যুবা স্থবির-গণ আজ এই পবিত্র প্রাতঃকালে প্রেম-হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে, উৎসাহপূর্ণ মনে তটস্থ হইয়া কেন এখানে সম্মিলিত হইয়াছেন। মর্ত্ত্যে আজ কি অতুলন উৎসব! রোগ-শোক-

সন্তাপ-বিষাদপূর্ণ বঙ্গে—দুর্ভিক্ষ-মহামারী-প্রপীড়িত অবসন্ন ভারতে আজ কিসের জন্য এই মহোল্লাস! রোগ-জর্জ্জরিত, সন্তাপ-বিদগ্ধ, মৃতকল্প শরীরে অসাড় হৃদয়ে আজ কিসের জন্য এত স্ফূর্ত্তি উদ্যম, এত আনন্দ উৎসাহ! আজ মাঘের একাদশ দিবস বলিয়াই গর্ত্তে এই আনন্দ উৎসব! চেতন অচেতনের মধ্যে এই মঙ্গল-ধ্বনি! নর-নারীর অভ্যন্তরে এই জয় জয় রব উত্থিত হইতেছে। মাঘের একাদশ দিবসের এত মাহাত্ম্য কিসে? এই পবিত্র দিনেই ভারতের শোভনতম অক্ষয় ধর্ম্মকীর্ত্তিস্তম্ভ এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্য্যকুলের পুনরুত্থানের সোপান—আর্য্যসন্তানদিগের ঐহিক পারত্রিকের অব্যর্থ-মঙ্গল-নিদান-স্বরূপ পবিত্র ব্রহ্ম-পূজার প্রশস্ত অনুষ্ঠানের, এই দিবসেই প্রথম সূত্রপাত হয়। বলিতে কি, এই দিন হইতেই ভারতের প্রকৃত প্রাণ-সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইয়াছে, বঙ্গের আধ্যাত্মিক সুখ-সৌভাগ্য-দ্বার প্রমুক্ত হইয়াছে। এই দিন হইতেই আর্য্যবংশের কুলদেবতা—সেই পুরাতন পিতামহ—সেই প্রত্যক্ষ পিতা পরব্রহ্মকে জনসাধারণ প্রকৃত প্রস্তাবে পূজার্চ্চনা করিতে শিক্ষা করিয়াছে। যত দিন "ব্রাহ্মসমাজ" এই পবিত্র শব্দ বর্ত্তমান থাকিবে, যত দিন পৃথিবীতে জ্ঞান বিজ্ঞান সমাদৃত হইবে, যত দিন মনুষ্য-শরীরে শোণিত-প্রবাহ প্রবাহিত হইবে, যত দিন ধর্ম্মপ্রিয় ঈশ্বর-প্রাণ একটী আত্মাও এই ধরাধামে বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন মাঘের একাদশ দিবসকে কেহই বিস্মৃত হইতে পারিবে না। লোক-সমাজের মধ্যে বিদ্যা-চর্চ্চা, সভ্যতা-লাভ, স্বাধীনতা-পুনঃপ্রাপ্তি, রাজ্যলাভ প্রভৃতি যত প্রকার শুভ ঘটনার দিন থাকুক না কেন ধর্ম্ম-লাভ—ঈশ্বর-লাভের দিবসই সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান্। সেই পবিত্র দিবসের গুরুত্ব মহত্ত্ব সন্নিধানে আর সকল দিনই লঘীয়ান্ কনীয়ান্ তাহার আর সন্দেহ নাই। ইতর জীব জন্তুদিগের উপরে মনুষ্যের যদি কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব থাকে, তবে তাহা ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুতেই নহে। মনুষ্য-নামের যদি কিছু মহত্ত্ব দেবত্ব থাকে তবে তাহা কেবল ধর্ম্ম-প্রভাবেই। মানব-কুলের যদি কিছু বল বিক্রম, শৌর্য্য বীর্য্য থাকে, তবে তাহা ধর্ম্ম-বল ভিন্ন আর দ্বিতীয় নয়। ধর্ম্মলাভ, ঈশ্বরলাভের নিকটে আর কোন লাভ, লাভ বলিয়া বোধ হয় না। "যৎলব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।" প্রভূত অর্থ, বিপুল বিদ্যা, প্রচুর মান-সম্ভ্রম লাভ করিলেও সাধকের অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই গভীর আর্ত্তনাদ নির্গত হয় "বিষয়-সুখে মন তৃপ্তি কি মানে? তব চরণামৃত, পান-পিপাসিত, নাহি চাহি ধন-জন-মানে।"

ধর্ম্মলাভ, ঈশ্বরলাভ করিয়া সকল দেশে—সকল জাতিমধ্যেই যে কোন কোন মহাত্মাকে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে দেখা যায়, ধর্ম্ম-ধন ঈশ্বর-ধনের গুরুত্বই তাহার কারণ। সহস্রবিধ বিষয়-সুখের প্রলোভন, অসংখ্যতর আশুতৃপ্তিকর ইন্দ্রিয়-সুখের আকর্ষণ, যে ধর্ম্মাত্মাগণ তৃণের ন্যায় অপদার্থ বলিয়া পরিত্যাগ করেন, ব্রহ্মামৃতের সারত্ব মধুরত্বই তাহার প্রবর্ত্তক। সেই জন্যই আজ্‌কার মহোৎসব দিন ভারতের সকল উৎসব দিন অপেক্ষা গরীয়ান্! কি রাজ-কার্য্য, কি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, ভারতে—কি সমুদায় পৃথিবীতে যত প্রকার উৎসব আছে, তাহাতে সকল অবস্থার বা বিবিধ ধর্ম্মভাব-সমন্বিত লোকের সমাবেশ হইবার সম্ভাবনা নাই। কোনরূপে তাদৃশ উৎসবে প্রবিষ্ট হইলেও বিচিত্রভাব, বিভিন্ন-রুচি মনুষ্যের সুচারু তৃপ্তি লাভ, আনন্দ লাভেরও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তৎসমূহ সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক দোষে দূষিত বলিয়া পরিত্যাজ্য হইতে পারে। কিন্তু অদ্যকার এই মহোৎসব সম্পূর্ণরূপে উদার, অসাম্প্রদায়িক। এখানে ধনী দরিদ্রের, বিদ্বান মূর্খের, কৃষি শিল্পীর প্রভেদ নাই, এখানে রাজার আদর, প্রজারও অনাদর নাই। এই উৎসব-দ্বার সকলের জন্য অনাবৃত রহিয়াছে। এই মহোৎসব, সমুদায় মনুষ্য-জাতিরই উৎসব। যিনি এই উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি সমুদায় নর-নারীর, সমস্ত দেবকুলের সম্ভজনীয়। তিনি এই নিখিল ভুবনের বিধাতা, প্রাণি-পুঞ্জের পালয়িতা, তিনি আমারদের অনন্ত কালের আশ্রয়-দাতা। তাঁর ঐশ্বর্য্যের নিকটে সকল ঐশ্বর্য্যই মলিন, তাঁর বলের সন্নিধানে সকল বল-প্রতাপই প্রভাহীন হইয়া যায়। তাঁহার জ্ঞান-জ্যোতির সমীপে সকল জ্ঞানই অন্ধীভূত, তাঁর শিল্প-চাতুর্য্য-প্রভায় সকল বুদ্ধি-কৌশলই জড়ীভূত হইয়া পড়ে!, যখন সেই পূর্ণ-জ্ঞান পূর্ণ-প্রেম সর্ব্বশক্তিমান্ রাজগণ-রাজা ত্রিভুবনরাজ এখানে পূর্ণ মহিমায় বিরাজ করিতেছেন, যখন তিনি তাঁর প্রজাকুলের প্রীতি-উপহার চাহিতেছেন, তখন কে কোথায় এমন তেজঃপুঞ্জ মহাবল ভূপতি বর্ত্তমান আছেন, যিনি পদ-মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া, তাঁহার সন্নিধানে বিনীত ভাবে আপনার মস্তক অবনত না করিবেন? এমন জ্ঞান-গম্ভীর বিদ্যা-নিপুণ সুপণ্ডিত কোথায়, যিনি আপনার পাণ্ডিত্য দূরে নিক্ষেপ করিয়া বিনম্র ভাবে তাঁহার শরণাগত না হইবেন? এমন মহাশাল সুসম্পন্ন গৃহস্থ কে আছেন, যিনি আপনার পদগর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া দীনভাবে এখানে আগমন না করিবেন? এমন পরিমিত দেবতার উপাসক কে কোথায় বর্ত্তমান আছেন, যিনি আপনার ক্ষুদ্র ভাব, ক্ষুদ্র লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া আজ এখানে ব্রহ্ম-পূজায় প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠিত হইবেন? এমন অমৃতধনের ভিখারী কে, কোথায় আছেন, যিনি আজ এই ব্রহ্মযজ্ঞে উপস্থিত হইয়া চির দারিদ্র্য-দুঃখ না দূর করিবেন? বিষয়-ক্ষেত্রে—কর্ম্মক্ষেত্রে নানা কারণে, নানা বিষয়ে আমারদের পরস্পর অনৈক্য থাকিতে পারে। বিদ্যা-বিত্ত, মান-মর্য্যাদার ন্যূনাতিরেক নিবন্ধন আমারদের মধ্যে উত্তম অধম, উচ্চ-নীচ-ভাব-জনিত লক্ষ্যের পার্থক্য থাকাও অসম্ভব নহে। কিন্তু আজ এই মহোৎসবে এই ব্রাহ্মসমাজে আমারদের সকলের এক লক্ষ্য। ঈশ্বর-সন্নিধানে আমারদের সকলেরই এক কামনা, আমারদের প্রীতি কৃতজ্ঞতা একভাবেই তাঁহার প্রতি উত্থিত হইতেছে। আমারদের মধ্যে বিদ্যা বুদ্ধি, মান সম্ভ্রম, বিষয় সম্পদের সবিশেষ তারতম্য থাকিলেও, আমারদের প্রত্যেকের রসনা হইতে একবিধ প্রার্থনা-বাক্যই বিনির্গত হইতেছে! দেখ, আমরা সকলে যোড়করে সেই রাজরাজেশ্বরের সন্নিধানে এই যাচ্ঞা করিতেছি 'আবিরাবীর্ম্মএধি" হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও।

তাঁহার দর্শন লাভ করা প্রতি আত্মারই প্রার্থনীয়। তাঁহার প্রসাদ উপভোগ করা প্রত্যেক জীবেরই বাঞ্ছনীয়। তখন আমারদের মধ্যে মতভেদ, লক্ষ্যভেদের সম্ভাবনা কি? যখন ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া ধর্ম্ম-সাধন করিতে যাই, তখনই সকলে ঐক্যস্থলে উপনীত হই। যখন ধর্ম্মের মধ্যে স্বার্থ-সম্বন্ধ আনয়ন করি, তখনই ঐক্যের মধ্যেও অনৈক্য আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন রাজার জয়ের প্রতি লক্ষ্য থাকে, তখন বিভিন্ন-জাতীয় সেনাদলও ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া অনায়াসে সমর-ক্ষেত্রের দুঃসহ কষ্ট ক্লেশেও অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকে, তখন অক্লেশে প্রাণ উৎসর্গও করিতে পারে। যখন আপনার স্বার্থের প্রতি, আপনার জীবনের প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হয়, তখনই

রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিবার জন্যই চেষ্টা পায়। ব্রাহ্মসমাজ—ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে স্বার্থ কোথায়? যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়াছি, তখনই যে শরীর-মন-আত্মা ঈশ্বরকে অর্পণ করিয়াছি। তখন তাঁহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করাই যে আমারদের পরম পুরুষার্থ। তখন জয়-পরাজয়, ক্ষতিলাভের প্রতি কেন আমরা দৃষ্টিপাত করিতে যাই, ঈশ্বরের জয়ই আমারদের লক্ষ্য, তাঁহার লক্ষ্য সাধনই আমারদের ব্রত-ধর্ম্ম, ক্রিয়া-কর্ম্ম সকলই। তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়, পরও তাঁহার আপনার হয়, দূরও তাঁহার নিকট হইয়া আইসে। তাঁহাকে ছাড়িয়া যে ধর্ম্মসাধন করিতে যায়, তাহার পরমাত্মীয়ও পর হইয়া পড়ে, নিকটও তাহার দূর হইয়া যায়, মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে।

দেখ, সকলে এখনই প্রত্যক্ষ দেখ, ব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া এখানে সাধু-সজ্জন সকল আগমন করিয়াছেন। এখানে কেমন অক্ষত ভ্রাতৃভাব সঞ্চরণ করিতেছে। দেখ, এক ব্রহ্ম-প্রীতিই কেমন বিচিত্র কৌশলে দূর-দূরান্তরকে নিকট করিয়া তুলিতেছে! নিঃসম্পর্কীয়কেও আমারদের হৃদয়-বন্ধু করিয়া আনিতেছে! ঈশ্বর এই সুবিস্তৃত পরিবারের পিতা মাতা হইয়া এখানে বিরাজ করিতেছেন। এ কি মনোহর দৃশ্য, কি দেবস্পৃহনীয় মহান্ উৎসব!!

হে পরমাত্মন্! তোমার করুণার কথা কি বলিব; তোমার স্নেহের তুলনা কোথায় দিব? তুমি যে সংবৎসরকাল রোগ শোক, সন্তাপ বিষাদ, জরা মৃত্যুর মধ্য হইতেও রক্ষা করিয়া আজ এই স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগে সমর্থ করিলে, এই দুর্লভ দর্শনলাভে ক্ষমবান করিলে, তজ্জন্য তোমাকে বারবার নমস্কার করি। হে ঈশ্বর! যেন তোমার সত্যের জয়, মঙ্গলের জয়, ধর্ম্মের জয় দেখিতে দেখিতে এখান হইতে অপসৃত হইতে পারি, তোমার সন্নিধানে কেবল এই মাত্র প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা।

কে আমাদিগকে অদ্য এই সমাজ-মন্দিরে আনয়ন করিল? কিসের দ্বারা আমরা উত্তেজিত হইয়া অদ্যকার উৎসব-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম? ব্রহ্মানুরাগ অদ্য আমাদিগকে এই সমাজ-মন্দিরে আনয়ন করিল; ব্রহ্মানুরাগ দ্বারা উত্তেজিত হইয়া আমরা অদ্যকার উৎসব-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সকল কার্য্যের মূলীভূত ব্রহ্ম-প্রীতি। কি চরিত্র-সংশোধন, কি ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন, কি ব্রহ্মধ্যান, কি পরোপকার, কি উপদেশ প্রদান, কি ধর্ম্মপ্রচার সকল কার্য্যের মূলে ব্রহ্ম-প্রীতি নিহিত রহিয়াছে। চরিত্র-সংশোধন-কার্য্যে ব্রহ্ম-প্রীতি দ্বারা উত্তেজিত না হইলে তাহাতে আমরা কখনই সুসিদ্ধ হইতে পারি না। আমরা সাংসারিক বিবেচনা দ্বারা প্রয়োজিত হইয়া, চরিত্র-সংশোধন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কখন তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি না। পাপ অতি প্রবল শত্রু, সেই প্রবল শত্রুর একটী প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থাপন না করিলে আমরা তাহার প্রতি কখন জয় লাভ করিতে সমর্থ হই না। সেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ঈশ্বর-প্রীতি। অনেকে আক্ষেপ করেন যে, তাঁহারা সহস্র চেষ্টা করিলেও পাপমতি দমন করিতে সক্ষম হয়েন না। কিন্তু তাঁহারা কি প্রকারে পাপমতি দমন করিতে সক্ষম হইবেন, যখন পাপের প্রতি তাঁহাদিগের নিগূঢ় প্রীতি আছে ও তাহা মধুর বলিয়া বোধ হয়? ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি যত বসিতে থাকে পাপের প্রতি প্রীতি তত ক্ষীণ হইতে থাকে।

ঈশ্বরের আকর্ষণ যত প্রবল হইতে থাকে পাপের আকর্ষণ তত ক্ষীণ হইতে থাকে। অতএব পাপের দাসত্ব হইতে বিযুক্ত হইবার একমাত্র উপায় ব্রহ্ম-প্রীতি; এই জন্য কোন ভক্ত ব্যক্তি বলিয়াছেন, "তুয়া পদ পরি-হরি, পাপ-পয়োনিধি পার হব কোন্ উপায়?" ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনেরও প্রধান প্রবর্ত্তক ও উত্তেজক ব্রহ্মপ্রীতি। ব্রহ্মকে জানিতে আমরা কেন সমুৎসুক হই? তাহার কারণ এই যে, ব্রহ্ম-প্রীতি আমাদিগের প্রকৃতি-গত। যেমন নব মধুমক্ষিকা মধুলাভ-লোভে অজ্ঞাত-পূর্ব্ব মধুগর্ভ পুষ্পের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি মনুষ্যের আত্মা ঈশ্বর কি পদার্থ তাহা অবিজ্ঞাত থাকিয়া, ঈশ্বর-প্রীতি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া ঈশ্বরের জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। আবার নীরস জ্ঞান সহকারে ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় যে সকল তত্ত্ব আমরা দেখিতে না পাই তাহা প্রেমের আলোকে আমরা উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাই। ব্রহ্মধ্যানেরও প্রধান প্রবর্ত্তক ও উত্তেজক ব্রহ্ম-প্রীতি। যদ্যপি ব্রহ্মকে আমরা ভাল না বাসি তবে তাঁহাকে চিন্তা করিতে আমাদিগের ইচ্ছা হয় না। যদ্যপি তাঁহাকে ভাল বাসি তাহা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বদা চিন্তা করিতে ইচ্ছা হয়। যে যাহাকে ভাল বাসে সেখানেই তাহার মন পড়িয়া থাকে। ব্রহ্মকে কখন বিস্মৃত না হওয়া, তাঁহাতে সর্ব্বদা মনঃসমাধান করা, তাঁহাকে সর্ব্বদা নয়নে নয়নে রাখা, এমন কি বিষয়-কর্ম্মের সময়েও তচ্চিন্ত ও তদ্গত-প্রাণ থাকা ব্রহ্মের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি ব্যতীত কি প্রকারে হইতে পারে? ব্রহ্ম-যোগ কাহাকে বলে তাহা উপনিষদের একটী শ্লোকে চমৎকাররূপে বর্ণিত হইয়াছে। সে শ্লোকটী এই;

—যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানম্ ততোন বিজুগুপ্সতে"

"যে ব্যক্তি সকল পদার্থে ঈশ্বরকে দেখেন এবং ঈশ্বরে সকল পদার্থ দেখেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না।" সকল পদার্থে ঈশ্বরকে অনুভব করার অর্থ, অন্তরাত্মারূপে সকল পদার্থে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান সর্ব্বদা অনুভব করা এবং ঈশ্বরে সকল পদার্থ দেখার অর্থ, সকল পদার্থ স্বীয় অস্তিত্ব ও শক্তির জন্য ঈশ্বরের প্রতি সর্ব্বদা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে এতদ্রূপ প্রতীতি করা ইহাই ব্রহ্মযোগ। এই ব্রহ্মযোগে যোগী হইবার জন্য প্রগাঢ় ব্রহ্ম-প্রীতি আবশ্যক করে। বিষয়-কর্ম্ম সম্পাদন সময়েও প্রকৃত সাধক যোগভ্রষ্ট হয়েন না। যেমন সুনিপুণা নর্ত্তকী জলপূর্ণ কুম্ভ মস্তকে রাখিয়া, নৃত্যের কঠিন নিয়মানুসারে নৃত্য করে, কিন্তু মস্তকস্থিত কুম্ভকে পতিত হইতে দেয় না, তেমনি ধীর ব্যক্তি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তৎপর হইয়াও সেই মুক্তিদাতা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়েন না। পরোপকারের জীবন ঈশ্বর-প্রীতি। নিজে কষ্ট সহ্য না করিলে লোকের উপকার সাধন হয় না। ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া যদি পরোপকার-কার্য্য সম্পাদন করা যায় তাহা হইলে আমরা দীর্ঘ কাল ধরিয়া তাহা সম্পাদন করিতে পারি। বিশেষতঃ যখন আমরা দুষ্ট লোকের প্রতিবন্ধকতাচরণ জন্য ঐ কার্য্যে কৃতকার্য্য না হইয়া নিরাশপঙ্কে পতিত হই তখন ব্রহ্মপ্রীতি কেবল আমারদিগের চিত্তকে উন্নত রাখিতে পারে। সাধু ব্যক্তির সাধু চেষ্টা বিফল হইলেও তিনি তাহাতে বিষণ্ণ হয়েন না; তিনি আপনার কার্য্যের ফলাফল সকল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। তিনি ঈশ্বরেতে নির্ভর করিয়া আপনার কর্ম্মের ফলের জন্য কালের প্রতীক্ষা করেন। ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ প্রদান কার্য্যেরও প্রধান প্রবর্ত্তক ও উত্তেজক ব্রহ্মপ্রীতি। অসাবধানকে সাবধান করিতে হইবে, নিরুৎসাহীকে উৎসাহান্বিত করিতে হইবে, অচে-

তনকে সচেতন করিতে হইবে, আর্দ্র ইন্ধনকে প্রজ্বলিত করিয়া তুলিতে হইবে ইহা ব্রহ্মপ্রীতি ব্যতীত কি প্রকারে হইতে পারে? ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যেরও প্রধান প্রবর্ত্তক ও উত্তেজক ব্রহ্মপ্রীতি। শারীরিক কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করা হইবেক না, অপমান ও কটুকাটব্যকে অঙ্গের ভূষণ করিতে হইবে, স্বদেশ ও স্বজন হইতে বহু দিবস বিচ্ছিন্ন থাকিতে হইবে, দুস্তর অরণ্য, পর্ব্বত ও সমুদ্র পার হইয়া দূর দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইবে, ইহা ব্রহ্মপ্রীতি ব্যতীত কি প্রকারে হইতে পারে? অনেকে জিজ্ঞাসা করেন যে, অদ্য সপ্তচত্বারিংশৎ বৎসর হইল ব্রাহ্মধর্ম্মের সূত্রপাত হইয়াছে কিন্তু ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্ম তত অধিক প্রচারিত হয় নাই কেন? এ প্রশ্নের উত্তর সহজ। আমাদিগের মনে প্রকৃত ব্রহ্মপ্রেম উদিত হয় নাই বলিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতে তত প্রচারিত হয় নাই। প্রকৃত ব্রহ্মপ্রেম আমাদিগের মনে উদিত হইলে ভারতে অচিরাৎ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হওয়া কোন্ বিচিত্র কথা?

কি চরিত্র-সংশোধন, কি ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন, কি ব্রহ্মধ্যান, কি পরোপকার, কি উপদেশ প্রদান, কি ধর্ম্মপ্রচার সকলেরই মূলীভূত ব্রহ্মপ্রীতি ইহা প্রদর্শিত হইল। প্রীতি অভ্যাস দ্বারা বৃদ্ধি পায়। পুত্রের প্রতি প্রীতি অভ্যাস কর, পুত্রের প্রতি প্রীতি বৃদ্ধি পাইবে; বন্ধুর প্রতি প্রীতি অভ্যাস কর, বন্ধুর প্রতি প্রীতি বৃদ্ধি পাইবে; স্বদেশের প্রতি প্রীতি অভ্যাস কর, স্বদেশের প্রতি প্রীতি বৃদ্ধি পাইবে; অন্যান্য প্রীতি যেমন অভ্যাস দ্বারা বৃদ্ধি পায় তেমনি ব্রহ্মপ্রীতিও অভ্যাস দ্বারা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। ব্রহ্মপ্রীতি অভ্যাস বশতঃ ক্রমে চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে অত্যন্ত নিঃস্বার্থ আকার ধারণ করে। পতঙ্গ যেমন দীপ্তাগ্নিতে পুড়িয়া মরে কিন্তু তাহার মুখ হইতে সে সময়ে একটী অর্ত্তনাদও নির্গত হয় না, তেমনি ব্রহ্মপ্রেমী ব্যক্তি ধর্ম্মের জন্য প্রাণ সমর্পণ করেন কিন্তু সে সময়ে তাঁহার মুখ হইতে একটী আর্ত্তনাদও বিনির্গত হয় না।

হে ব্রাহ্মগণ! ব্রহ্মপ্রীতি অর্জ্জন করিতে চেষ্টা কর। ব্রহ্মপ্রীতির ন্যায় প্রয়োজনীয় পদার্থ আর জগতে নাই। দুঃখ দারিদ্র্য, রোগ, শোক, মৃত্যু-সময়ে ব্রহ্ম-প্রীতি যেমন কাজে আইসে এমন অন্য কিছুই নহে। যিনি সম্পদাবস্থা হইতে অবনত দরিদ্রাবস্থায় পতিত হইয়াছেন তাঁহার কি কষ্ট! যিনি দাস দাসী দ্বারা পরিবৃত ছিলেন, তাঁহাকে নিজের পরিচর্য্যা করিতে হয়; যিনি দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় শয়ন করিতেন তাঁহাকে হয় ত মৃত্তিকার উপর শয়ন করিতে হয়; যিনি সর্ব্বদা বন্ধুগণ দ্বারা বেষ্টিত থাকিতেন তাঁহাকে নির্জ্জনে বাস করিতে হয়। সম্পদের সময়ে যে সকল বন্ধু সর্ব্বদা দেখা দিতেন তাঁহারা দারিদ্র্যাবস্থায় আর দেখা দেন না; সে সময়ে বরং দু একটী দরিদ্র বন্ধু দেখা দেন কিন্তু ধনাঢ্য বন্ধুদিগের আর দেখা পাওয়া যায় না। তাঁহাকে সকলের অবজ্ঞাত হইয়া কাল যাপন করিতে হয়। এরূপ সময় কি কষ্টের সময়! এই কষ্টের সময়ে কে আমাদিগের চিত্তকে উন্নত রাখিতে পারে? কেবল ব্রহ্মপ্রীতি আমাদিগের চিত্তকে উন্নত রাখিতে পারে। ঝটিকার সময় যেমন গৃহ, শীতের সময় যেমন উষ্ণ পরিচ্ছদ, সেইরূপ দুঃখ-দারিদ্র্যের সময় ঈশ্বর। দরিদ্রতা সর্পের ন্যায় কুৎসিৎ কিন্তু উহা নিজ মস্তকে একটী অমূল্য মণি ধারণ করে। উহা ধর্ম্মের প্রতি মনকে আকর্ষণ করে, প্রবৃত্তি সকলকে দমন করিতে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করে এবং আত্মাকে বলীয়ান করিয়া পরলোকের নিমিত্ত প্রস্তুত করে। এই জন্য কোন কোন ধর্ম্মাত্মা

ব্যক্তি আপনাকে দুঃখ দারিদ্র্যে সর্ব্বদা রাখিতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রোগের সময় অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিও সুদীন হইয়া পড়েন। এক জন মুখে অন্ন উত্তোলন করিয়া দিবে তবে তিনি আহার করিতে পারিবেন; এক জন ধরিয়া বশাইয়া দিবে তবে বশিতে পারিবেন; দিন-রাত্রি একস্থানে বদ্ধ, শরীরের কষ্ট, মনের অসুখ, চিত্ত অবসাদ-সাগরে মগ্ন। এমন সময়ে কে আমাদিগের চিত্তকে উন্নত রাখিতে পারে? কেবল ব্রহ্ম-প্রীতি আমাদিগের চিত্তকে উন্নত রাখিতে পারে। রোগের সময় জরা-মরণ-বিঘাতী ভিষকবর পরমেশ্বর স্বয়ং রোগীর শীর্ষদেশে উপবিষ্ট হইয়া, তাহার আরোগ্যসাধন করেন এবং তাহার চিত্তকে উন্নত রাখেন। শোকের সময় কি ভয়ানক সময়! যাঁহার পুত্র-বিয়োগ হইয়াছে তিনি জানিয়াছেন শোক কি পদার্থ। সেই কাষ্ঠাসন রহিয়াছে কিন্তু সে তাহাতে আর বশে না, সেই পুস্তকগুলি রহিয়াছে কিন্তু তাহা আর সে পাঠ করে না, সেই ক্রীড়ার-বস্তুগুলি রহিয়াছে কিন্তু তাহা লইয়া সে আর ক্রীড়া করে না, সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে আর ফিরিয়া আসিবে না, তাহার মুখচন্দ্র আর দেখিতে পাইব না, তাহার মধুর বাণী, আর শুনিতে পাইব না। এই সকল বিষয় ভাবিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এই ভয়ানক সময়ে কে আমাদিগের চিত্তকে উন্নত রাখিতে পারে? কেবল ব্রহ্ম-প্রীতি আমাদিগের চিত্তকে উন্নত রাখিতে পারে। পরমেশ্বর স্বহস্তে সাধকের অশ্রুজল মোচন করেন। কখন কখন পুত্রবিয়োগ অপেক্ষাও মিত্রবিয়োগ অধিকতর যাতনা-দায়ক হয়। যে হৃদয়াধিক প্রিয় মিত্রের সহিত লোক দুঃখ-বিপদের সময় পরামর্শ করে, যাঁহাকে দুঃখের কথা বলিয়া দুঃখ হ্রাস করে, যাঁহাকে সুখের কথা বলিয়া সুখ দ্বিগুণিত করে, অমৃত ফল পাইলে যাঁহার সহিত বিভাগ করিয়া খায়, কোন উৎকৃষ্ট কাব্য পাইলে যাঁহার সহিত একত্রে পাঠ করে, কোন উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ প্রাপ্ত হইলে যাঁহার সহিত একত্রে অধ্যয়ন করে, যাঁহার সহিত ঈশ্বরের কথা কহিয়া পবিত্র আনন্দ সম্ভোগ করে, সেই বন্ধুর বিয়োগে লোকের সংসারকে অরণ্য জ্ঞান হয়। বিপদের সময় উপস্থিত, কিন্তু পরামর্শ করিবার লোক নাই, দুঃখের সময় উপস্থিত, কিন্তু দুঃখের কথা কহিয়া দুঃখ হ্রাস করিবার লোক নাই, সুখের সময় উপস্থিত, কিন্তু সুখের কথা বলিয়া সেই সুখ দ্বিগুণিত করিবার লোক নাই, অমৃত ফল পাইয়াছি, কিন্তু যাহার সহিত ভাগ করিয়া খাইতাম তিনি নাই, ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট কথা মনে হইতেছে, কিন্তু যে ব্যক্তি অন্য সকল ব্যক্তি অপেক্ষা সেই প্রকার কথায় আনন্দ প্রকাশ করিতেন তাঁহার আর দেখা পাইবার উপায় নাই, এই সকল বিবেচনা করিতে গেলে মুমূর্ষু-প্রায় হইতে হয়, এই সময়ে কে আমাদিগকে উত্থানবান রাখিতে পারে? কেবল ব্রহ্ম-প্রীতিই আমাদিগকে উত্থানবান রাখিতে পারে। সেই চির-জীবন-সখা চির-সুহৃদ পরমেশ্বরই আমাদিগের চিত্তকে উন্নত রাখিতে পারেন। লোকে সকল-অপেক্ষা মৃত্যুকেই অত্যন্ত ভয়ানক বস্তু জ্ঞান করে। যে সময় এই সুন্দর দিবালোকের নিকট হইতে একবারে বিদায় লইতে হয়, যে সময়ে পরকালরূপ তমসাচ্ছন্ন অজ্ঞাত সমুদ্রে আত্মারূপ তরী প্রথম ভাসমান হইতে উন্মুখ হয়, যে সময়ে "গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ, দৃষ্টি হীন, নাড়ী ক্ষীণ, হীম কলেবর," সেই সময় কি ভয়ানক সময়! আমরা পার্থিব পদার্থ, আমাদিগের শরীর পার্থিব, আমাদিগের ইন্দ্রিয় পার্থিব, আমাদিগের মনের অনেক ভাব পার্থিব। যে সময়ে পার্থিব যাহা কিছু তাহা সকলই পরিত্যাগ

করিতে হইবে, যে সময়ে চিরসঙ্গিনী পৃথিবীর নিকট একবারে বিদায় লইয়া সম্পূর্ণ নূতন দেশে উপস্থিত হইতে হইবে, সেই সময় কি ভয়ানক সময়! এই সময়ে কেবল ব্রহ্ম-প্রীতিই আমাদিগের একমাত্র ভরসাস্থল। ধাত্রী যেমন গর্ভ হইতে নূতন-নিঃসৃত বালককে আপনার ক্রোড়ে ধারণ করে, পরমেশ্বর সেইরূপ স্বয়ং ধাত্রী হইয়া, এই শরীররূপ গর্ভ হইতে পরলোকে নূতন-প্রসূত মনুষ্যের আত্মাকে ধারণ করেন।

করুণাময় পরমেশ্বর! তোমার অনুরক্ত ভক্তদিগকে তোমার প্রেমসুধা বিতরণ কর, তোমার দীন হীন দুর্ব্বল সন্তানদিগকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান কর। "হৃদয়-চাতক মোর চাহে তোমারি পানে শান্তিদাতা। প্রেম-পীযূষ-বারি বরিষ বরিষ।" তোমার বিস্মরণই মৃত্যু, তোমার স্মরণই জীবন। তুমি যখন কৃপা করিয়া আমাদিগকে জীবন দান করিয়াছ তখন আমাদিগকে জীবিত রাখ, আমাদিগের চিত্তে তোমার প্রেম সর্ব্বদা উদীপ্ত রাখ। কত সময় তোমার প্রেম সাধন করিতে পারিতাম, কিন্তু সে সকল সময় বৃথা যাপন করিয়াছি। মৃত্যুর পর কেহ আমাদিগের কথা জিজ্ঞাসাও করিবেক না, কেবল তোমার প্রেম ও তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন সঙ্গে যাইবে। হে পরমাত্মন্! তোমার পদস্বরূপ নৌকাতে আত্মাকে বাঁধিয়া লও। ধন-যৌবনে মত্ত হইয়া আমরা চিরকাল যাপন করিলাম, অমৃত ত্যাগ করিয়া হলাহল পান করিলাম। এক্ষণে এই সকল কথা কহিলে কি উপকারে আসিবে? এক্ষণে কেবল তুমি আমাদিগের একমাত্র ভরসা। বিচার করিতে গেলে আমাদিগের গুণের লেশমাত্র নাই, কেবলই দোষ দৃষ্ট হয়। হে জগৎতারণ পরমেশ্বর! যখন আমরা জগতের বাহির নহি তখন কৃপা করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। তোমার ভক্ত জনেরা অতিশয় কাতর হইয়া তোমাকে ডাকিতেছে, তাহাদিগকে নিরাশ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার কর। নিদান-সময়ে তোমাবিনা আর আমাদিগের গতি নাই। হে নাথ! আমাদিগকে কৃপা কর, ভবতারণের ভার তোমারই হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে।

"যতনে যতেক ধন, পাপে বাঁটায়নু(১)
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি, কোই না পুছত,
করম সঙ্গে চলি যায়॥
এ হরি বন্ধা তুয়া পদ নায়।
তুয়া পদ পরিহরি, পাপ-পয়োনিধি
পার হব কোন উপায়॥
যাবত জনম হাম, তুয়া পদ না সেবিনু
যুবতী মতিময় মেলি। (২)
অমৃত তেজি কিয়ে, হলাহল পীয়নু
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥
ভণহু ভক্তজন, সেহ মনে গুণি
কহিলে কি বাঢ়ব কাজে।
সাজব বেরি, সেব কোই মাগই,
হেরইতে তুয়া পায় লাজে॥
এ হরি বহুত মিনতি করি তোয়
দেই ভকতি ফুল দেহ সমর্পিণু।
দয়া করি না ছাড়বি মোয়।
গণইতে দোষ, গুণ লেশ না পাওবি
যব্ তুহুঁ করবি বিচার।
তুহু জগন্নাথ, জগতে কহায়সি
জগবাহির নহি মুঞি ছার॥
ভণয়ে ভক্তজন, অতিশয় কাতর,
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদ-পল্লব, করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

(১) বাঁটায়নু—বণ্টন করিলাম।

(২) ধন যৌবনে মত্ত হইয়া।—

তাতল সৈকত, বারি-বিন্দু সম
সুতমিত রমণী সমাজে। (৩)
তোহে বিসরি মন, তাহে সমর্পিনু
অব মঝু হব কোন কাজে॥
এ বিভু মঝু-পরিণাম নিরাশা
তুহু জগতারণ, দীন দয়াময়
অভয়ে তোহারি বিশোয়াসা।
আধ জনম হাম, নিদে গোঙাইনু
জরা শিশু কত দিন গেলা
বাকালে রমণী রসরঙ্গে মাতনু
তোহে ভজব কোন বেলা॥
ভণয়ে ভক্তজন, শেষ শমন ভয়ে,
তুয়াবিনা গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক, নাথ কৃপায়সি
ভবতারণ ভার তোহারা॥" (৪)

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

প্রাতঃকাল।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

তৎসৎ ব্রহ্মপদ প্রণমি হে দণ্ডবৎ;
শ্রবণ করো করুণা করি, প্রভু এ স্তুতিগীত ত্বরিত।
শান্তি-সুধা সর্ব্বভুবন বিস্তারো,
ইচ্ছা তোমারি হউক সফল হে,
অনীতি দুর্ম্মতি করি অপহৃত,
পুণ্য-সলিল বরিষ বরিষ অমৃত॥
প্রাণের প্রাণ তুমি হৃদয়ের স্বামী,
বিকসিত কর আসি হৃদয়কমল হে,
প্রেম-সুধা দেও চিত্ত-চকোরে,
প্রসাদ-বিন্দুর তরে প্রাণ তৃষিত॥

(৩) তাতল, ইত্যাদি—উত্তপ্ত সৈকত ভূমিতে বারি বিন্দুসম পরিদৃশ্যমানা মরীচিকার মত এই পুত্র মিত্র কলত্র জড়িত সংসারে।

(৪) কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া বঙ্গভাষার আদি কবি বিদ্যাপতি হইতে উদ্ধৃত। প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ১ খণ্ড, ৫ সংখ্যা।

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বসাক্ষী পুরাণ,
কি আর জানাব জানিছ সকল হে,
ভক্তবৎসল তুমি ভক্ত এই যাচে,
মোচন কর সর্ব্ব দুরিত দুষ্কৃত॥
কাতর হইয়ে এসেছি তব দ্বারে,
দীন হীন সবে মলিন দুর্ব্বল হে,
বিঘ্নবিনাশন পতিতপাবন,
দেখাও দেখাও হে তব পুণ্যপথ॥
বিশ্বনিয়ন্তা বিভু ন্যায়সিন্ধু,
ইচ্ছা তোমারি হউক সুফল হে,
দিব্য পিতা প্রভু পরম কৃপাময়,
বিতর সবে শান্তি সুমতি সতত॥

রাগিণী খট্—তাল সুরফাকতাল।

মঙ্গল তোমার নাম, মঙ্গল তোমার ধাম,
মঙ্গল তোমার কার্য্য, তুমি মঙ্গলনিদান।
অকূল ভবসাগরে অনুদিন তুমি সহায়,
পাপ-তিমির নাশি বিতর কল্যাণ।
দুর্ব্বল হৃদয় মোর, আশ্রয় কর দান;
দুর্গম পথ তরাও, দেও হে পরিত্রাণ।
দুর্জ্জয় রিপু দ্বন্দ্বে অন্তরে বাহিরে,
এ সঙ্কটে ধ্রুব নেতা তুমি, কর বিজয় দান।

সায়ংকাল।

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

সন্তান-সন্ততি পিতামাতার আজ্ঞাবহ থাকিলে, যেমন গৃহ পরিবারের অপূর্ব্ব শোভা বর্দ্ধিত হয়, ছাত্রবৃন্দ যেমন জ্ঞানাপন্ন গুরুর অনুগত থাকিলে বিদ্যালয় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে, প্রজা-পুঞ্জ যেমন হিতাকাঙ্ক্ষী রাজার আশ্রিত অনুগত হইয়া থাকিলে রাজ্যের অনুপম শ্রী-সমৃদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হয়, তেমনি আজ সকলে সেই নিখিল-জনক-জননী বিশ্বগুরু অদ্বিতীয় রাজরাজেশ্বরের শরণাগত হওয়াতে এই উৎসব-ক্ষেত্র অনি-

র্ব্বচনীয় স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। দেখ, ঈশ্বরের স্নেহ-রশ্মি সকল-আবরণ ভেদ করিয়া আজ সহস্র-ধারে এখানে বর্ষিত হইতেছে, তাঁহার জ্ঞান-জ্যোতির বিমল আলোক আমারদের অন্তরাকাশের সকল অন্ধকার তিরোহিত করিতেছে, তাঁহার প্রেম-স্রোত শতধা বহুধা হইয়া এই অগণ্য আত্ম-ক্ষেত্রের সকল কলঙ্ক ধৌত অপসারিত করাতে সকলের হৃদয়-মন-আত্মায় তাঁহার নিষ্কলঙ্ক মঙ্গলছবি কেমন বিশদরূপে প্রতিবিম্বিত হইতেছে, সকলের অন্তশ্চক্ষু অনিমেষ হইয়া কেমন স্তব্ধপুলকে তাঁহার মহিমা সন্দর্শন করিতেছে!! সূর্য্য-প্রকাশের মধ্যে যেমন দীপালোক হতপ্রভ হইয়া যায়, তেমনি ঈশ্বরের উজ্জ্বলতর প্রকাশের মধ্যে আমারদের ক্ষুদ্রত্ব লঘুত্ব কেমন স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে! আমারদের বল-বিক্রমের অল্পতা আমরা কেমন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করত স্তম্ভিত হইয়া চতুর্দ্দিকে অন্তরে বাহিরে সেই অনন্তেরই শক্তি সামর্থ্য, প্রতাপ আধিপত্য জাজ্বল্যমান দেখিতেছি। বিষয়-ক্ষেত্রের মধ্যে ব্যক্তিগত আধিপত্য থাকাতেই মহা কোলাহল উপস্থিত হয়, বাণিজ্য ব্যবসায়ের অভ্যন্তরে ব্যক্তিগত স্বার্থ-সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকাতেই বিষম বিবাদ বিসম্বাদ উত্থিত হইয়া থাকে, ধর্ম্ম-রাজ্যের মধ্যে তাহার নাম-গন্ধ নাই বলিয়াই এই উৎসব-ক্ষেত্র অনুপম শান্তি—অতুলন সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যের মানব, দ্যুলোকের দেবতা সকলেরই চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে।

এই যে মাঘের একাদশ দিবসীয় মহোৎসব, ইহা সেই ভূতকালের সমুদায় ঘটনার মধ্যে এক ঈশ্বরেরই আধিপত্য প্রদর্শন করিতেছে; বর্ত্তমানের সম্পদ-বিপদ, জয়-পরাজয়ের অভ্যন্তরে তাঁহারই মঙ্গল হস্ত দেখাইয়া দিতেছে; ভবিষ্যতের ক্রিয়া-কলাপে যে তাঁহারই কর্ত্তৃত্ব-প্রভুত্বই বিদ্যমান থাকিবে, তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছা যে জয়-যুক্ত হইবে, এই অটল বিশ্বাস প্রতি-আত্মাতে মুদ্রিত করিয়া দিতেছে। যাঁহার নিয়ম অতিক্রম করিয়া মনুষ্য একটী বীজের অঙ্কুর উৎপাদন করিতে পারে না, যাঁহার আদেশ অবহেলা করিয়া সে একপদ অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় না, তাঁহাকে ছাড়িয়া মনুষ্য কি স্বীয় উন্নতি সাধন, জনসমাজে কল্যাণ সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়? তাঁহার সাহায্য ব্যতীত নর-নারী কি এক দিনের গ্রাস-আচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে পারে? এই সৃষ্ট আশ্রিত জীব—এই সকল তাঁহার দ্বারের চির-ভিখারী তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া কি কোন কালে তাঁহার শুভ সঙ্কল্প প্রতিরোধ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে? কোন ইতিহাস পুরাবৃত্ত ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিবে না। প্রত্যুত জ্ঞান-বিজ্ঞানশাস্ত্র, ইতিহাস পুরাবৃত্ত সকলই একবাক্যে কেবল সত্যেরই জয়, মঙ্গলেরই জয় ঘোষণা করিতেছে। এগারই মাঘের এই মহোৎসব, উচ্চরবে কেবল ধর্ম্মেরই জয়—ঈশ্বরেরই জয় কীর্ত্তন করিতেছে। একটী নয়, দশটী নয়, শত সহস্রটী নয়, ভারতের বিংশতি কোটি লোকের বিশ্বাস-বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া কি মনুষ্যের সাধ্য? দেখ, প্রত্যক্ষ দেখ, ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বীয় অপরাজিত স্বর্গীয় বলে দণ্ডায়মান হইয়া বল-বিক্রমে নয়, যুদ্ধ-বিগ্রহে নয়, কেবল স্নিগ্ধ মাতৃস্নেহ প্রদর্শন করত সকলকে সত্যের পথে, কল্যাণের পথে, ঈশ্বরের পথে আকর্ষণ করত ভারত-বক্ষে ব্রহ্মনামের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। একটী নয়, দুইটী নয়, তিনটী নয়, তেত্রিশ কোটি দেবাধিপত্য খর্ব্ব করিয়া এখানে অরূপী অশরীরী একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরের প্রশস্ত পূজার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছেন। এই অসাধ্য সাধনের মধ্যে,

এই অসম্ভাবিত পরিবর্ত্তন-স্রোতে মনুষ্যের হস্ত কোথায়? চন্দ্র-সূর্য্যে, নদী গিরি সমুদ্রে, যাঁহার হস্ত, এই শান্তিপ্রদ কল্যাণকর ব্যাপারে তাঁহারই শক্তি জাজ্বল্যমান দেখিতেছি! এই বর্ত্তমানের ঘটনা-প্রবাহে তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছা জাগ্রত রহিয়াছে! প্রজ্বলিত ইন্ধন ভস্মাচ্ছাদিত হইতে আরম্ভ হইলে যেমন তাহা উদ্দীপন করিয়া দিবার আবশ্যক হয়, তেমনি এক ঈশ্বরের উপাসনা, এক ধর্ম্ম-প্রধান ঈশ্বর-প্রধান অনুষ্ঠানের সঙ্গে নিরীশ্বর-সম্পর্ক স্পর্শ করিবার উপক্রমেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বল আমরা কেমন প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিয়াছি। ঈশ্বরের হস্ত সমুদায় ঘটনাকে কেমন নিঃশব্দে কল্যাণে পরিণত করিয়া দেওয়াতে আমরা কেমন তাঁর করুণা জাজ্বল্যতররূপে উপলব্ধি করিতেছি। আমরা তাঁর করুণা ঘোষণা করি, আর না করি, আমরা আমারদের যথাকর্ত্তব্য সম্পাদনে যত্নযুক্ত হই, আর না হই, সেই সত্যধর্ম্মা মহান্ ঈশ্বর একাদিক্রমে যাথাযথরূপে আমারদের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। বিবিধ বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়াও আমারদের আত্মাকে তাঁহার শীতল ক্রোড়াভিমুখে আকর্ষণ করিতেছেন। সম্পদ্-সৌভাগ্য-বিহীন ভারত—বল-বিক্রম-শূন্য অবসন্ন বঙ্গবাসিগণের পুনরুত্থানের জন্য সকল কল্যাণের মূলাধার-স্বরূপ পবিত্র পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়া অতুলন মাতৃস্নেহের কি পরাকাষ্ঠাই প্রদর্শন করিয়াছেন! ভারতের সহস্রবিধ অনৈক্যের মধ্যে তিনি এই এক ঐক্যস্থল নির্দ্দেশ করিতেছেন! বঙ্গের গভীর বিষাদ বিলাপের অভ্যন্তরে তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম এক শান্তিপ্রদ আনন্দপ্রদ, আত্মার পরিতৃপ্তিকর উৎসবের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার মধ্যে তাঁহার স্নেহ করুণা দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এই দীপালোক ভেদ করিয়া তাঁহার প্রেমালোক এখানে বিকীরিত হইতেছে। এই ওষধি বনস্পতি—এই সকল কুসুম-হারের মধ্য দিয়া তাঁহারই জ্ঞান শক্তি দীপ্তি পাইতেছে। এই যোগধ্যানপরায়ণ সাধক-মণ্ডলীর হৃদয়-কন্দর হইতে জ্বলন্ত প্রেমাগ্নি উত্থিত হইয়া সেই জ্যোতির জ্যোতি মহান্ জ্যোতিতে মিলিত হইতেছে।

ভবিষ্যতে উন্নত আত্মা-সকল লোক-লোকান্তরে আর কি দেখিবে, যে ঈশ্বরের উজ্জ্বলতর নবতর প্রকাশ অধিকাধিকরূপে সন্দর্শন করিবে, এখানে এখনই তাঁহার প্রকাশ প্রাতঃ-সূর্য্য-প্রকাশের ন্যায় প্রেমোৎফুল্ল হৃদয়ে সকলে নিরীক্ষণ কর। কালে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম যেরূপে মানবকুলকে ঐক্য-সূত্রে গ্রথিত করিয়া ব্রহ্ম-পূজায় প্রবৃত্ত করিবে, এই উৎসব-ক্ষেত্রে তাহার পূর্ব্বাভাস অবলোকন কর। এখন ভূলোক দ্যুলোকে ঈশ্বরের যে জ্ঞান শক্তি মহিমার প্রকাশ দেখিতেছি, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সকলই অব্যক্ত রূপে তাঁহাতেই সন্নিহিত ছিল, আবার এখন অধোঊর্দ্ধে, অন্তর বাহিরে, তাঁহার সত্য-জ্ঞান, শান্তি-মঙ্গলের যে ঈষৎ আভাস পাইতেছি; লোক-লোকান্তরে তাহারই পরিস্ফুট প্রকাশ দেখিতে পাইব। সেই অমৃত-স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া এই যে আত্মা প্রাণ পাইয়াছে, দেব-লোক হইতে দেব-লোকে অনন্ত জীবন সেই অমৃতত্ব উপভোগ করিবে। সংসার-কোলাহলের মধ্যে এখন যে এক এক বার সেই অনন্তের গুণ গান করিতেছি, নানা-বিঘ্ন দুঃখ তাপের মধ্যে এখন যে আমারদের আত্মা এইরূপ এক একটী উৎসব লাভ করিয়া প্রেমানন্দে উৎফুল্ল হইতেছে, ভবিষ্যৎকালে দেব-লোক পুণ্য-লোকে নিত্য উৎসবে মিলিত হইয়া অপসৃত আত্মা সকল ক্রমাগতই তাঁহার যশঃ কীর্ত্তি ঘোষণা করিতে থাকিবে, আনন্দের উপর ভূমানন্দ সম্ভোগ করিতে থাকিবে।

দেখ, প্রত্যক্ষ দেখ! ঈশ্বরকে পাইয়া আমরা সকলই পাইয়াছি, তাঁহাকে জানিয়া আমরা ভূত ভবিষ্যত্ বর্ত্তমান সকলই জানিতেছি—তাঁহার জ্ঞান প্রেমালোক কেমন বিশদরূপে আমারদের সম্মুখে অনন্ত উন্নতির পথ প্রমুক্ত করিয়া দিতেছে! তাঁহার স্নিগ্ধ মঙ্গল কিরণ চন্দ্র-কিরণের ন্যায় আমারদের আশালতাকে কেমন ফল-মুখী করিয়া তুলিতেছে! অতএব আইস, সকলে তাঁহার শরণাপন্ন হই। যাঁহা হইতে সকলই পাইয়াছি যাঁহার নিকটে সুখের পর সুখ, মঙ্গলের পর মঙ্গল, শান্তির পর শান্তি, উন্নতির পর উন্নতি লাভের প্রত্যাশা করিতেছি, আইস এখনই সকলে হৃদয-মন-আত্মা সর্ব্বস্ব তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়া জীবনকে সার্থক করি।

হে করুণানিধান! তোমার দুরবগাহ গম্ভীর জ্ঞান প্রেম-সমুদ্রের তলস্পর্শ করে কার্ সাধ্য? তোমার নিগূঢ় কৌশলগর্ভে বুদ্ধি নিবেশ করে এমন কার্ সামর্থ? সৃষ্টি কাল হইতে সূর্য্যের প্রত্যেক রশ্মিই যেমন লোকের হিতের জন্যই বর্ষিত হইতেছে, তেমনি তোমার অনন্ত জ্ঞান-শক্তি, অতুলন স্নেহ-করুণা জড়-জগৎ, আধ্যাত্মিক রাজ্যের রক্ষণ পালন এবং উন্নতি সাধন জন্যই নিয়োজিত রহিয়াছে। এই নিরবলম্ব প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড যেমন তোমাকে অবলম্বন করিয়াই শূন্যপথে নিরুদ্বেগে সঞ্চরণ করিতেছে, আমরা দীন হীন দুর্ব্বল বঙ্গবাসী তেমনি তোমার আশ্রয় লাভ করিয়া দুর্গতি দুর্দ্দশার মধ্যেও সুরক্ষিত হইতেছি। তুমি যাহাদিগের নেতা, তাহারদের কি ভয়, কি শোক? হে ঈশ্বর! সমস্ত সম্পদ্-সৌভাগ্য আমারদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তুমি আমারদিগকে পরিত্যাগ কর নাই, আমরা যেন তোমাকে পরিত্যাগ না করি তুমি এই বর দাও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

সায়ংকাল।

রাগিণী গৌরী—তাল কাওয়ালি।

আহা আজি পুলকে পূরিল দিক চারি।
ঝরিছে নয়নে আনন্দধারা একি অনুপম করুণা তোমারি।
বরিষে সুধা আজি চন্দ্র তারা অনিল হিল্লোলে অমৃতলহরী।
ত্রিজগত-পাতা অখিল-বিধাতা, পূজিব চরণ আজি তোমারি।

গুজরাটী ভজন—তাল যৎ।

সৎচিদ্‌ঘন প্রভু পরব্রহ্ম পাবন, সব মিত্রে ভজ প্রেম ভক্তি ভরে প্রণমি প্রতি দিন।
সৃষ্টি নিয়ন্তা সত্য সে এক, তাঁর সমান অন্য নাহি কেহ রে—
বিশ্বগ্রন্থ রচনা প্রকাশে, অচিন্ত্য অনন্ত আদি কারণ॥
এ মঙ্গলময় প্রভুর মহিমা গাও সদা শুদ্ধ-সত্ত্ব হয়ে রে—
অদ্ভুত সুন্দর নিয়ম নিরখি, আশ্চর্য্য-রসে হও মগন॥
ন্যায়কারী তাঁর ন্যায় অখণ্ড, সংকল্প তাঁর কভু না ফেরে রে—
পুণ্যাত্মা পুণ্যলোকে বিরাজে, পাপীর নিশ্চয় হইবে পতন॥
সৎসঙ্গ সৎগুরু লাভে মানব জনম এই সফল করো রে—
উত্তম দেহ এ ধারণ করিয়ে বৃথা করো না কাল হরণ॥
ত্যজিয়ে তুচ্ছ বিষয়-কামনা, প্রভু-পদ-আশ্রয় ধরো রে—
জনহিত-কারক কার্য্য করো সদা, জানো সেই উত্তম সাধন॥
ধনজন যৌবন গর্ব্ব হে মিথ্যা, সকলি লইবে কাড়ি শমন দুর্জয় রে—

ক্ষণভঙ্গুর এই দেহ অনিত্য, নাহি রবে কর কোটি যতন॥
মঙ্গল ভাব প্রভুর অপার, সুখ দুখে ভুলো না কভু ভুল না রে—
তাঁরি করুণা তাঁরি কৃপাগুণে হইবে সর্ব্ব পাপ দহন॥
জাগিবে যদি তো জাগো রে ভাই, কালচক্র অনিবার ঘুরে রে—
সময় বহিয়া গেলে ফিরে নাহি আর, মিছা কাজে করো না হে ভ্রমণ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট্—তাল একতালা।

ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী, সবে মিলি তব সত্য ধর্ম্ম ভারতে প্রচারি।
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম, দিশ দিশি তব পুণ্য নাম, ভক্তজনসমাজ আজ স্তুতি করে তোমারি।
নাহি চাহি ধন জন মান, নাহি প্রভু অন্য কাম, প্রার্থনা করে তোমারে আকুল নরনারী।
তব পদে প্রভু লইনু শরণ, কি ভয় বিপদে কি ভয় মরণ, অমৃতের খনি পাইনু যখন জয় জয় তোমারি।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

বিমল রজত ভাসে, পূর্ণ করি নীলাকাশে, চন্দ্রমা আরতি করে সহস্র-কিরণে সেই সত্য সনাতনে।
অগণ্য তারকাবলী, চৌদিকে রয়েছে জ্বলি, মঙ্গল কনক-দীপ গগনে গগনে।
ফুলের সুরভি শ্বাস, উঠিছে ধূপের বাস, কানন কুসুম-ভার অর্পিছে চরণে।
পর্ব্বত-কন্দরে গিয়া, শুভ শঙ্খ বাজাইয়া, পবন হরষে তাঁরে চামর ব্যজনে।
অমৃতের অধিকারী, আছ যত নরনারী, তোমরাও আরতি কর প্রকৃতির সমে।
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালি, প্রেমের সৌরভ ঢালি, শত কণ্ঠে কর গান সুমধুর তানে।

বন্দনা।

রাগিণী মিশ্র—তাল একতালা।

জয় দেব জয় দেব জয় মঙ্গলদাতা, জয় জয় মঙ্গলদাতা,
সঙ্কট-ভয়-দুখ-ত্রাতা, বিশ্বভুবনপাতা।
জয় দেব জয় দেব।
অচিন্ত্য অনন্ত অপার, নাহি তব উপমা, প্রভু নাহি তব উপমা;
বিশ্বেশ্বর ব্যাপক বিভু চিন্ময় পরমাত্মা।
জয় দেব জয় দেব।
জয় জগবন্দ্য দয়াল, প্রণমি তব চরণে, প্রভু প্রণমি তব চরণে,
পরমশরণ তুমি হে জীবন মরণে।
জয় দেব জয় দেব।
জগতারণ দীনেশ সুখশান্তিদাতা, প্রভু সুখশান্তিদাতা;
শরণাগতবৎসল তুমি পরম পিতা মাতা।
জয় দেব জয় দেব।
আপনা প্রতি নিরখি না দেখি নিস্তার, প্রভু না দেখি নিস্তার;
একমাত্র ভরসা হে করুণা তোমার।
জয় দেব জয় দেব।
শত অপরাধী আমরা পাপ ক্ষমা কর হে, প্রভু পাপ ক্ষমা কর হে;
তব প্রসাদ লাভে প্রভু পাপ তাপ না রহে।
জয় দেব জয় দেব।
মিলিয়ে ভক্তসমাজ মাগি বরাভয় দান, প্রভু মাগি বরাভয় দান,
কৃপা করি হে কৃপাময় দাও চরণে স্থান।
জয় দেব জয় দেব।
কি আর যাচিব আমরা করি হে এমিনতি, প্রভু করি হে এমিনতি;
এলোকে সুমতি দাও, পরলোকে সুগতি।
জয় দেব জয় দেব।

অশুদ্ধ শোধন।

৯ কল্প ২ ভাগ ৯০ পৃষ্ঠা, বৈদিক আর্য্যসমাজ।

প্রথম স্তম্ভের একাদশ পংক্তি। "পুরোহিতং যজ্ঞস্য" এই পদদ্বয়ের পরিবর্ত্তে "পুরোহিতং পুরোহিতং যজ্ঞস্য„ এই পদত্রয় পঠিত হইবে।

ঐ স্তম্ভের ষোড়শ পংক্তি ইত্যাদি। শুদ্ধ করিয়া এইরূপ পঠিত হইবে যথা—

"অগ্নিং ঈলে, ঈলে অগ্নিং, অগ্নিং ঈলে ; ঈলে পুরোহিতং, পুরোহিতং ঈলে, ঈলে পুরোহিতং ; পুরোহিতং যজ্ঞস্য, যজ্ঞস্য পুরোহিতং, পুরোহিতং যজ্ঞস্য ; যজ্ঞস্য দেবং, দেবং যজ্ঞস্য, যজ্ঞস্য দেবং ; দেবং ঋত্বিজং, ঋত্বিজং দেবং, দেবং ঋত্বিজং।„

ঐ স্তম্ভের বিংশতি পংক্তি "তৃতীয় আবৃত্তিকালে এতৎপরিবর্ত্তে„ "দ্বিতীয়বার আবৃত্তিকালে„ পঠিত হইবে।

ঐ স্তম্ভের ত্রয়োবিংশতি পংক্তি। ঘন পাঠ যথা "অগ্নিং ঈলে, ঈলে অগ্নিং, অগ্নিং ঈলে পুরোহিতং, পুরোহিতং ঈলে অগ্নিং, অগ্নিং ঈলে পুরোহিতং।„ প্রথম পদ হইতে আরম্ভ করিয়া এই প্রথম ঘন। দ্বিতীয় পদ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় ঘন যথা "ঈলে পুরোহিতং, পুরোহিতং ঈলে, ঈলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য, যজ্ঞস্য পুরোহিতং ঈলে, ঈলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য।„ তৃতীয় ঘন যথা "পুরোহিতং যজ্ঞস্য, যজ্ঞস্য পুরোহিতং, পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবং, দেবং যজ্ঞস্য পুরোহিতং, পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবং।„ চতুর্থ ঘন যথা "যজ্ঞস্য দেবং, দেবং যজ্ঞস্য, যজ্ঞস্য দেবং ঋত্বিজং, ঋত্বিজং দেবং যজ্ঞস্য, যজ্ঞস্য দেবং ঋত্বিজং।„ পঞ্চম ঘন যথা "দেবং ঋত্বিজং, ঋত্বিজং দেবং, দেবং ঋত্বিজং হোতারং, হোতারং ঋত্বিজং দেবং, দেবং ঋত্বিজং হোতারং।„ ইত্যাদি নিয়মানুসারে পাঠের নাম ঘন পাঠ। ঘন পাঠে মন্ত্রের পদসমূহ পাঠ করিবার নিয়ম এই "প্রথম দ্বিতীয়, দ্বিতীয় প্রথম, প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়, তৃতীয় দ্বিতীয় প্রথম, প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়, এবং দ্বিতীয় হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ এবং তৃতীয় হইতে এবং চতুর্থ হইতে ইত্যাদি।

নবম কল্প দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ১১৬।

প্রথম স্তম্ভ ৮ পংক্তি। 'বাচা বিরূপ নিত্যয়', ইহার পরিবর্ত্তে "তস্মৈ নূনমভিদ্যবে বাচা বিরূপ নিত্যয়া বৃষ্ণে চোদস্ব সুষ্টুতিং "পঠিত হইবে।

৯ পংক্তি। "সুতরাং শব্দ নিত্য„ 'ইহার পূর্ব্বে "আর মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে "অনাদিনিধানা নিত্যা বাক্ উৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।" এই-বচন নিবেশিত হইবে।

আয় ব্যয়।

কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ১৭৯৮ শক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয় ...	৪৮৭ /১৫
পূর্ব্বকার স্থিত ...	৮০০।ℓ০
সমষ্টি ...	১২৮৭॥ ১৫
ব্যয় ...	১০২০ / ৫
স্থিত ...	২৬৭।ℓ১০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ ...	১৩৮ ℓ/১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৪০ ॥০
পুস্তকালয় ...	১৪ ℓ/১০
যন্ত্রালয় ...	১৭৩। ৫
গচ্ছিত ...	২০ ।/১০
সমষ্টি ...	৪৮৭ /১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ ...	২৪২ ℓ/১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩৮৬ (১০
পুস্তকালয় ...	২৮ ॥/০
যন্ত্রালয় ...	৩৩৯ ॥/১০
গচ্ছিত ...	২৩ ॥ℓ/১০
সমষ্টি ...	১০২০ /৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩৫
" লক্ষ্মীনারায়ণ বসু ...	৯
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন ...	৩
" রাজনারায়ণ বসু ...	১
মৃত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	১৪
	৬২

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১২
" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১২
" সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ...	১২
	৩৬

দানাধারে প্রাপ্ত ...	২৬।ℓ/১৫
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয় ...	১৪। ১৫
	১৩৮ℓ/১০

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৫ ফাল্গুন রবিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক মহোৎসব হইবে।

শ্রী অম্বিকাচরণ সরকার।
সম্পাদক।

Registered No 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
চৈত্র ১৭৯৮ শক

৪০৪ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৭

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ।

৪ ফাল্গুন রবিবার ১৭৯৮ শক।

যস্তিষ্ঠতি চরতি যশ্চ বঞ্চতি
যো নিলায়ং চরতি যঃ প্রতঙ্কং।
দ্বৌ সংনিষদ্য যন্মন্ত্রয়েতে
রাজা তদ্বেদ বরুণস্তৃতীয়ঃ।
উতেয়ং ভূমির্ব্বরুণস্য রাজ্ঞ
উতাসৌ দ্যৌর্বৃহতী দূরেঅন্তা
উতো সমুদ্রৌ বরুণস্য কুক্ষী
উতাস্মিন্নল্প উদকে নিলীনঃ। *

'যস্তিষ্ঠতি' যিনি একস্থানে থাকেন, 'চরতি' চলিয়া বেড়ান, 'যশ্চ বঞ্চতি' যিনি বিশ্রাম করেন, 'যো নিলায়ং চরতি' যিনি তিমিরাবৃত গুহার অন্ধকার মধ্যে লুক্কায়িত থাকেন, 'যঃ প্রতঙ্কং চরতি' যিনি জনশূন্য গুপ্ত গহ্বরে প্রবেশ করেন; বরুণ রাজা তাহা সকলই জানিতেছেন। যে একস্থানে থাকে, যে চলিয়া বেড়ায়, যে বিশ্রাম করে; যে অন্ধকার-গৃহে লুক্কায়িত থাকে, যে কোন নির্জন গহ্বরে প্রবেশ করে; সকলই সেই বরুণরাজা জানেন। 'দ্বৌ সন্নিষদ্য' দুই জনে বিরলে বশিয়া 'যন্মন্ত্রয়েতে' যাহা কিছু মন্ত্রণা করে, সেই দুই জনের মধ্যে তৃতীয় বরুণরাজা থাকিয়া সমস্ত জানেন। 'রাজা তদ্বেদ বরুণস্তৃতীয়ঃ'। তাঁহার নিকটে কিছুই গুপ্ত থাকে না, তাঁহার নিকট হইতে কেহই লুক্কায়িত থাকিতে পারে না। যদি কেহ তিমিরাবৃত গৃহে লুক্কায়িত থাকে, যদি কেহ অন্ধকূপে প্রবেশ করে; তাহা তাঁহার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না, তিনি তাহা সকলই জানেন। যদি দুই জনে বশিয়া কুমন্ত্রণা করে বা শুভমন্ত্রণা করে, তার মধ্যে তিনি তৃতীয় থাকিয়া তাহা সকলই জানেন। অতএব তাঁহাকে সর্ব্বসাক্ষী জানিয়া পাপাচরণ করিতে ভয় কর এবং সৎকর্ম্ম সাধনে উৎসাহী হও। পাপকর্ম্ম গোপন রাখিবার উপায় নাই। পরম পিতা অখিলমাতা সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া কুকর্ম্ম হইতে বিরত হও এবং তাঁহার উৎসাহ-জনন প্রেম-প্রফুল্ল দৃষ্টি দেখিয়া সাধু কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। যখন সাধু কর্ম্ম করি, তখন তাঁহার প্রসন্ন দৃষ্টি দেখিতে পাই; যখন পাপাচরণ করি, তখন তাঁহার রুদ্র মূর্ত্তি প্রকাশ পায়। পাপ করিলেও তিনি জানিতেছেন, পুণ্য করিলেও তিনি জানিতেছেন, এবং তাহার উপযুক্ত

* অথর্ব্ববেদ সংহিতা ৪ অঃ ৭ প্রঃ।

দণ্ড পুরস্কার দিতেছেন। 'একোহমস্মীত্যাত্মানং যৎ ত্বং কল্যাণ মন্যসে' হে ভদ্র, তুমি যে মনে করিতেছ, আমি একাই আছি, তাহা নহে। 'নিতাং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ' পুণ্যপাপদর্শী পরমাত্মা স্তব্ধ হইয়া তোমার হৃদয়ে নিত্যই রহিয়াছেন। এই ভাবটি অথর্ব্ব বেদের এই মন্ত্রে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। যে কেহ দণ্ডায়মান থাকে, যে কেহ চলিয়া বেড়ায়, যে কেহ বিশ্রাম করে, যে কেহ গুহা-গহ্বরে লুকাইবার চেষ্টা করে, সকলই তিনি জানেন। দুই জনে যেখানে মন্ত্রণা করে, তাহার মধ্যে তিনি তৃতীয় থাকেন; তিন জনের মধ্যে তিনি চতুর্থ; চারি জনের মধ্যে তিনি পঞ্চম; পাঁচ জনের মধ্যে তিনি ষষ্ঠ; এখানে যদি এখন চারি শত জন উপস্থিত থাকেন, তবে তাঁহাকে লইয়া চারি শত এক জন গণনা করিতে হয়। সেই বরুণ রাজা কে? তাঁহার পরিচয় পরের মন্ত্রে আছে। 'ইয়ং ভূমির্ব্বরুণস্য রাজ্ঞঃ' এই ভূমি সেই বরুণ রাজার। এই সমুদায় পৃথিবী সেই বরুণ রাজার। এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ অধিকার করিয়া যাঁহারা আপনাকে রাজা বলিয়া জানিতেছেন; সে তাঁহারদের অভিমান মাত্র, সে তাঁহারদের শূন্য উপাধিমাত্র। বাস্তবিক এই পৃথিবীর রাজা সেই বরুণ রাজা। তিনি কি কেবল এই পৃথিবীর রাজা? তাহা নহে। 'অসৌ দ্যৌর্বৃহতী' এই যে বৃহৎ দ্যুলোক 'দূরেঅন্তা' যাহার অন্ত পরস্পর দূরে রহিয়াছে, যাহার অন্ত পাওয়া যায় না, তাহারও তিনি রাজা। তিনি এই প্রকাণ্ড ভূলোক ও অসীম দ্যুলোকের রাজা। তিনি এই ভূলোক ও দ্যুলোক সকলেরই অধিপতি। 'উতোসমুদ্রৌ বরুণস্য কুক্ষী' আর যে এই সমুদ্র—জলের ও বায়ুর—উভয়ই বরুণের উদরের মধ্যে রহিয়াছে। উভয় সমুদ্র তাঁহারই আশ্রয়ে রহিয়াছে। তিনি যে কেবল গভীর সমুদ্রে আছেন, তাহা নহে, তিনি অল্প জল-বিন্দুতেও আছেন। 'অস্মিন্নল্পউদকে নিলীনঃ'। যিনি দ্যুলোক ও ভূলোকের রাজা, যিনি ক্ষুদ্র বৃহৎ তাবৎ পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন; তিনি আমারদের উপাস্য দেবতা। যিনি সমুদায় পৃথিবীর ও অসীম দ্যুলোকের রাজা; যিনি গভীর সমুদ্রে যিনি বায়ু-সাগরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন; যিনি অণু হইতেও অণু, বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, যিনি অসীম আকাশে, যিনি ক্ষুদ্র জলবিন্দুতে; তিনি আমারদের উপাস্য দেবতা। যিনি সকল সময়ে আমারদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন; পুণ্যকর্ম্মে উৎসাহী করিতেছেন; পুণ্যকর্ম্মে পুরস্কার দিতেছেন; পাপে পরাজিত হইলে দণ্ডবিধান করিয়া তাহা হইতে পরিত্রাণ করিতেছেন; তিনি আমারদের উপাস্য দেবতা। কত কাল পূর্ব্বে ঋষিরা এই অথর্ব্ব বেদে এই সকল জীবন্ত সত্য নিঃশ্বসিত করিয়া গিয়াছেন, যাহা আজও আমরা সমুদয় হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিতেছি, যাহাতে আমারদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি উত্তেজিত হইতেছে। অথর্ব্ব বেদের এই শ্লোকে সাক্ষীস্বরূপ পরমেশ্বরকে আমরা কেমন সুস্পষ্ট জানিতেছি। আমারদের অন্তরে এখন যে সকল ভাব রহিয়াছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিরা তাহাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সত্য কখন কোন বিশেষ সময়ে বদ্ধ নহে। সত্য সকল সময়েই প্রকাশ পাইতেছে। যেমন অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, যেমন সূর্য্য হইতে কিরণ-সকল বিকীর্ণ হয়; তেমনি ঈশ্বর হইতে সত্য নিয়তই বিনির্গত হইতেছে। যখন যে সাধু ভক্ত শুদ্ধ-সত্ত্ব হইবে, তাহার নিকটে আধ্যাত্মিক সত্য তখন প্রকাশ হইবেই হইবে। ঈশ্বর হইতে সত্য চিরকালই প্রচার হইতেছে, কিন্তু তাহা গ্রহণ করিবার লোক অতি বিরল।

আমারদের এ কি সৌভাগ্য! আমরা এই দুর্ব্বল বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, সেই অনাদ্যনন্ত ব্রহ্মের উপাসনা করিতেছি। অদ্য কি শুভ দিন! যিনি সমুদায় ভূমণ্ডলের রাজা, যিনি দেব-মনুষ্য সকলেরই অধিপতি, তাঁহার আরাধনার জন্য এখানে আসিয়াছি, তাঁহার বিশুদ্ধ ভাব দেখিয়া পবিত্র হইতেছি; ইহা আমারদের কেমন সৌভাগ্য! এই যে পবিত্র সময়—ইহা অমৃত-বেলা, ইহা ব্রহ্ম-মুহূর্ত্ত। তিনি যেমন সূর্য্যের অন্তরে থাকিয়া তাহার রশ্মি-সকল বিকীর্ণ করিয়া সপ্ত লোককে উজ্জ্বল করিতেছেন, তেমনি আবার তিনি আমারদের আত্মাতে থাকিয়া শুভবুদ্ধি ও ধর্ম্মবল উত্তেজিত করিয়া সৃষ্টির মঙ্গল বিধান করিতেছেন। তাঁহার সহিত আমারদের অনন্ত যোগ, তিনি আমারদের আরাধ্য দেবতা। এস, এখন আমরা সকলে মিলিয়া প্রীতিভক্তি সহকারে তাঁহার উপাসনা করিয়া জীবনকে সার্থক করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

উপদেশ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৯ মাঘ ১৭৯৮ শক।

অনন্ত-স্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য অদ্য আমরা পিতা পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবে মিলিয়া এই শান্তিধামে সমাগত হইয়াছি। যে অনন্ত-স্বরূপের তুলনায় অখিল ব্রহ্মাণ্ড এক কণা বালুকা অপেক্ষাও লঘু, তাঁহার সমীপে আমরা সমাগত হইয়াছি। যাঁহার প্রতাপে সূর্য্য উদয়াস্ত হইতেছে, চন্দ্র পক্ষ পরিবর্ত্তন করিতেছে, পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করত নব নব ঋতু সম্বৎসরে বিভূষিত হইতেছে, সেই রাজরাজেশ্বরের সমীপে আমরা সমাগত হইয়াছি। এক বিন্দু পৃথিবীর যিনি রাজা, যাঁহার ভয়ে আমরা ভীত এবং শশব্যস্ত, যাঁহার প্রতাপ আমারদের মর্ম্মে শেল বিদ্ধ করে, যাঁহার লৌহময় রাজদণ্ড আমারদের চক্ষে যমদণ্ডতুল্য প্রতীয়মান হয়, তাঁহারই বা উপাসনাতে কেন আমরা এত অগ্রসর; এবং অখিল ব্রহ্মাণ্ডের যিনি রাজা, যাঁহার সমীপস্থ হইলে আমারদের মনে কেবল আশারই সঞ্চার হয়, ভয় তাপ সকলই দূরে পলায়ন করে, শোকাশ্রু-ধারা আনন্দে পরিণত হয়, তাঁহারই বা উপাসনাতে কেন আমরা এত পশ্চাদ্‌গামী? আমারদের এই দুরবস্থার প্রথম কারণ অজ্ঞতা বা অবিদ্যা; আমরা দেবতাকে অসুর মনে করি, অসুরকে দেবতা মনে করি, সত্যকে শত্রু মনে করি, মিথ্যাকে মিত্র মনে করি; জ্ঞানকে আমরা দুই চক্ষে দেখিতে পারি না, অজ্ঞানকে আমরা প্রাণসখা বলিয়া আলিঙ্গন করি। বিক্ষেপ-ধর্ম্মী অজ্ঞানকে অন্ধকারময় জড়শক্তিকে আমরা সম্বোধন করিয়া বলি, তুমিই আমারদের আদি-কারণ, তুমিই আমারদের ভজনীয়, তুমিই আমারদের বরণীয়; একমেবাদ্বিতীয়ং জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানকে আমরা বলি, তুমি আমারদের কেহই নহ, তোমাকে, আমরা জানি না! আমারদের নিকটে জ্ঞানী কে? না যিনি অজ্ঞানকে মূলশক্তি বলিয়া মানেন, অজ্ঞানের যিনি ভক্ত উপাসক তিনিই আমারদের নিকটে মহা জ্ঞানী। অজ্ঞানের ভক্ত কি কখন জ্ঞানী হইতে পারে? বিষবৃক্ষে যখন অমৃত উৎপন্ন হইবে, সর্পের দংশনে যখন মৃত ব্যক্তি জীবন লাভ করিবে, অমানিশা যখন দিবালোক বিকীর্ণ করিবে, অজ্ঞানের উপাসক তখনই জ্ঞানী নামের যোগ্য হইবেন; তাহার এ দিকে নহে। ঈশ্বরের উপাসনাতে আমরা যে এত পশ্চাৎগামী তাহার প্রথম কারণ আমারদের অজ্ঞতা, দ্বিতীয় কারণ আমার-

দের হৃদয়শূন্যতা, অন্যান্য দেশের সহিত আমারদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে আমারদের হৃদয়শূন্যতা জলের ন্যায় সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। অন্যান্য দেশের লোকেরা সহস্র দুর্বিপাকে পড়িলেও আপনারদের দেশকে, আপনারদের গৃহকে, আপনারদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে প্রেমোজ্জ্বল নয়নে দৃষ্টি করেন, আমারদের দেশের লোকেরা আপনারদের দেশের প্রতি, আপনারদের গৃহের প্রতি, এবং আপনারদের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি কথায় কথায় হতশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। মানিলাম, আমারদের দেশে রাজকীয় স্বাধীনতা নাই, কিন্তু আমারদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অনির্ব্বচনীয় মহদ্ভাব সকলের ভাবুক হই, এটুকু স্বাধীনতাও ত আমারদের আছে? না তাহাও আমরা কুটিল কাল-স্রোতে বিসর্জ্জন দিব; বাহুবলে আমারদের রাজ্য কাড়িয়া লইতে পারে, ধন-ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইতে পারে, এমন কি আমারদের প্রাণপর্য্যন্ত কাড়িয়া লইতে পারে, কিন্তু দীনের সম্বল এই হৃদয়টুকুও কি আমরা বাহুবলরূপ মত্ত হস্তীর পদে ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনারা নিক্ষেপ করিব? ঈশ্বর থাকিতে, ব্রাহ্মধর্ম্ম থাকিতে, আত্মা থাকিতে, প্রাণ থাকিতে, আমরা আমারদের হৃদয়টুকুকেও বিপক্ষের পদে দলিত হইতে দিব? আমারদের পুরাতন বাল্মীকি মুনি, যিনি আমারদের দেশের অন্ধকারের আলোক হইয়া অদ্যাপি জীবিত-মান আছেন, তাঁহার মনের ভাব কিরূপ ছিল, একবার কর্ণে শ্রবণ কর; তিনি বলিয়াছেন "ধিক্ বলং ক্ষত্রিয়-বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং।" অস্ত্র শস্ত্রের যে বল বাহুর যে বল তাহাকে ধিক্; ব্রহ্মতেজের যে বল তাহাই বল। আমারদের শরীরের মধ্যে যদি কণামাত্রও হৃদয় থাকিত, তাহা হইলে "ব্রহ্মতেজোবলং বলং" এই মৃতসঞ্জীবনী একটি বচন শ্রবণ মাত্রে আমরা জাগ্রত হইয়া উঠিতাম, এবং "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই নামোচ্চারণ-বলে সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সকলে আমরা এক-হৃদয় এক-প্রাণ এক-বাক্য হইতাম। কিন্তু আমারদের হৃদয় কোথায়? যে "মহাবাক্য এক মুহূর্ত্তে আমারদের দেশের সমস্ত হৃদয়কে এক-হৃদয় করিয়া তুলিবে সেই একমেবাদ্বিতীয়ং, যে মহানিনাদ অচেতন জগৎকে সচেতন করিয়া, শূন্য আকাশকে প্রেমে পুলকিত করিয়া, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদ্যন্ত ব্যাপিয়া, প্রতিনিয়ত শব্দায়মান হইতেছে সেই "একমেবাদ্বিতীয়ং"—তাহার বল অদ্যাপি আমরা পরীক্ষা করিলাম না, অথচ চল্লিশ বৎসর তাহা আমারদের হতভাগ্য শ্রবণে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। হে কৃতবিদ্য যুবক-বৃন্দ, "আমারদের মধ্যে ঐক্য নাই" এ কথা বলিয়া মিথ্যা আর কপট আক্ষেপ করিও না। যে দিন তোমরা সকলে মিলিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে একমেবাদ্বিতীয়ং এই নাম উচ্চারণ করিবে, এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিবে যে, সেই একের উপাসনাতে অদ্যাবধি আমরা কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত হইলাম, সেই দিন তোমারদের মধ্যে অখণ্ডনীয় ঐক্য সংস্থাপিত হইবে, যে ঐক্যে সমুদায় জগৎসংসার বিধৃত রহিয়াছে সেই ঐক্য তোমারদের হইবে, বরং জীবন যাইবে তথাপি সে ঐক্য যাইবে না। অনেক আড়ম্বর-বাক্য পরিত্যাগ করিয়া আমারদের দেশের লোক সকলে মিলিয়া যখন একবার একমেবাদ্বিতীয়ং এই এক বাক্য উচ্চারণ করিবে, তখনই আমারদের দেশে অখণ্ডনীয় ঐক্য সংস্থাপিত হইবে, ঐক্য সংস্থাপনের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। ঈশ্বরের উপাসনাতে আমরা যে এত পশ্চাদ্‌গামী, তাহার প্রথম কারণ অজ্ঞতা; দ্বিতীয় কারণ হৃদয়শূন্যতা, তৃতীয় কারণ

মোহ এবং জড়তা। আমরা প্রলোভনের বশ, লোকভয়ে জড়সড়, প্রবৃত্তির আজ্ঞাকারী ভৃত্য। আমারদের মধ্যে পদার্থ নাই! যেখানে বাহুবল, যেখান হইতে আমরা কশাঘাত প্রাপ্ত হই সেই খানেই কি আমারদের ভক্তিশ্রদ্ধা? যেখানে মুক্তির সমীরণ বহমান হইতেছে, যেখানে মনুষ্যের মহত্ত্ব হিমালয়ের ন্যায় উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান আছে, যেখানে সত্য, জ্ঞান, আনন্দ, অভয়, ভক্তি, প্রেম, এ সকল দেবশক্তির প্রভাবে আসুরিক বাহুবল হতদর্প হতশ্রী ও হতবুদ্ধি হইয়া, অন্ধতম রসাতলে প্রবেশ কামনা করিতেছে সেই খানেই কি আমারদের বিতৃষ্ণা! দেবলোকে আমাদের বিতৃষ্ণা, ব্রহ্মধামে আমাদের বিতৃষ্ণা! হায়! যেখানে অজ্ঞতা, হৃদয়শূন্যতা, এবং জড়তা এই তিনের সঙ্গম, তাহারই নাম কি বঙ্গদেশ হইল? এই ঘোর বিপদের করাল গ্রাস হইতে উদ্ধার পাইবার কেবল একমাত্র উপায় দেখিতেছি; সে উপায় ব্রাহ্মধর্ম্ম। উপরে শত্রুপক্ষের কোপদৃষ্টি, নিম্নে গৃহবিচ্ছেদ বন্ধুবিচ্ছেদ, সম্মুখে বিষয়প্রলোভন, উপরে প্রচণ্ড দিবাকর, নিম্নে উত্তপ্ত বালুকারাশি, সম্মুখে মৃগতৃষ্ণিকা, হে আতপক্লান্ত বিভ্রান্ত পথিক সকল! এ মরুভূমিতে বিচরণ করিয়া তোমরা কি সুখ পাইতেছ? উত্তাপে উত্তাপে তোমারদের অস্থি মাংস জীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তথাপি কি তোমরা শীতল ছায়া অন্বেষণ করিবে না, পিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া যাইতেছে তথাপি কি তোমরা স্বচ্ছ বারি অন্বেষণ করিবে না? বিবাদ-কলহে মোহ-কোলাহলে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইতেছে তথাপি কি তোমরা একমেবাদ্বিতীয়ং জ্ঞান-প্রেমের আকর সকল মঙ্গলের নিদান পরব্রহ্মের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করিবে না? সেই পরম পিতার নিকটে গেলে তিনি আমারদিগকে যেরূপ উপদেশ দিবেন এমন আর কে দিবে? বিপদের কাণ্ডারী তিনি যেমন এমন আর আমারদের কে আছে? তবে কেন আমারদের দশা এরূপ হইল, যে, বরং আমরা আমারদের শত্রুপক্ষের দ্বারস্থ হইব, তথাপি যিনি আমারদের চিরকালের সুহৃৎ, আমারদের গৃহের গৃহদেবতা, আমারদের কুলের কুল-দেবতা, আত্মার পরমাত্মা, যিনি বিঘ্নের কৃপাণ মুক্তির সোপান, যিনি আমারদের দেশের পিতা মাতা বন্ধু, যাঁহার সহবাসে মুনিঋষিগণ অরণ্যের গভীরে থাকিয়াও অকুতোভয়ে পরমানন্দে কাল যাপন করিতেন, আমারদের সেই একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের প্রতি আমরা ভ্রমেও একবার চাহিয়া দেখিব না! বরং কালসর্পকে আমরা হৃদয়ে স্থান দিব, তথাপি পরমাত্মাকে হৃদয়ে স্থান দিব না। এই পাপেই আমারদের দেশ দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছে। এই পাপেই অশ্রুতপূর্ব্ব ভয়ানক বিপত্তি সকল আমারদের দেশে দুর্গপ্রতিষ্ঠা করিতেছে। বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে যে পাপ হয়, সতী লক্ষ্মীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে যে পাপ হয়, জন্মভূমিকে নিয়ত অশ্রুপাত করাইলে যে পাপ হয়, পরমাত্মাকে আত্মা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে তাহা হইতে যে কতগুণ অধিক পাপ হয়, তাহা বলা যায় না। এ পাপ হইতে পরমাত্মার অনন্ত প্রেম অনন্ত করুণা অনন্ত শক্তি আমারদের সকলকে রক্ষা করুন। হে পরমাত্মন্! যে সুন্দর তুমি এবং যে তোমার অপার করুণা, জীবন থাকিতে কি তোমাকে আমরা বিস্মৃত হইব? জীবন গেলেও কি তোমাকে আমরা বিস্মৃত হইব? তোমার ভক্ত আচার্য্যের মুখে এই উপদেশ শুনিয়াছি যে, আমারদের শত্রুরা যদি আমারদের হৃদয়কে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন কাটিয়া ফেলে, তথাপি আমরা সেই হৃদয় লইয়া তোমার

নিকটে গমন করিব। হে করুণানিধান! আমারদের এই দীনহীন এবং হতভাগ্য দেশকে একবার দেখাও যে একমেবাদ্বিতীয়ং তোমার এই নামের কিরূপ বল। তোমাকে ছাড়িয়া আমারদের বিদ্যাবুদ্ধির যত বল তাহা আমারদের বিস্তর দেখা হইয়াছে, আর তাহা আমরা দেখিতে চাই না, তোমাকে সাক্ষাৎ বর্ত্তমান দেখিতে চাই, অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান দেখিতে চাই, সম্পদে বিপদে সকল কালে বর্ত্তমান দেখিতে চাই, আমারদের এই প্রিয় ভারতভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে দুর্ব্বলের বলরূপে নির্ধনের ধনরূপে বর্ত্তমান দেখিতে চাই, তোমাকে পাইলেই আমরা প্রাণ পাই, জ্ঞান পাই, বল পাই, ভরসা পাই নিখিলের ঐশ্বর্য্য আমরা করতলে প্রাপ্ত হই। হে দয়াঘন! দর্শন দিয়া তৃষিত চাতক সকলের আশা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

সাধুসঙ্গ পাপীর সংশোধনের একটি প্রধান উপায়।

ঘোর পাপীর যখন অবশেষে চৈতন্যোদয় হয়, যখন তাহার উপর স্বর্গের "ডোর" আসিয়া নাবে, এবং সে আপনাকে অকল্যাণ-পথচারী জানিতে পারে, ও পাপ-প্রমুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়; সেই শুভ কাতরতার সময় সে আপনাকে ক্ষীণ ও অসহায় বোধ করিয়া এমন এক জন সৎপুরুষের আশ্রয় শশব্যস্ত হইয়া কামনা করে, যাঁহার বিশুদ্ধ পবিত্র হৃদয়ে সে আপন ক্লিষ্ট হৃদয় ন্যস্ত করিয়া আশ্বস্ত হইতে পারে, যাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া পুণ্যপথে স্বীয় বীত-অভ্যাস দুর্ব্বল চরণকে চালনা করিতে পারে। সংসারের অশান্তি ও বিগ্রহপূর্ণ মলিন অধোভাগে বহুকাল বিচরণ করিয়া সে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার আত্মা তেজোহীন ও ক্ষীণচক্ষু হইয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বর-কৃপায় কোন সুযোগ-সূত্রে সে উত্তুঙ্গ ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রবেশ-দেশে সদ্যমাত্র উপনীত; নিম্নে পাপ-কন্দর মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, পুরোভাগে পুণ্যের অতুল প্রখর জ্যোতি তাহাকে পরাঙ্মুখ ও হতাশ্বাস করিতেছে; কল্যাণকর এই নূতন পথে সে আপনাকে একাকী ও অসহায় দেখিয়া আতঙ্কিত হইতেছে। তাহার মনের এরূপ দোলায়মান অবস্থার সময় এদিকে নিম্নের আপাত মনোরম পাপ-প্রলোভন সকল সুযোগ পাইয়া আবার তাহাকে নানারূপ আশ্বাস প্রদর্শন করত আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করে, তাহার এরূপ ধর্ম্মবল সঞ্চয় নাই যে, সে সেই আকর্ষণ উপেক্ষা করে। ইহা পাপীর সঙ্কটের অবস্থা! ভাগ্যবান সেই, এ ঘোর সঙ্কটের সময় যাহার সাধুসঙ্গ-লাভ ঘটিয়া যায়।

উক্ত অভাজন এতকাল উহার দেবাদৃত সৎপ্রবৃত্তি সকলকে অধঃক্ষিপ্ত রাখিয়া মলিন করিয়া ফেলিয়াছে। অধোলোকের গরলময় বায়ুরাশিমধ্যে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া তাহার আত্মা রুগ্ন ও মৃতকল্প হইয়া গিয়াছে। সহসা ঈশ্বর-কৃপারূপ সুবায়ু-সংস্পর্শে কথঞ্চিৎ সচেতন হইয়াছে বটে কিন্তু সে এখনও সাহসহীন, সামর্থ্যহীন। সচেতন হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার চৈতন্য অনুতাপ-দহনে দগ্ধ হইবার জন্য। হায়! তাহার সে সময়ের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া কোন্ সাধু হৃদয় করুণাতে দ্রবীভূত না হয়? নিজে তৎসামর্থ্যহীন; সাধু কৃপা না করিলে, কে তাহার ধূসরিত মলিন আত্মার উপর ধর্ম্মের পূত বারি সিঞ্চন করিবে? সতত বীভৎস দর্শন দ্বারা তাহার নয়ন মন বিকলিত হইয়াছে, কে তাহাকে জ্যোতির্ম্ময় সুরলোকের আরামকর মোহনচ্ছবি দর্শন করাইয়া শান্ত করিবে? নিরন্তর অপভাষা শ্রবণ করিয়া তাহার কর্ণের বিকার জন্মিয়াছে, তাহার পবিত্র মাতৃভূমির মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি শুনাইয়া তাহাকে কে প্রকৃতিস্থ করিবে? এই চির-কুপথ্য-সেবী মুমূর্ষু আত্মাসমক্ষে সাধু মহাপুরুষ ভিন্ন অন্যে কে সঞ্জীবনী অলৌকিক সত্য-সুধা আনিয়া উপস্থিত করিবে? কে তাহার বিদ্রোহী অধুনা অনুতাপী পাপাত্মাকে মধুর সান্ত্বনা-বাক্য দ্বারা শান্ত করিবে? কাহার নিকট সে আপনার দোষ খ্যাপন করিয়া আপনার আত্মার লঘুত্ব ও স্বাস্থ্য সম্পাদন করিবে?

সে নিরন্তর ঈশ্বরের স্পষ্ট আদেশ সকল অবহেলন করিয়া আসিয়াছে, আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ তাহার কিছুমাত্র বলিবার নাই। বলিবার যো নাই যে, সে তাঁহার আদেশ সকল অনভিজ্ঞাত ছিল বা তৎসমুদায় গূঢ়ার্থক। ঈশ্বরের যে সমস্ত আদেশ অর্থাৎ নিয়মের উপর আমাদের আত্মার মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে, যাহা প্রতিপালন জন্য আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দায়ী, তৎসমুদায় অতি সহজ ও সহজ-জ্ঞান-লভ্য। তৎসমুদায় আমাদের জ্ঞান-গোচর হইবার জন্য কোন বাহ্য উপায় অপেক্ষা করে না। আমরা যখনই সেই কল্যাণকর নিয়ম সকল উল্লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হই, আমাদের নিজের অন্তরাত্মাই তখন আমাদিগকে বিরত হইতে উপদেশ দেয়; করিলে নিপীড়ন করে। এই অন্তরাত্মাকে অবজ্ঞা করিয়া এক্ষণে পাপীর দোষ খণ্ডনার্থ বলিবার কোন কথা নাই; বলিবার কথা নাই এই চিন্তা তাহার কাতরতাকে অত্যন্ত বৃদ্ধি করে।

আমরা পাপীর যে অবস্থার চিত্র উপরে অঙ্কিত করিয়াছি, তাহা তাহার অনুতাপের প্রথমাবস্থা। সে অবস্থায় তাহার আকুলিত তরল চিন্ততলে ঈশ্বরের যে স্বরূপ প্রতিফলিত হয় তাহা "উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহাভয়ঙ্কর।" তৎকালে সে অনুতাপ-তাড়নে পীড়িত হইয়া ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ জন্য ব্যাকুল হয় বটে, কিন্তু তাহার সাহস হয় না যে, সেই সর্ব্বদর্শী বিচারকের সম্মুখীন হয়। পূর্ব্ব দুষ্কৃত সমস্ত স্মরণ করিয়া সে হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছে, করুণাসাগর অনন্তদেবের অসীম করুণার প্রকৃত ভাব তখন তাহার বিক্ষুব্ধমনে প্রতিভাত হয় না।

অতএব অনুতাপ-তাড়নে অনুতাপী পাপী অসন্মার্গ পরিত্যাগেচ্ছু হইয়াও দুরিত-ভার-প্রপীড়িত আত্মা লইয়া ঈশ্বরের নিকটস্থ হইতে সাহস করে না। সে দূর হইতে তাঁহার ভৈরব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভীত ও হতাশ্বাস হইয়া পড়ে। মনে করে, স্বীয় দুষ্কৃত সকলের সমুচিত দণ্ড তাহার দুর্ব্বল আত্মা কখনই সহ্য করিতে পারিবে না। অনন্তদেবের বিরুদ্ধে তাহার অপরাধ, অনন্ত কালেও তাহার মার্জ্জনা নাই, এই সমস্ত অননুকূল ভাবে তাহার মনোবৃত্তি সকল অবসন্ন হইয়া যায়; তাহার ভবিষ্যতের আশা কিছুমাত্র থাকে না।

পাপী এই অবস্থায় উপনীত হইলে হয় ত সে পরকালের ভয়ে সংশয়বাদের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং, পুনরায় প্রলোভনের আশ্বাসে ভুলিয়া যায়। এই শেষোক্ত অবস্থাপন্ন ব্যক্তি যে পুনরায় পাপপথে পদার্পণ করে, তাহা এ জন্য নহে যে, সে পাপের অকল্যাণকারিতাকে ভয় করে না;—ভয় করে, কিন্তু সে অনভ্যস্ত পথে প্রবেশ করা কষ্টের বিষয় বোধ করিয়া আলস্য ও আরামের অনুরোধে ভবিষ্যৎ ফলাফলের প্রতি উদাসীন হইয়া স্বীয় চিরাভ্যস্ত অপথে প্রত্যাবৃত্ত হয়। কারণ আরাম-লালসা মানব-মনের অনিবার্য্য অন্ধ প্রবৃত্তি। সকল অবস্থাতেই উহা মানব-মনে প্রবল ভাবে অবস্থান করে।

তবে এরূপ সংকটে পড়িয়া দুর্ব্বল পাপীদিগের কি আর নিস্তার নাই? ঈশ্বর ইহার কি কোন প্রতিবিধান করেন নাই? তাঁহার সৃষ্ট এই দ্বিবিধ জগৎ কোন বিষয়ে ক্ষুণ্ণ নহে; অগ্রসূচনায় তিনি সকল অনর্থপাতেরই প্রতিবিধান করিয়া রাখিয়াছেন। যে ঈশ্বর ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল এবং বিবিদিসার জন্য বিশদ সত্য ও আত্মার বিহার জন্য ক্রমোন্নত জ্যোতির্ম্ময় স্বর্লোক-পরম্পরার সংস্থান করিয়া রাখিয়াছেন; তাঁহারই ব্যবস্থায় সাধুসঙ্গ প্রাগুক্তরূপ দুর্গতি পরিহারের মহৌষধ-স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥"

এই সজ্জন-সঙ্গতি কি?—কেবল জড়দেহ লইয়া সাধু-শরীরের সমীপস্থ করিতে পারিলেই পাপকৃৎদিগের সাধুসঙ্গ করা হইল না। সাধু-আত্মার সহিত আপন আত্মার সম্মিলন করা আবশ্যক। আত্মা ভিন্ন-জগতের পদার্থ; উহার প্রকৃতি জড়েতর। উহা স্থান বা কালের অধীন নহে। এক আসনস্থ হইলেই দুই আত্মার সম্মিলন হইল না এবং সমস্ত পৃথিবী চিরকাল ব্যবধান-স্বরূপ থাকিলেও দুই আত্মার সংযোগ ছিন্ন হইবে না। আত্মার নিত্য প্রকৃতি এই যে, সাদৃশ্য-সত্তায় উহারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এবং আত্মার ন্যায় পরিচালক ও পরিগ্রাহক পদার্থও বোধ হয়, জগতে আর দ্বিতীয় নাই। দুই আত্মার সন্নিকর্ষে এক পক্ষে দুর্ব্বল আত্মা অচিরাৎ তেজীয়ানের গুণ গ্রহণ করে, পক্ষান্তরের সংক্রমণ দ্বারা তেজীয়ান পবিত্র আত্মার বল অন্যতরে সঞ্চালিত হয়। অধিকন্তু আশ্চর্য্যের এই যে, এতৎ প্রক্রিয়া দ্বারা এই দ্বিতীয় আত্মার বলসম্বল ক্ষয় না হইয়া বরং উহা ধর্ম্মবলে অধিকতর বলীয়ান হইয়া উঠে। আমরা এইরূপে পরস্পরের সাহায্যে উপকৃত হইয়া সেই মহান্ আত্মার দিকে ধাবিত হই।

ধরাতলে মানব জাতির সর্ব্বপ্রকার উন্নতিই পরস্পরের সাহায্য-সাপেক্ষ, আত্মোন্নতিও সেইরূপ। যদি ঈশ্বর জগতে কেবল একটীমাত্র জীবাত্মার সৃজন করিতেন এবং তাহাকে একাকীই এই সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তির মধ্য দিয়া উন্নতির লক্ষ্যস্থল ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে হইত, অবলম্ব জন্য সমধর্ম্মী অন্য আত্মা একটীও না থাকিত, তাহা হইলে অদ্য পর্য্যন্ত সেই একাকী জীবাত্মা বর্ত্তমান কালের অতি নিকৃষ্ট অনুন্নত আত্মারও সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হইত কি না, সন্দেহ স্থল। কিন্তু সেই দয়াময় পিতার করুণা-সম্পৃক্ত বিধান ভিন্নরূপ। আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই তিনি আমাদিগকে জগতে আনিয়াছেন। উক্ত প্রকার উন্নতির সর্ব্বপ্রকার সম্ভাবিত সুযোগ সকলও আমাদের হস্তায়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি অসংখ্য জীবাত্মাকে অস্তিত্বে আনিয়া উন্নতির পথে স্থাপিত করিয়াছেন, আমরা ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই চরম ও পরম গতি বিশ্বাত্মার দিকেই উদ্‌গমন করিতেছি।

ক্রমশঃ

সাংখ্যদর্শন।

পরকাল।

যাহা দেখা যায় না তাহাতেই লোকের সংশয়, মতামত ও বিবাদ, সুতরাং মৃত্যুর উত্তর কাল কীদৃশ, ইহাতেও লোকের সংশয় মতামত ও বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে। পরকাল-ঘটিত প্রশ্ন অতি অসভ্য আদিম জীবের হৃদয়েও উত্থিত হইত, এখনকার লোকেরও হয়, ভবিষ্যতেও হইবে। কিন্তু

পরিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মনুষ্যকেই 'অস্তি' অর্থাৎ 'পরকাল একটা আছে' এই অংশে বিশ্বাস রক্ষা করিতে দেখা যায়। যজুর্ব্বেদের কঠবল্লীতে এতদর্থবোধক একটি আখ্যায়িকা আছে, এস্থলে আমরা সাধারণের গোচরার্থে তাহার মর্ম্মানুবাদ করিলাম, দৃষ্ট কর।

রাজশ্রবা নামক এক ঋষি একদা সর্ব্বস্বদেয় বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞ সমাপন করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে তৎকালে 'অমুককে অমুক দাও—অমুককে অমুক দাও—' এইরূপ একটা কোলাহল উত্থিত হইল। এতদবসরে তদীয় শিশুসন্তান নচিকেতা পিতৃসন্নিধানে গমন করিয়া বলিল "পিতঃ! আমায় কাহাকে দিবেন?" একবার দুইবার ও ততোধিকবার ঐরূপ কহিলে রাজশ্রবা বিরক্ত হইয়া কহিলেন "তোমায় যমকে দিব।"

নচিকেতা পিতৃবাক্যের সত্যতা রক্ষার নিমিত্ত মৃত্যু-রাজের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি, নচিকেতাকে বিবিধ বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া কহিলেন "নচিকেত! আমি তুষ্ট হইয়াছি, তুমি অভিলষিত বর গ্রহণ করিয়া বিদায় হও।"

নচিকেতা গো হিরণ্যাদি পার্থিব বস্তু পরিত্যাগ করিয়া গুহ্যতম অতীন্দ্রিয় বিজ্ঞান-ঘটিত পাঁচটি বর প্রার্থনা করিলেন, তন্মধ্যে, পরলোক বিজ্ঞান তাঁহার তৃতীয় বর। যথা,—

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষবরস্তৃতীয়ঃ।"
(কঠবল্লী)

জীব মৃত হইলে অনেকেই সংশয় করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, মরণের পর আত্মা থাকেন, কেহ বলেন, না—কিছুই থাকে না, মরণই শেষ। অতএব, আমাকে উহাই বিজ্ঞাপিত করুন, আমি যেন আপনার প্রসাদে উহার যাথার্থ্য অবগত হইতে পারি।

যম কহিলেন,

"দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতোবৃণীষ মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্"॥
(কঠবল্লী)

নচিকেত! তুমি এই বর ত্যাগ কর। তুমি এবিষয়ে আমায় অনুরোধ করিও না। এবিষয়ে দেবতারাও সন্দেহ করিয়া থাকেন, অতএব তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর।

এইরূপে নচিকেতাকে প্রলোভিত বা পরীক্ষিত করিবার নিমিত্ত ক্রমে হস্তী, অশ্ব, বৃষ, স্ত্রী, পুত্র, পশু, হিরণ্যাদি প্রদান করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু নচিকেতা তাহাতে মোহিত বা লুব্ধ না হইয়া পুনঃ পুনঃ পরলোকবিষয়ক গূঢ়তম রহস্য জানিতে ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে যম এই বলিয়া তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন।

"ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ংলোকো নাস্তি পরইতি মানী পুনঃপুনর্বশমাপদ্যতে মে॥"
[ইত্যাদি কঠবল্লী দেখ।

অর্থাৎ, পরলোকসত্তা অবিবেকী ও সাংসারিক সুখে নিমগ্ন মূঢ় জীবের সম্বন্ধে স্ফূর্ত্তি পায় না। তাদৃশ ব্যক্তিরা পুনঃ পুনঃ আমার বশতাপন্ন হয়। যম, এইরূপে কথাবতরণ করিয়া নচিকেতাকে পরলোকসত্তা বুঝাইয়া দিলে পর নচিকেতা পরলোকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে কাল কর্ত্তন করত এবং দুর্লভ্য আত্মবিজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন।

এই নাচিকেত-উপাখ্যানে পরলোকসত্তা-নির্ণায়ক যে সকল অন্যান্য বাক্য আছে, এস্থলে আর সে সমস্ত আহরণ করিলাম না, কারণ

আত্মার অমরত্ব দেহাতিরিক্তত্ব এবং স্বাতন্ত্র্য-ভাব নির্ণয় করাই নাচিকেত-উপাখ্যানের সার। যদি আত্মার অমরত্ব, দেহব্যতিরিক্তত্ব এবং স্বাতন্ত্র্যভাব নির্ণয় হইল, পরলোকসত্তা-নির্ণয় কৈমুতিক ন্যায়ে আপনাআপনিই নির্ণীত হইবে। এবং সে সমস্ত 'আত্মা' নামক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে সুতরাং আর বলিবার আবশ্যক নাই। অতএব পুরাতন কাল হইতেই পরলোক সত্বাসত্বের বিচার চলিয়া আসিতেছে এবং পরিশেষে সকলেরই অস্তিত্ব-পক্ষ অবলম্বন করিতে হইয়াছে। পরলোকসত্তা সমস্ত হিন্দুদার্শনিকদিগের অভিমত। প্রাচীন দার্শনিকদিগের অপর এক গভীর বাক্য আছে যাহা অনায়াসে পরকালের সাধক হইতে পারে। তাঁহারা বলেন, জরা মরণ প্রভৃতি বৈকারিক ধর্ম্ম সমস্ত আত্মাতে সংলগ্ন নহে—সমস্তই দেহে সংলগ্ন। "কৃশোহং—গৌরোহং—স্থূলোহং—বৃদ্ধোহং—জীর্ণোহহং" অর্থাৎ আমি কৃশ—আমি গৌর—আমি স্থূল—আমি বৃদ্ধ—আমি জীর্ণ—" ইত্যাদি বাক্য এবং অনুভব সকল মনুষ্যের সম্বন্ধে আধ্যাসিক অর্থাৎ পারমার্থিক নহে। এইরূপ চির-আধ্যাসিক জ্ঞান একপ্রকার স্বভাব শব্দের বাচ্য। এই আধ্যাসিক বা স্বাভাবিক প্রত্যয়ের মধ্যে যে জটিলতা আছে, পরমার্থ-জ্ঞান উপস্থিত হইয়া যদি তাহাকে ভঙ্গ করে, তাহা হইলে মনুষ্য কখন 'আমি কৃশ'—'আমি স্থূল'—'আমি বৃদ্ধ'—'আমি জীর্ণ' ভাবিয়া হৃষ্ট বা বিষণ্ণ হয় না। মনুষ্য যখন 'আমি বৃদ্ধ' ভাবিয়া বিষণ্ণ হয়, তখন তাহার শরীরের সহিত সম্পূর্ণ অধ্যাস [অধ্যাসের মর্ম্ম পূর্ব্বে বলা হইয়াছে] আছে, তথাপি তাহার অভ্যন্তর হইতে একটু একটু আত্মার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায়। যে বৃদ্ধ হইয়াছে সে কখনই সহজ জ্ঞানে মনে করে না 'আমি বৃদ্ধ হইয়াছি'। যখন সে শরীরের প্রতি লক্ষ্য করে, ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতা দৃষ্ট করে, বলহীনতা অনুভব করে, তখন সে 'আমি বৃদ্ধ হইয়াছি' ভাবিয়া বিষণ্ণ হয়, তাহার কারণ এই যে, সে তখন দৈহিক অধ্যাসে নিমগ্ন থাকে। যখন দৈহিক বৈকৃতির প্রতি লক্ষ্য না থাকে তখন সে কখনই ভাবে না যে 'আমি বৃদ্ধ'।—তাহার কারণ এই যে তাহার অজর অমর আত্মা তৎকালে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য-ভাবে আছে। অতএব বৃদ্ধ হইলেও বৃদ্ধ না হওয়ার ভাব আত্মার অমরত্ব পরকালের অস্তিত্বের সাক্ষী। সম্প্রদায়বিশেষ যেমন সাহজিক আত্মপ্রত্যয় দ্বারা ঈশ্বরসত্তা অবধারণ করেন, সেইরূপ ঈদৃশ আত্ম-প্রত্যয় দ্বারা আত্মার অমরত্ব এবং পরলোকের অস্তিত্ব সহজে অবধারিত হইতে পারে।

জন্ম, মরণ ও জীবন।

আত্মার অমরত্ব এবং পরকালের অস্তিত্ব যদি হিন্দুদিগের মতে নির্ণীত বা নিশ্চয় হইল, তবে মরে কে? কেবল দেহ? না মরণ-শব্দিত আর কিছু পদার্থ আছে? এই রূপ প্রশ্ন মনুষ্যসাধারণের হৃদয় হইতে উত্থিত হইতে পারে, এ জন্য আমারদিগকে এতদীয় মতের জন্ম, মরণ ও জীবন ব্যাপার বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

"মরে কে?"—এই প্রশ্নের উত্তরে সকল ঋষিরাই একবাক্যে বলেন "নায়ং হন্তি ন হন্যতে" কেহই মরে না এবং মরণ নামক কোন পদার্থান্তর নাই। তোমরা যে ঘটনাকে মরণ বলিয়া জান—একবার সূক্ষ্ম বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া তদীয় অভ্যন্তরে প্রবেশ কর, বুঝিতে পারিবে যে 'মরে কে—এবং মরণই বা কি'—মনে কর, কতকগুলি তৃণকাষ্ঠ ও রজ্জু প্রভৃতি সাবয়ব বস্তু আহরণ করিয়া দিব্য একটি অবয়বী [গৃহাদি] নির্ম্মাণ করিলে—জল বায়ু ও মৃত্তিকা আহরণ করিয়া

অপর একটি সাবয়বী [ঘটাদি] নির্ম্মাণ করিলে—ক্ষিতি জল বীজ একত্রিত করিলে তাহা হইতে অঙ্কুর, ক্রমে শাখা পল্লব জন্মিল—তাহাতে অপূর্ব্ব এক অবয়বী প্রস্তুত হইল—কিছু দিন পরে সেই সকল অবয়বের বিশ্লেষ বা বিকারভাব উপস্থিত হইল—যেরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলে বা নির্ম্মিত হইয়াছিল সে ভাবের অন্যথা হইল—বলিলে কি না গৃহটি ভগ্ন হইয়াছে, ঘটটি ধ্বংস হইয়াছে, বৃক্ষটি মরিয়া গিয়াছে। মনে কর দেখি, কি রূপ ঘটনার উপর তোমরা ভগ্ন, ধ্বংস ও মরণ শব্দ ব্যবহার করিলে? যে সকল সাবয়ব বস্তু সংযুক্ত হইয়া অপূর্ব্ব এক অবয়বী (মূর্ত্তি) প্রস্তুত করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই সকল অবয়বের শৈথিল্য হইয়াছে, বিকার হইয়াছে, সংযোগ ও নাশ হইয়াছে, সুতরাং তাদৃশ সংযোগের ধ্বংস, শৈথিল্য কি বিকার ভাবের উপরেই তোমাদের পূর্ব্বোক্ত শব্দের প্রয়োগ, সন্দেহ নাই। যদি তাহাই করিয়া থাক, তবে ঐ ভাবটি নির্জীব পদার্থ হইতে উঠাইয়া সজীব পদার্থে আন—তাহা হইলেই জীবন্ত পদার্থের মরণ কি? তাহা জানা হইল। জন্ম মরণ আর কিছুই নহে, বহুতর অবয়বের অপূর্ব্ব সংযোগ ভাবের নাম জন্ম, আর তাহারই বিয়োগ ভাবের নাম মরণ বা বিনাশ। মূর্ত্তি, রূপ, স্পর্শাদি গুণ ও উৎপত্তিভাব প্রায়শঃ সাংযোগিক বিকার, আর তাহার অমূর্ত্তি, অরূপ, অস্পর্শ ও পচন, ক্লেদন, চূর্ণন প্রভৃতি এবং ধ্বংসভাব সকল বৈয়োগিক বিকারমাত্র। জগৎযন্ত্র বা বিশ্বব্যাপার কেবল এবংবিধ সংযোগ বিয়োগেই চলিতেছে বুঝিতে হইবে। অতএব, সাবয়ব বস্তুর অবয়ব বিশেষের সংযোগ বিশেষের নাম জন্ম এবং তাহারই বিশ্লেষ বিশেষের নাম বিনাশ। এই বিনাশ সজীব অবয়বীর হইলে মরণ, আর নির্জীব জড় অবয়বীর হইলে ধ্বংস, বিনাশ এবং কদাচিৎ মরণও বলা যায়। সাংখ্যাচার্য্যেরা জীবের জন্ম মরণ ঘটনার বিষয় এইরূপেই বুঝাইয়াছেন, যথা,—

"অপূর্ব্বদেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতবিশেষেণ সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ"

(ইত্যাদি সাঙ্খ্যভাষ্য)

অর্থাৎ অভিনব দেহের সহিত সেন্দ্রিয় সমনস্ক জীবের সংযোগ ভাবের নাম জন্ম, আর তাহারই বিয়োগ ভাবের নাম মরণ।

এখন বিবেচনা কর, যদি সাবয়ব বস্তুর অবয়ববিশ্লেষ অর্থাৎ যে সংযোগ দ্বারা কতক গুলি অবয়ব একটি অপূর্ব্ব সংঘাতভাব ধারণ করিয়াছিল—সেই সংযোগের বিনাশের নাম মরণ হইল এবং তাহা সাবয়ব বস্তুতেই সম্ভবে, নিরবয়ব পদার্থে সম্ভবে না; কেন না নিরবয়ব বস্তুর বিনাশের কারণ নাই, সুতরাং আত্মারও মরণ নাই বলা হইল। যেহেতু আত্মা সূক্ষ্ম এবং নিরবয়ব। সূক্ষ্মতা এবং নিরবয়বত্ব নিবন্ধন যেমন আত্মার মরণ নাই, তেমনি ইন্দ্রিয়দিগেরও মরণ নাই, কেননা ইন্দ্রিয়গণও সূক্ষ্ম ও নিরবয়ব [ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে]।

আত্মা মরে না,—ইন্দ্রিয় মরে না,—দেহই মরে,—যদি এই সিদ্ধান্তই স্থির হইল, তবে অমুক মরিয়াছে—'আমি মরিব না বলিয়া 'দেহ মরিয়াছে—দেহ মরিবে, বলাই' ত উচিত? কিন্তু কেহই তাহা বলে না এবং ওরূপ সাহজিক প্রত্যয়ও কাহারো নাই কেন?

কারণ আছে। বস্তুতঃ এই দৃশ্যমান সংঘাত অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, আত্মা, এই সকলের সংযোগ ভাবের বিনাশ ভাব লক্ষ্য করিয়াই মরণ শব্দ এবং প্রত্যয় শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে প্রাণ সংযোগের ধ্বংসই প্রধান এবং প্রত্যক্ষ। প্রাণব্যাপার

নিবৃত্তি না হইলে অন্য গুলির সম্বন্ধ নিবৃত্তি হয় না। 'জীবন' 'মরণ' এই শব্দদ্বয়ের মূল অন্বেষণ করিলে ঐ অর্থ প্রতীতি হইবে। যথা 'জীব' ধাতু হইতে 'জীবন' আর 'মৃ' ধাতু হইতে 'মরণ'। 'জীব' ধাতুর অর্থ প্রাণ ধারণ, আর 'মৃ' ধাতুর অর্থ প্রাণত্যাগ। সুতরাং প্রাণ যখন দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাতের সহিত সম্মিলিত থাকে, ততক্ষণ জীবন, আর তাহা বিযুক্ত হইলেই মরণ।*

* তৃণকাষ্ঠাদি সংহত করিয়া তাহার যে দৃঢ়তা এবং ব্যবহারোপযোগিতা সম্পাদন করা যায়—তাহার নাম গৃহের জীবন। সেই দৃঢ়তা এবং সেই ব্যবহারোপযোগিতার যে অবস্থানকাল, তাহাই তাহার আয়ুঃ। জীবদেহের জীবন এবং আয়ুও এইরূপ।

শ্বাস প্রশ্বাস যাহার কার্য্য, তাহাই 'প্রাণ' শব্দের বাচ্য। পরন্তু সেই প্রাণ যে কি পদার্থ, তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া দার্শনিকদিগের মধ্যে মতভেদ জন্মিয়াছে। কেহ বলেন, উহা বাহ্য বায়ু, কেহ বলেন উহা ইন্দ্রিয়-সমষ্টির ব্যাপার মাত্র, কেহ বলেন, উহা একপ্রকার স্বতন্ত্র পদার্থ। প্রথম মতের নির্ণয় এইরূপ—"শরীরে যে তেজ অর্থাৎ উষ্মতা, জল ও আকাশ বা অবকাশ আছে, নিশ্বাস প্রশ্বাস বা প্রাণ, তন্ত্রিতয়ের সাংযোগিক কার্য্য।" দৈহিক উষ্ণতা, রস রক্তাদিরূপ জলকে উত্তেজিত করে। তদুভয়ের সংঘর্ষজনিত ক্রিয়াবিশেষ (বেগ) উদরকন্দরস্থ আকাশে গিয়া পরিপুষ্ট হয়। ঐ পরিপুষ্ট সাংযোগিক ক্রিয়া, ফুসফুস নামক সঙ্কোচ বিকাশসাধন যন্ত্রকে সঙ্কোচিত ও বিকাশিত করে। ফুসফুসের বিকাশ ক্রিয়াদ্বারা বাহ্য বায়ুকে পরিগ্রহ করে এবং সঙ্কোচ ক্রিয়া দ্বারা তাহা পুনরায় ত্যাগ করে। সুতরাং প্রাণ পদার্থ বাহ্য বায়ু হইতে পৃথক বস্তু নহে। এইরূপ প্রাণনব্যাপার থাকাতেই রসরক্তাদি সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হইয়া সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হয় এবং তদনুসারেই দেহের হ্রাস, বৃদ্ধি, জন্ম মরণাদি ভাব ঘটনা হয়। প্রাণোৎপত্তির মূল কারণ জল ও উষ্মতার যদি ধ্বংস হয় বা অন্যথা ঘটে, তাহা হইলে ঐ প্রাণ ব্যাপার বন্দ হইয়া যায় এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য সংযোগ ও বিধ্বস্ত হয়, সুতরাং প্রাণীর প্রাণধ্বংস রূপ মরণ উপস্থিত হয়। ঐ প্রাণ নাভিকন্দর হইতে সমুৎপন্ন হইয়া ফুসফুস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করে বলিয়া উহার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যথা, —হৃদি অর্থাৎ উর্দ্ধগামী হইলে প্রাণ, গুহ্যে অর্থাৎ অধোগামী হইলে অপান ইত্যাদি।

দ্বিতীয় মতেরও প্রণালী এইরূপ। প্রভেদ এই-যে, তাহারা জল ও উষ্মতাকে প্রাণোৎপত্তির কারণ না বলিয়া পঞ্জর চালন ন্যায়ে ইন্দ্রিয় সমষ্টির ব্যাপারকেই প্রাণোৎপত্তির কারণ বলেন। যেমন একটি পিঞ্জরস্থ অনেকগুলি পক্ষীর স্ব স্ব ব্যাপারে পঞ্জরটি পরিচালিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের দর্শন, শ্রবণ, মননাদি প্রত্যেক প্রত্যেক ব্যাপারের অনুব্যাপাররূপ স্বতন্ত্র একটি ব্যাপার উপস্থিত হয়, তদ্বলেই প্রাণযন্ত্র উত্তেজিত হইয়া যথাকথিত কর্ম্ম সম্পাদন করে। এই মতের ফল এই যে, ইন্দ্রিয় বৃত্তি সতেজ থাকিতে প্রাণ ব্যাপার বন্দ হয় না সুতরাং মরণকালে অগ্রে ইন্দ্রিয় বৃত্তির নিরোধ—তৎপরে প্রাণ ধ্বংস।

তৃতীয় পক্ষ বলেন, প্রাণ বাহ্যবায়ু নহে এবং ইন্দ্রিয় ব্যাপারও নহে। ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় উহা একটি স্বতন্ত্র পদার্থ, জীবের সহিত একযোগে বাস করে। ইন্দ্রিয়ের কার্য্য শক্তি এই প্রাণের দ্বারা উৎপন্ন হয় ও সুরক্ষিত হয়, এই প্রাণ যতক্ষণ সতেজ থাকিবে ততক্ষণই ইন্দ্রিয়গণ কার্য্য করিতে পারিবেন। এই প্রাণ যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ রস রক্তাদি সমুৎপন্ন ও সঞ্চালিত হইয়া দেহ রক্ষা করিবে। এই প্রাণ যে অঙ্গ পরিত্যাগ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইবে (পক্ষঘাতাদি) এবং প্রাণই উৎক্রান্তির কারণ। অর্থাৎ মনুষ্য যখন মরে তখন এই প্রাণই ক্রমশ ইন্দ্রিয়কে একত্র করিয়া আত্মাকে লইয়া উৎক্রান্ত অর্থাৎ শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। শ্রুতি, স্মৃতি এবং শারীরিক দর্শনে ইহার যুক্তি এবং বিস্তার আছে, আবশ্যক হইলে পাঠকগণ সেই সেই স্থান দেখিবেন।

জৈনধর্ম্ম।

পূর্ব্বোল্লিখিত জৈনগ্রন্থ সমূহ হইতে অর্হৎগণের জীবনীবিষয়ে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা সংক্ষেপে এই প্রস্তাবে নিবেশিত করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। বর্ত্তমান অবসর্পিনীকালে চব্বিশ জন অর্হৎ আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের নাম হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণির প্রথমকাণ্ডে উল্লিখিত আছে।

"এতস্যামবসর্পিণ্যামৃষভোঽজিতসম্ভবৌ।
অভিনন্দনঃ সুমতিস্ততঃ প্রদ্মপ্রভাভিধঃ ॥২৬
সুপার্শ্বশ্চন্দ্রপ্রভশ্চ সুবিধিশ্চাথ শীতলঃ।
শ্রেয়াংশোবাসুপূজ্যশ্চ বিমলোঽনন্ততীর্থকৃৎ ॥২৭
ধর্ম্মঃ শান্তিঃ কুন্থুররোমল্লিশ্চ মুনিসুব্রতঃ।
নিমির্নেমিঃ পার্শ্বো বীরশ্চতুর্বিংশতিরর্হতাম্।"২৮

ইহাঁদের বিষয় ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে। ইহাঁদের মধ্যে মুনি সুব্রত এবং নেমি কেবল হরিবংশোৎপন্ন; অবশিষ্ট দ্বাবিংশতি ঈক্ষ্বাকু বংশীয়। জৈনদিগের ঈক্ষ্বাকু সূর্য্যবংশীয় ঈক্ষ্বাকু হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। জৈনদিগের হরিবংশও হিন্দুদিগের হরিবংশ হইতে ভিন্ন। এক্ষণে অর্হৎগণের বিষয় বিবৃত হইতেছে।

১। ঋষভ প্রথম রাজা, প্রথম ভিক্ষাকর, প্রথম জিন এবং প্রথম তীর্থকর বলিয়া কীর্ত্তিত আছেন। কল্পসূত্রের মতে তিনি কোশলা বা অযোধ্যা প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, কৌশলিক শব্দে অভিহিত হয়েন। হেমচন্দ্রের মতে তাঁহার পিতার নাম নাভি এবং তাঁহার মাতার নাম মেরুদেবী। নাভি ঈক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ছিলেন। ঋষভ কনকবর্ণ এবং বৃষধ্বজযুক্ত। ইনি পঞ্চশত-ধনু (চতুর্হস্ত পরিমাণ) দীর্ঘ এবং ৮৪০০,০০০ পূর্ব্ব বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। ২০,০০০, ০০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি রাজত্ব প্রাপ্ত হয়েন এবং ৬৩০০,০০০ বৎসর রাজত্ব করেন। অতঃপর নিজ পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া ১০০, ০০০ একলক্ষ বৎসর তপস্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধনে অতিবাহিত করিয়া অষ্টাপদ পর্ব্বত শিখরে সংসার ত্যাগ করিয়া দেবত্ব লাভ করেন। ইহাঁর সংসার ত্যাগকালে জৈনদিগের তৃতীয় যুগের তিন বৎসর ৮॥০ মাস অবশিষ্ট ছিল। ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে ক্রমশঃ ঋষভদেবের আবির্ভাব এবং অনুচরিত বর্ণিত হইয়াছে। ইনি ভগবানের অবতার।

"ভগবান্ পরমর্ষিভিঃ প্রসাদিতোনাভেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া তদবরোধায়নে মেরুদেব্যাং ধর্ম্মান্ দর্শয়িতু কামোবাতরসনানাং শ্রমণানামৃষীণাং ঊর্দ্ধমন্থিনাং শুক্লয়া তনুবাবতার।*"

ভগবান্ পরম ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া নাভিরাজের হিতকরণ-মানসে তৎপত্নী মেরুদেবীর গর্ভে দিগম্বর শ্রমণদিগের ধর্ম্ম-প্রদর্শন করিতে কামনা করিয়া শুক্ল শরীর ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইলেন। উচিত বয়ঃক্রম কালে নাভিরাজ ঋষভকে রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক বিশালা নগরীতে সমাধি আরম্ভ করিলেন। ঋষভ জয়ন্তী নাম্নী কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহে তাঁহার শত পুত্র লাভ হয়; তন্মধ্যে মহাযোগী ভরত জেষ্ঠ্য। এই ভরতের নামে ভারতবর্ষের নাম হয়। ঋষভ হেমকূট পর্ব্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন। সে শৃঙ্গের নাম ঋষভকূট হইল। উভয় পরস্পর-বিরুদ্ধ শাস্ত্রে অর্থাৎ হিন্দু ও জৈনশাস্ত্রে ঋষভ এবং ইহার জনক জননীর নাম একরূপ। কিন্তু উভয় ঋষভ অভিন্ন ব্যক্তি কখনই হইতে পারে না। জৈনধর্ম্মাবলম্বীরা পূর্ব্বকালে হিন্দুদিগের হেয় এবং অশ্রদ্ধেয় ছিলেন না এই নিমিত্ত ভাগবতে প্রথম জিনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

২। অজিত দ্বিতীয় জিন। ইনি ঈক্ষ্বাকু বংশীয় জিতশত্রুর এবং বিজয়ার পুত্র। একটী গজ ইহার ধ্বজ। ইনি পীতবর্ণ। ইহাঁর দৈর্ঘ্য ৪৫০ ধনু এবং সংসার-কাল ৭২০০,০০০ পূর্ব্ব বর্ষ। ইহাঁর দেবত্ব প্রাপ্তি জৈনদিগের চতুর্থ যুগে ঘটিয়াছিল।

৩। সম্ভব তৃতীয় অর্হৎ। ইহাঁর পিতার নাম জিতারি এবং মাতার নাম সেনা। ইনি কনককান্তি ও অশ্বধ্বজ। ইহাঁর দৈর্ঘ্য ৪০০ ধনু, জীবিত কাল ৬০,০০,০০০ বৎসর।

৪। অভিনন্দন চতুর্থ জিন। ইহাঁর পিতার নাম সম্বর, মাতার নাম সিদ্ধার্থা। ইনি কপি

* ভাগবত তৃতীয় অধ্যায়।

ধ্বজ, দৈর্ঘ্য ৩০০ ধনু, সংসারকাল ৫০,০০,০০০ বৎসর।

৫। সুমতি পঞ্চম অর্হৎ। পিতার নাম মেঘ, মাতার নাম মঙ্গলা। ইনি ক্রৌঞ্চধ্বজ ও পীতবর্ণ। ৪০,০০,০০০ বৎসর ইহাঁর সংসারকাল।

৬। পদ্মপ্রভ ষষ্ঠ জিন। ইহাঁর পিতা শ্রীধর, মাতা সুসীমা, ইনি রক্তবর্ণ, অব্জধ্বজ। ইহাঁর জীবিতকাল ৩০,০০০০০ বৎসর, দৈর্ঘ্য ২০০ ধনু।

৭। সুপার্শ্ব সপ্তম জিন। ইহাঁর পিতা প্রতিষ্ঠ, মাতা পৃথ্বী। ইনি সুবর্ণদ্যুতি। ইহাঁর ধ্বজ স্বস্তিকাখ্য চিহ্ন। ২০,০০০০০বৎসর সংসারকাল।

৮। চন্দ্রপ্রভ অষ্টম অর্হৎ। ইনি মহাসেন নৃপতির পুত্র। ইহাঁর মাতার নাম লক্ষ্মণা। ইনি পীতবর্ণ, শশিধ্বজ, ১৫০ ধনুষ দীর্ঘ এবং ১০,০০০০০ বৎসর ইহাঁর জীবিতকাল।

৯। পুষ্পদন্ত নবম জিন। ইহাঁর অপর নাম সুবিধি। পিতার নাম হেমচন্দ্রের মতে সুগ্রীব, কিন্তু কল্পসূত্রের মতে সুপ্রিয়। মাতার নাম রামা। ইনি সুবর্ণবর্ণ, মকরধ্বজ, ১০০ ধনু দীর্ঘ, এবং ২০০০০০ বৎসর ইহাঁর সংসারকাল।

১০। শীতল দশম অর্হৎ। ইহাঁর পিতার নাম দৃঢ়রথ এবং মাতার নাম নন্দা। ইনি পীতবর্ণ, ইহাঁর ধ্বজ শ্রীবৎসচিহ্ন, ইনি ৯০ ধনু দীর্ঘ, ১০০০০০ বৎসর ইহাঁর জীবিতকাল।

১১। শ্রেয়াংশ একাদশ জিন। ইহাঁর অপর নাম শ্রেয়ান্। পিতা বিষ্ণু, মাতা বিষ্ণা। ইনি পীতবর্ণ, খড়্গীধ্বজ, ৮০ ধনু দীর্ঘ এবং ৮৪০০০০০ সামান্য বৎসর ইহাঁর সংসারকাল। পূর্ব্বে উল্লিখিত সমস্ত পূর্ব্ব বৎসর (জৈন বৎসর বিশেষ) এক্ষণ হইতে সামান্য বৎসর অর্থাৎ সাধারণ চলিত বৎসর লিখিত হইবে। জৈন কালভেদ নিরূপণ পরে প্রকাশিত হইবেক।

১২। বাসুপূজ্য দ্বাদশতম অর্হৎ। ইনি বাসুপূজ্যসুত। ইহাঁর মাতার নাম জায়া। ইনি রক্তবর্ণ, মহর্ষিধ্বজ, ৭০ ধনু দীর্ঘ এবং ৭২০০,০০০ সামান্য বৎসর ইহাঁর সংসারকাল।

১৩। বিমল ত্রয়োদশতম জিন। ইহাঁর পিতা কৃতবর্ম্মা, মাতা শ্যামা, বর্ণ পীত; ধ্বজ শূকর, দৈর্ঘ্য ৬০ ধনু এবং জীবিতকাল ৬০,০০০০০ বৎসর।

১৪। অনন্ততীর্থকৃৎ অথবা অনন্ত চতুর্দশতম অর্হৎ। ইহাঁর পিতা সিংহসেন, মাতা সুযশা; ধ্বজ শ্যেনপক্ষী, দৈর্ঘ্য ৫০ ধনু এবং সংসার ৩০,০০০০০ বৎসর।

১৫। ধর্ম্ম পঞ্চদশতম জিন। ইহাঁর পিতা ভানু, মাতা সুব্রতা; ধ্বজ বজ্র, দৈর্ঘ্য ৪৫ ধনু এবং সংসারকাল ১০,০০,০০০বৎসর।

১৬। শান্তি ষোড়শতম অর্হৎ। পিতা মহাসেন, মাতা অচিরা। ধ্বজ মৃগ, দৈর্ঘ্য ৪০ ধনু এবং জীবিতকালে ১০০,০০০ বৎসর। শান্তিপুরাণাখ্য জৈনগ্রন্থে ইহাঁর জীবনচরিত লিখিত আছে।

১৭। কুন্থু সপ্তদশতম জিন। ইহাঁর পিতার নাম সুর এবং মাতার নাম শ্রী। ইনি ছাগধ্বজ; দীর্ঘ ৩৫ধনু, ইহাঁর সংসারকাল ৯৫০০০ বৎসর।

১৮। অর অষ্টাদশতম অর্হৎ। ইহাঁর পিতা সুদর্শন, মাতা দেবী, ধ্বজ নন্দাবর্ত্তাখ্য চিহ্ন, দৈর্ঘ্য ৩০ ধনু, এবং জীবিতকাল ৮৪০০০ বৎসর।

১৯। মল্লি বা শ্রীমল্লি ঊনবিংশতিতম জিন। ইহাঁর পিতা কুম্ভ, মাতা প্রভাবতী। ইনি নীলবর্ণ, ঘটধ্বজ, ২৫ ধনু দীর্ঘ এবং ৫৫০০০ বৎসর ইহাঁর সংসারকাল।

২০। মুনিসুব্রত বিংশতিতম অর্হৎ। ইহাঁর অপর নাম সুব্রত বা মুনি। পিতার নাম সুমিত্র এবং মাতার নাম পদ্মা। ইনি হরিবংশোৎপন্ন, কৃষ্ণবর্ণ, কূর্ম্মধ্বজ ইহাঁর দৈর্ঘ্য ২০ ধনু এবং সংসারকাল ৩০,০০০ বৎসর।

২১। নিমি একবিংশতিতম জিন। পিতা বিজয়, মাতা বিপ্রা। ইনি ঈক্ষ্বাকুবংশীয়, পীতবর্ণ, নীলোৎপলধ্বজ, ১৫ ধনু দীর্ঘ এবং ১০০০০ বৎসর সংসারী।

২২। নেমি দ্বাবিংশতিতম অর্হৎ। ইহাঁর অপর নাম অরিষ্টনেমি। পিতা সমুদ্রবিজয় নৃপতি, মাতা শিবারাজ্ঞী। ইনি হরিবংশোৎপন্ন, কৃষ্ণবর্ণ, শঙ্খধ্বজ এবং ১০০০ বৎসর সংসারী। কল্পসূত্রের অনুসারে সোরিয় পুরে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৩০০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তপঃকৃচ্ছ্র আরম্ভ করিয়া ৭০০ বৎসরকাল তাহার অনুশীলন করত পবিত্র হইয়া উজ্জিন্ত নামক গিরিশৃঙ্গে সংসারমুক্ত হয়েন। টীকাকারের মতে উজ্জিন্ত গুর্জ্জর দেশস্থ গিণার পর্ব্বত। এইস্থানে অদ্যাপি একটি তীর্থ আছে। এই ঘটনাকালে জৈনদিগের চতুর্থযুগের ৮৪০০০ বৎসর অবশিষ্ট ছিল।

২৩। পার্শ্ব বা পার্শ্বনাথ ত্রয়োবিংশতিতম জিন। ইহাঁর পিতার নাম অশ্বসেন নৃপতি এবং মাতার নাম বামাদেবী। ইনি ঈক্ষ্বাকুবংশীয়, নীলবর্ণ ও ফণিধ্বজ। পার্শ্বনাথচরিত নামে জৈনগ্রন্থে ইহাঁর বিষয় সবিশেষ বর্ণিত আছে। কল্পসূত্রানুসারে বারাণসী ইহাঁর জন্মস্থান। বরাণসীর নিকটস্থ ভেলুপুরা তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি ত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তপস্যা দ্বারা শরীর সাধন আরম্ভ করিয়া, সপ্ততি বৎসর ক্রমাগত সাধন করিয়া, একশত বর্ষ বয়সে সমেত-শিখরে সংসারমুক্ত হয়েন। সমেত পর্ব্বত বঙ্গদেশের অন্তর্গত ছোটনাগপুর বিভাগে হাজারিবাগ জেলার মধ্যে অবস্থিত। ইহাকে পার্শ্বনাথ পর্ব্বতও বলে। এই পর্ব্বতের উপর পার্শ্বনাথের মন্দির আছে এবং শীতকালে তথায় বহুবিধ যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। এই পর্ব্বতে গন্ধর্ব্বনালা নামে একটী নদী প্রবাহিত আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, পুরাকালে গন্ধর্ব্বগণ এই নদীতে স্নানার্থ আগমন করিতেন। এই পর্ব্বতের উপর গবর্ণমেণ্টের 'বাঙ্গলা' নির্ম্মিত আছে এবং বিবিধ চা-ক্ষেত্রও দৃষ্ট হয়। স্থানটী দেখিতে অতিরম্য এবং প্রীতিকর। ইহা জৈনদিগের পরমতীর্থ। কল্পসূত্রের অনুসারে কল্পসূত্ররচনার ১২৩০ বৎসর পূর্ব্বে পার্শ্বনাথের সংসারমুক্তি হইয়াছিল। তদনুসারে খৃষ্টের ৮২০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা ঘটিয়াছিল।

২৪। মহাবীর চরম অর্হৎ। ইহাঁর অপর নাম বীর বা বর্দ্ধমান। ইহাঁর পিতার নাম সিদ্ধার্থ এবং মাতার নাম ত্রিশালাদেবী। ইনি পীতবর্ণ এবং সিংহধ্বজ। ইনি চরমতীর্থকৃৎ এবং শ্রবণ শব্দে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। কল্পসূত্রে ইহাঁর জীবনী বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। তদ্ভিন্ন মহাবীরচরিত নামক একখান জৈনগ্রন্থও আছে। ইহাঁর জীবনচরিত অতি বিস্তৃত, প্রস্তাবান্তরে তাহা প্রকাশিত হইবেক।

বর্ত্তমান অবসর্পিণী কালের অর্হৎগণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রকটিত হইল। এক্ষণে অতীত এবং অনাগত উৎসর্পিণী কালের অর্হৎগণের নামোল্লেখ করা যাইতেছে। হেমচন্দ্র কোষের প্রথম কাণ্ডের ৫০—৫৬ শ্লোকে ইহাঁদের নাম উল্লিখিত আছে। অতীত উৎসর্পিণীকালে চব্বিশ জন অর্হৎ আবির্ভূত হইয়াছিলেন; যথা, কেবলজ্ঞানী, নির্ব্বাণী, সাগর, মহাযশা, বিমল, সর্ব্বানুভূতি, শ্রীধর, দত্ততীর্থকৃৎ, দামোদর, সুতেজা, স্বামী, মুনিসুব্রত, সুমতি, শিবগতি, অস্তাগ, নিমীশ্বর, অনিল, যশোধর, কৃতার্থ, জিনেশ্বর, শুদ্ধমতি, শিবকর, স্যন্দন এবং সংপ্রতি। ভবিষ্যৎ উৎসর্পিণীতে যে চব্বিশ জন অর্হৎ আবির্ভূত হইবেন তাঁহাদিগের নাম; যথা, পদ্মনাভ, শূরদেব, সুপার্শ্বক স্বয়ম্প্রভ, সর্ব্বানুভূতি, দেব, শ্রুতোদয়, পেঢ়াল, পোট্টিল, শতকীর্ত্তি, সুব্রত, অমম, নিষ্কষায়, নিষ্পুলাক, নির্ম্মম, চিত্রগুপ্ত, সমাধি, সম্বর, যশোধর, বিজয়, মল্ল, দেব, অনন্তবীর্য্য এবং ভদ্রকৃৎ।

উপরি উক্ত ৭২ জন অর্হৎ জৈনদিগের

পূজ্য। বর্ত্তমান কালের অর্হৎগণের উপাসক এবং শাসনদেবতার নাম হেমচন্দ্রকোষে উক্ত আছে। উপাসকসংখ্যা যথা; গোমুখ, মহাযক্ষ, ত্রিমুখ, যক্ষনায়ক, তুম্বরু, কুসুম, মাতঙ্গ, বিজয়, জিত, ব্রহ্মা, যক্ষেট, কুমার, যন্মুখ, পাতাল, কিন্নর, গরুড়, গন্ধর্ব, যক্ষেশ, কুবের, বরুণ, ভৃকুটি, গোমেধ, পার্শ্ব এবং মাতঙ্গ। এই চব্বিশ জন অর্হৎদিগের উপাসক। শাসনদেবতাদিগের নাম উল্লিখিত হইতেছে, যথা, চক্রেশ্বরী, অজিতবলা, দুরিতারি, কালিকা, মহাকালী, শ্যামা, শান্তা, ভৃকুটি, সুতারকা, অশোকা, মানবী, চণ্ডা, বিদিতা, অঙ্কুশী, কন্দর্পা, নির্বাণী, বলা, ধারিণী, ধারণপ্রিয়া, নরদত্তা, গান্ধারী, অম্বিকা, পদ্মাবতী এবং সিদ্ধায়িকা এই চব্বিশজন ক্রমানুসারে জৈন শাসনদেবতা।

জৈন সিদ্ধপুরুষদিগের দেহ, রূপ ও গুণাদি বর্ণনা অতি আশ্চর্য্যকর। বক্ষ্যমাণ অন্যান্য সাধারণ গুণ সকলের নাম অতিশয় অর্থাৎ অলৌকিক এবং সর্ব্বলোকাতিগ। সিদ্ধপুরুষদিগের দেহোদ্ভূত রূপ এবং গন্ধ আময়শূন্য ও স্বেদমলবিবর্জ্জিত। শরীর অলৌকিক রূপ-লাবণ্যের আধার; রক্ত এবং মাংস দুগ্ধধারার ন্যায় ধবল, সুতরাং শরীর শুক্লবর্ণ। নিশ্বাস-বায়ু পদ্মগন্ধসদৃশ মনোহর এবং উহা চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া থাকে। কেশ, শ্মশ্রু, নখ প্রভৃতির বৃদ্ধি নাই। ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি লোকসাধারণ পরিবর্ত্তও তাঁহাদিগের লক্ষিত হয় না। তাঁহাদিগের আহারাদি ক্রিয়া অদৃশ্য। তাঁহারা ইচ্ছামাত্র যোজনমাত্র পরিসরেও কোটি কোটি মনুষ্য, দেব এবং পশু পক্ষী প্রভৃতি জীবগণকে একত্র সমাবেশ করিতে পারেন। তাঁহাদিগের বাণী যোজনগামিনী অর্থাৎ বহুদূর পর্য্যন্ত শ্রবণ করা যায় এবং মনুষ্য, পশু পক্ষী প্রভৃতি সকল প্রাণীই তাঁহাদিগের ভাষার ভাবগ্রহ করিতে পারে। তাঁহাদিগের পশ্চাদ্ভাগে স্থিত সূর্য্যমণ্ডলসদৃশ অতি দীপ্তিশালী একটি জ্যোতির্ম্মণ্ডল চতুর্দ্দিক আলোকিত করে। তাঁহারা যে প্রদেশ দিয়া গমন করেন তাহার চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত রোগ, মহামারী (অর্থাৎ মরক বা জনক্ষয়) অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ষড়্ শস্যের বিঘ্ন, দুর্ভিক্ষ, বৈর এবং যুদ্ধ বিগ্রহাদি সমস্ত অমঙ্গল একবারে বিদূরিত হয়। আকাশদেশে তাঁহাদিগের ধর্ম্মচক্র; চামর, পাদপাঠ সহিত সিংহাসন, উজ্জ্বল ছত্র, রত্নময় ধ্বজ এবং পদতলে সুবর্ণ পঙ্কজ শোভা পায়। মেঘধ্বনিসদৃশ গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য, ব্যাঘাতরাহিত্য, সন্দেহাভাব, স্নিগ্ধতা, মধুরতা, তত্ত্বনিষ্ঠতা, ভ্রমশূন্যতা, সত্বপ্রধানতা এবং অখিন্নতা প্রভৃতি তাঁহাদিগের পঞ্চত্রিংশৎ বাক্যগুণ কীর্ত্তিত আছে। রোগ, শোক, ভয়, নিন্দা, দ্বেষ, কাম, হাস্য, নিদ্রা, মিথ্যাকথন, অজ্ঞান প্রভৃতি মানুষিক দোষ সমূহ হইতে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এইরূপ তাঁহাদিগের যে কত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা উল্লেখ করিয়া শেষ করা অসাধ্য।

ভগবদ্গীতা বিষয়ে বক্তৃতা।

(জাতীয় সভায় অভিব্যক্ত)

আমি অদ্য ভগবদ্গীতা বিষয়ে বলিতে মানস করি। বিষয়টী যেরূপ কঠিন ও সময় যেরূপ অল্প তাহাতে আমার আশঙ্কা হইতেছে যে এবিষয়ে যেমন করিয়া বলা কর্ত্তব্য সেরূপ বলিতে পারিব না।

ভগবদ্গীতা শব্দের অর্থ "ঈশ্বরবিষয়ক সঙ্গীত।" প্রাচীন কালে ঈশ্বরবিষয়ক সকল কবিতাই উদ্গীত হইত এই জন্য ভগবদ্গীতা "গীতা" শব্দে আখ্যাত হইয়াছে। ভগবদ্গীতা মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্বের অন্তর্গত। উহা অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। উহাতে সর্ব্বশুদ্ধ সাত শত শ্লোক আছে। কল্পতরু মহাভারত হইতে যে সকল অমৃত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তন্মধ্যে ভগবদ্গীতা প্রধান। মহাভারতরূপ খনিতে যে সকল হীরক প্রাপ্ত হওয়া যায় তন্মধ্যে ভগবদ্গীতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিদেশীয় লোকে আমাদিগের কোহেনূর অপহরণ করিতে পারে কিন্তু এই অমূল্য হীরক অপহরণ করিতে পারে না। বিদেশীয় লোকে কোহেনূর উপভোগ করিলে আমাদিগের ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইতে পারে কিন্তু এই হীরক উপভোগ করিলে আমাদিগের ঈর্ষানল কখনই প্রজ্বলিত হইতে পারে না, বরং যতই তাহারা তাহা উপভোগ করিবে ততই আমাদিগের জাতির গৌরব বৃদ্ধি হইবে। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত এবং ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষের হিন্দু অধিবাসীরা ভগবদ্গীতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। কথাই আছে "গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।" মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের সহিত তর্ককালে ভগবদ্গীতার প্রমাণ দিয়া লিখিয়াছিলেন,

"ভগবদ্গীতা মানে না যে,
তার কথা মানিবে কে?"

ভগবদ্গীতা হিন্দুদিগের এত প্রিয় গ্রন্থ যে উহাকে আদর্শ করিয়া ভগবতীগীতা, রামগীতা, শিবগীতা প্রভৃতি গ্রন্থ সকল বিরচিত হইয়াছে এবং এই সকল গ্রন্থ অতিশয় আদরের সহিত অধীত হইয়া থাকে। সে কালে সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করিবার রীতি ছিল। আমার বিলক্ষণ স্মরণ হয়, আমার স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠ তাত মহাশয় ঐ প্রকার শ্লোকের মধ্যে রামায়ণের "মা নিষাদ" ইত্যাদি শ্লোকটি এবং ভগবদ্গীতার "ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে" ইত্যাদি শ্লোকটি প্রথম মুখস্থ করাইয়াছিলেন।

সেকালে বঙ্গদেশে এমন একটি গ্রাম ছিল না যন্নিবাসী কোন না কোন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভগবদ্গীতা বাঙ্গালা পদ্যে না অনুবাদ করিয়াছিলেন। সেই সকল অনুবাদের মধ্যে অদ্যাপি কোন না কোনটী বিদ্যমান থাকিতে পারে। ভগবদ্গীতা যে কেবল বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে এমত নহে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রচলিত ভাষায়ও অনুবাদিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতা যে কেবল ভারতবর্ষস্থ প্রচলিত ভাষা সকলে অনুবাদিত হইয়াছে এমত নহে তাহা ইউরোপ খণ্ডের অনেক ভাষাতেও অনুবাদিত হইয়াছে। বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ চার্লস উইল্কিন্স্ সাহেব মহোদয় ভগবদ্গীতা ইংরাজিতে প্রথম অনুবাদ করেন। আমার স্মরণ হয়, বীটন-বালিকা-বিদ্যালয়ের সংস্থাপক মহানুভাব ড্রিঙ্কওয়াটর বীটন্ সাহেব উইল্কিন্স সাহেবের অনুবাদ আমার নিকট হইতে লইয়া তাহা পাঠ করিয়া, হিন্দুশাস্ত্রে এমত সকল মহান্ সত্য পাওয়া যায় ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক পাদ্রি গ্যারেট সাহেব দেবনাগর ও দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত সকল ভাষার অক্ষরে ইংরাজী অনুবাদসহ ভগবদ্গীতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে তিনি ভগবদ্গীতার এরূপ প্রশংসা করিয়াছেন যে সেই প্রশংসা পাঠ কালে তাঁহাকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া বোধ হয় না। প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান-বিশারদ মহাযশা জরম্যান পণ্ডিত হুম্বোল্ড, যিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পাদনার্থ আমেরিকা, এফ্রিকা প্রভৃতি পৃথিবীর এমন স্থান নাই যেখানে ভ্রমণ করেন নাই, যাঁহার প্রণীত 'কস্‌মস্*' গ্রন্থ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ, তিনি মহা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত লাসেন সাহেবের সঙ্গে মিলিত হইয়া, ভগবদ্গীতা জরমেনী দেশে

* গ্রীকভাষায় 'কস্‌মস্' শব্দে জগৎ বুঝায়।

প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমাদিগের বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব কোন যুবক এক্ষণে জরমেনী দেশে তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন। তিনি আমাদিগকে সম্প্রতি যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা হইতে ভগবদ্গীতা সম্বন্ধীয় এক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"যখন দেশীয় জনগণ জানিতে পারিবেন ইউরোপের মহা মহা পণ্ডিতগণ আমাদিগের সাহিত্যের কেমন সম্মান করিয়াছেন ও করিতেছেন তখন দুরদৃষ্ট সুশিক্ষিত নব্য বাবুগণ দেখিয়া বিভ্রান্ত হইবে প্রবীণ জরমান্, ফরাশী, ইটালীয় ও ইংরাজী পণ্ডিতগণ সংস্কৃত সাহিত্য কি গভীররূপে আলোচনা করিয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে কিরূপ মতামত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা কেবল পোপের ইলিয়াস্ পড়িয়া কাব্যরসে নিমগ্ন হন তাঁহারা গোড়েচিও ও শ্লেগেলের রামায়ণভক্তি দেখিয়া অবশ্যই লজ্জিত হইবেন; যাঁহারা কেবল জোহন অথবা কেম্পিস পড়িয়া ঈশ্বরপ্রীতি সম্বর্দ্ধিত করেন, তাঁহারা হুম্বোলডের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ বাক্য শুনিলে অবশ্য অধিকতর উদারচিত্ততা লাভ করিবেন; যাঁহারা কেবল ঈশার পার্ব্বত্য বক্তৃতা পড়িয়াই মুগ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা কঠোপনিষদ পাঠ এবং তৎসম্বন্ধে প্রবীণ ব্যক্তিগণের মত শ্রবণ করিলে অনেক অনুদারতা হইতে মুক্তি লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।"

ভগবদ্গীতার আরম্ভ অতি চমৎকার। কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের সৈন্যগণ ব্যূহাকারে দণ্ডায়মান হইয়াছে, অর্জ্জুনের সারথী শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন "হে পার্থ! অবস্থিত কুরুগণকে দর্শন কর।" অর্জ্জুন দুই দল অবলোকন করিলেন এবং অনিত্য সম্পদের জন্য এতদ্রূপ নিকটসম্পর্কীয় ও পরমাত্মীয় ব্যক্তিগণকে নিহত করিতে উদ্যত হইয়াছেন ইহা মনে করিয়া অত্যন্ত মোহাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার একান্ত যুদ্ধবিরতি উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "আত্মার হন্তা কেহই নাই এবং তাহার বিনাশও হয় না, অতএব পণ্ডিত লোকে আত্মার জন্ম মৃত্যু মানিয়া মোহিত হয়েন না। সর্ব্বদা একরূপ, বিনাশরহিত ও অপরিচ্ছিন্ন যে আত্মা তাহার আশ্রিত দেহেরই কেবল বিনাশ হয়, অতএব তুমি শোক মোহ ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।" এইরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তদুপলক্ষে ধর্ম্মবিষয়ে অষ্টাদশ উপদেশ দেন তাহা লইয়া ভগবদ্গীতা রচিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ইংরাজ পুরাবৃত্ত-লেখক ডাক্তর রবার্টসন বলেন যে, দুই সৈন্যদল যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান রহিয়াছে এরূপ সময়ে ধর্ম্মবিষয়ে অষ্টাদশ দীর্ঘ উপদেশ দেওয়া সম্ভব নহে। তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে প্রাচীন হিন্দুরা সরওয়াল্টর স্কট্ কিম্বা ডিকেন্সের ন্যায় গল্প সাজাইতে পারিতেন না কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে এমন উপদেশ প্রদান করিতে পারিতেন যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকেরা এরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিল কি না সন্দেহ।

ক্রমশঃ

বিজ্ঞাপন।

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ আগামী ৩০ চৈত্র বুধবার সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে হইবে,

এবং

নববর্ষের ব্রাহ্মসমাজ আগামী ১ বৈশাখ বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে ৫ঘটিকার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজের নিজের পুস্তক এককালে অন্যূন ১০ দশ টাকার ক্রয় করিলে শতকরা ২৫ পঁচিশ টাকা এবং বাহিরের পুস্তক এককালে অন্যূন ১০ দশ টাকার লইলে শতকরা ২০ কুড়ি টাকা কমিসন দেওয়া যাইবে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নবম কল্পের দ্বিতীয় ভাগের সূচী পত্র

বৈশাখ ৩৯৩ সংখ্যা	পৃষ্ঠা
উপদেশ	১
বসন্ত কালের ব্রহ্মোপাসনা	৩
অধ্যাত্ম-বিদ্যা	৪
লবণাহার	৯
মনুষ্যের উন্নতির ত্রিবিধ সোপান	১৪
বাহ্য জগৎ আধ্যাত্মিক জগতের ছায়া	১৮
জ্যৈষ্ঠ ৩৯৪ সংখ্যা	
বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ	২১
নব-বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ	২৪
ধর্ম্মসাধন	২৬
অধ্যাত্ম-বিদ্যা	৩০
দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের সমন্বয়	৩২
সাংখ্য দর্শন	৩৩
স্ত্রীশিক্ষা	৩৭
গৃহকর্ম্ম হইতে উদ্ধৃত	৩৯
আষাঢ় ৩৯৫ সংখ্যা	
উপদেশ	৪১
প্রার্থনা ও ব্রহ্মদর্শন	৪৩
জ্ঞান ও প্রীতির সমন্বয়	৪৮
অধ্যাত্ম-বিদ্যা	৫০
বর্ত্তমান কাল অল্পবিদ্যা ও লঘু চিত্ততার কাল	৫১
সাংখ্যদর্শন	৫২
গৃহকর্ম্ম হইতে উদ্ধৃত	৫৫
নূতন পুস্তকের সমালোচনা	৫৬
শ্রাবণ ৩৯৬ সংখ্যা	
অধ্যাত্ম-বিদ্যা	৫৭
শরীর হইতে নবোন্মুক্ত আত্মার উক্তি	৬২
পার্থিব পদার্থের অকিঞ্চিৎকরতা	৬৩
বিজ্ঞান ধর্ম্মের অবিরোধী	৬৪
বিদ্যা	৬৬
পুরুষোত্তম ক্ষেত্র	৭০
ভাদ্র ৩৯৭ সংখ্যা	
ব্রহ্মোপাসনা	৭৩
বৌদ্ধ ধর্ম্ম	৭৭
অধ্যাত্ম-বিদ্যা	৮০
যোগী, ভক্ত ও সেবক	৮৩
বিদ্যা	৭৪
বৈদিক আর্য্যসমাজ	৮৫
The credulous age	৯০
আশ্বিন ৩৯৮ সংখ্যা	
ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ	৯৩
অধ্যাত্ম-বিদ্যা	৯৬
স্বদেশানুরাগ	৯৭
সাংখ্য দর্শন	১০২
বৈদিক আর্য্যসমাজ	১০৪
দুর্গোৎসব	১১১

কার্ত্তিক ৩৯৯ সংখ্যা	পৃষ্ঠা
জন্মতিথি দিবসে প্রার্থনা	১১৩
বৈদিক আর্য্যসমাজ	১১৪
ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি	১২১
স্বদেশীয় ভাষানুশীলন	১২৬
অগ্রহায়ণ ৪০০ সংখ্যা	
মোহ	১২৯
সাংখ্য দর্শন	১৩০
সুরাপান	১৩৪
অধুনা আমাদের দেশে বিদ্যা ফলবতী হয় না কেন	১৩৭
ঈশ্বরের উদ্ধারিণী শক্তি	১৪৫
নূতন পুস্তক	১৪৬
পৌষ ৪০১ সংখ্যা	
ঋগ্বেদের ব্যাখ্যান	১৪৯
সিন্দুরপটী ব্রাহ্মসমাজ	১৫০
উপদেশ	১৫১
সাংখ্য-দর্শন	১৫৩
নিরীশ্বর বিবাহ	১৫৬
জৈনধর্ম্ম	১৫৯
বৈদিক আর্য্যসমাজ	১৬৩
ভগবদ্গীতা হইতে শ্লোক সংগ্রহ	১৬৬
মাঘ ৪০২ সংখ্যা	
উপদেশ	১৬৯
বৈদিক আর্য্যসমাজ	১৭২
জৈনধর্ম্ম	১৭৬
বঙ্গদেশে শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা	১৭৯
কামকাট্‌কা দেশ	১৮৩
ভগবদ্গীতা হইতে শ্লোক সংগ্রহ	১৮৫
ফাল্গুন ৪০৩ সংখ্যা	
উপদেশ	১৮৯
সপ্তচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	১৯৫
ব্রহ্ম-সঙ্গীত	২০৩
ব্রহ্ম-সঙ্গীত	২০৬
অশুদ্ধ শোধন	২০৮
চৈত্র ৪০৪ সংখ্যা	
মাসিক ব্রাহ্মসমাজ	২০৯
উপদেশ	২১১
সাধুসঙ্গ পাপীর সংশোধনের প্রধান উপায়	২১৪
সাংখ্য দর্শন	২১৬
জৈনধর্ম্ম	২২০
ভগবদ্গীতা বিষয়ে বক্তৃতা	২২৪

	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
অধ্যাত্ম-বিদ্যা ...	৩৯৩ ...	৪
অধ্যাত্ম-বিদ্যা ...	৩৯৪ ...	৩০
অধ্যাত্ম বিদ্যা ...	৩৯৫ ...	৫০
অধ্যাত্ম বিদ্যা ...	৩৯৬ ...	৫৭
অধ্যাত্ম বিদ্যা ...	৩৯৭ ...	৮০
অধ্যাত্ম বিদ্যা ...	৩৯৮ ...	৯৬
অধুনা আমারদের দেশে বিদ্যা ফলবতী হয় না কেন ...	৪০০ ...	১৩৭
অশুদ্ধ শোধন ...	৪০৩ ...	২০৮
ঈশ্বরের উদ্ধারিণী শক্তি ...	৫০০ ...	১৪৫
উপদেশ ...	৩৯৩ ...	১
উপদেশ ...	৩৯৫ ...	৪১
উপদেশ ...	৪০১ ...	১৫১
উপদেশ ...	৪০২ ...	১৬৯
উপদেশ ...	৪০৩ ...	১৮৯
উপদেশ ...	৪০৪ ...	২১১
ঋগ্বেদের ব্যাখ্যান ...	৪০৩ ...	১৪৯
কামকাট্‌কা দেশ ...	৪০২ ...	১৮৩
গৃহকর্ম্ম হইতে উদ্ধৃত ...	৩৯৪ ...	৩৯
গৃহকর্ম্ম হইতে উদ্ধৃত ...	৩৯৫ ...	৫৫
জন্মতিথি দিবসে প্রার্থনা ...	৩৯৯ ...	১১৬
জৈনধর্ম্ম ...	৪০১ ...	১৫৯
জৈনধর্ম্ম ...	৪০২ ...	১৭৬
জৈনধর্ম্ম ...	৪০৪ ...	২২০
জ্ঞান ও প্রীতির সমন্বয় ...	৩৯৫ ...	৪৮
দুর্গোৎসব ...	৩৯৮ ...	১১১
দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের সমন্বয়	৩৯৪ ...	৩২
ধর্ম্মসাধন ...	৩৯৪ ...	২৬
নব-বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ ...	৩৯৪ ...	২৪
নিরীশ্বর বিবাহ ...	৪০১ ...	১৫৬
নূতন পুস্তকের সমালোচন ...	৩৯৫ ...	৫৬
নূতন পুস্তক ...	৪০০ ...	৪৬
পার্থিব পদার্থের অকিঞ্চিৎকরতা	৩৯৬ ...	৬৩
পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ...	৩৯৬ ...	৭০
প্রার্থনা ও ব্রহ্মদর্শন ...	৩৯৫ ...	৪৩
বশন্তকালে ব্রহ্মোপাসনা ...	৩৯৩ ...	৩
বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ ...	৩৯৪ ...	২১
বর্ত্তমান কাল অল্পবিদ্যা ও লঘু চিত্ততার কাল ...	৩৯৫ ...	৫১
বঙ্গদেশে শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা	৪০২ ...	১৭৯
বাহ্য জগৎ আধ্যাত্মিক জগতের ছায়া ...	৩৯৩ ...	১৮
বিজ্ঞান ধর্ম্মের অবিরোধি ...	৩৯৬ ...	৬৪
বিদ্যা ...	৩৯৬ ...	৬৬
বিদ্যা ...	৩৯৭ ...	৭৪
বৈদিক আর্য্যসমাজ ...	৩৯৭ ...	৮৫
বৈদিক আর্য্যসমাজ ...	৩৯৮ ...	১০৪
বৈদিক আর্য্যসমাজ ...	৩৯৯ ...	১১৪
বৈদিক আর্য্যসমাজ ...	৪০১ ...	১৬৩
বৈদিক আর্য্যসমাজ ...	৪০২ ...	১৭২
বৌদ্ধধর্ম্ম ...	৩৯৭ ...	৭৩
ব্রহ্মোপাসনা ...	৩৯ ...	৭৩
ব্রহ্মসঙ্গীত ...	৪০৩ ...	২০৩
ব্রহ্মসঙ্গীত ...	৪০৩ ...	২০৪
ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ ...	৩৯৮ ...	৯৩
ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি ...	৩৯৯ ...	১২১
ভগবদ্গীতা হইতে শ্লোক সংগ্রহ	৪০১ ...	১৬৬
ভগবদ্গীতা হইতে শ্লোক সংগ্রহ	৪০২ ...	১৮৫
ভগবদ্গীতা বিষয়ে বক্তৃতা ...	৪০৪ ...	২২৪
মনুষ্যের উন্নতির ত্রিবিধ সোপান ...	৩৯৩ ...	১৪
মোহ ...	৪০০ ...	১২৯
মাসিক ব্রাহ্মসমাজ ...	৪০৪ ...	২০৯
যোগী, ভক্ত ও সেবক ...	৩৯৭ ...	৮৩
লবণাহার ...	৩৯৩ ...	৯
শরীর হইতে নবোন্মুক্ত আত্মার উক্তি ...	৩৯৬ ...	৬২
সপ্ত চত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ...	৪০৩ ..	১৯৫
সাধুসঙ্গ পাপীর সংশোধনের প্রধান উপায় ...	৪০৪ ...	২১৪
সাংখ্য দর্শন ...	৩৯৪ ...	৩৩
সাংখ্য দর্শন ...	৩৯৫ ...	৫২
সাংখ্য দর্শন ...	৩৯৮ ..	১০২
সাংখ্য দর্শন ...	৪০০ ...	১৩০
সাংখ্য দর্শন ...	৪০১ ...	১৫৩
সাংখ্য দর্শন ...	৪০৪ ...	২১৬
স্বদেশানুরাগ ...	৩৯৮ ...	৯৭
স্বদেশীয় ভাষানুশীলন ...	৩৯৯ ...	১২৬
সিন্দূরপটী সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	৪০১ ...	১৫০
সুরাপান ...	৪০০ ...	১৩৪
স্ত্রীশিক্ষা ...	৩৯৪ ...	৩৭
The credulous age. ..	৩৯৭ ..	৯০

বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক ছয় আনা।